কাঁটায়-কাঁটায়

নারায়ণ সান্যাল

পি. কে. বাসু—কাঁটা সিরিজের গোয়েন্দা কাহিনী

কাঁটায়-কাঁটায়

পঞ্চম খণ্ড

বিশের কাঁটা 9

দর্পণে প্রতিবিম্বিত কাঁটা 115

সকল কাঁটা ধন্য করে 175

চাঁপারঙের মুর্শিদাবাদী শাড়ির কাঁটা 249

বিশের কাঁটা

নারায়ণ সান্যাল

বিশের কাঁটা

রচনাকাল : 1995

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, 1996

প্রচ্ছদশিল্পী : অমিত চক্রবর্তী

উৎসর্গ : শ্রী বিশ্বজিৎ মতিলাল

বেশ কিছুদিন হাতে কোনো কাজ আসেনি। তার মানে এ নয় যে, এই কল্লোলিনী কলকাতায় খুন-জখম-রাহাজানি জাতীয় অপরাধ কমে গেছে। মোট কথা বাসু-সাহেবের দ্বারস্থ হয়নি নিরপরাধীরা। বাসু-সাহেব প্রাতর্ভ্রমণ অন্তে ফিরে এসে সকলের সঙ্গে প্রাতরাশ সেরেছেন। বাগানে নয়; কাল রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই প্রাতরাশ সারা হয়েছে 'ডাইনিং হল'-এ। তারপর খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে এসে বসেছেন তাঁর চেম্বারে। শীতের সকাল—জানুয়ারির মাঝামাঝি। বস্তুত 15.1.93 তারিখ শুক্রবারের কথা। কলকাতার শীত অবশ্য—তবে বাসু-সাহেবের ঠাণ্ডার ধাত। তাই তাঁর গায়ে গরম কোট, তদুপরি গলায় গলবন্ধ। খবরের কাগজে প্রথম পাতার হেড-লাইগুলো পড়া শেষ হবার আগেই ইন্টারকমে 'নজরকাড়ি' শব্দ হলো। কাগজটা নামিয়ে বাঁ-হাতে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললেন, বলো? কোনো মক্কেল-টক্কেল পথ ভুলে এ পাড়ায় এসে পড়েছে নাকি?

ভিজিটার্স রুম, বা গৌরবে যাকে 'রিসেপশান' বলা হয় সেই ঘর থেকে রানী বলেন, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চাইছেন। গুয়াহাটি থেকে আসছেন। নাম বলুলেন, মিস্টার মহাদেব জালান।

বাসু জানতে চাইলেন, ব-ফলা আছে?

একটু হকচকিয়ে যান রানী। আগন্তুকের সামনে অপ্রস্তুত হতে চান না বলে যন্ত্রটার 'কথামুখে' বলেন, আসছি ও-ঘরে।

মিস্টার জালানকে রিসেপশান রুমের ডানলোপিলো-সোফায় বসিয়ে একটু অপেক্ষা করতে বলে, রানী দেবী তাঁর চাকা-গাড়িতে পাক মেরে এ-ঘরের দিকে এগিয়ে আসেন।

যেসব পাঠক-পাঠিকা ইতিপূর্বে কোনো কন্টকাকীর্ণ কাহিনীর ঘুলঘুলিয়ায় বিড়ম্বি... দুর্ভাগ্য থেকে বঞ্চিত তাঁদের এইখানে জনান্তিকে জানিয়ে রাখা দরকার : বৃদ্ধ-তরুণ পি. বাসু কলকাতা হাইকোর্টের একজন নামকরা ক্রিমিনাল-সাইড ব্যারিস্টার। থাকেন তাঁর নি... আলিপুরের বাড়িতে। চেম্বারটা ঐ বাড়ির বৈঠকখানায়। একই বাড়ির অপরাংশে থাকে ওঁদের স্নেহধন্য দম্পতি কৌশিক আর সুজাতা। ভাড়াটে নয়, নিঃসন্তান বৃদ্ধ দম্পত্তির পরিবারভুক্ত হিসাবে। তারা দুজনে একটি প্রাইফেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছে। নাম 'সুকৌশলী'। বাসু-সাহেবের ধর্মপত্নী তথা একান্তসচিব রানী দেবী প্রৌঢ়া। ইনভ্যালিড চেয়ারে চেপে এঘর-ওঘর করেন। একটিমাত্র সন্তান ছিল তাঁর। মোটর-অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

চেয়ারের চাকায় পাক মেরে রিসেপশান থেকে বাসু-সাহেবের চেম্বারে এসে রানী জানতে চান, ওটা কী বললে তখন? 'ব-ফলা আছে' মানে?

—'ব-ফলা' চেন না? বিদ্যাসাগরমশায়ের বর্ণ-পরিচয়টা আর একবার ঝালিয়ে নিও। জানতে চাইছি, মহাদেব কি তৃতীয় নেত্রের আগুনে মানুষজনকে ক্রমাগত জ্বালান? দেখে তাই মনে হলো?

—ও! 'জ্বালান'! না বাপু, আমার তা মনে হয়নি। পরনে দামী সাফারি স্যুট, ব্রাউন রঙের। বছর চল্লিশ বয়স। খর্বকায়, কিন্তু স্বাস্থ্যবান। শরদিন্দু হলে হয়তো বলতেন, 'মস্তকে দর্পণসদৃশ ইন্দুলুপ্ত'। শৌখিন মানুষ। বলেছেন, গতকাল বিকালে গুয়াহাটি থেকে আই. সি-230 ফ্লাইট ধরে কলকাতায় এসেছেন। উঠেছেন লিন্ডসে স্ট্রিটের ডিউক হোটেলে। প্রয়োজনটা কী, তা শুধু তোমাকে জানাতে চাইছেন।

—বুঝলাম। আ-নে বোলো! দেখি, জালান কী পরিমাণ জ্বালান।

একটু পরেই এ-ঘরে এলেন মিস্টার জালান। রানী দেবীর বর্ণনায় আর কিছু সংযোজন করা চলে : গায়ের রঙ বায়সকৃষ্ণ। মুখে বসন্তের দাগ। উচ্চতা পাঁচ ফুট তিনের কাছাকাছি। চোখে দামী ফ্রেমের চশমা। দেখলেই বোঝা যায়, লোকটি ধূর্ত এবং অর্থকরী-বিচারে জীবনে সাফল্যমণ্ডিত। হাতে ক্লাসিক সিগারেটের কার্টন।

বাসুকে নমস্কার করে বললেন, কাল সন্ধ্যায় গুয়াহাটি থেকে এসেছি। জানি, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসা উচিত ছিল। চেষ্টার ত্রুটি করিনি স্যার; কিন্তু কিছুতেই লাইন পেলাম না।

বাসু বলেন, আপনি বোধহয় টেলিফোন ডাইরেক্টারি দেখে ফোন নাম্বারটা সংগ্রহ করেছেন। আপনার জানা নেই, জোব চার্নকের প্রয়াণের পরবর্তী কালে এ শহরে টেলিফোন গাইডের আর কোনো সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। এই নিন আমার কার্ড। নাম্বারটা ওতেই লেখা আছে। কী ব্যাপার বলুন?

—কোথা থেকে শুরু করব তাই ভাবছি।

—একেবারে 'বিগ্ ব্যাঙ' থেকে শুরু নাই বা করলেন।

—'বিগ্ ব্যাঙ'? বিগ্ ব্যাঙ কী?

—আমাদের পুরাণে বলা হয়েছে, সৃষ্টির আদিমতম অবতার হচ্ছেন 'মৎস্য'। আধুনিক বিজ্ঞানীরা তা মানেন না। তাঁরা বলেন, মৎস্য নয় ঃ ব্যাঙ! Big Bang! গড দ্য ফাদার বললেন, 'লেট দেয়ার বি লাইট!' অমনি লাফ মারল বিরাটাকার একটা 'ব্যাঙ'। বিগ্ ব্যাঙের উল্লম্ফনে সব আলোয় আলো হয়ে গেল...

মহাদেব বললেন, আমি ব্যবসায়ী মানুষ, আধুনিক বিজ্ঞান...

—তাই তো বলছি। ওসব প্রসঙ্গ থাক। নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়ে এসেছেন। সেই

বিপদের সূত্রপাত থেকেই না হয় শুরু করুন। আপনার নাম তো মহাদেব জালান। কী করেন আপনি?

—অনেক রকম বিজনেস্ আছে আমার। নানারকম এজেন্সি। পেট্রল পাম্প, ইন্ডেন গ্যাস...

—তাই বলুন। ঠিকই ধরেছি! 'ব-ফলা' প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্তমান!

—আজ্ঞে?

—কিছু না। বলে যান?

মহাদেব জালান একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ইদানীং ধনী ব্যবসায়ীরা যে ব্যবসা কব্জা করে কোটিপতি থেকে অর্বুদপতি হওয়া যায় সেটিও করায়ত্ত করেছেন অর্থাৎ 'রাজনীতি ব্যবসায়'। কখনো ডান, কখনো বাম! 'আসামভ্যালী মাল্‌টিপার্পাস এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড' কোম্পানির এই বড় তরফ কখন কোন পার্টির সমর্থক বোঝা কঠিন। স্থানীয় একজন ধনী ব্যক্তিকে পার্টনার করে ব্যবসায় নেমেছিলেন বছর-দশেক আগে। এক দশকেই জালান গুয়াহাটির অন্যতম ধনিকশ্রেষ্ঠ। দুর্ভাগ্যবশত ওঁর বিজনেস-পার্টনার ইতিমধ্যে স্বর্গারোহণ করেছেন : সন্তোষমোহন বড়ুয়া। মহাদেব কাজের ঘূর্ণাবর্তে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, বিবাহ করে ওঠার সময় পাননি। অপরপক্ষে সন্তোষমোহনের একটিমাত্র কন্যাসন্তান : মাধবী। গত বছর বি. এ. পাশ করে পড়াশুনায় পূর্ণচ্ছেদ টেনেছে। বয়স : বাইশ। অত্যন্ত সুন্দরী, সুতনুকা। খুব ভাল গানের গলা। গুয়াহাটির দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে তার নিয়মিত প্রোগ্রাম থাকে। শহরের সবাই তাকে চেনে।

বাসু আগ বাড়িয়ে বলেন, বিপদটা মনে হচ্ছে ঐ মাধবী বড়ুয়ারই?

—আজ্ঞে ঠিকই ধরেছেন আপনি।

—তাহলে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন না কেন? তাছাড়া বিপদটা কি গুয়াহাটি হাইকোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত নয়?

মহাদেব তাঁর ক্লাসিক-কার্টন থেকে একটি সিগারেট বার করে ধরালেন। বাসু-সাহেবের দিকে কার্টনটা বাড়িয়ে ধরতে গিয়ে লক্ষ্য করেন তিনি পাইপ সেবন করছেন। দেশলাই-কাঠিটা অ্যাশ্‌ট্রেতে গুঁজে দিয়ে মহাদেব বলেন, আপনি দু-দুটো প্রশ্ন করেছেন। প্রথম প্রশ্নের জবাব : মাধু—আই মীন মাধবী, এখন কোথায় আছে তা আমি জানি না। এটুকু শুধু জানি যে, গত সোমবার ইন্ডিয়ান এয়ার-লাইন্সের ফ্লাইট আই-সি 708 এর প্যাসেঞ্জার লিস্টে তার নাম ছিল। সে ঐ প্লেনে উঠেছিলও। কলকাতা এসেছে এটা অবধারিত; কিন্তু এখানে আছে, না বোম্বাই চলে গেছে তা জানি না। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব এই যে, অপরাধটার সূচনা গুয়াহাটিতে হয়েছিল বটে, তবে সেটা দুঃসম্পন্ন হয়েছে এই কলকাতাতেই।

—'দুঃসম্পন্ন' মানে?

—আয়াম সরি। আমি ভাল বাঙলা জানি না। 'সুসম্পন্ন' শব্দটার অ্যান্টোনিম কি 'দুঃসম্পন্ন' নয়?

বাসু বললেন, আয়াম ইকোয়লি সরি। বাঙলাভাষাটা আমিও ভাল জানি না। তা সে যা-হোক, এবার ঐ মাধু—ইউ মীন মাধবীর, বিপদটা কীভাবে পাকালো সেটা জানান বরং?

মহাদেবের দীর্ঘ জবানবন্দি সংক্ষেপিত করলে মোদ্দা তথ্যটা এইরকম দাঁড়ায় —

আসামভ্যালী মাল্‌টিপার্পাস এন্টারপ্রাইজ-এর তিনজন ডাইরেক্টার। পঞ্চাশ শতাংশ শেয়ারের মালিক মহাদেব, পঁয়তাল্লিশ শতাংশের বর্তমান মালিক সন্তোষমোহন বড়ুয়ার বিধবা শান্তি দেবী। বাকি পাঁচ শতাংশ শেয়ার বিক্রয় করা হয়েছিল সন্তোষমোহনের বাল্যবন্ধু ডাক্তার

হৃদয়নাথ বড়গোঁহাইকে। কোম্পানি-ল অনুসারে অন্তত তিন জন অংশীদার না থাকলে নানান অসুবিধা দেখা দেয়। সে যাহোক, সন্তোষবাবুর মতো তাঁর বাল্যবন্ধুও স্বর্গারোহণ করেছেন। ঐ পাঁচ শতাংশ শেয়ার বর্তেছে হৃদয়নাথের একমাত্র পুত্র, মাতৃহীন শান্তনুর অ্যাকাউন্টে। শান্তনু পড়ত গুয়াহাটির মেডিকেল কলেজে। মাধবীর চেয়ে কিছু সিনিয়ার। বছর দুয়েক আগে ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়েছে। সম্প্রতি হাসপাতালের হাউস-ফিজিশিয়ানশিপ ছেড়ে নিজের বাড়িতে প্র্যাকটিসে বসেছিল। বাবার প্র্যাকটিস ভালই ছিল। ফলে শান্তনু ধীরে ধীরে পশার জমিয়ে তুলছিল।

যে তথ্যটা মহাদেব স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেননি, কিন্তু তীক্ষ্ণধী বাসু-সাহেব আন্দাজ করে নিলেন তা এই : সন্তোষমোহনের মৃত্যুর আগে থেকে না হলেও, তাঁর প্রয়াণের পরবর্তীকালে মহাদেব অর্ধেক রাজত্বসহ একটি রাজকন্যার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। শান্তি দেবী নানা বিষয়ে মহাদেবের উপর নির্ভরশীলা। ফলে যাতায়াতটা ছিলই। বাধা একটাই : বয়সের। মাধবী বাইশ, মহাদেব বিয়াল্লিশ! কিন্তু তাতে কী হলো? এটাই তো ভারতীয় প্রথা! বিবাহবাসরে হবুজামাইকে দেখে মেনকার কি মূর্ছা যাবার উপক্রম হয়নি? আর শুধু ভারতীয়ই বা কেন? সারা বিশ্বে কীর্তিমান মানুষেরা কী ঐতিহ্য রেখে গেছেন? অনাসিস, পাব্‌লো পিকাসো, মার্লিন ব্র্যান্ডো? তাছাড়া মহাদেব জালান কিছু দোজবরে নন!

বয়সের বাধাটা মহাদেবের মতে অনতিক্রমণীয় ছিল না। বয়সের খামতিটার জন্য যথাযোগ্য 'মূল্য ধরে দিতে' সে তো গররাজি নয়। রূপের খামতি রূপায় না কুলালে, সোনায়। বাধ সাধলো পাঁচ শতাংশের ছপ্পড়-ফোঁড়-মালিক ঐ কালকের ছোঁড়াটা। সে কিছুতেই ঐ পাঁচ শতাংশ শেয়ার বেচতে রাজি হলো না। ক্রমে সে মহাদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে চাইল। বোঝ দুঃসাহসের দৌড়টা! ঐ ছোঁড়া সারা মাসে যা উপার্জন করে তার দ্বিগুণ অর্থ দৈনিক জমা পড়ে মহাদেবের মাসিক ফিক্সড-ডিপোসিট অ্যাকাউন্টের সুদ হিসাবে। কিন্তু মুশকিল এই যে, মল্লযুদ্ধটা তো কুবেরমঞ্চে নয় মদনের বাসরে! তবু লড়ছিল মহাদেব। মদনভস্মের আয়োজন করছিল নেপথ্যে।

ইতিমধ্যে ঘটে গেল একটা অবিশ্বাস্য আজব ঘটনা। কোথাও কিছু নেই, বোম্বাই থেকে উড়ে এল এক ভুঁইফোঁড় আলাদীনের দৈত্য : অনীশ আগরওয়াল। বোম্বাইয়ের একটি প্রখ্যাত ফিল্ম প্রোডাকশানের তরফে সে নাকি ভূ-ভারত চুঁড়ে বেড়াচ্ছে একজন বেহেস্তী হুরীর তল্লাশে। মেদবর্জিত, সুতনুকা, সুন্দরী, বয়স পঁচিশের কম, কনভেন্ট ললিতা, হিন্দি কথোপকথনে পারদর্শিনী, মাইক-ফিটিং গলা। উচ্চতা পাঁচ-তিনের কম নয়। খুঁজতে খুঁজতে অনীশ গোটা গাঙ্গেয় উপত্যকা পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁছেছে ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায়—গুয়াহাটিতে। সে সন্ধ্যায় ঘটনাচক্রে টি. ভি. তে মাধবীর একটা গানের অনুষ্ঠান ছিল। পছন্দ হয়ে গেল অনীশের। দূরদর্শন অফিস থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে এসে দেখা করল শান্তি দেবীর সঙ্গে, মাধবীর সঙ্গে।

অনীশ তার অ্যাটাচি খুলে দেখালো—বোম্বাই-এর ফিল্ম কোম্পানি তাকে নায়িকা নির্বাচনের নির্ব্যূঢ় অধিকার দিয়েছে। অবশ্য নির্বাচিতা প্রার্থিনীকে মাইক-টেস্ট, স্ক্রীন-টেস্ট ইত্যাদি পাশ করতে হবে। তবে মাধবীর ক্ষেত্রে সেসব প্রশ্ন ওঠে না। কারণ মাধবী দূরদর্শন ও আকাশবাণীর বাঁধা আর্টিস্ট। মাধবীকে নির্বাচন করে চুক্তিনামা স্বাক্ষর করলে কোম্পানি তাকে নায়িকা হিসাবে অন্তত তিনটি ছবিতে কাজ করাবে, অথবা তিন বছর ধরে—যেটা কম হয়। মাস-মাহিনা পঁচিশ হাজার টাকা। এছাড়া বোম্বাইয়ে একটি তিন-কামরার ফার্নিশ্‌ড্ ফ্লাট, ড্রাইভারসহ গাড়ি, টেলিফোন, টি.ভি, ভি সি. আর, ফ্রিজ, আরও নানা জাতের পার্কস্!

শহরে রীতিমতো হৈচৈ পড়ে গেল। শান্তি দেবীর আপত্তি ছিল। একমাত্র মেয়ে, অতদূরে চলে যাবে, দীর্ঘ তিন বছরের জন্য। কিন্তু মেয়ের জেদাজেদিতে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হলো।

অনীশ জানালো, ঐ ফিল্ম কোম্পানির কোনো অফিস আসাম রাজ্যে নেই। মাধবীকে তাই কলকাতায় এসে চুক্তিনামায় স্বাক্ষর দিতে হবে। কলকাতায় ঐ ফিল্ম কোম্পনির একটি শাখা-অফিস আছে ধর্মতলায়। তার আগে অবশ্য মাধবীর টি. ভি. ক্যাসেটের ভি. ডি. ও. টেপ বানিয়ে তা ক্যুরিয়ার সার্ভিসে বোম্বাইয়ে পাঠানো হলো। অবিলম্বে তাদের সম্মতিও এসে গেল।

মহাদেব জালানের ঘোরতর আপত্তি ছিল। কিন্তু সে আপত্তি ধোপে টিকল না। মাধবীর স্বার্থে মহাদেব বোম্বাইতে এস. টি. ডি. টেলিফোন করেছিল। কোম্পানির লীগ্যাল অ্যাডভাইসার সেকশান জানালো যে, অনীশ আগরওয়াল কোম্পানির বৈধ এজেন্ট। তাকে নায়িকা নির্বাচনের জন্য কোম্পানি স্পেশ্যাল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দিয়ে রেখেছে।

ডিসেম্বরের একুশে মাধবী আর অনীশ এসেছিল কলকাতায় চুক্তিনামায় সই করতে। শান্তি দেবীর অনুরোধে মহাদেবও এসেছিল ওদের সঙ্গে। ওরা উঠেছিলেন লাউডন স্ট্রিটের 'হোটেল রাতদিন'-এ। তিন জনে তিনটি পৃথক কক্ষে। পরদিন একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওরা তিন জনে চলে আসে ধর্মতলার ব্রাঞ্চ-অফিসে। খুব সাজানো-গোছানো অফিস। বাতানুকূল করা। রিসেপশানিস্টের কাউন্টারে তিন রঙের তিনটে টেলিফোন। তদপুরি একটি ইন্টারকম। সেদিন ছিল ছুটির দিন। তবু পুরো দমে অফিসে কাজ হচ্ছে। বোধকরি সবাই ওভারটাইমে।

অনীশ ওঁদের দুজনের সঙ্গে কলকাতা ব্রাঞ্চ-অফিসের ম্যানেজারের আলাপ করিয়ে দিল। তিনি মাধবীকে অভিনন্দন জানালেন। বীয়ার এল সকলের জন্য। শুধু মাধবী পান করল কফি। একটু পরে এলেন কলকাতাস্থিত কোম্পানির আইন পরামর্শদাতা। তিনিও আনুষ্ঠানিকভাবে মাধবীকে কনগ্র্যাচুলেট করলেন। মাধবী এবং মহাদেব চুক্তিখানি পাঠ করলেন। মাধবী স্বাক্ষর দিল। মহাদেব সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর দিলেন। কোম্পানির তরফে অনীশ সই দিল—সে ছিল স্পেশাল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি হোল্ডার।

সে রাত্রে মোকাম্বোতে দারুণ খানাপিনার আয়োজন হলো। মাধবীই একমাত্র মহিলা। পরদিন চুক্তিনামা নিয়ে অনীশ ফিরে গেল বোম্বাই, এঁরা দু'জন ফিরে এলেন গুয়াহাটিতে।

আসামের নানান পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে গুয়াহাটিতে একাধিক দৈনিকে মাধবীর ছবি ছাপা হলো। তার ইন্টারভিয়ু প্রকাশিত হলো। শহরের কিছু উৎসাহী সিনেমাপাগল স্থানীয় সাংসদকে চেপে ধরল। বাধ্য হয়ে তিনি একটি নাগরিক সম্বর্ধনার আয়োজন করলেন। একটি অসমীয়া মেয়ে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় সবাইকে পিছনে ফেলে বোম্বাইয়ের তারকাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যাচ্ছে এটা কি কম কথা?

বলা বাহুল্য, সাংসদ শুধু ব্যবস্থাই করেছিলেন। তিনি শুধু আমন্ত্রণ কর্তা। বাস্তবে ব্যয়ভার বহন করেছিলেন মহাদেব জালান। তারপরেই একেবারে বিনামেঘে বজ্রপাত। এগারোই জানুয়ারির ডাকে এসে পৌছালো বোম্বাই থেকে একটি মর্মান্তিক পত্র। প্রযোজক চুক্তিনামার সাঁইত্রিশ-সি ধারা মোতাবেক জানাচ্ছেন যে, বিশেষ কারণে ওঁরা মাধবী বড়ুয়ার চুক্তিপত্র গ্রহণ করতে অসমর্থ।

বাসু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, কী ছিল সেই সাঁইত্রিশ-সি ক্লজ-এ?

—প্রয়োজনবোধে কোনো কারণ না দেখিয়ে কোম্পানি একতরফাভাবে ঐ চুক্তিপত্রটা বাতিল করতে পারবে। এ জন্য কোনো খেসারত দাবি করা চলবে না।

—তা এ ক্লজটা আপনারা পড়ে দেখেননি?

—দেখেছিলাম। কিন্তু গুরুত্বটা বুঝতে পারিনি।

—আই সী। তা আপনাদের প্লেন ভাড়া, হোটেল ভাড়া, মোকাম্বোর খাওয়ার খরচ কে মেটালো? অনীশ না আপনি?

—অধিকাংশই অনীশ। কিছুটা আমি।

বাসু বলেন, বুঝলাম। এ ক্ষেত্রে না অনীশ আগরওয়াল, না ওদের কোম্পানি কেউই তো বে-আইনি কাজ কিছু করেনি। তাহলে আপনি কেন এসেছেন?

—আপনাকে স্যার, আসল কথাটাই এখনো বলা হয়নি।

—কী সেই আসল কথাটা? এবার সেটাই বলুন?

—চাকরিটা পাইয়ে দেবে বলে অনীশ মাধুর কাছে থেকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছে।

—প-ঞ্চা-শ হাজার! অত টাকা মাধবীর কাছে ছিল?

—মানে, ইয়ে, মা-মেয়ের তো জয়েন্ট-অ্যাকাউন্ট। ইউনিট-ট্রাস্ট, এন. এস. সি., শেয়ার, সবই দুজনের নামে। এগ্রিমেন্টে সই করার পর মাকে না-জানিয়ে, মায় আমাকেও না-জানিয়ে মৌখিক চুক্তিমতো মাধু অনীশকে টাকাটা দিয়েছে। সরল বিশ্বাসে, যাতে অনীশ কন্ট্রাক্টটা বোম্বাইয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি পাকা করে ফেলতে পারে। তারপর থেকেই অনীশ হাওয়ায় মিশে গেছে। মাধু কারও কাছে মুখ দেখাতে পারছে না। গুয়াহাটি শহরে সে কোনমুখে ফিরে যাবে? চিঠিখানা পেয়েই সে কাউকে কিছু না বলে কলকাতায় চলে এসেছে। আমি দু-চারজন উকিল-ব্যারিস্টারের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, সহজ সরল আইনের পথে কিচ্ছু হবে না। অনীশ বে-আইনি কাজ কিছুই করেনি। তার এই শয়তানীর জন্য কেউ যদি তাকে শায়েস্তা করতে পারে—তাহলে সেটা আপনিই। পঞ্চাশ হাজার টাকাটা কিছু নয়, কিন্তু আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে, মাধু আমাকে এগ্রিমেন্টটা দেখিয়ে তারপর স্বাক্ষর করেছে। আমি যে মরমে মরে আছি। টাকাটা আপনি উদ্ধার করুন তা বলছি না, কিন্তু শয়তানটাকে আপনি যথোপযুক্ত শাস্তি দিন—এটাই আমার প্রার্থনা। বলুন স্যার, আপনাকে কী রিটেইনার দেব?

বাসু বললেন, 'রিটেইনারের প্রসঙ্গে পরে আসছি। আপনি এ পর্যন্ত যা বলেছেন তা আইনের পর্যায়ে আসে না। না অনীশ, না তার ফিল্ম কোম্পানি, কেউই বে-আইনি কোনো কাজ করেনি। আপনারা কন্ট্রাক্টের অর্থ না বুঝে, আইনজ্ঞের পরামর্শ না নিয়ে যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন তার জন্য যা ভোগান্তি তা আপনাদেরই পোহাতে হবে। তাছাড়া ফিল্ম কোম্পানি আপনাদের গুয়াহাটি-কলকাতার বিমান ভাড়া দিয়েছে, হোটেল খরচ দিয়েছে। ফলে কোনোভাবেই আপনাদের কোনো কেস আইনত দাঁড়ায় না। কিন্তু নেপথ্যে যে কাণ্ডটা ঘটেছে তা নিশ্চয় অন্যায়। একটি কুমারী মেয়েকে গ্ল্যামারের লোভ দেখিয়ে আগরওয়াল যে অর্থটা আত্মসাৎ করেছে, ন্যায়ত ধর্মত সেজন্য তার শাস্তি হবার কথা। যেহেতু সে রসিদ দিয়ে ঘুষের টাকাটা নেয়নি তাই আইন এখানে ক্ষমতাহীন। আইনের চোখে যে ঘুষ দেয় এবং যে ঘুষ নেয়—দুজনেই দায়ী। কিন্তু আইনই তো ন্যায়ধর্মের শেষ কথা নয়। আমার মনে হয় আপনি যা চাইছেন তা একটি প্রাইভেট গোয়েন্দা এজেন্সির এক্তিয়ারে। তারাই অনীশ আগরওয়ালের হদিস আপনাকে জানাবে। তারপর সে যদি ঘুষের টাকাটা প্রত্যর্পণে স্বীকৃত না হয়...

মহাদেব বাধা দিয়ে বলে, তেমন বিশ্বস্ত গোয়েন্দা এজেন্সি আছে এই কলকাতা শহরে?

—আছে। এই বাড়িতেই আছে। আমি ইন্টারকমে বলে দিচ্ছি, ওরা স্বামী-স্ত্রী একটি গোয়েন্দা সংস্থার মালিক। নাম : সুকৌশলী। আপনি ওদের কাছে গিয়ে আপনাদের সমস্যার কথা বলুন। ওরা হয়তো অনীশ আগরওয়াল আর মাধবী বড়ুয়ার সন্ধান খুঁজে বার করতে

পারবে। বাকি কাজ আপনাদের দুজনের এবং সুকৌশলীর। আমার কোন ভূমিকা নেই।

—থ্যাঙ্কু, স্যার। কিন্তু আমার একটা আশঙ্কা হচ্ছে যে, মাধু—আই মীন মাধবী, যদি অনীশের সন্ধান আদৌ পায় তাহলে রাগের মাথায় কিছু একটা ভালমন্দ করে ফেলতে পারে। সেটা খুবই স্বাভাবিক। তাকে নিয়ে গুয়াহাটিতে অনেক হৈচৈ হয়েছে। অনীশ তাকে রাতারাতি খ্যাতির সপ্তম স্বর্গে তুলে দিয়েছিল। তাই মাকে না জানিয়ে মাধবী লুকিয়ে অনীশকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছে। আর পরিবর্তে অনীশ ওকে চরম অবমাননার মধ্যে এনে ফেলেছে। বেচারি নিজের জন্মভূমিতে ফিরতে পারছে না। আমি জানি, মাধু একেবারে মরিয়া হয়ে আছে। আপনি স্যার, অনুমতি দিন, আমি আপনাকে কিছু অগ্রিম রিটেইনার দিয়ে যাই—মানে মাধু যদি কোনো ভালমন্দে জড়িয়ে পড়ে তবে আপনি তার কেসটা দেখবেন। ধরুন, আপাতত হাজার টাকা? ঠিক আছে?

বাসু বললেন, ঠিক আছে। আপনি ওঘর থেকে রসিদটা নিয়ে যাবেন। আমি ইন্টারকমে আমার সেক্রেটারিকে বলে দিচ্ছি। তবে একটা কথা পরিষ্কার সমঝে নিন, মিস্টার জালান। টাকাটা কে দিচ্ছেন সেটা কোনো ফ্যাকটার নয়, যদি এই ব্যাপারে কোনো মামলা-মোকদ্দমা হয় তবে আমি মাধবী বড়ুয়ার স্বার্থ দেখব শুধু।

—সার্টেনলি, স্যার। আপনি একমাত্র মাধবী বড়ুয়ার স্বার্থটাই দেখবেন। সে যদি বে-আইনি, আই মীন উত্তেজনাবশে বিসদৃশ কিছু করে বসে তবে আপনি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন।

—অলরাইট। আপনি এবার এই 'ইউ-শেপ' বাড়ির অপর উইং-এ চলে যান। সুকৌশলী গোয়েন্দা এজেন্সির সাইন বোর্ডটা নিশ্চয় দেখতে পাবেন। আমি ইতিমধ্যে ইন্টারকমে ব্যাপারটা ওদের জানিয়ে দিচ্ছি। আপনি নিঃসঙ্কোচে ওদের সব কথা খুলে বলবেন।

—থ্যাঙ্কু, স্যার।

দুই

বাসু ঘড়ি দেখলেন। বেলা দশটার কাছাকাছি। বাসু-সাহেবের জানা ছিল সমরেন্দ্র নন্দী আই. পি. এস. দশটার আগেই অফিসে হাজিরা দেন। ফলে কোনো সময় নষ্ট না করে গাড়িটা বার করেন।

বারান্দায় হুইল চেয়ারে বসেছিলেন রানী। বলেন, কখন ফিরছ?

—দুপুরে এসে লাঞ্চ খাব। ক্যারামেল পুডিংটা ফ্রিজে আছে তো? না কি কালই খতম হয়ে গেল?

রানী মুখে আঁচল চাপা দেন। বলেন, বয়স যত বাড়ছে তোমার নোলাও তত বাড়ছে।

বাসু স্বীকার করেন, উপায় কী? তোমার নজরদারিতে এখন তো একাহারী হয়ে পড়েছি। ওবেলা তো স্রেফ খই দুধ!

ভবানী-ভবনে দুর্নীতিদমন বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার ডি. সি. ক্রাইম সমরেন্দ্র নন্দীর সঙ্গে বাসু-সাহেবের বিশেষ খাতির। সেটা জানা ছিল তাঁর একান্ত সচিবের। তাই সরাসরি চেম্বারে উপস্থিত হতে কোনো বাধা পেতে হলো না। সুইংডোরে সৌজন্যসূচক নক করে দরজাটা ইঞ্চিখানেক ফাঁক করে বাসু জানতে চান, ভিতরে আসতে পারি? স্যার খুব ব্যস্ত নন তো?

সমরেন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। প্রবীণ ব্যারিস্টারটিকে আরক্ষা বিভাগে সবাই সম্মান করে। নন্দী বলেন, আসুন, আসুন, স্যার। আজ যে এক্কেরে সাত সকালে? খুনটা হলো কোথায়?

বাসু ভিতরে এসে ওঁর দর্শনার্থীর চেয়ার দখল করে বসলেন। বললেন, অনেকদিন এ-পাড়ায় আসিনি। তোমাদের আধুনিক হালচাল তাই ঠিক জানি না। ইদানিং কি কেউ খুন না হওয়া পর্যন্ত তুমি ভিজিটার্সদের কফি-টফি খাওয়াও না?

নন্দী প্রাণখোলা হাসি হাসেন। বলেন, আপনি আধাআধি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। মানে ভিজিটার্সদের শুধু কফি খাওয়াই। প্রাপ্তবয়স্ক হলে 'টফি' খাওয়াই না।

ইন্টারকমে একান্ত সচিবকে আদেশ দিলেন ঘরে দু-কাপ কফি পাঠিয়ে দিতে। তারপর বলেন, খুন নয় তাহলে? কী কেস? এম্বেজ্‌লমেন্ট?

বাসু গুয়াহাটির কেসটা সংক্ষেপে বিবৃত করে বলেন, কেসটা যদিও অঙ্কুরিত হয়েছে আসামে, কিন্তু চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছে ধর্মতলায়। ফলে আইনত, ধর্মত, ধর্মতলাত, এটা ক্যালকাটা হাইকোর্টের এক্তিয়ারে।

নন্দী বলেন, জানি। কেসটা নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে প্রাথমিক তদন্তও করেছি। একজন ব্যবসাদারের পীড়াপীড়িতে। তিনি ইলেকশনে মোটা চাঁদা দেন, ফলে রাজনৈতিক চাপও ছিল।

—ব্যবসাদারটি কে? মহাদেব জালান?

—হ্যাঁ, তাই। আমরা তদন্ত করে জেনেছি যে, অনীশ আগরওয়াল ঐ ফিল্ম কোম্পানির এজেন্ট—হক কথা। স্পেশাল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি হোল্ডার হিসাবে কোম্পানির তরফে সই করার অধিকার তার ছিল। আবার চুক্তনামার ধারা-মোতাবেক সেটা নাকচ করার একতরফা অধিকারও কোম্পানির ছিল। ইতিমধ্যে আপনার মক্কেল মাধবী বড়ুয়া যদি ঘুষ দিতে গিয়ে ফেঁসে যায় তাহলে পুলিশ কী করতে পারে বলুন?

—বটেই তো! পুলিশ কিছু করতে পারে না। কিন্তু আমরা কিছু করলে পুলিশের আপত্তি নেই তো?

—আপনি কী করবেন?

—আমি একবচনে বলিনি নন্দী, বলেছি গৌরবে বহুবচনে, 'আমরা'। আমি বুড়ো মানুষ, কী আবার করব? তবে আমার নন্দীভৃঙ্গিরা যদি উত্তম-মধ্যমের মাধ্যমে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়—

বাধা দিয়ে সমরেন্দ্র বলেন, 'উত্তম-মধ্যমে' আপত্তি নেই—সে তো লক্‌-আপের ভিতরে আমরাও দিয়ে থাকি। দেখবেন 'অধম' না হয়ে যায়। অর্থাৎ ভায়া-হাসপাতাল শ্মশানে না নিয়ে যেতে হয়। ঐ ডাক্তারবাবুকেও আমি সে-কথাই বলেছি।

—'ডাক্তারবাবু' মানে?

—ঐ যে কী যেন নাম—হ্যাঁ, মনে পড়েছে শান্তনু বড়গোঁহাই। কাল বিকালে সে ঐ একই কেসে খোঁজখবর নিতে এসেছিল।

—তুমি তাকে কী বললে?

—বললাম ঐ একই কথা। আমাদের হাতে কোনো প্রাইমাফেসি কেসই নেই। কেউ কোনো এফ. আই. আর. করেনি। আর করবেই বা কী করে? অনীশ তো রসিদ দিয়ে টাকাটা নেয়নি মাধবী কাজ হাঁসিল করতে ঘুষ দিয়েছে, যার কোনো প্রমাণ নেই। এর আবার পুলিশ-কেস হয় নাকি?

ইতিমধ্যে দু-কাপ কফি এসে গেল। কফি পানান্তে বাসু উঠে দাঁড়ালেন। বলেন, অসংখ্য

ধন্যবাদ। তবে আমি যে ঐ কেস সম্বন্ধে খবর নিতে এসেছিলাম এটা ঐ ডাক্তার বা মহাদেবকে জানাবার দরকার নেই।

সমরেন্দ্র উঠে দাঁড়ান। বলেন, দিন স্যার, অধম-ঘেঁষা উত্তম-মধ্যম দিন। এই অনীশ আগরওয়াল জাতীয় জুয়াচোরেরা হচ্ছে 'লেজিটিমেট র‍্যাকেটীয়ার'। এরা আইন বাঁচিয়ে মানুষজনকে ঠকায়। এদের আইন-মোতাবেক শাস্তি হয় না।

বাসু বাড়ি ফিরে এলেন। গাড়িটা গ্যারেজ করতে গিয়ে খেয়াল হলো তামাক ফুরিয়েছে। ওঁর বাড়ির উল্টো দিকে সম্প্রতি একটা বহুতলবিশিষ্ট বাড়ি উঠেছে। তার একতলায় একটা ছোট্ট মনিহারি দোকান খুলে বসেছে অল্পবয়সী একটি মেয়ে। বাসু-সাহেব বিশুকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন ঐ দোকান থেকেই যাবতীয় মনিহারি জিনিস খরিদ করতে। উনি নিজেও তাই করেন। কী ব্রান্ডের টোব্যাকো ওঁর মনপসন্দ্ তা জানিয়ে রেখেছেন মেয়েটিকে, যাতে সে আনিয়ে রাখতে পারে। মেয়েটির প্রতি ওঁর কিছু দুর্বলতা আছে। পাড়ারই মেয়ে। ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে পার্কে খেলতে অথবা বাসে চেপে স্কুলে যেতেও দেখেছেন। বাসু-সাহেবের একমাত্র সন্তানটি— যে মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে—তার সহপাঠিনী ছিল এই মেয়েটি : অর্পণা। পাড়ারই একটি ছেলের সঙ্গে ভালবেসে বিয়ে হলো। কিন্তু বিধি বাম। বছর তিনেকের মধ্যেই অর্পণা বিধবা হলো। বৃদ্ধা শাশুড়ি আর শিশুকন্যাটিকে নিয়ে এই বয়সেই জীবনসংগ্রামে নেমেছে। স্বামীর একটা ইন্সিওরেন্স পলিসি ছিল। সেটুকুই ওর দোকানের মূলধন।

বাসু এগিয়ে এসে বললেন, অপুদিদি, মুন্না-মা কেমন আছে?

অপর্ণা হাসিমুখে বললে, ভাল আছে, মেসোমশাই।

—আমাকে একটা প্যাকেট টোব্যাকো দাও, আর একটা ক্যাডবেরি চকলেটের স্ল্যাব। ম্যাগনাম সাইজ।

অপর্ণা সওদা দিয়ে দাম নিল। তারপর বাসু-সাহেব ওর কাউন্টারে ক্যাডবেরি চকলেটটা নামিয়ে রেখে বললেন, এটা মুন্না-মাকে দেবে।

হঠাৎ কেমন যেন ম্লান হয়ে গেল অর্পণা। বললে, কিছু মনে করবেন না, মেসোমশাই, একটা কথা বলব?

—বল? একটা ছেড়ে দশটা কথাও বলতে পার।

—এ কথা ঠিক যে, মুন্নার মায়ের আর্থিক সঙ্গতি নেই মেয়েকে ক্যাডবেরি চকলেট কিনে দেবার। আপনি প্রায়ই...

হঠাৎ বাসু-সাহেব হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলেন অপর্ণার শাঁখাহীন মণিবন্ধ। ও হতচকিত হয়ে যায়। বাসু চাপা গলায় বললেন, স্টপ ইট, অর্পণা! ঐদিকে তাকিয়ে দেখ একবার। রাস্তার ওদিকের বাড়ির বারান্দায়। তারপর তোমার বক্তব্যটা শেষ কর বরং। দেখতে পাচ্ছ? হুইল-চেয়ারে-বসা ঐ বৃদ্ধাকে? উনি কেন ঐ চেয়ারটা ব্যবহার করেন তা জান?

অর্পণার সাদা-সিঁথি মাথাটা নিচু হয়ে যায়। পাড়ার মেয়ে। সে জানে, বিশ বছর আগেকার সেই দুর্ঘটার কথাটা। ওর বাল্যবান্ধবীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ইতিবৃত্ত। বাসু ধরা গলায় বললেন, বেঁচে থাকলে সে হতভাগী আজ তোমার বয়সীই হতো। হ্যাঁ, এবার বল, কী বলছিলে?

অপর্ণা বললে, আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে বলছিলাম। একটা প্রণাম করবার কথা বলতে যাচ্ছিলাম।

কাউন্টারের এপারে এসে মেয়েটি বাসু-সাহেবকে প্রণাম করল।

বাসু বললেন, তোমার দোকান তো বিষ্যুদ্‌বারে বন্ধ থাকে। বিষ্যুদ্‌বারে বিকালে এস না আমাদের বাড়িতে। মা-মেয়েকে নিয়ে।

অর্পণা বলল, আসব।

বাসু সওদা নিয়ে বাড়ি-পানে রওনা হচ্ছিলেন। হঠাৎ নজর হলো ওঁদের বাড়ি থেকেই বার হয়ে আসছে কৌশিক আর মহাদেব। কাছাকাছি আসতে বাসু বললেন, এতক্ষণ ধরে তোমরা কী এত আলোচনা করলে?

মহাদেব বললেন, এন্টায়ার কেস হিস্ট্রিটা ডিটেলে শোনাতে হলো কিনা।

মিস্টার মিত্র কিছু ফটো চেয়েছেন। ওবেলা দিয়ে যাব। গুয়াহাটির লোকাল কাগজে অনেক ছবি ছাপা হয়েছিল। তাছাড়া ঐ এম. পি.-র পার্টিতে একজন প্রফেশনাল ফটোগ্রাফারকে এনগেজ করা হয়েছিল। ওদের সকলের ফটোই আছে আমাদের কাছে—মধু, আই মীন মাধবী, অনীশ এবং শান্তনু ডাক্তারের! ওবেলা সব নিয়ে আসব। আমি উঠেছি হোটেল ডিউকে। রুম নম্বর ২০৭, দরকার হলে ফোন করবেন। হোটেলের ঘরে ঘরে ফোন আছে।

বাসু কিছু বলার আগেই মহাদেব চোখ তুলে দেখতে পেল অপর্ণাকে। একটু যেন চম্‌কে উঠল। তারপর রাস্তা ছেড়ে এগিয়ে গেল অপর্ণার স্টলে। ক্লাসিক সিগারেটের কার্টন দেখিয়ে বললে, পাঁচ প্যাকেট দিবেন তো, দিদি।

অপর্ণার কাছে পাঁচ প্যাকেটই ছিল। নামিয়ে দিল। মহাদেব উঠে এল দোকানে। ম্যাগাজিনগুলো ঘাঁটতে থাকে—স্টার ডাস্ট, ডেবনেয়ার, আলোকপাত, মনোহর কহানিয়া সবকিছুই।

কৌশিক বললে, ঠিক আছে, আমরা চলি তাহলে?

মহাদেব অন্যমনস্কের মতো বললে, ও. কে.!

বাসু ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চলতে থাকেন। কৌশিক তাঁকে অনুসরণ করে। একবার পিছন ফিরে দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখে। মহাদেব ইতিমধ্যে অনেকগুলি পত্রিকা খরিদ করেছে। ভারী ওয়ালেট বার করে দাম মেটাচ্ছে।

কৌশিক বলে, মামু, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন? অপর্ণাকে দেখে মহাদেব জালান যেন একটু চম্‌কে উঠেছিল।

অপর্ণা পাড়ার মেয়ে। কৌশিক তাকে ভালমতোই চেনে।

বাসু বললেন, হ্যাঁ। ব্যাপারটা আমার নজর এড়ায়নি।

—কী মনে হলো বলুন তো আপনার? মহাদেব কি অপর্ণাকে চিনত?

—না। তা মনে হয়নি আমার।

—তাহলে? তবে অপর্ণার মধ্যে অমন করে ও কী দেখছিল?

—হতভাগীটার যৌবন! মেয়েটি যে অল্পবয়সী, বিধবা, এটুকু বুঝে নিয়েছে। আন্দাজ করেছে, অর্থকৃচ্ছ্র তাও আছে। আরও কিছু সম্‌ঝে নিতে চায় বোধহয়। হোটেলে একা একা থাকে তো। তাই!

সেদিনই দুপুরবেলা। ঘড়িতে তখন দেড়টা। বাসু-সাহেব আর রানী বসেছিলেন বাইরের বারান্দায়। সচরাচর এই সময়ে ওঁরা মধ্যাহ্ন আহার সারেন। বিশে ভিতর থেকে এসে জানতে চাইল, দাদাবাবুরা তো এলেননি, আপনাদের দু'জনার ভাত বেড়ে দেব টেবিলে?

রানী বললেন, আর একটু দেখি বরং...

বলতে বলতে বাসু-সাহেবের গাড়িটা এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনে। নেমে এল কৌশিক

আর সুজাতা। গাড়ি লক করে কৌশিক লাফাতে লাফাতে উঠে এল বারান্দায়। বললে, মামু! আপনার হারানো মানিকের সন্ধান পাওয়া গেছে! শ্রীমান অনীশ আগরওয়াল বর্তমানে এই কল্লোলিনী কলকাতাতেই সশরীরে বিরাজমান!

—তাই নাকি! কোথায়? তার ঠিকানা?

—বাড়ির অ্যাড্রেসটা এখনো পাইনি...

—রাস্তার নাম? পাড়া?

—এক্‌জ্যাক্ট লোকেশানটা,...মানে...

বাসু ওর কথার মাঝখানেই বলে বসেন, বাঃ বাঃ বাঃ। তবে তো সারা সকাল ধরে মস্ত কাজ করে ফেলেছ! সুতানুটির মতো ছোট্ট একটা গ্রামে অনীশকে কোণঠাসা করে ফেলেছ! আর পালাবে কোথায়? বাই দ্য ওয়ে—সুতানুটিই তো? নাকি গোবিন্দপুর?

কৌশিক একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে ধপাস্ করে বসে পড়ে। বাসু-সাহেবকে কিছু বলে না, সালিশ মানে রানী দেবীকে। বলে, দেখেছেন মামি! মামুর ঐ এক চারিত্রিক দোষ। কারও সাফল্যটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারেন না। লোকটা বোম্বাই নয়, চন্ডীগড় নয়, মাদ্রাজ নয়, বাঙ্গালোর নয়, খাশ কলকাতায়! অথচ উনি...

রানী বলেন, বটেই তো! তুমি দুঃখ কর না, কৌশিক। আমি বুঝতে পেরেছি। শুধু বোম্বাই মাদ্রাজ কেন, লোকটা তো আবুধাবিতেও পালিয়ে যেতে পারত, কিংবা হনলুলু। কিন্তু কীভাবে হদিস পেলে?

কৌশিক তার স্ত্রীর দিকে ফিরে বললে, তুমি বুঝিয়ে বল, সুজাতা। আমি আর কোন উৎসাহ পাচ্ছি না।

অগত্যা সুজাতাই বুঝিয়ে বলল, কীভাবে যুক্তির পারম্পর্যে ধাপে ধাপে সমস্যাটা সমাধান করে ওরা অনীশের সন্ধান পেয়েছে। প্রথম কথা : অনীশ আগরওয়ালের পরিকল্পনাটা ছিল নিশ্ছিদ্র। ডি. সি. ক্রাইমের ভাষায় একে নাকি বলে, 'লেজিটিমেট র‍্যাকেটীয়ারিং'— আইনসঙ্গত ভাবে অপরের মস্তক বিদীর্ণান্তে পনসভক্ষণ! সেক্ষেত্রে আমরা কেন ধরে নিচ্ছি যে, অনীশ এই খেল্‌টা গুয়াহাটিতেই প্রথম খেলেছে? তা তো নাও হতে পারে। দেখা যাচ্ছে, মাধবী অথবা মহাদেব ঐ সিনেমা-কোম্পানির কাছে অনীশের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেনি। করার উপায়ও নেই। চিত্র-প্রযোজক প্রতিষ্ঠান তো অনীশ আগরওয়ালকে নায়িকা নির্বাচনের ক্ষমতা নির্ব্যূঢ় শর্তে দিয়ে রেখেছে। প্রার্থিনীকে উৎকোচ দেবার কোনো পরামর্শ তো তারা দেয়নি!

সুতরাং? যদি ধরে নেওয়া যায় যে, গুয়াহাটিতেই অনীশ তার জীবনের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করেনি, তাহলে এটাও যুক্তি-নির্ভরভাবে আশা করা যায় যে, আগের-আগের আছাড়-খাওয়া নির্বাচিতার দল একইভাবে কিল খেয়ে কিল চুরি করেছে। সেসব খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। ভূপতিতার দল আপ্রাণ চেষ্টা করেছে জানাজানিটা যত কম হয়। তা যদি ঘটে থাকে তবে সেই ঘটনাস্থল কোথায়? কলকাতায় সম্ভবত নয়। কলকাতার ব্যাপার হলে 'সুকৌশলী' কোনো-না কোনো সূত্র থেকে ঐ মুখরোচক কিস্‌সাটা শুনতে পেত। তা কলকাতায় যদি না হয় তবে ইম্ফল, ত্রিপুরা, শিলং ইত্যাদিও হবে না। সেসব শহরের লোকসংখ্যা কম, গুয়াহাটির কাছাকাছি জনপদ। সুকৌশলীর আন্দাজ হলো, অনীশ যদি একই কায়দায় আর কোনো ধনীর দুলালীকে লেঙ্গি মেরে ভূতলশায়ী করে থাকে, আর ঘটনাস্থল যদি পূর্বভারত হয় তাহলে এই কয়টি শহরের মধ্যে সম্ভবত কোনো একটিতে— ভুবনেশ্বর, কটক, পাটনা, জামশেদপুর, ধানবাদ বা রাঁচি। এই কয়টি শহরে 'নেতি-নেতি' পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হবে। পূর্বভারতে একটি প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কমফেডারেশনের সভ্য হয়েছে

'সুকৌশলী'। ক্রাইম যে-হারে ক্রমবর্ধমান, আর বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ যে-ভাবে স্থানীয় শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে চলতে ক্রমশ অভ্যস্ত হচ্ছে, তাতে প্রাইভেট গোয়েন্দা-সংস্থাগুলি এভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হতে বাধ্য হচ্ছে। ওরা পরস্পরকে সাহায্য করে কমিশন বেসিস্-এ। কৌশিক একের পর একটি এস. টি.ডি. টেলিফোন করে শেষ পর্যন্ত হদিস পেল। যা আন্দাজ করেছিল ঠিক তাই। ঘটনাস্থল ইস্পাতনগরী জামশেদপুর। গত নভেম্বর মাসে সেখানে একজন উচ্চপদস্থ পারচেজ অফিসারের একমাত্র মেয়েটিকে একই পদ্ধতিতে বোকা বানানো হয়েছে। বোম্বাইয়ের ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সম্পাদনের পরে সুরঙ্গমার বাবা পাণ্ডে-সাহেব একটা বিরাট পার্টি থ্রো করেছিলেন। ইস্পাতনগরীর অফিসার্স ক্লাব থেকেও সুরঙ্গমাকে একটি পৃথক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তারপর স্ক্রীন-টেস্টের জন্য সুরঙ্গমা পাণ্ডে আর অনীশ আগরওয়াল বোম্বাই চলে যায়। হ্যাঁ, অনীশ বেনামে কোনো কারবার করেনি—করতে পারেও না—কারণ ফিল্ম কোম্পানি অনীশকেই নির্বাচন-দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। যাহোক, সুরঙ্গমা সেই যে বোম্বাই গেল আর জামশেদপুর ফিরে এল না! বাপিকে সে টেলিফোনে জানিয়েছিল কী-ভাবে সে বোকা বনেছে। এ-ক্ষেত্রে অবশ্য বাস্তবে বোকা বনেছেন পাণ্ডে-সাহেব স্বয়ং। কন্ট্রাক্ট সই হয়ে যাবার পর অনীশকে কালো-টাকার বাণ্ডিলটা তিনিই তুলে দিয়েছিলেন। সুরঙ্গমা তার বাবাকে জানিয়েছে যে, অনীশ কলকাতায় আত্মগোপন করে আছে। ফলে, সুরঙ্গমাও কলকাতা যাচ্ছে। একটা মুখোমুখি ফয়শালা করতে।

সুরঙ্গমার বয়স চব্বিশ। স্থানীয় গার্লস স্কুলের গেম্স্ টীচার। মেয়েদের বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় মহিলা হিসাবে বিহারের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ভাল রকম ক্যারাটে জানে। প্রচণ্ড দুঃসাহসী। তবু সে ঐ প্রাইভেট-ডিটেকটিভ এজেন্সিকে সবকিছু জানিয়ে রেখেছে। নির্ভয়ে বলেছে, যদি খবর পান যে, আমার দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হয়েছে, তাহলে দেখবেন দেহটা যেন পোস্টমর্টাম হয়। বলেন তো, এজন্য কিছু রিটেইনার দিয়ে যাই!

বাসু জানতে চান, তা ঐ দুঃসাহসিকা সুরঙ্গমা পাণ্ডের ঠিকানাটা কি জানা গেছে?

সুজাতা বলে, তা গেছে। ইন্টালি-বাজারের কাছাকাছি একটা বাড়ির এক-কামরার মেজানাইন ফ্লোরের ফ্লাটে।

—বটে! তা মিস্ পাণ্ডে কলকাতা শহরে রাতারাতি অমন একটা এক-কামরার ফ্লাট যোগাড় করল কেমন করে? তুমি-আমি তো পাই না?

—সেসব আপনার শুনে কাজ নেই। ওর বাবা জামশেদপুরের একজন পার্চেজ অফিসার। ইন্টালি-মার্কেটের ঐ বাড়িটা একজন সাপ্লায়ারের। ঐ মেজানাইন ঘরখানা গেস্ট-রুম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ফার্নিশ্ড্। সংলগ্ন স্নানাগার ও ছোট্ট কিচেনেট। সাপ্লায়ার ভদ্রলোকের পরিচিত বিশিষ্ট মেহ্মানরা দু-এক দিনের জন্য কলকাতায় এলে হোটেলে না উঠে ঐ ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সুরঙ্গমা সেই সুযোগটাই নিয়েছে। ওর ঘরে একটি টেলিফোন কানেকশানও আছে।

—নম্বরটা জানা গেছে?

—নিশ্চয়। ঘণ্টাখানেক আগে কৌশিক টেলিফোন করেছিল। সুরঙ্গমা তখন ঘরে ছিল না। ঘর তালাবন্ধ করে কোথাও গেছিল। যিনি টেলিফোন ধরলেন তিনি জানালেন, সুরঙ্গমা বিকেল চারটে নাগাদ ফিরে আসবে।

রানী জানতে চান, ঘর যদি তালাবন্ধ, তাহলে টেলিফোন ধরল কে?

সুজাতা বলে, এক্সটেনশান-লাইনে দোতলায় বা তিনতলায় সম্ভবত গৃহস্বামী। মামুর যেমন আছে চেম্বারে আর রিসেপ্শানে।

বাসু বলেন, জামশেদপুরের প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার কি জানিয়েছে যে, সুরঙ্গমা অনীশ আগরওয়ালের ঠিকানা জানে?

কৌশিক এতক্ষণে কথোপকথনে যোগ দেয়। বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। সুরঙ্গমা যে অনীশের ঠিকানা জানে একথা জানিয়েছে তার জামশেদপুরের ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি। সুরঙ্গমা তাদের বলেছে, দু-চার দিনের মধ্যেই সে যাবে ফয়শালা করতে। যদি তিন দিনের মধ্যে আবার ফোন না করে তাহলে ওরা যেন কলকাতায় এসে খোঁজ করে। যাবতীয় ব্যবস্থা করে।

রানী বলেন, যাবতীয় ব্যবস্থা মানে?

—মানে, সুরঙ্গমার ডেড বডিটা যাতে পোস্টমর্টাম হয়!

বাসু বলেন, এ তো আচ্ছা পাগল মেয়ে দেখছি!

কৌশিক আরও বলে, তাই আমাদের স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে সুজাতা বিকাল চারটে নাগাদ ঐ মেজানাইন ঘরে গিয়ে সুরঙ্গমার সঙ্গে আলাপ করবে। বলবে, ওকেও অনীশ একই ভাবে লেঙ্গি মেরেছে—ভুবনেশ্বরে। তাই অনীশের খোঁজে ও কলকাতায় এসেছে টাকা আদায় করতে!

রানী এবার বলেন, শোন বাপু। তোমাদের বাকি স্ট্র্যাটেজির কথা না হয় খেতে খেতে আলোচনা কর। বেলা দুটো বেজে গেছে। বিশেও না খেয়ে বসে আছে। বার-দুই উঁকি মেরে দেখে গেছে। তাছাড়া সুজাতা তো তিনটে নাগাদ আবার বেরুবে ঐ ডাকাবুকোর সঙ্গে দেখা করতে। ও একাই যাবে তো?

বাসু বলেন, না। আমার গাড়িটা নিয়ে কৌশিক আর সুজাতা দু'জনেই যাবে। অনীশের ঠিকানা জানামাত্র আমাকে টেলিফোন করে জানাবে। আমি এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে যাব। সুজাতা বাড়ি ফিরে আসবে। বাসে বা ট্যাক্সিতে। আর কৌশিক একা গাড়ি নিয়ে ঐ ঠিকানায় আমাকে 'মীট' করবে।

কৌশিক বলে, ধরুন আমরা দু'জন ওর ঘরে হানা দিলাম। দেখাও পেলাম। তারপর? অনীশ তো বে-আইনি কোনো কাজ করেনি! মানে কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। সে যে সুরঙ্গমা পাণ্ডের বাবার কাছ থেকে অথবা মাধবী বড়ুয়ার কাছ থেকে কোনো টাকা নিয়েছে এটা তো আমরা প্রমাণ করতে পারব না। ও তো স্রেফ অস্বীকার করবে। তাই না?

বাসু বললেন, তুমি শুধু বাগিয়ে কর্নার-কিক্‌টা কর তো কৌশিক। শুধু দেখ, বলটা যেন গোল-লাইনের বাইরে চলে না যায়। অনীশ-গোলকীপারকে কাটিয়ে আমি কিভাবে হেড করব সে চিন্তা আমাকেই করতে দাও। আর হ্যাঁ, তোমার যন্ত্রটা যেন সঙ্গে থাকে। বেগতিক বুঝলে অনীশ আগরওয়াল ভায়োলেন্ট হয়ে উঠতে পারে।

রানী বলেন, কী দরকার বাপু এসব উট্‌কো ঝামেলায়? আর পাঁচটা ব্যারিস্টার যেভাবে প্র্যাকটিস্ করে...

কথাটা শেষ হয় না। বাসু তড়াৎ করে লাফিয়ে ওঠেন। চিৎকার-চেচাঁমেচি শুরু করে দেন; বিশেটা আবার কোথায় গেল? ওদিকে বেলা দুটো বেজে গেছে সে খেয়াল আছে?

সুজাতা বলে, আমি বলছিলাম কি...

—ওর নাম কি, খাবার টেবিলে বাকি কথা হবে। শুনলে না, তোমার মামিমা কী বললেন। বিশে, এই বিশে...

তিন

আহারান্তে সুজাতা আর কৌশিক বাসু-সাহেবের গাড়িখানা নিয়ে বেরিয়ে গেল। রানী দুপুরে ঘণ্টাখানেক গা-গড়িয়ে নেন। তাছাড়া সকাল থেকে তাঁর একটু জ্বর-জ্বর মতো হয়েছে। তিনি ঘুমের বড়ি খেয়ে শুতে গেলেন। বাসু 'দিবা মা শাপ্সি' মন্ত্রে বিশ্বাসী। লাইব্রেরী ঘর থেকে 'ডানসিং উ-লী মাস্টার্স' নামে একটি সম্প্রতি-প্রকাশিত পপুলার বিজ্ঞানের বই নিয়ে পড়তে থাকেন। কিন্তু তাতেও বাধা। বিশে এসে জানালো, একজন ভদ্রলোক সাক্ষাৎপ্রার্থী। রানী বিশ্রাম নিচ্ছেন। বাসু বলেন, সেদিন কী শেখালাম তোকে? ভিসিটার্স স্লিপে নাম-ঠিকানা লিখিয়ে নিয়ে আয়, আর বাইরের ঘরে তাঁকে বসা।

একটু পরে বিশ্বনাথ ফিরে এল। ভদ্রলোক স্লিপে কিছুই লিখে দেননি। পরিবর্তে নিজের নামাঙ্কিত ছাপা কার্ড দিয়েছেন : ডঃ শান্তনু বড়গোঁহাই, এম. বি. বি. এস., ডি. জি. ও., তাঁর গুয়াহাটির ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরও লেখা আছে।

একটু পরে বাসু-সাহেবের চেম্বারে এসে উপস্থিত হলেন ডঃ বড়গোঁহাই। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায়। মাথার চুলগুলি পেছনে ফেরানো। চোখে চশমা নেই। সরু গোঁফ আছে। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এলেন বাসু-সাহেবের টেবিলের কাছে। বললেন, নমস্কার স্যার, অসময়ে বিরক্ত করছি। জানি না, দুপুরে আপনি বিশ্রাম নেন কিনা!

বাসু বললেন, বসুন। গুয়াহাটি থেকে কবে এসেছেন? উঠেছেন কোথায়?

—এসেছি দিন-তিনেক হলো। উঠেছি একটা হোটেলে। আপনার কাছে কয়েকটা কথা জানতে এলাম। আপনাকে কি মিস্টার মহাদেব জালান অ্যাটর্নি নিযুক্ত করেছেন? মাধবীর ব্যাপারে?

বাসু বলেন, কেন জানতে চাইছেন বলুন তো?

—না হলে আমিই আপনাকে ঐ কাজে নিযুক্ত করতে চাইতাম।

—কোন কাজে? মাধবী নামে কোনো মেয়েকে কি পুলিশ খুঁজছে?

—আজ্ঞে না। পুলিশে নয়। খুঁজছে মহাদেব জালান, খুঁজছি আমি। আর মহাদেব যদি আপনাকে এনগেজ করে থাকে, তবে খুঁজছেন আপনি। ভবানীভবনের মিসিং স্কোয়াড অবশ্য খুঁজছে না তাকে।

এই সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। বিশে বাইরের ঘরে ঝাড়পোঁছ করছিল। সে ছুটে গিয়ে রিসিভারটা তুলল। তুলে শুনল বাসু-সাহেব তাঁর চেম্বারে বসে এক্সটেনশান লাইনের ফোনটা তুলে কথা বলছেন। বাসু বললেন, হ্যালো? বাসু স্পিকিং...

বিশে ধারক-অঙ্গে টেলিফোনের জঙ্গম অংশটা নামিয়ে রাখল।

ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল, আমি মহাদেব বলছি। কোনো সন্ধান পাওয়া গেল?

বাসু বললেন, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? খবর পাওয়া গেলে আমিই জানাব।

—আমি আপনার সামনা-সামনি বসে কিছু কথা বলতে চাই।

—আমি এখন ব্যস্ত আছি। আপনি রা‌‌ আটটার সময় আমার চেম্বারে আসতে পারেন। তখন আপনার যা বলার আছে শুনব। আর ভাল কথা, ঐ সময় ফটোগুলো নিয়ে আসবেন। কেমন?

ক্র্যাডলে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতেই ডক্টর বড়গোঁহাই বলেন, জালান-সাহেব মনে হচ্ছে?

বাসু সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, লুক হিয়ার, ডক্টর! আপনার কোনো

অ্যাসাইন্‌মেন্ট আমি নিতে পারছি না। কেন, তা আপনি নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছেন। তবে এটুকু বলতে পারি, আমি আপনার স্বার্থের পরিপন্থী কিছু করছি না। ভাল হয়, যদি আপনার হোটেলের ঠিকানা আমাকে জানিয়ে যান। তাহলে প্রয়োজনবোধে আমি আপনাকে কোনো তথ্য জানাতে পারি, যা আমার মক্কেলের স্বার্থবিরোধী নয়।

—অন্তত একটা কথা বলুন, স্যার। আপনার মক্কেল কি মহাদেব জালান?

—সার্টেনলি নট! আমার মক্কেল শ্রীমতী মাধবী বড়ুয়া।

—থ্যাঙ্কস্। সেক্ষেত্রে জানিয়ে যাই আমি উঠেছি রাজাবাজারের কাছে 'পথিক হোটেলে'। ঘরের নম্বর ৩৭—ওদের প্রতি বোর্ডারের ঘরে-ঘরে টেলিফোন নেই। তবে রিসেপশানে ফোন করে কোনো বোর্ডারকে ডাকলে ডেকে দেয়। কোনো মেসেজ থাকলে লিখে রাখে. নম্বরটা রাখুন কাইন্ডলি।

বাসু হাত বাড়িয়ে স্লিপ কাগজটা নিলেন। বললেন, থ্যাঙ্কস্ ফর য়োর কাইন্ড ভিজিট।

ডক্টর বড়গোঁহাই বুদ্ধিমান। বুঝে নিলেন, এটা সাক্ষাৎকারের সমাপ্তিসূচক সৌজন্য-ধন্যবাদ। উনি উঠে দাঁড়ালেন। দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। এদিক ফিরে বললেন, এক্সকিউজ মি, স্যার। যদি আপনার মক্কেলের সন্ধান পান, আর মনে করেন সে-খবরটা আমি জানলে আপনার মক্কেলের কোনো ক্ষতি হবে না...

বাসু ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, সে ক্ষেত্রে আমি নিজেই আপনাকে টেলিফোনে জানাব। উইশ য়ু বেস্ট অব ল্যক!

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। শীতের সন্ধ্যা গুড়মুড়িয়ে আসে। বিশেষ ধুলো আর ধোঁয়ায় যে কল্লোলিনী শহর, যেখানে পাশাপাশি শুধু ইটের উপরে ইট, মাঝেতে মানুষ কীট। বাসু-সাহেব আর রানী দেবী সচরাচর শীতের অপরাহ্ণে পশ্চিমের বারান্দায় বসে চা-পান করতেন—গত বছরও করেছেন—কারণ সূর্যের দক্ষিণায়ন হলে ঐ এক চিলতে বারান্দায় বসে সূর্যাস্তের স্বর্ণাভা উপভোগ করা যায়। যায় নয়, যেত। সম্প্রতি সেখানে একটি মালটি-স্টোরিড মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সূর্যাস্তের সোনা ছিনতাই হয়ে গেছে। তাই ইদানীং বিশে ওঁদের আপরাহ্ণিক-চা ঘরেই পরিবেশন করে যায়।

রানীর জ্বরটা বেড়েছে। কাল একজন ডাক্তার ডাকতে হবে। সুজাতা আর কৌশিক ফিরে আসেনি। রানী আবার গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। বাসু একা-একা ঘর-বার করছেন। সময় আর কাটে না। শেষে টিভির চ্যানেল পালটাতে পালটাতে হঠাৎ ওয়াল্ট ডিজনের একটা পুরনো ছবি পেয়ে গেলেন। তাতেই বুঁদ হয়ে গেলেন।

একটু পরে বিশে এসে খবর দিল, একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চাইছেন। এবার আর ভুল করেনি। ভিজিটার্স স্লিপে সাক্ষাৎপ্রার্থীর নাম-ঠিকানা লিখিয়ে এনেছে : মহাদেব জালান।

বাসু বললেন, রিসেপশানে বসতে বল। আমি যাচ্ছি—

ভিতর দিক থেকেও ওঁর চেম্বারে যাবার একটা সরাসরি পথ আছে। বাসু গায়ে একটা পশমের গাউন জড়িয়ে ঐ পথে চেম্বারে এলেন। বিশে গিয়ে বাইরের ঘরে খবর দিল। একটু পরে বাইরের দরজায় সৌজন্যসূচক করধ্বনি করে মহাদেব চেম্বারে ঢুকলেন। নমস্কার করে বসলেন দর্শনার্থীর আসনে। তাঁর পরিধানে ও-বেলার সেই ব্রাউন রঙের স্যুটটাই। হাতে একটা অ্যাটাচি। সেটা চেয়ারের পাশে নামিয়ে রাখলেন।

বাসু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি একটু তাড়াতাড়ি এসেছেন।

মহাদেব বলেন, সে কি কথা? আপনি তো বলেছিলেন আজ সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন।

—না, 'সন্ধ্যেবেলা' বলিনি। বলেছিলাম, রাত আটটায় আসতে। এখন সাতটা বত্রিশ।

মহাদেব নতুন ক্লাসিক কার্টনের সেলফোন-মোড়ক ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলেন, কী জানেন, বাসু-সাহেব, আমার আর ধৈর্য মানছে না। ঠিক আছে, আমি না হয় আধঘণ্টা-খানেক ঐ পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসি। আটটার সময়েই আসব।

বাসু বললেন, না। তার দরকার হবে না। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। আপনি বরং সামনের ঘরে ঐ ভিজিটার্স রুমে গিয়ে বসুন। আই মীন, রিসেপশানে। ওখানে দেখবেন, টেবিলে অনেক ম্যাগাজিন আছে। আধঘন্টা কেটে যাবে। আমারও হাতের কাজটা সারা যাবে।

—থ্যাঙ্কু, স্যার। শুধু একটা কথা বলুন। সুকৌশলী কি এখনো কোনো সন্ধান পায়নি? মাধবী কিংবা আগরওয়ালের?

বাসু বললেন, এত উতলা হচ্ছেন কেন? ওরা দু'জন সেই খোঁজেই গেছে। এখনো কোনো খবর দেয়নি। যে-কোনো সময়ে আমি জানতে পারব। কিন্তু আমার কিছু জরুরী কাজ আছে...

—আয়াম সরি, স্যার, এক্সট্রীমলি সরি! আমি বাইরের ঘরে গিয়েই অপেক্ষা করি বরং।

মহাদেব উঠে চলে গেল বাইরের ঘরে। বাসু-সাহেবের সত্যিই কোনো কাজ ছিল না। ওয়াল্ট ডিজনেতে আর নতুন করে মন বসবে না। নির্জন ঘরে উনি ভাবতে বসলেন। তখন কৌশিক যে প্রশ্নটা করেছিল তার জবাবটা ওঁর জানা নেই। কৌশিক যদি কর্নার কিক্‌টা ঠিক মতো করতে পারে তাহলে কোন কায়দায় বলটাকে গোলে ঢোকাবেন। অনীশ আইনত কোনো অপরাধ করেনি—মানে তা প্রমাণ করা যাবে না। জামশেদপুরের সেই ডাকাবুকো মেয়েটাই বা কী করতে পারে? দু-দশ ঘা বসিয়ে দিতে পারে হয়তো—তাতে তো টাকাটা উশুল হবে না। তবে সে নাকি বলে এসেছে দ্বৈরথ সংগ্রামে তার মৃত্যু হলে যেন তার শব-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ সেই দুঃসাহসিনী শেষ পর্যন্ত লড়বার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছে। সে কি শুধু তার ক্যারাটে বিদ্যার উপরেই নির্ভর করতে চায়, অথবা তার সঙ্গে কোনো মরণাস্ত্র আছে?

হঠাৎ কী মনে হলো, উঠে দাঁড়ালেন। সন্তর্পণ পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন সামনের দরজাটার দিকে, যে দরজা খুলে মিনিট দশেক আগে মহাদেব বেরিয়ে গিয়ে রিসেপশানে বসেছে। নিঃশব্দে হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে আধ ইঞ্চি মতো ফাঁক করে চোখ লাগালেন দরজার ফাঁকে। দেখলেন, মহাদেব জালান রানী দেবীর টেবিলে টেব্‌ল-ল্যাম্পটা জ্বেলেছেন। একমনে রীডার্স ডাইজেস্টের একটা সংখ্যা পড়ছেন। তাঁর বাঁ-হাতে ধূমায়িত সিগ্রেট। উনি তন্ময়। বাসু নিঃশব্দেই দরজাটা বন্ধ করে নিজের আসনে ফিরে এলেন, ঠিক তখনি বেজে উঠল টেলিফোনটা। তুলে নিয়ে উনি বললেন, বাসু স্পিকিং...

—মামু! এইমাত্র হদিস পেয়েছি। সুজাতা কিছু নতুন তথ্যও সংগ্রহ করেছে। জামশেদপুর কেসটায়। সুরঙ্গমা সুজাতাকে সাহায্য করতে স্বীকৃত। তবে সে বারে বারে সুজাতাকে বলেছে আজ রাত্রে আগরওয়ালের ডেরায় না যেতে।

—ঠিকানাটা জানা গেছে?

—হ্যাঁ। বেগবাগানের কাছে। বাংলাদেশ মিশনের খানকতক বাড়ি পরে। ঐ একই রাস্তায় 'রোহিণী-ভিলা'।

—হোটেল?

—না, অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। বহু পুরনো বাড়ি। সাত-আট তলা উঁচু। কারনানি ম্যানসন্স-এর মতো। বোম্বাই-এর সেই ফিল্ম কোম্পানি ঐ বাড়ির একটি দু-কামরা ফ্লাটের ভাড়া গুনে যায়। অনীশ আগরওয়াল কলকাতায় এলে ঐ ফ্লাটে ওঠে। দোতলায় পুবদিকের অ্যাপার্টমেন্ট। নম্বর ২৩

—অনীশের ঘরে টেলিফোন আছে?

—না, নেই। তবে একতলায় দারোয়ানের টুলের পাশে একটা টেবিল আছে। তাতে আছে এক সার্বজনীন টেলিফোন। বোর্ডাররা পয়সা দিয়ে সেখানে ফোন করতে পারে। আবার ফোনে কেউ কোনো খবর দিলে দারোয়ান সেটা লিফ্‌টম্যানের হাতে বিশেষ-বিশেষ বোর্ডারকে পৌছে দেয়।

—বিশেষ-বিশেষ বোর্ডার মানে?

—যারা দরাজ হাতে বকশিস্ দিতে প্রস্তুত।

—এত খবর তুমি জানলে কি করে?

—সুজাতাই জেনেছে সুরঙ্গমার কাছ থেকে।

—তা সুজাতাকে ও আজ রাত্রে অনীশের ডেরায় যেতে বারণ করল কেন?

—সুরঙ্গমা যুক্তি দেখিয়েছে—সন্ধ্যার পর পাড়াটা বড় নির্জন হয়ে যায়। সুজাতার পক্ষে তখন একা একা ওখানে যাওয়াটা বিপজ্জনক। তার মতে কাল সকালে দিনের আলোয় সুজাতার পক্ষে ও-পাড়ায় অনীশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাওয়াই ভাল।

—অল রাইট। এবার শোন। তুমি সুজাতাকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে বল। তোমার মামিমার জ্বর হয়েছে। ঘুমোচ্ছে। সুজাতা তার দেখভাল করুক। আমি এখনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হচ্ছি। এখন সাতটা পঞ্চাশ। আমার এখানে মহাদেব জালান বসে আছে। তাকে বিদায় করে, ধর পৌনে নটা নাগাদ আমি বাংলাদেশ মিশনের গেটের কাছে পৌছাব। একটু বেশি সময় নিচ্ছি, কারণ তোমার মামিমাকে রাতের খাবারটা খাইয়ে রওনা হব। তুমি আমার গাড়িটা নিয়ে ঐ মিশনের বিপরীত ফুটপাতে রাত ঠিক পৌনে ন'টায় অপেক্ষা কর। যন্ত্রটা সঙ্গে আছে তো?

—আছে। আমি ঠিক পৌনে নটায় ঐখানে থাকব।

বাসু টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। মিনিটখানেক কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর এগিয়ে এসে রিসেপশানের দরজাটা খুলে সে-ঘরে ঢুকলেন। মহাদেব একমনে পত্রিকাটা পড়ছিলেন। বাসুর পদশব্দে বইয়ের পাতায় আঙুল গুঁজে চোখ তুলে চাইলেন। বললেন, আটটা বাজল? আপনার কি এখন...

বাসু বললেন, আয়াম সরি, মিস্টার জালান। একটা জরুরী টেলিফোন এসেছিল। আমাকে এখনি বের হতে হবে। আপনি বরং একটু ঘুরে আসুন।

মহাদেব বললেন, কী দরকার? আমি বরং এখানেই অপেক্ষা করি। আপনি কখন ফিরবেন?

—ধরুন সাড়ে নয়টা।

—ঠিক আছে। আমি বরং এখানে বসে বসে এই বইটাই পড়ি। একটা দারুণ গল্প পড়ছিলাম রীডার্স ডাইজেস্টে। বড় গল্প—ঘণ্টাখানেক লাগবে শেষ হতে।

বাসু বললেন, ঠিক আছে। তবে অপেক্ষাই করুন। শুধু ফটো আর কাগজপত্র যা এনেছেন তা আমাকে দিন।

মহাদেব উঠে দাঁড়ান। রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে যান ভদ্রলোক। বলেন, আয়াম সো সরি, স্যার। ওগুলো আনতে ভুলে গেছি।...ঠিক আছে, আমি বরং সেগুলো হোটেল থেকে নিয়ে আসছি। ট্যাক্সি নিয়ে যাব আর আসব। যাতায়াতে দেড় ঘণ্টাই লাগুক। আমি সাড়ে নয়টার মধ্যেই ফিরে আসব। আমারই ভুল। মিস্টার মিত্রও আমাকে বলেছিলেন। আমি সবকিছু গুছিয়েও রেখেছি। আসার সময় সেটা অ্যাটাচিতে ভরে নিতে ভুলে গেছি।

বাসু বললেন, ঠিক আছে। আপনি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যান। হোটেল থেকে ছবি আর পত্রিকার কপি নিয়ে আসুন।

মহাদেব জিজ্ঞেস করেন, ম্যাডামকে আজ দেখছি না যে? আই মীন মিসেস্ বাসু?

—ওঁর শরীরটা ভাল নেই। আপনি হোটেল থেকে কাগজপত্র নিয়ে এসে ডোরবেল বাজাবেন। আমি আমার কমবাইন্ড-হ্যান্ডকে বলে যাচ্ছি। ও দরজা খুলে আপনাকে বসাবে।

মহাদেব সম্মতি জানিয়ে বিদায় হলেন। দরজা বন্ধ করে বাসু ফিরে এলেন শয়নকক্ষে। রানী অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। কপালে হাত দিয়ে দেখলেন। না, জ্বরটা কমেছে—হয়তো ছেড়েই গেছে। বাসু নিঃশব্দে উলেন গাউনটা ছেড়ে গরম-স্যুট পরে নিলেন। ভেবেছিলেন রানী দেবীকে নৈশ আহার খাইয়ে রওনা হবেন, কিন্তু তিনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ঘুম ভাঙানোটা ঠিক হবে না। সুজাতা এসে না হয় খাওয়াবে। হাতে যথেষ্ট সময় আছে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ড্রয়ারটা খুলে রিভলভারটা হিপ্‌পকেটে ভরে নিলেন। খুনোখুনি হবার কথা নয়। তবে আত্মরক্ষার অস্ত্রটা সঙ্গে থাকা ভাল। বিশেকে বললেন, শোন, আমি একটু বেরুচ্ছি। সাড়ে নটা নাগাদ ফিরে আসব। ঐ যে বাবুটি এতক্ষণ বাইরের ঘরে বসেছিলেন, উনি হয়তো তার আগেই ফিরে আসবেন। ম্যাজিক-আই দিয়ে দেখে নিয়ে তারপর দোর খুলে ওঁকে বাইরের ঘরে বসাবি—

—কোন বাবু? ঐ যিনি এতক্ষণ টেলিফোন করছিলেন?

বাসু ধমকে ওঠেন, তোর মাথায় কি নিরেট গোবর পোরা? কটা বাবু বাইরের ঘরে বসেছিল এতক্ষণ? একটাই তো? তার কথা বলছি। উনি নটা সাড়ে নটা নাগাদ আবার ফিরে আসবেন। ম্যাজিক-আইয়ের ভিতর দিয়ে ভাল করে দেখে নিয়ে ওঁকে বসতে দিবি। সুজাতাদিদিও এখুনি হয়তো এসে পড়বে। অজানা লোক এসে কলবেল বাজালে দোর খুলবি না। জানালা দিয়ে কথা বলবি। বুঝলি?

বিশে বললে, না বোঝার কী আছে? এসব কথা তো জানিই।

—আবার না হয় নতুন করে জানলি। বাড়িতে তো আর কেউ নেই এখন। তাই বলছি।

বিশে অবাক হয়ে বললে, মানে? বাড়িতে কেউ থাকবে না কেন? মা আছেন, আমি আছি—

বাসু চলতে শুরু করেছিলেন, থমকে থেমে পড়ে বলেন, সরি য়োর অনার! আই বেগ টু উইথড্র।

বিশে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

চার

বেগবাগান পার হয়ে বাংলাদেশ মিশনের কাছাকাছি পৌঁছে বাসু-সাহেবের নজর হলো তাঁর গাড়িটা রাস্তার কার্ব ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। উনি ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলেন। গাড়ির ড্রাইভারের দরজা খুলে এগিয়ে এল কৌশিক। বলল, এবার বলুন, আমাদের অপারেশনটা কী জাতের হবে?

—তুমি এখানেই গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা কর। 'রোহিণী-ভিলা' বোধহয় ঐ ছয়তলা বাড়িটা, না? আমি একাই প্রথমে যাব। আমাকে মিনিট দশেকের হ্যান্ডিকাপ দাও। আমি গিয়ে কথাবার্তা শুরু করি। ঘরে ঢুকে আমি দেখব সদর দরজাটা যেন খোলা থাকে। আমার সঙ্গে যেন তোমার পরিচয় নেই। আমি ওর কাছে গেছি মাধবীর তরফে। তুমি এসেছ সুরঙ্গমার

তরফে। দুদিক থেকে সাঁড়াশি-আক্রমণে ও ঘাবড়ে যেতে বাধ্য। মোট কথা, নাউ অর নেভার। আজ রাতেই একটা শো-ডাউন করতে হবে।

কৌশিক বলে, আপনার নিজের যন্ত্রটা সঙ্গে আছে তো?

—আছে। তবে তার প্রয়োজন হবে না। তুমি এসে পৌঁছোনোর আগে বিতণ্ডাটা অত বাড়াবাড়ি হতে দেব না।

বাসু দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাবার পর কৌশিক একটা সিগ্রেট ধরালো। বাসু পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন রোহিণী-ভিলার দিকে। প্রবেশপথে একটা জোরালো বাল্‌ব জ্বলছে, কিন্তু জনমানবের দেখা পেলেন না। বাড়ির প্রবেশপথ থেকে যখন দশ মিটার দূরে তখন দেখলেন ঐ বাড়িটা থেকে একটি মেয়ে দ্রুতপায়ে বার হয়ে আসছে। বয়স—বিশ-বাইশ। পরনে মেরুন রঙের সালোয়ার কামিজ, একই রঙের উড়নি। তার হাতে একটা টর্চ, পায়ে শাদা রঙের মিডিয়াম-হিল সোয়েডের জুতো। বাসু-সাহেবকে দেখেই সে যেন কেমন সিঁটিয়ে গেল। রাস্তাটা যদিও সেখানে তিন মিটার চওড়া তবু সে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বাসুর মনে হলো, মেয়েটা ভয় পেয়েছে। কেন? তাঁকে? নির্জনতাজনিত আতঙ্ক? এতটা ঘাবড়ে যাবার তো কোনো কারণ নেই। জবাবটা জানা ছিল তবু বাসু ইংরেজিতে জানতে চাইলেন, এটাই রোহিণী-ভিলা?

অভিনয়-অভিধানে যাকে 'স্টিল-হয়ে-যাওয়া' বলে সেই কায়দায় এতক্ষণ মেয়েটি দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে নিস্পন্দে দাঁড়িয়ে ছিল। বাসু-সাহেবের প্রশ্নটা শুনেই সে যেন সংবিদ্ ফিরে পেল। নতনেত্রে 'ইয়েস' বলেই চলতে শুরু করে। বাসুও এগিয়ে গেলেন বিপরীতমুখো। রোহিণী-ভিলার প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে একবার পিছন ফিরে দেখলেন। আশ্চর্য! মেয়েটি দৌড়াচ্ছে না বটে, কিন্তু যেন 'ওয়াকিং রেস'-এর প্রতিযোগী।

বাসু এদিকে ফিরলেন। দারোয়ানের টুলটা খালি। টেলিফোনটা দেওয়ালে একটা কাঠের ব্রাকেটে সাঁটা। তালাবন্ধ। লিফ্‌ট্‌ম্যান নেই। অটোমেটিকের ব্যবস্থা আছে। বাসু লিফ্‌টের খাঁচায় ঢুকে দুটি দরজাই বন্ধ করলেন। স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌টে উঠে এলেন দ্বিতলে। সামনেই তিন নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট।

বাসু কলবেল বাজালেন। ভিতরে কর্কশ একটা 'বাজার'-এর শব্দ হলো। কেউ সাড়া দিল না। চরাচর শুন্‌শান। কলবেলটা একবার, দুবার, তিনবার বাজালেন। ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ শোনা গেল না। অথচ ঘরে আলো জ্বলছে—সদর দরজার উপর গ্রিলবদ্ধ 'ট্রানসম্'-এর ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘরে বাতি জ্বালা আছে।

দ্বারে করাঘাত করতে গিয়ে নজর হলো দরজায় গোদরেজের ইয়েল-লক। কী মনে হলো, নবটা ধরে ঘোরাতেই দরজাটা খুলে গেল। নিঃশব্দে উনি প্রবেশ করলেন ঘরে। দরজাটা ঠেলে দিলেন আবার।

এটি নিঃসন্দেহে বৈঠকখানা। ছোট ঘর। কিছু চেয়ার টেবিল। টেবিলের ওপরে একটা স্লিপ কাগজ—কাচের কাগজ-চাপা দেওয়া। তুলে দেখলেন, দেবনাগরী হরফে লেখা আছে "শ্রীআগরওয়াল-2/3—আপনি কামরায় ওয়াপস্ এলে মেহেরবানি করে 24-9378-এ একটা ফোন করবেন—দুপুর দুটো দশ।" কাগজটা যথাস্থানে নামিয়ে কাচের কাগজ-চাপায় ঢাকা দিলেন। বৈঠকখানার অপরপ্রান্তে আর একটি দরজা। এতে ইয়েল-লক ছিল না। বাসু দরজায় 'নক' করলেন। কেউ সাড়া দিল না। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঠেলতেই এ-দরজাটাও ভিতর দিকে খুলে গেল। এ-ঘরেও আলো জ্বলছে। ঘরের ও-প্রান্তে একটি ডবল-বেড বড় খাট। তার উপর খুব

তাড়াহুড়োয় ছুঁড়ে ফেলা কিছু পুরুষের পোশাক— কোট-প্যান্ট-শার্ট-টাই। খাটের নিচে জুতো-মোজা। আর রক্তের ধারার মধ্যে চিৎ হয়ে পড়ে আছে মৃতদেহটা। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। কাঁচা-পাকা চুল। চশমাটা ছিটকে দূরে পড়ে আছে। লোকটার ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই, নিম্নাঙ্গে শুধু আন্ডার-ওয়্যার। বুকের বাঁদিকে একটা বুলেটের গর্ত।

বাসু সাবধানে রক্তের ধারা টপকে লোকটার কাছে এগিয়ে গেলেন। সাবধানেই হাত রাখলেন মণিবন্ধে। নিঃসন্দেহে মারা গেছে। নাড়ির স্পন্দন নেই। তবে মৃত্যু বোধহয় পাঁচ-সাত মিনিট আগে হয়েছে। দেহ শীতল হবার সময়ই হয়নি। উপরন্তু লক্ষ্য করে দেখলেন, বুক থেকে রক্ত এখনো ক্ষীণ ধারায় নির্গত হচ্ছে। অর্থাৎ হৃদপিণ্ড তার কার্যকারিতা থামিয়েছে কিন্তু যেটুকু রক্ত নির্গত হয়েছিল, মাধ্যাকর্ষণের টানে তা বুক থেকে টপটপ করে ঝরে পড়ছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। জনমানবের চিহ্ন নেই। সাবধানে পা ফেলে শয়নকক্ষের ও-প্রান্তের ছোট্ট পাল্লাটা খুলে দেখলেন। সেটা স্নানাগার। সে-ঘরেও বাতি জ্বলছে। মেঝে ভিজে নয়। পকেট থেকে রুমাল বার করে প্রতিটি মসৃণ বস্তু—যাতে ওঁর আঙুলের ছাপ পড়ে থাকতে পারে, তা মুছে দিয়ে ফিরে এলেন সদর দরজার কাছে। ইয়েল-লকের কলকব্জা খুঁটিয়ে দেখলেন—'লকিং অ্যারেঞ্জমেন্টটা'। লকের নবটা জমির সমান্তরাল রয়েছে। অর্থাৎ শেষবার যে পাল্লাটা বন্ধ করেছিল সে 'লক-নবটা' জমি থেকে খাড়া করে রাখেনি। তার ফলে দরজাটা লক হয়নি। তালাবন্ধ হয়নি। সেজন্যই বাসু-সাহেব হাতল ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকতে পেরেছিলেন। উনি রুমাল দিয়ে ভিতর থেকে হ্যান্ডেলের মসৃণ অংশটা মুছে দিলেন। একবার উঁকি মেরে দেখলেন বাইরের দিকে। করিডোর এবং সিঁড়ি জনমানবশূন্য। নিঃশব্দে দরজার বাইরে বার হয়ে এলেন। ঠিক তখনই লিফ্‌ট্‌টা চালু হলো। কেউ ওপরে উঠছে। কৌশিক নিশ্চয় নয়। কারণ তার দশ মিনিট পরে আসার কথা। এ অন্য লোক!

মুহূর্তমধ্যে সিদ্ধান্ত নিলেন। পাল্লাটা আবার খুলে 'লকনব'টা জমির আলম্ব অবস্থায় রেখে আস্তে পাল্লাটা টেনে দিলেন! ক্লিক্ করে শব্দ হলো। অর্থাৎ দরজার ভিতর থেকে তালা পড়ে গেল। ঠিক তখনই লিফ্‌ট্‌টা এসে থামল ঐ ফ্লোরে। লিফ্‌টের দরজা খুলে বার হয়ে এল একজন পুলিশ সার্জেন্ট। তার সঙ্গে একজন মাঝবয়সী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভদ্রমহিলা।

পুলিশ সার্জেন্ট-এর হেলমেটটা মেঝে ফুঁড়ে লিফ্‌টে উঠতে শুরু করা মাত্র বাসু পিছন ফিরে ছিলেন। অনীশের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল বাজাতে থাকেন। চোখে দেখছেন না, কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছেন ওঁর ঠিক পিছনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে আছে সার্জেন্টটা। বাসু দু-তিনবার বেল বাজালেন। তারপর হতাশার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এপাশে ফিরলেন। পিছন ফিরতেই সার্জেন্টের মুখোমুখি হলেন। সার্জেন্ট ওঁকে প্রশ্ন করে, কী হলো? ফিরে যাচ্ছেন?

বাসু যেন এই প্রথম ওকে দেখলেন। ওকে, আর পিছনে যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁকে। বললেন, তাছাড়া কী করব? দরজাও খুলছে না, সাড়াও দিচ্ছে না। অথচ ওদিকে ভিতরে আলো জ্বলছে।

সার্জেন্ট প্রশ্ন করে, কে থাকে এই অ্যাপার্টমেন্টে?

—অনীশ আগরওয়াল। অন্তত আমি সেই রকমই শুনেছি।

—আপনার পরিচিত? কেন এসেছিলেন ওর কাছে?

—না, আমার পরিচিত নয়। একটা প্রয়োজনে ঠিকানা সংগ্রহ করে দেখা করতে এসেছিলাম, এত কথা কেন জানতে চাইছেন বলুন তো?

সার্জেন্ট মহিলাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করে, এঁকে চেনেন? আগে কখনো রোহিণী-ভিলায় বা অন্যত্র কোথাও দেখেছেন?

প্রৌঢ়া নীরবে দুদিকে মাথা নাড়লেন। বাসু নিঃশব্দে হিপ পকেট থেকে তাঁর ওয়ালেট বার করে একটি নামাঙ্কিত কার্ড পুলিশ অফিসারটিকে দিলেন।

—ও, আপনিই ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু? তাই বলুন! সেজন্যই এত চেনা-চেনা লাগছিল। আদালতে আপনাকে দেখেছি, তা আপনি কতক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছেন, স্যার?

—তা মিনিট-খানেক, অথবা দু-মিনিট হবে। কেন?

—'কেন' তা বলছি। তার আগে অনুগ্রহ করে বলুন, ঐ দেড়-দু মিনিটের ভিতর আপনি কি ভিতর থেকে কোনো শব্দ শুনেছেন? অথবা সন্দেহজনক কোনো কিছু কি নজরে পড়েছে আপনার?

—না। 'সন্দেহজনক' কিসের কথা বলছেন? কিসের সন্দেহ?

সার্জেন্ট বলল, এই ভদ্রমহিলার অ্যাপার্টমেন্ট ঠিক পাশেই। উনি বলছেন, মিনিট দশেক আগে এই ফ্লাট থেকে একটা ঝগড়া বা কথা-কাটাকাটির আওয়াজ শুনেছেন। একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। তারপর হঠাৎ দ্রাম করে একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ। ওঁর মনে হয়েছে শব্দটা এ-ফ্লাটের বাথরুম থেকে—সেটা ওঁর বাথরুমের লাগাও—একটি মহিলা 'ফিল্ম কন্ট্রাক্টের' কথা কিছু বলছিল। বাংলা কথা—উনি অর্থ বোঝেননি, কিন্তু 'ফিল্ম কন্ট্রাক্টের' কথা সে বলছিল—

—বেশ তো। তাতে কী হলো। 'ফিল্ম কন্ট্রাক্ট' কথাটা তো অশ্লীল নয়। যে কেউ তা বলতে পারে—

সার্জেন্ট সে কথায় কর্ণপাত না করে এক নিশ্বাসে বলে গেল—আর তারপরেই উনি একটা ফায়ারিঙের শব্দ শুনেছেন।

বাসু সবিস্ময়ে ইংরেজিতে বললেন, কী শুনেছেন? ফায়ারিঙের শব্দ? এই ফ্লাট থেকে?

প্রৌঢ়া কথোপকথনে যোগ দেন, আমার প্রথমে মনে হয়েছিল রাস্তায় কোনো গাড়ি ব্যাক-ফায়ার করেছে। তাই রাস্তার দিকে জানলার কাছে সরে গিয়ে নিচে ঝুঁকে দেখলাম। তখন ত্রিসীমানায় কোনো গাড়ি ছিল না। এবার আমার আশঙ্কা হলো ওটা তাহলে ফায়ারিঙের শব্দ। আশ্চর্যের কথা, ঐ শব্দটা হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি আচমকা থেমে গেল। এ-ফ্ল্যাটে সব শুনশান! আমার মনে হলো...

সার্জেন্ট মাঝপথেই প্রশ্ন করে বসে, আপনার পাশের ফ্ল্যাটে কে থাকে তা আপনি জানেন না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

ভদ্রমহিলা রুখে ওঠেন, লুক হিয়ার, সার্জেন্ট! একজন আইন-সচেতন নাগরিক হিসাবে আমার মনে হয়েছিল আপনাকে ডেকে আনা আমার কর্তব্য। তাই জানলা দিয়ে রাস্তায় আপনাকে দেখতে পেয়ে ডেকে এনেছি। সেটা যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে...

আবারও বাধা দিয়ে সার্জেন্ট বললে, আমাকে ভুল বুঝবেন না ম্যাডাম। আপনি আপনার কর্তব্যই করেছেন। সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমি শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম, এই পাশের ফ্লাটে—

—কেন জানব না? এই অ্যাপার্টমেন্টটা বোম্বাইয়ের একটা ফিল্ম কোম্পানি ভাড়া নিয়েছে। তারা যাকে চাবি দেয় সেই থাকে এই ফ্লাটে। আজ টম তো কাল হ্যারি। আমি কাউকেই চিনি না।

সার্জেন্ট নিজে কয়েকবার কলবেল বাজালো। দরজায় দমাদ্দম কিলও মারল। কোনো

সাড়াশব্দ জাগল না। এমন সময় লিফ্‌ট্‌টা এসে ঐ ল্যান্ডিং-এ দাঁড়ালো। পুলিশ দেখে লিফ্‌ট্‌ম্যান এগিয়ে এল। বলল, ক্যা হুয়া সাব?

সার্জেন্ট জানতে চাইল, কেয়ারটেকার কোথায় থাকে? তাকে খবর পাঠাও—এই ফ্লাটের ডুপলিকেট চাবি আমার চাই।

লিফ্‌ট্‌ম্যান লিফ্‌ট্‌-কূপের কাছে এগিয়ে গিয়ে নিচের দিকে মুখ করে হাঁকাড় পাড়ে, দোবেজি! তুরন্ত্‌ উপর চলা আইয়ে!

নিচে থেকে প্রতিপশ্ন হলো, ক্যোঁও? ম্যয় কেঁউ উপর যাঁউ? তু নিচে আ যা।

বাসু সার্জেন্টকে বললেন, আমি তাহলে চলি। কোনো প্রয়োজন হলে আমার চেম্বারে ফোন করবেন।

সার্জেন্ট রাজি হলো। লিফ্‌ট্‌ম্যানকে আদেশ দিল বাসু-সাহেবকে নামিয়ে দিতে এবং ঐ ফ্লাটের ডুপলিকেট চাবি যোগাড় করে আনতে।

নিচে এসে বাসু লক্ষ্য করলেন যে, রোহিণী-ভিলার প্রবেশপথ থেকে বাংলাদেশ মিশনের সামনে রাখা ওঁর গাড়িটা দেখা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, রোহিণী-ভিলা থেকে দুটি গলিপথ দুদিকে গেছে। একটি পার্কসার্কাসের দিকে, একটি বেগবাগানের মোড়ের দিকে। দ্রুত পদচারণে বাসু এসে পৌছালেন নিজের গাড়ির কাছে। কাচ নামিয়ে কৌশিক বলল, কী হলো? অনীশ বাড়ি নেই?

সে-কথার জবাব না দিয়ে বাসু বলেন, আমি চলে যাবার পর ওদিক থেকে একটি মেয়েকে আসতে দেখেছ? খুব জোরে হেঁটে? বয়স কুড়ি থেকে পঁচিশ, সালোয়ার-পাঞ্জাবি পরা, পায়ে শাদা জুতো, হাতে টর্চ?

কৌশিক বললে, দেখেছি। একটা ফ্লাইং-ট্যাক্সি ধরে বেগবাগানের দিকে চলে গেল। ট্যাক্সিটা ডাইনে মোড় নিয়েছিল। সার্কুলার রোড ধরে, শেয়ালদার দিকে।

বাসু বলেন, ঠিকই আন্দাজ করেছি। ফলো হার—

—কী বলছেন মামু? ওকে ফলো করব কী করে? সে তো সাত-আট মিনিটের লীড নিয়েছে। এতক্ষণে পার্ক স্ট্রীটের মোড় পার হয়েছে।

—আহ্‌। কেন তর্ক করছ? চিনতে পারনি? ও হচ্ছে সুরঙ্গমা পান্ডে। ও বাড়ি গেছে নিশ্চয়। সোজা ওর ফ্লাটের দিকে চল। ইন্টালি বাজারে ওর ফ্লাটের কাছাকাছি গাড়িটা রাখবে। বাড়িটা আমাকে চিনিয়ে দিয়ে তুমি অপেক্ষা কর। আমি একাই যাব সুরঙ্গমার মেজানাইন ফ্লাটে।

নটা কুড়িতে ইন্টালি বাজারের কাছাকাছি কৌশিক গাড়িটা পার্ক করল। বাসুকে চিনিয়ে দিল বাড়িটা। বাসু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন মেজানাইন ফ্লোরে। সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে ঐ ফ্লাটের কলবেল বাজালেন। ভিতরে একটা মিঠে বাজনার সুর শোনা গেল। তারপর দোরগোড়ায় নারীকণ্ঠের প্রশ্ন হলো : কে?

বাসু অম্লানবদনে বললেন, টেলিগ্রাম!

একটু বিস্ময়মিশ্রিত প্রতিপশ্ন হলো, কার নামে?

বাসু তোৎলামি শুরু করলেন, মিস্‌ সুর...সুরা...সুরাং সিঁড়িতে আলো কম, ঠিক পড়া যাচ্ছে না। সাম মিস্‌ এস. পান্ডে। এই দরজা না উপরতলায় যাব?

ক্লিক্‌ করে অর্গলমোচনের শব্দ হলো। দরজার পাল্লাটা দশ-পনের সেন্টিমিটার ফাঁক হলো। একটি সুডৌল ফর্সা হাত বার হয়ে এল। পিছন থেকে কথার জবাবও, এই ফ্লোরেই। দাও টেলিগ্রামটা, সই করে দিচ্ছি...

বাসু হঠাৎ চাপ দিয়ে দরজাটা ঠেলে খুলে দিলেন। ভিতরে প্রবেশ করেই ঠেলে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। দুরন্ত বিস্ময়ে দু-পা পিছিয়ে গেল মেয়েটি। তার পরনে শুধু একটা হাউসকোট। মনে হলো ভিতরে কিছু নেই—শাড়ি-শায়া-সেমিজ-ব্রা। ওর চুলগুলো ভিজা। তোয়ালে দিয়ে বোধকরি এতক্ষণ মাথা মুছছিল। এখন প্রতিবর্তী-প্রেরণায় সেই তোয়ালেটাই বুকে জড়িয়ে বললে, কে আপনি? হাউ ডেয়ার য়ু...

বাসু বললেন, কাম অন, সুরঙ্গমা। ঠাণ্ডা লাগিও না। ঐ লেডিজ শালটা প্রথমে গায়ে জড়িয়ে নাও।

কথাটা ও শুনল। বোধকরি স্নানের পর শীত করছিল বলে। অথবা অপরিচিত পুরুষের সামনে অপ্রতুল গাত্রাবরণের অস্বোয়াস্তিতে। শালটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ও ঘুরে দাঁড়ালো মহড়া নিতে। বাসু-সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, এভাবে অনধিকার প্রবেশ করলেন কেন? কে আপনি?

জবাব না দিয়ে বাসু বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেলেন টেবিলটার দিকে। তার উপর একটা টেলিফোন। ঝুঁকে পড়ে জোরে জোরে তার নম্বরটা পড়ে শোনালেন : 24-9378।

মেয়েটি ওঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ছিনিয়ে নিল টেলিফোনের 'কথামুখ' অংশটা। সেটা বাগিয়ে ধরে বললে, এই মুহূর্তে আপনি এ-ঘর ছেড়ে চলে না গেলে আমি ইন্টালি থানায় ফোন করব কিন্তু! আপনাকে ট্রেসপসিং চার্জে...

বাসু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে জুৎ করে বসলেন। বললেন, কর। থানাও তোমাকে খুঁজছে। থানার সঙ্গে যোগাযোগ হলে ওরাই উলটে জানতে চাইবে, অনীশ আগরওয়াল তোমার অনুরোধমতো রিঙ-ব্যাক করেছিল কিনা।

মেয়েটির সুর নামে। হাতটাও। বলে, কে অতীশ আগরওয়াল?

—অতীশ নয়, সুরঙ্গমা। অনীশ। রোহিণী-ভিলার। চিনতে পারছ না? যাকে ফোন করেছিলে দুপুরবেলা—দুটো দশ মিনিটে। তার সাড়া না পেয়ে দারোয়ানের কাছে মেসেজ রেখেছিলে...কী আশ্চর্য! এখনো মনে পড়ছে না?

টেলিফোনটা এবার ধারক-অঙ্গে নামিয়ে রাখল মেয়েটি। বললে, আপনি কিন্তু এখনো নিজের পরিচয়টা দেননি। আপনি কি থানা থেকে আসছেন?

—'থানা থেকে!' কেন? থানা থেকে তোমার খোঁজে কারও আসার কিছু কারণ ঘটেছে নাকি?

মেয়েটি জবাব দেয় না। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না। বাসুই আবার জানতে চান, তোমার বাথরুমে কে আছে? এই শীতের সন্ধ্যায় ওখানে স্নান করছে কে?

মেয়েটি যেন প্রতিবর্তী-প্রেরণায় জবাবে বলে, বাথরুমে কেউ নেই।

বাসু হেসে ওঠেন। কারণ ঠিক তখনই বাথরুমে জলের কলটা বন্ধ হলো। জলপড়ার শব্দটাও। বাসু বললেন, ওকে বল গায়ে কিছু একটা জড়িয়ে বাইরে আসতে। তুমি জামশেদপুরে থাক, তাই হয়তো আমার নাম শোননি। ও বোধহয় আমাকে নাম শুনে চিনবে। দরজা খোলার আগে ওকে জানিয়ে দাও পি. কে. বসু, ব্যারিস্টার এসেছেন। ওর সঙ্গে দেখা করতে।

সুরঙ্গমা রুদ্ধদ্বারের কাছে গিয়ে ওঁর অনুরোধটা জানালো। গায়ে শাড়ির আঁচলটা জড়িয়ে বার হয়ে এল সদ্যস্নাতা একটি তরুণী। জানতে চাইল, কে তিনি? ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু? আমাকে কেন খুঁজছেন?

বাসু ওকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, আমার দিকে তাকিয়ে একবার দেখ তো মাধবী। চিনতে পারছ? আধঘন্টা আগে রোহিণী-ভিলার 'এন্ট্রেন্সে' যাঁকে দেখে দেওয়ালে সিঁটিয়ে গেছিলে! তাই নয়?

মেয়েটি জবাব দিল না। বাণবিদ্ধ হরিণীর মতো বিস্ফারিত লোচনে শুধু তাকিয়ে থাকে।

বাসু তাঁর মণিবন্ধে ঘড়ির দিকে একনজর দেখে নিয়ে বললেন, সময় অত্যন্ত কম। দশ থেকে পনের মিনিট...

সুরঙ্গমা জানতে চায়, তারপর কী হবে?

—পুলিশের ভ্যানটা ইন্টালিতে পৌঁছে যাবে। তার আগে কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই, এবং শুনেও নিতে চাই। আমি ধরে নিচ্ছি তোমার নাম মাধবী বড়ুয়া, সাকিন গুয়াহাটি; আর তুমি সুরঙ্গমা পান্ডে, জামশেদপুরের একটি স্কুলের গেম্‌স টীচার। আমার আন্দাজে ভুল হলে প্রতিবাদ করো, ঠিক হলে চুপচাপ শুনে যাও। কী করে আন্দাজ করেছি জানতে চেও না। অ্যাম আই কারেক্ট?

কেউ কোনো কথা বলে না। বাসু বলেন, তোমাদের মৌনতাই প্রমাণ দিচ্ছে আমার আন্দাজ ঠিক।

সুবঙ্গমা বললে, কিন্তু পুলিশে আমাদের পাত্তা পাবে কি করে?

—সহজেই। ঠিক যে পদ্ধতিতে আমি এখানে এসে পৌঁছেছি। তোমার টেলিফোন কলটা একটা সহজ সূত্র। শোন মাধবী, তোমার স্বার্থ দেখবার জন্য মহাদেব জালান আমাকে 'রিটেইন' করেছে। আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, তোমার একটা প্রচণ্ড বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আমাকে কয়েকটা কথা এক্ষুণি জানতে হবে। জনান্তিকে—

মাধবী বললে, না! সুরঙ্গমার কাছ থেকে লুকাবার মতো কোনো গোপন কথা আমার নেই! আপনি যা জানতে চান তা ওর সামনেই জানতে চাইতে পারেন। আপনার নাম আমি শুনেছি। কিন্তু আপনিই যে সেই ব্যারিস্টার বাসু তা আমি...

বাসু ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ইন্টেলিজেন্ট কোশ্চেন! এই দেখে নাও মাধবী।

হিপ্-পকেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বার করে ওর চোখের সামনে মেলে ধরেন। বলেন, আমি তোমার সঙ্গে একমত নই, মাধবী। সুরঙ্গমার কাছ থেকে লুকাবার মতো কথা তোমার অনেক কিছু আছে। আমাকে তুমি যা বলবে তা 'প্রিভিলেজড্ কন্‌ভার্সেশান'; কোনো আদালত আমাকে বাধ্য করতে পারে না সে কথা স্বীকার করতে। কিন্তু সুরঙ্গমাকে যদি পুলিশ ডেকে তোলে...

সুরঙ্গমা বাধা দিয়ে বললে, কেন ওকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন? আমরা কিছুই জানি না। মাধবী কিছু জানে না, কিছুই দেখেনি। এ মার্ডার কেস সম্বন্ধে আমরা...

মাঝপথেই ও থেমে যায়। বাসু বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠের মতো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, কী বললে? 'মার্ডার কেস'? কেন? আমি তো এখনো পর্যন্ত বলিনি কেউ খুন হয়েছে? বলেছি? কী সুরঙ্গমা?

পাঁচ

সুরঙ্গমা তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিল। বলল, না, আপনি অবশ্য তা বলেননি। কিন্তু আপনার ভাবখানা ঐরকম। যেন পুলিশের হোমিসাইড স্কোয়াড সারা শহর দাবড়ে বেড়াচ্ছে আমাদের দুজনের সন্ধানে।

বাসু বললেন, তাই বেড়াচ্ছে, সুরঙ্গমা। কেন তারা তোমাদের দুজনকে খুঁজছে তা তোমরা জান, কিন্তু আমার কাছে স্বীকার করছ না। আমার কথাটা শোন। একটুও সময় নষ্ট কর না। তোমাদের দুজনের কাছ থেকেই আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করে নিতে চাই, এখানে পুলিশ এসে পৌঁছানোর আগে। না হলে পুলিশের সামনে আমি কী স্ট্রাটেজি নেব বুঝে উঠতে পারছি না। প্রথমে বল, তোমরা পরস্পরকে চিনলে কী করে?

সুরঙ্গমা বলে, আমিই ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। গুয়াহাটিতে টেলিফোন করেছিলাম।

—আর একটু আগে থেকে শুরু কর। মাধবী বড়ুয়ার গুয়াহাটির টেলিফোন নম্বর তুমি পেলে কেমন করে? ওকে চিনলে কীভাবে?

—আপনি নিশ্চয় জানেন, মাধবীর মতো আমিও জামশেদপুরে বোকা বনেছি। ঠিক একইভাবে। সেটা নভেম্বরের ফার্স্ট উইক। অনীশের সঙ্গে আমি বোম্বাই যাই 'তারকা' হবার বাসনা নিয়ে। সেখানে গিয়ে টের পাই অনীশ কীভাবে আমাদের লেঙ্গি মেরেছে। মাধবী নিজে হাতে নিজের টাকা দিয়েছিল; আমার ক্ষেত্রে 'চীটেড' হয়েছেন আমার বাবা। তাই বোম্বাই থেকে ট্রাঙ্ককলে বাবাকে সব কথা জানাই। ফিরে আসি জামশেদপুরে। বাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আমি একটা ফয়শালা করব বলে গোপনে অগ্রসর হলাম। প্রথমে ঐ জামশেদপুরের একটি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সিকে নিয়োগ করি। তারা দু-তিন দিনের মধ্যেই আমাকে জানিয়ে দিল যে, অনীশ এভাবে একের পর এক নানা শহরে গিয়ে লোককে বোকা বানিয়ে টাকা কামাচ্ছে। মাধবী বড়ুয়ার নাম-ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর তারাই আমাকে সরবরাহ করে। আমি তখন মাধবীকে গুয়াহাটিতে একটা এস. টি. ডি. টেলিফোন করি। তাকে সব কথা খুলে বলি। আর চলে আসতে বলি কলকাতায়। কারণ ইতিমধ্যে ঐ গোয়েন্দা সংস্থা অনীশের কলকাতার ঠিকানাটাও আমাকে সরবরাহ করেছিল। মাধবীকে এই মেজানাইন-ফ্লোরের ঘরে উঠতে বলি। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা দুজনে যদি অনীশকে একসঙ্গে আক্রমণ করি তখন ও বলবার অবকাশ পাবে না যে, এটা ওর অজ্ঞাতসারে অ্যাকসিডেন্টালি হয়েছে। তাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এটা 'ডেলিবারেট র‍্যাকেটীয়ারিং'! সুপরিকল্পিত জুয়াচুরি।

বাসু বললেন, বুঝলাম। সেজন্যই কি মাধবী আজ রাত পৌনে নয়টা নাগাদ রোহিণী-ভিলায় গিয়েছিলে?

মাধবী স্বীকার করল।

বাসু বললেন, কিন্তু তোমাদের তো একযোগে সাঁড়াশি-আক্রমণ করার কথা ছিল, তুমি একলা গেলে কেন?

মাধবী কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুরঙ্গমা বললে, সেরকমই কথা ছিল বটে, কিন্তু আজ আমার একটা থিয়েটারের টিকিট কাটা ছিল বলে ও একাই গিয়েছিল।

বাসু সুরঙ্গমার দিকে ফিরে বললেন, ওর হয়ে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না, মিস্ পাণ্ডে। ওকে যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব মাধবীকেই দিতে দাও। তারপর তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হবে। কেমন? তা মাধবী, তোমার সঙ্গে অনীশের আজ কী কথা হলো?

—আমি ঢুকতেই পারলাম না ওর অ্যাপার্টমেন্টে। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। অনেকবার কলবেল বাজালাম। কেউ সাড়া দিল না। অথচ ভিতরে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছিল।

—ভিতরে কোনো শব্দ শোননি? কোনো ঝগড়া বা তর্কাতর্কি? দ্রাম করে দরজা বন্ধ হয়ে যাবার শব্দ? অথবা ফায়ারিঙের?

সুরঙ্গমা একটু চমকে উঠে বলল, কী বললেন, ফায়ারিঙ?

বাসু ধমকে ওঠেন, প্লিজ কীপ কোয়ায়েট! এটা স্টেজ নয়!

মাধবী নিঃশব্দে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল। নেতিবাচক ভঙ্গিতে।

—তুমি বলতে চাইছ যে, তুমি ঘরের ভিতর আদৌ ঢোকনি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই তো ক্রমাগত বলে চলেছি। ঘরে ঢুকতে না পেরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি। আর তখনি আপনার মুখোমুখি পড়ে যাই।

—তাহলে আমাকে দেখে তুমি অত ঘাবড়ে গেলে কেন?

—ঘাবড়াইনি তো!

—ও! ঘাবড়াওনি! তবে বোধহয় আমারই দৃষ্টিভ্রম। সেক্ষেত্রে তোমার জামাকাপড় বা জুতোয় রক্ত লাগল কী করে?

—রক্ত? আমার জামাকাপড়ে? কী বলছেন! কই না তো!

বাসু সুরঙ্গমার দিকে ফিরে বললেন, তোমার বাথরুমে গীজার আছে? অথবা ইমার্শান-হীটার?

—না, একথা কেন?

—তাহলে কী কারণে এই জানুয়ারীর সন্ধ্যায় তোমাদের দুজনকেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হলো সেটাই আমাকে বুঝিয়ে বল।

দুজনের মুখে কথা ফোটে না। পরস্পরের দিকে তাকায়।

বাসু এদিকে ফিরে বলেন, অল রাইট। রাত আট থেকে নটা তুমি কোথায় ছিলে সুরঙ্গমা?

—রবীন্দ্রসদনের পার্শে অ্যাকাডেমি হলে। আমার এক কাজিনের সঙ্গে থিয়েটার দেখছিলাম। শো ভাঙলো রাত আটটা চল্লিশে। তারপর আমার সেই কাজিন তার নিজের গাড়িতে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

—কী থিয়েটার দেখলে তোমরা?

—মনোজ মিত্রের 'অলকনন্দার পুত্রকন্যা'।

—আই সী। তোমার দাদার গাড়ি আছে শুনলাম। যেহেতু নিজের গাড়িতে পৌঁছে দিল। কী করে সে?

—আর্কিটেক্ট। নিজেরই ব্যবসা আছে। দোতলায় থাকে। একতলায় অফিস।

—বিবাহিত?

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

—বউ বুঝি থিয়েটার দেখতে ভালবাসে না?

—না, তা কেন? বউ আছে নার্সিংহোমে। তার বাচ্চা হয়েছে।

—বাঃ। তোমার দাদা তো বেশ কাজের ছেলে। বউ নার্সিংহোমে আর সে কাজিন-

সিস্টারকে নিয়ে থিয়েটার দেখে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যায় ভিজিটিং আওয়ার্সে বউ-এর কাছে যায় না!

—যাবে না কেন? আজ যায়নি।

—ওকে কি এখন টেলিফোনে পাওয়া যাবে? কী নাম?

—যাবে, যদি এখান থেকে সোজা বাড়িতেই গিয়ে থাকে। ওর নাম রামলগন ভার্গব।

বাসু টেলিফোনটা তুলে সুরঙ্গমার হাতে দিয়ে বললেন, তোমার দাদাকে একটা ফোন কর তো? লাইনে রিঙিং-টোন হলেই আমাকে দেবে। দাদার সঙ্গে কথা বলবে না। বুঝলে?

সুরঙ্গমা আদেশ পালন করল। ম্যানিকিওর করা আঙুলে ছয়-সাতটা নম্বর ডায়াল করল। রিঙিং-টোন হতেই যন্ত্রটা বাড়িয়ে ধরল বাসু-সাহেবের দিকে। একটু পরে ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল, ভার্গব স্পিকিং।

—মিস্টার রামলগন ভার্গব?

—ইয়েস । স্পিকিং । বলুন।

—লুক হিয়ার, মিস্টার ভার্গব। আমি পি. জি. হসপিটালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে বলছি। একটা দুঃসংবাদ আছে। মনটাকে শক্ত করুন।

—ইয়েস। ফায়ার?

—মিস সুরঙ্গমা পাণ্ডে কি আপনার পরিচিত?

—ইয়েস। আমার কাজিন-সিস্টার। কেন?

—একটা মোটর অ্যাকসিডেন্টে মিস্ পাণ্ডে আহত হয়েছেন। অ্যারাউন্ড 'রাত সাড়ে আটটায়। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস হলের সামনে। জ্ঞান নেই। ওঁর ব্যাগের নোটবইতে আপনার টেলিফোন নাম্বার...

বাসু-সাহেবের কথাটা শেষ হলো না। তার আগেই ভার্গব ধমকে ওঠে, হোয়াটস্ অল দিস রাবিশ! আপনি কে মশাই? অ্যাবাউট সাড়ে আটটায় সুরো আর আমি অ্যাকাডেমিতে বসে থিয়েটার দেখছিলাম। তারপর শো ভাঙার পর ওকে ওর ইন্টালির বাসায় যখন নামিয়ে দিই তখন নটা পাঁচ-সাত হবে। অথচ আপনি...

বাসু নিঃশব্দে ধারক-অঙ্গে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। মাধবীর দিকে ফিরে বললেন, অঙ্কটা যে মিলছে না মাধবী! তুমি বলছ, তুমি ঘরের ভিতরে ঢোকনি। সুরঙ্গমার পাক্কা অ্যালেবাঈ আছে। রাত সাড়ে আটটায় সে দাদার সঙ্গে থিয়েটার দেখছে। অথচ আমি যে নিশ্চিতভাবে জানি, রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে তোমাদের দুজনের মধ্যে অন্তত একজন ওঘরে ছিলে?

সুরঙ্গমা বললে, আমাদের দুজনের মধ্যে একজন? তা তো নাও হতে পারে। কোনো থার্ড মহিলা...

—না! সে মেয়েটির সঙ্গে অনীশের ঝগড়া হচ্ছিল। ঝগড়ার সময় সেই মেয়েটি 'ফিল্ম কন্ট্রাক্ট' কথাটা বলেছিল। সুতরাং তৃতীয় কোনো মহিলার প্রশ্ন উঠছে না!

সুরঙ্গমা বলে, উঠছে স্যার। আমরা দুজন ছাড়া আরও একটি মহিলাকে অনীশ একইভাবে ফাঁসিয়েছে। ভুবনেশ্বরে। ওড়িয়া নয়, মেয়েটি বাঙালী। তার নাম সুজাতা মিত্র। আমি তাকে রোহিণী-ভিলার ঠিকানা দিয়েছিলাম। কিন্তু বারণ করেছিলাম যেন আজ রাতে সে রোহিণী-ভিলায় না যায়। কারণ আজ সন্ধ্যায় মাধবী ওর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল। ইন ফ্যাক্ট, রামদা থিয়েটারের টিকিটটা না কেটে ফেললে হয়তো আমরা দুজন একসঙ্গেই যেতাম।

ঠিক তখনি ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল। সুরঙ্গমা সেটা তুলে নিয়ে আত্মঘোষণা করতেই ও-প্রান্ত থেকে যেন টাইফুন ধেয়ে এল। সুরঙ্গমা বলে, তা আমার উপর তড়পাচ্ছ

কেন? ও নিশ্চয় তোমার কোনো বন্ধু-টন্ধু—প্র্যাকটিক্যাল জোক করছে।...নিশ্চয়! খুব অন্যায় কথা! বন্ধুকে লোকেট করতে পারলে ধমকে দিও...না, না, আমি আর বাড়ি ছেড়ে বার হইনি। তুমি নামিয়ে গিয়ে গিছ—তা মিনিট কুড়ি হবে, তাই নয়? মোটর অ্যাকসিডেন্ট হবে কী করে! হয়তো তুমি 'কান' শুনতে 'ধান' শুনেছ!...কী? অলরাইট! অলরাইট! বেশ তো, মেনে নিচ্ছি, ঠিকই শুনেছ! এ তোমার কোনো থার্ড ক্লাস ইয়ার দোস্ত! গুড নাইট!

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলে, রামদা!

বাসু তা আগেই বুঝেছেন। তিনি মাধবীর দিকে ফিরে বলেন, ডক্টর বড়গোঁহাই কলকাতা এসেছেন তা জান?

মাধবী চমকে ওঠে। বলে, আপনি তাকে কী করে চিনলেন?

বাসু ধমকে ওঠেন, প্লীজ ডোন্ট কাউন্টার-কোশ্চেন। যা জানতে চাইছি চটপট করে জবাব দাও। সময় খুব কম। এখনি হোমিসাইড-স্কোয়াড থেকে টেলিফোনটা এসে যেতে পারে। বল, বড়গোঁহাই যে কলকাতা এসেছে তা তুমি জান?

মাধবী সম্মতিসূচক গ্রীবাভঙ্গি করে।

—ও কোথায় উঠেছে তা জান?

—জানি! 'পথিক হোটেল'-এ। গুয়াহাটি থেকে রওনা হবার আগে আমি ডক্টর বড়গোঁহাইকে এই ইন্টালি অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর দিয়ে এসেছিলাম। প্রয়োজনে ফোন করতে বা চিঠি লিখতে—

—অর্থাৎ তুমি তাকে কলকাতায় আসতে বলনি?

—নিশ্চয় নয়। সে নিজের কাজে কলকাতায় এসেছে।

—ও! নিজের কাজে! কী কাজ তা জান না বোধকরি?

—আমি কেমন করে জানব?

—বটেই তো! সে কলকাতায় আসার পর তোমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে?

এবার একটু দেরি হলো জবাবটা দিতে। শেষে মাধবী বলল, না। দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। শুধু টেলিফোনে কথা হয়েছে।

বাসু বলেন, আই সী, ডক্টর বড়গোঁহাই আমার সঙ্গে আজ দেখা করতে এসেছিলেন। বললেন, তিনি তোমার ঠিকানা খুঁজছেন। এবার বল, কে মিথ্যা কথা বলছে? তুমি না বড়গোঁহাই? তোমার ঠিকানা যদি জানাই থাকবে তাহলে তিনি কেন আমাকে ওকথা বললেন?

—আমি জানি না।

সুরঙ্গমা হঠাৎ বলে ওঠে, আমি আন্দাজ করতে পারি। ডক্টর বড়গোঁহাই হয়তো জানতে গিয়েছিলেন, আপনি মাধবীর পাত্তা পেয়েছেন কিনা।

বাসু আবার ওকে থামিয়ে দেন, প্লীজ ডোন্ট ইন্টারাপ্ট মী, মিস্ পান্ডে। যার কাছে যা জানতে চাইছি একমাত্র সে-ই তার জবাব দেবে। ওয়েল মাধবী! ডক্টর বড়গোঁহাই যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখন তিনি একটা প্রাইভেট গাড়ি ড্রাইভ করে এসেছিলেন। গুয়াহাটি থেকে বাই রোড কেউ একা কলকাতা আসে না। গাড়িটা কার?

—না, ও প্লেনেই এসেছে। গাড়িটা কলকাতায় এসে ভাড়া নিয়েছে। 'রেন্ট-আ-কার' মানে একটা এজেন্সি থেকে।

—ভাড়া নেওয়া গাড়ি? আমার তো তা মনে হলো না। কী রঙের গাড়ি বল তো?

—শাদা অ্যাম্বাসাডার। কেন? আপনার কেন মনে হলো ওটা 'রেন্ট-আ-কার' এজেন্সির নয়?

বাসু এতক্ষণে পাইপ পাউচ বার করলেন। বললেন, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখতে চাওয়ার তোমাকে বুদ্ধিমতী মনে হয়েছিল, আসলে তুমি ততটা নও।

মাধবী জবাব দেয় না। জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকে।

পাইপটা ধরিয়ে বাসু বললেন, এবার আমাকে বুঝিয়ে বল তো মাধবী, কলকাতায় আসার পর তোমার সঙ্গে যদি বড়গোঁহাইয়ের দেখাসাক্ষাৎ না হয়ে থাকে তাহলে তুমি কেমন করে জানলে ওর ভাড়া-করা গাড়িটার রঙ স্কাই-ব্লু বা কালো রঙের নয়? শাদা অ্যাম্বাসাডার? তথ্যটা কি বড়গোঁহাই তোমাকে টেলিফোনে জানিয়েছিল?

মাধবী লজ্জা পায়। জবাব দেয় না। সুরঙ্গমা আবার ফোড়ন কাটে, আপনি আমাদের দুজনকে এভাবে জেরা করছেন কেন বলুন তো?

—অঙ্কটা যে মিলছে না। রাত সাড়ে আটটায় অনীশের ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে কে ছিল? সিনেমা কন্ট্রাক্টের প্রসঙ্গ কেন উঠল? না সুরঙ্গমা, মেয়েটির নাম সুজাতা মিত্র নয়। কারণ সুজাতা মিত্রের অ্যালেবাঈ আমি নিজে। ও আমারই এজেন্ট। তোমার কাছে এসেছিল অনীশের ঠিকানা সংগ্রহ করতে। ও আমার বাড়িতেই থাকে। ভুবনেশ্বরে নয়।

সুরঙ্গমা বলে, বুঝলাম। এখন আপনি আমাদের কী করতে বলেন?

—শোন! তোমরা দুজন যা আন্দাজ করেছ, বরং বলা উচিত দুজনের মধ্যে একজন যা প্রত্যক্ষ করেছ, বাস্তবে সেটাই ঘটেছে. অনীশ আগরওয়াল খুন হয়েছে আজ রাত সাড়ে আটটা থেকে পৌনে নটার মধ্যে। সেসময় অথবা খুনের ঠিক আগে ওর বাথরুমে একজন বঙ্গভাষী মহিলা ছিল। যার সঙ্গে অনীশের উচ্চকণ্ঠে ব্যক্যবিনিময় হচ্ছিল। কী নিয়ে ঝগড়া তা বুঝতে পারেননি প্রতিবেশিনী। কারণ তিনি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, বাংলা জানেন না। কিন্তু মেয়েটি—আগেই বলেছি—'ফিল্ম কন্ট্রাক্ট' বিষয়ে কী যেন বলছিল। অনীশ খুন হয়েছে সম্ভবত রিভলভারের গুলিতে। সারা মেঝেতে চাপ-চাপ রক্ত। আমাদের সময় কম। শোন! তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউ আত্মরক্ষার্থে অথবা আত্মসম্মানরক্ষার্থে অনীশকে খুন করেছ কিনা তা আমি জানি না;কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তোমাদের দুজনের মধ্যে কোনো একজন আজ রাত সাড়ে আটটা থেকে পৌনে নটার মধ্যে ঐ ঘরের ভিতর গিয়েছিলে। মৃতদেহটা সে দেখেছে। তার জামাকাপড়ে রক্তের দাগ লেগেছে। হয়তো তোমরা দুজনেই ঐ ঘরে ঢুকেছিলে, অথবা একজনের জামাকাপড়ের কাঁচা রক্তের দাগ আর একজনের পোশাকে লেগেছে। না হলে এই শীতের সন্ধ্যায় তোমাদের দুজনকেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হতো না। খুন কে করেছে...না, না, তোমরা আমাকে বাধা দিও না। সময় খুব কম। আমার যা বলার আছে তা আমাকে বলতে দাও। প্রথম কথা, সুরঙ্গমা, আমি জানি না, জামশেদপুর থেকে তুমি কোনো রিভলভার সঙ্গে করে এনেছিলে কিনা। তোমার বাবা শুনেছি স্টীল অথরিটির একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। তাঁর নিজস্ব রিভলভার থাকা সম্ভব। আছে, তাই নয়?

—আছে। কিন্তু আমি...তা

—নো, নো, নো, সুরঙ্গমা! যেটুকু জানতে চাইছি তার বেশি আমাকে কিচ্ছু বলবে না। বেণী চাইলে স্রেফ বেণী, নট্ উইথ মাথা! বুঝলে না? তুমি আমার মক্কেল নও। তবে এটুকু আমি বলতে পারি : লিস্‌ন্ কোয়ারফুলি—যদি তোমার ধারণায় বা জ্ঞানমতে তোমার বাবার সেই রিভলভারটা বর্তমানে জামশেদপুরে না থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকে, তাহলে রাত পোহালেই তুমি কোনো ক্রিমিনাল ল-ইয়ারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে! ফলো? আমার কার্ডটা রাখ। প্রয়োজনে আমাকে ফোন কর। আমি ভাল ডিফেন্সের ব্যবস্থা করে দেব।

সুরঙ্গমা বলে, কেন স্যার? আপনি নিজেই তো—

—না, তা আমি পারি না। এ কেসে মাধবী আমার ক্লায়েন্ট। মাধবীর তরফে আমি রিটেইনার গ্রহণ করেছি। হয়তো মামলা চলাকালে দেখা যাবে তোমাদের দুজনে স্বার্থে সংঘাত বাধছে—

—কিন্তু আমার দাদার অ্যালেবাঈ—

—আই নো, আই নো। সেটা আমি যাচাই করে নিয়েছি। তা হোক। তবু যদি তোমার বাবার রিভলভারটা...এক কথা বারবার বলার দরকার নেই। তুমি বুদ্ধিমতী। নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাইছি। অ্যান্ড য়ু মিস্ মাধবী বড়ুয়া! তোমার কোনো অ্যালেবাঈ নেই। বরং উল্টোটা আছে। হত্যামুহূর্তের কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমাকে ঘটনাস্থলে দেখতে পাওয়া গেছে। তখন তুমি অত্যন্ত অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিলে। বস্তুত ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলে ঘটনাস্থল থেকে!

সুরঙ্গমা বলে, কিন্তু দেখেছেন তো আপনি। ওর পক্ষের উকিল।

বাসু মাথা নেড়ে বলেন, তোমার ভুল হচ্ছে, সুরঙ্গমা। মক্কেল তার আইনজীবীকে বিশ্বাস করে যেটুকু বলে সেটুকুই 'প্রিভিলেজড্'! তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে আসামীর আইনজীবী আইনত বাধ্য। কিন্তু তাই বলে কোনো কোর্ট অফিসার—তিনি যে পক্ষেই থাকুন—তাঁর জ্ঞানমতে প্রত্যক্ষ করা কোনো ঘটনার কথা গোপন করতে পারেন না! নো, নেভার! সেটা এভিডেন্স! মক্কেলের বলা গোপন কথা নয়। তাছাড়া আরও একজন মাধবীকে ঐ বাড়ি ছেড়ে যেতে দেখেছে। সে ঐ সুজাতা মিত্রের স্বামী। মুশকিল হচ্ছে এই যে, এই টেলিফোনের একটা এক্সটেনশান আছে। না হলে তোমাকে পরামর্শ দিতাম ক্র্যাড্ল থেকে টেলিফোনের মাউথপীসটা নামিয়ে রাখতে।

সুরঙ্গমা জানতে চায়, কেন স্যার?

—অনীশের ঘরে দারোয়ানের পাঠানো ঐ স্লিপটা পুলিশের হস্তগত হলেই ওরা এখানে ফোন করবে। তুমি এটা ডেড করে রাখলেও গৃহস্বামীর ঘরে টেলিফোন বাজবে। তিনি লোক পাঠিয়ে তোমাকে বলবেন টেলিফোনে কথা বলতে। বিশেষ যদি থানা থেকে টেলিফোনটা আসে।

—তাহলে আমি কি কোনো হোটেলে পালিয়ে যাব?

—আয়াম সরি। এক্সট্রীমলি সরি, মিস্ পান্ডে। আমি তোমাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারি না। তবে একটা কথা বলি, হঠাৎ এভাবে আত্মগোপন করাটা পুলিশ ভাল চোখে দেখবে না। সিদ্ধান্তটা তোমাকেই নিতে হবে। তোমার অ্যালেবাঈ আছে। তোমার বাবার রিভলভারটা যদি জামশেদপুরে থাকে তাহলে তোমার ঘাবড়াবার কী আছে? বাট য়ু মাধবী! তোমার কোনো অ্যালেবাঈ নেই। তুমি পাঁচ মিনিটের ভিতর তোমার স্যুটকেসে সবকিছু গুছিয়ে নাও। নিচে আমার গাড়ি আছে। তোমাকে কোনো হোটেলে চেক ইন করিয়ে আমি বাড়ি যাব। তুমি সেই হোটেল ছেড়ে একদম বার হবে না—যতক্ষণ না আমি পারমিশান দিচ্ছি। নিজে থেকে বড়গোঁহাই বা সুরঙ্গমার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করবে না। দিন দুই শুয়ে শুয়ে টিভি দেখবে বা বই পড়বে। বুঝলে? পুলিশে তোমাকে খুঁজবে। কারণ সুরঙ্গমার বজ্রবাঁধুনি অ্যালেবাঈ আছে। তোমার তা নেই। নাউ লুক হিয়ার মাধবী—আমি তোমাকে সুরঙ্গমার সামনে জিজ্ঞেস করছি না যে, তুমি গুয়াহাটি থেকে কোনো রিভলভার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ কিনা, অথবা সেল্‌ফ্-ডিফেন্স—আত্মরক্ষার্থে বা আত্মসম্মানরক্ষার্থে তুমি অনীশকে গুলি করেছ কিনা—

মাধবী দৃঢ়স্বরে বলল, দুটো প্রশ্নের একই জবাব : না!

—আমি শুনিনি। কোনো তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে আমি ও-জাতীয় প্রশ্ন মক্কেলকে জিগ্যেস করতেই পারি না। যা বলছি কর। তুমি পাঁচ মিনিটের ভিতর তৈরি হয়ে নাও।

ঠিক তখনই ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোনটা।

সুরঙ্গমা তুলে নিয়ে 'কথামুখে' বলল, হ্যালো?...কে? লালবাজার? হোমিসাইড সেকশান? ইয়েস? বলুন। আমার নাম সুরঙ্গমা পাণ্ডে। হ্যাঁ, এই ঘরেই থাকি...হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা আমারই টেলিফোন আপাততঃ

বাসু বললেন, কুইক! স্যুটকেসটা সাজিয়ে ফেল, মাধবী। ওরা আসছে। এ-ঘরে তোমার কোনো ট্রেস্ রেখে যেও না। বাথরুমে তোমার কোনো ভিজে জামাকাপড় থাকলে তা প্লাস্টিকে জড়িয়ে তুলে নাও। এই চটি পরেই চল। সেই সোয়েডের শাদা জুতোজোড়া কাগজে জড়িয়ে...

—কোন শাদা জুতো?

—আঃ! কেন তর্ক করছ যেটা পরে রোহিণী-ভিলায় গেছিলে।

—আমার কোন শাদা জুতো নেই।

—অলরাইট। আমারই দৃষ্টিবিভ্রম। মোট কথা তোমার যা যা আছে সবই তুলে নাও!

মাধবী স্যুটকেসটা টেনে নিয়ে গুছোতে বসল। ইতিমধ্যে সুরঙ্গমা টেলিফোনটা ক্র্যাডেলে নামিয়ে রেখেছে। বললে, ডিসিশানটা আমাকে আর নিতে হলো না। আমাকে এখানেই থাকতে হবে আপাতত। ওরা আসছে।

বাসু একটু ইতস্তত করে বললেন, একটা জরুরী কথা বলি। মন দিয়ে শোন। বুঝে, জবাব দাও! তুমি কি একটা ছোট হাতব্যাগে তোমার কোনো দামী জিনিস—জিনিসটার নাম উচ্চারণ না করে—আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে চাও?

সুরঙ্গমা পূর্ণদৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে বলল, বাবার রিভলভারটা আমি জামশেদপুর থেকে আনিনি, মিস্টার বাসু।

ছয়

সুরঙ্গমার বাড়ি থেকে বড় রাস্তায় নেমে বাসু-সাহেব এগিয়ে এলেন তাঁর পার্ক করা গাড়িটার কাছে। ড্রাইভারের সীটে অন্ধকারে বসে ছিল কৌশিক। লক্ষ্য হলো, ড্রাইভারের সীটের পাশের কাচটা একটু নেমে গেল, আর একটি জ্বলন্ত সিগ্রেটের স্টাম্প উড়ে গিয়ে পড়ল কার্বের কাছে। পরমুহূর্তেই পিছনদিকের ফুটপাতের দিকে দরজাটা খুলে গেল। জ্বলে উঠল পিছনের আলো।

বাসু-সাহেবের পিছন-পিছন স্যুটকেস-হাতে এগিয়ে আসছিল মাধবী। বাসু খোলা দরজার হাতলটা ধরে তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার ভাল নাম তো মাধবী, আর কোনো নামটাম আছে? ডাকনাম জাতীয়?

মাঝরাস্তায় হঠাৎ এমন একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে সেটা বোধকরি মেয়েটি আশঙ্কা করেনি। বলে, ডাকনাম 'মাধু', পুরো নাম মাধবীমঞ্জরি বড়ুয়া।

—দ্যাটস্ ফাইন। শোন মাধু। আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি না। কৌশিক তোমাকে একটা হোটেলে পৌঁছে দেবে...

মাধবী বাধা দিয়ে বলে, কৌশিক কে?

ড্রাইভারের সীটে বসা লোকটা মুখ না ঘুরিয়ে উইন্ডস্ক্রীনকে সম্বোধন করে এই সময় বলে ওঠে, পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল'র ড্রাইভার।

বাসু শ্রাগ করে বলেন, সরি! তোমাদের ইন্ট্রোডিউস্ করে দেওয়া হয়নি। শোন মাধবী, ঐ যে আমার গাড়ির ড্রাইভারের সীটে বসে আছেন, উনি হচ্ছেন শ্রীমান কৌশিক মিত্র বি. ই.—'সুকৌশলী গোয়েন্দা সংস্থা'র সিনিয়ার পার্টনার। এঁর স্ত্রীর নামই সুজাতা—যে সুরঙ্গমার কাছ থেকে অনীশ আগরওয়ালের পাত্তা জেনে নেয়। আর এ হচ্ছে মাধবী বড়ুয়া অব গুয়াহাটি, হু হ্যাজ...

দৃষ্টি না ঘুরিয়েই কৌশিক বলে ওঠে, আই নো! উঠে আসুন।

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, না। আমার বাকি বক্তব্যটা আগে শেষ করি, যেহেতু আমি গাড়িতে উঠছি না।

এতক্ষণে কৌশিক এদিকে ফেরে। বলে, অ্যাত রাত্রে ইন্টালি বাজারে আপনি কী করবেন? ফিরবেন কী করে?

—সে আপনাকে ভাবতে হবে না, মিস্টার মিত্র। আমি কাজ সেরে ট্যাক্সি করে ফিরে যাব। আপনি কাইন্ডলি আমার এই ক্লায়েন্টটিকে কোনো হোটেলে পৌছে দিন। হোটেলের ভিতরে গিয়ে আপনার খানদানী বদনখানি রিসেপশানিস্টকে দেখাবেন না। চেক-ইন হয়ে গেলে মাধুই বেরিয়ে এসে আপনাকে জানিয়ে যাবে যে, সে একটা পছন্দমতো সিঙ্গলসীটেড রুম পেয়েছে। রুম নম্বরটা আপনাকে বলে যাবে। আর হোটেলের টেলিফোন নম্বরটা!

কৌশিকের বুঝতে অসুবিধা হয় না, বাসু-সাহেব মর্মান্তিক চটেছেন। তিনি যে ওদের দুজনের 'ফর্মাল-ইন্ট্রোডাকশান' না করিয়েই ফর্মান জারি করেছেন এবং সেটা যে এটিকেট-বিরুদ্ধ কাজ—এটা কৌশিক চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়াতেই এই অভিমানের বহিঃপ্রকাশ। এবার মাধবীর দিকে ফিরে বললেন, যে-কথা বলছিলাম মাধু। তুমি এই কার্ডখানা রাখ। এতে আমার টেলিফোন নম্বর আছে। তোমাকে কৌশিক একটা মডারেট হোটেলে পৌছে দেবে—ফর এক্জাম্পল্ হাজরা-ল্যান্সডাউনের মোড়ে 'ত্রিস্তার' হোটেল। ওখানে যদি সিঙ্গেল-সীটেড রুম পেয়ে যাও নিয়ে নেবে। না পেলে অন্য কোনো হোটেলে। তোমার নাম লেখাবে 'মঞ্জরী এম. বড়ুয়া'—অর্থাৎ মিড্‌ল-নেমটা এগিয়ে দিয়ে...

মাধবী মাঝপথেই বাধা দিয়ে বলে, কেন স্যার?

—কেন? 'য়ু আর নট টু রিজন হোয়াই।' কিন্তু মুখ-ফসকে যখন জানতে চেয়েছ, তখন বলি—পুলিশে হয়তো তোমাকে খুঁজবে। হয়তো সুরঙ্গমার মাধ্যমে নামটাও জানবে—'মাধবী বড়ুয়া'। ফলে হয়তো 'মঞ্জরী বড়ুয়া' নামটা ওদের নজরে পড়বে না—যদি বিভিন্ন হোটেলে আজকের রাত্রের 'এন্ট্রি' চেক্ করতে বসে। আবার নামটা একেবারে অন্য জাতির হলে—'বেলা দত্তগুপ্তা' বা 'নির্মলা গুহঠাকুরতা' হলে, যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, তুমি পলাতকা—'ফিউজিটিভ্'। যেটা আইনের চোখে স্বতই সন্দেহভাজক। এক্ষেত্রে এক ঢিলে দুটো পাখি মরল—তোমাকে নাম-ভাঁড়ানোর চার্জেও ফেলা যাবে না। আবার আত্মগোপনও করা গেল। সেকেন্ডলি, সাকিন, মানে ঠিকানা হিসাবে 'গুয়াহাটি' লিখ না। তোমার কলকাতাবাসী কোনো মামা-কাকা-মেশো-বন্ধুর ঠিকানা লিখে দেবে, বুঝলে?

মাধবী ঘাড় নেড়ে জানাল যে, সে বুঝেছে।

—আর একটা নির্দেশ, কোনো প্রয়োজনেই হোটেল ছেড়ে রাস্তায় নামবে না, আমাকে ছাড়া আর কোথাও কোনো ফোন করবে না। একটা পুরো দিন হোটেলে বসে গল্পের বই পড়বে অথবা টি. ভি. দেখবে। টি. ভি. -ওয়ালা ঘর বুক কর। আমি কাল বিকালে তোমার হোটেলে আসব। অ্যান্ড দিস্ ইজ মাই লাস্ট ইন্সট্রাকসন্স : কোনোক্রমে যদি পুলিশ তোমার সন্ধান পায়, তাহলে তাদের প্রশ্নের কোনো জবাব দেবে না। তোমার কী নাম, কোথা থেকে

এসেছ, মায় তোমার ঘড়িতে কটা বাজে—নাথিং। সব প্রশ্নের একটাই জবাব, আমার সলিসিটারের নাম মিস্টার পি. কে. বাসু—এই তাঁর কার্ড। তাঁকে ফোন করুন। তাঁর অসাক্ষাতে আমি আপনাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না। আন্ডারস্ট্যান্ড

ঘাড় নেড়ে মাধবী জানায় সে বুঝেছে।

—এবার তাহলে গাড়িতে ওঠ।

মাধবী বুঝতে পারে না এক্ষেত্রে তার পিছনের সীটে উঠে বসা অভদ্রতা হবে কি না। কিংবা অপরিচিত পুরুষের পাশে এত রাত্রে সামনের সীটে উঠে বসা দুঃসাহসিকতা হবে কি না। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল কৌশিকের কণ্ঠস্বরে। সে উইন্ডস্ক্রীনের দিকে তাকিয়েই স্বগতোক্তি করে : হে মাধবীদেবী! দ্বিধা কেন?

'মিস্-কোট'টা শ্রবণমাত্র মনস্থির করে মিস্ বড়ুয়া। উঠে বসে পিছনের সীটে।

কৌশিক হাত বাড়িয়ে বলে, গুড-নাইট, মামু!

বাসু প্রতিবাদ করেন, নাইট ইজ ইয়েট ইয়াং, ইয়াং ম্যান! গুড নাইট সম্বোধনটা ডাইনিং-টেবিলের জন্য মুলতুবি থাক!

গাড়িটা দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করামাত্র বাসু ঘড়ি দেখলেন। রাত নটা চৌত্রিশ। এগিয়ে গেলেন একটি পাবলিক টেলিফোন বুথ্-এর দিকে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। সাতটা নম্বর ডায়াল করা মাত্র ও-প্রান্তে সাড়া জাগল : গুড ঈভনিং, দিস্ ইজ ডিউক হোটেল—রিসেপ্শান। হোয়াট ক্যানাই...

বাসু ইংরেজিতে বললেন, অনুগ্রহ করে আমাকে 207 নম্বর ঘরে কানেকশানটা দেবেন?

ও-প্রান্তের মহিলা বললেন, সরি, স্যার! 207 নম্বরের চাবি কী-বোর্ডে ঝুলছে। ঘরে কেউ নেই।

—ঘরটা কি মিস্টার মহাদেব জালানের নামে বুক করা?

—জাস্ট এ মোমেন্ট। লাইনটা ধরুন। রেজিস্টার দেখে বলছি।

রেজিস্টার দেখে মহিলা জানালেন যে, ঐ ঘর মিস্টার জালানের নামেই বুক করা। এবং তিনি এ মুহূর্তে ঘরে নেই।

ধন্যবাদ জানিয়ে লাইনটা কেটে দিয়ে এবার ফোন করলেন বাড়িতে। একবার রিঙিং টোন হতেই ধরল সুজাতা। বাসু বললেন, তুমি কতক্ষণ এসেছ?

—অনেকক্ষণ। আপনি বেরিয়ে যাবার ঠিক পরেই। বিশে বলল, সাহেব এক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন।

—এর মধ্যে আমার কোনো ফোন এসেছিল?

—হ্যাঁ, ডিউক হোটেল থেকে মিস্টার মহাদেব জালান ফোন করে জানতে চান আপনি ফিরেছেন কি না। আমি বললাম, না ফেরেননি।

—আর কোন ফোন?

—না।

—তোমার মামিমা কেমন আছেন?

—ভাল। জ্বর নেই। ঘুমটা হওয়ায় শরীর অনেক ঝরঝরে। রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছেন।

—তুমি কোথা থেকে কথা বলছ? আমার চেম্বার, না রিসেপ্শান?

—না, চেম্বার। রিসেপ্শানে বসে আছেন সেই মহাদেব 'জ্বালান'।

—ও কতক্ষণ জ্বালাচ্ছে?

—মিনিট পাঁচেক হলো।

—লাইনটা ওকে দাও তো?

একটু পরেই মহাদেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বলুন স্যার? কোথা থেকে বলছেন?

বাসু ভৌগোলিক অবস্থানের প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললেন, একটা টেলিফোন বুথ থে আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

—ঘড়ি দেখিনি। মিনিট দশ-পনের হবে। আমি সেই কাগজপত্রগুলো, ফটো, পেপার-কার্টিং সব হোটেল থেকে নিয়ে এসেছি। আপনি বাড়ি ফিরে না এসে বাইরে থেকে ফোন করছেন কেন স্যার?

বাসু গম্ভীরভাবে বললেন, যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। সুজাতা কি ঐ ঘরে আছে, না চলে গেছে?

মহাদেব একটু ইতস্তত করে বললে, না, এখানেই।

—তাহলে মনটাকে শক্ত করুন। আমি চাই না আমার কথা শুনে আপনি চমকে উঠুন বা এমন কোনো আচরণ করুন, যাতে ঐ মেয়েটি কিছু বুঝতে পারে। বুঝলেন?

—না বোঝার কী আছে? বলুন? কী এমন কথা?

—বলছি। কিন্তু বেশি কথা বলবেন না। যা বলছি শুধু শুনে যান। উত্তেজিত না হয়ে। আমি চাই না সুজাতা যেন কিছু আন্দাজ করতে পারে।

—সে তো আগেই বলেছেন। কথাটা কী?

—আমার বাড়ি থেকে আপনি ডিউক হোটেলে গেছিলেন?

—হ্যাঁ। এতে উত্তেজিত হব কেন?

—কাগজপত্র, ফটো, পেপার-কাটিং নিয়ে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—ডিউক হোটেল থেকে আমাকে ফোন করেছিলেন ইতিমধ্যে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—জানতে যে, আপনি বাড়ি ফিরে এসেছেন কি না।

—ঠিক আছে। শুনুন, আমরা অনীশ আগরওয়ালের পাত্তা পেয়েছি। আমি তার বাড়িতে গিয়েছিলাম।

—দ্যাটস গ্রেট! দেখা হলো? কী বললে বদমায়েশটা?

—কিছু বলার ক্ষমতা ছিল না তার। আমি পৌঁছানোর আগেই লোকটা ফৌত হয়েছে।

—কী! ...কী বললেন? ফৌত হয়েছে! কে? মানে, আপনি ওর বাড়িতে গিয়ে...

—শাট আপ! আপনাকে বললাম না, 'চুপচাপ শুনে যাবেন।' এমন চেঁচাচ্ছেন কেন?

—আয়াম সরি, স্যার! বলুন?

—আমি আগেই বলেছি মনটাকে শক্ত করুন। যা বলছি মন দিয়ে শুনে যান। চুপচাপ। আমরা অনীশ আগরওয়ালের ঠিকানা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। বেগবাগানে। বাংলাদেশ মিশনের কাছাকাছি একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস 'রোহিণী-ভিলা'য় সে থাকত। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেখানেই যাই। আপনি লিন্ডসে স্ট্রিটের ডিউক হোটেলের দিকে রওনা হবার কিছুক্ষণ পরে। আমি কৌশিককে সঙ্গে নিয়ে গেছিলাম। ভেবেছিলাম, দুজনে মিলে চেপে ধরলে সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে। আপনাকে ইচ্ছে করেই সঙ্গে নিতে চাইনি। কারণ আমার আশঙ্কা ছিল, ওকে দেখলেই আপনি উত্তেজিত হয়ে উঠবেন, আর অনীশ সতর্ক হয়ে যাবে। সে যাই

হোক, কৌশিককে গাড়িতে রেখে আমি একাই ওর ঘরে যাই। আমি ওর 2/3 নম্বর ঘরে গিয়ে যখন পৌঁছাই তখন রাত আটটা পঞ্চাশ। মনে হয়, তার মিনিট পাঁচ-দশ আগে কেউ ওকে খুন করে ফেলে রেখে গেছে। বুলেটের গুলি। বুকের বাঁ-দিকে। রক্তের মধ্যে মেঝেতে ওর মৃতদেহটা পড়েছিল। খালি গা, পরনে শুধু আন্ডারওয়্যার। স্টোন ডেড।

নিজের অজান্তেই মহাদেব স্বগতোক্তি করে বসে, গুড গড!

তারপর সামলে নিয়ে বলে, আয়াম সরি, স্যার! তারপর?

—আমি যখন রোহিণী-ভিলার পোর্টিকোর কাছাকাছি পৌঁছেছি তখন ঐ অ্যাপার্টমেন্ট-হাউস থেকে একটি সুন্দরী তরুণীকে বার হয়ে আসতে দেখেছিলাম। বয়স বিশ-বাইশ, খুব ফর্সা রঙ। চুল বব্ করে কাটা। চোখে চশমা নেই। তার পরনে ছিল মেরুন রঙের সালোয়ার-কামিজ, একই রঙের উর্নি, পায়ে শাদা রঙের সোয়েডের জুতো। হাইট পাঁচ চার-সাড়ে চার। এবার বলুন, এ বর্ণনার সঙ্গে মাধবী বড়ুয়ার চেহারাটা মেলে?

—ইয়েস স্যার। শাদা সোয়েড়ের জুতোটা ও আমাকে সঙ্গে নিয়েই কিনেছিল। গুয়াহাটির বাজারে।

—তাহলে অবস্থাটা বুঝতে পারছেন? মাধবী একটা গভীর গাড্ডায় পড়ে গেছে।

—তা কেন, স্যার? শাদা সোয়েডের জুতো তো যে কেউ পরতে পারে! তাছাড়া কেউ তো ওকে দেখেনি...

—লুক হিয়ার, জালান। মেয়েটিকে আমি ছাড়া আরও কেউ কেউ দেখেছে। তাকে শনাক্ত করার লোকের অভাব হবে না। তার মানে প্রসিকিউশান অনায়াসে প্রমাণ করবে যে, হত্যামুহূর্তের তিন-চার মিনিট পরে মাধবী বড়ুয়া 'রোহিণী-ভিলা' ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। এটুকু প্রমাণ হলেই সর্বনাশ! কারণ 'রোহিণী-ভিলা' কেন, গোটা 'বেগবাগান' এলাকায় মাধবী কোনও পরিচিত ব্যক্তির নামধাম বলতে পারবে না। যার সঙ্গে দেখা করতে যাবার একটা যৌক্তিকতা খাড়া করা যায়। কলকাতাতেই সে কাউকে চেনে না, বেগবাগান 'দূর অস্ত্'। তাছাড়া আগরওয়ালের এক প্রতিবেশিনী ঐ দিন সন্ধ্যায় ঐ ঘর থেকে কিছু তর্কাতর্কি শুনেছেন।একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার কণ্ঠ! মেয়েটি নাকি 'ফিল্ম কন্ট্রাক্ট'-এর প্রসঙ্গে কী সব কথা বলছিল। সমস্ত কথাই সেই মহিলা পুলিশের কাছে জানিয়েছেন। আমি যখন অনীশের ঘর ছেড়ে বার হয়ে আসি তখন সেই মহিলা একজন সার্জেন্টকে ডেকে নিয়ে আসেন। অনীশের প্রতিবেশিনী অথবা হয়তো সেই সার্জেন্টও মাধবীকে রোহিণী-ভিলা ছেড়ে চলে যেতে দেখেছে। সুন্দরী মেয়ের দিকে অজান্তেই নজর চলে যায়। এখন বলুন, এ বিষয়ে কী করা যেতে পারে?

টেলিফোনে মহাদেবের কণ্ঠস্বর একটু উত্তেজিত শোনালো, কী বলছেন স্যার! এ-কথা কী প্রশ্ন করে জানবার? মাধবীর যদি গভীর গাড্ডায় পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে তবে আপনি তাকে রক্ষা করবেন। কী করে করবেন তা আপনিই জানেন। অনীশ আগরওয়াল ফৌত হয়েছে তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। যেই খুনটা করে থাক সে ধরণীর ভার লাঘব করেছে। কিন্তু সেজন্য মাধবীর কেশাগ্র কেউ যেন স্পর্শ না করে...

—কিন্তু কাজটা যদি সে-ই করে থাকে?

—ইম্পসিবল! অ্যাবসার্ড! মাধু সেরকম মেয়েই নয়। তাছাড়া ও রিভলভার পাবে কোথায়? শুনুন মশাই! ও-সব ফালতু কথার মধ্যে আমি নেই। খুনটা যে করেছে সে হয়তো দোষটা মাধুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইবে—নিজেকে বাঁচাতে। বিশেষ যদি প্রমাণিত হয় মাধু ঐ সময় অনীশের সঙ্গে দেখা করতে গেছিল। এই জাতের আশঙ্কা করেই আমি আপনাকে

আগাম রিটেইনার দিয়ে রেখেছি। বলেন তো, আরও কিছু দিয়ে যাই। মানি ইজ নট এনি ফ্যাক্টর...

বাসু ওকে মাঝপথে থামিয়ে বলেন, অল রাইট ! তাহলে আপনি ওখানেই অপেক্ষা করুন। আমি আধ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসছি। জরুরী কথা আছে আপনার সঙ্গে। আমাদের স্ট্রাটেজিটা খাড়া করতে হবে।

—না, স্যার! এখানে নয়। এখন রাত পৌনে দশটা। হোটেলে একজনের সঙ্গে আমার রাত দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। বিজনেস-ব্যাপার। আপনি যেখান থেকে কথা বলছেন সেখান থেকে স্ট্রেট ডিউক হোটেলে চলে আসতে পারবেন কি?

—তা পারব। অ্যারাউন্ড দশটায়।

—না, স্যার। ঐ লোকটাকে বিদায় করতে আমার মিনিট পনের লাগবে। আপনি সওয়া দশটা নাগাদ আসুন।

—ঠিক আছে, তাই হবে। আপনি যেন সুজাতা বা আর কাউকে কিছু বলবেন না অনীশের ব্যাপারে।

—ঠিক আছে। ফটো, পেপার-কাটিং এগুলো কি হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাব? আপনার হাতে-হাতে দেব?

—না। ওগুলো আপনার কাছে আমি চাইনি। বরং 'সুকৌশলী' চেয়েছিল। ওগুলো সুজাতার কাছে দিয়ে আপনি হোটেলে ফিরে যান।

সাত

বাসু-সাহেব ডিউক হোটেলের রিসেপ্‌শানে যখন এসে পৌছালেন রাত তখন দশটা দশ। কাউন্টারে প্রশ্ন করে জানলেন 207 ঘরের বোর্ডার উপস্থিত আছেন। এবার কাউন্টারে ছিলেন একটি বাঙালী মহিলা, বললেন, কী নাম বলব, স্যার?

—পি. কে. বাসু।

নামটা অ্যানাউন্স করতে গিয়ে উনি মাঝপথে থেমে গেলেন। টেলিফোনের কথামুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন, এক্সকিউজ মি স্যার, আপনি কি ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু?

—হ্যাঁ, মা। মনে হচ্ছে ইতিপূর্বে তোমার কন্টকিত হবার দুর্ভাগ্য হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ তা হয়েছে। আমি এবং আমার মেয়ে। সে তো আপনার দারুণ ফ্যান। আপনি আসবেন জানলে তার অটোগ্রাফ খাতাখানা আজ সকালে অফিসে আসার সময় ব্যাগে ভরে নিয়ে আসতাম।

বাসু হাসতে হাসতে বললেন, সে জন্য দুঃখ করার কিছু নেই, মহাদেব জালান আমার মক্কেল। আমাকে হয়তো আরও দু-একবার এ হোটেলে আসতে হবে—যদ্দিন না ওর কেসটা মেটে। তুমি একবার ফোন করে দেখ দেখি, ও একা আছে কি না। বলেছিল, দশটা নাগাদ ওর এক পার্টি আসবে। সে আছে, না গেছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, না, দশটা নাগাদ ওঁর কোনো গেস্ট তো আসেনি। যাহোক দেখছি। এরপর তিনি ফোন করে জানালেন, আজ্ঞে না, মিস্টার জালান আপনার জন্যই অপেক্ষা করছেন। আপনি উপরে যান 207।

বাসু স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌টের মাধ্যমে তিনতলায় উঠে এলেন। 207 নম্বর ঘরে কল-বেল বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে পাল্লাটা খুলে গেল। মহাদেব স্নানান্তে ধবধবে শাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে ঘরোয়া হয়েছেন। 'সীতশ্চ হসিতম্'। অর্থাৎ ভালুকে শাঁকালু খাচ্ছে! বললেন, আইয়ে সাব, তসলিম রাখিয়ে।

বাসু জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সেই বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্টটা...

মহাদেব বাধা দিয়ে বলে, হ্যাঁ, লোকটাকে বিদায় করেছি।

বাসু এগিয়ে এসে একটি চেয়ারে বসলেন। বেশ বড় সিঙ্গলবেড-ঘর। এয়ারকন্ডিশান করা। জালানের হাতে সিগারেট। সেও সামনের একটা চেয়ার দখল করে বসল। বলল, একটা কথা বলি, স্যার? আমার বেশ খিদে পেয়ে গেছে। আপনি যদি বাড়িতে একটা ফোন করে জানিয়ে দেন, তাহলে আমরা দুজনে এখানে ডিনারটা সারতে সারতে কথা বলতে পারি। আপনার পক্ষেও আরও রাত করে ডিনার খাওয়া উচিত হবে না। কী বলেন?

বাসু বললেন, আপত্তি নেই। তবে রাতে আমি অল্পই খাই।

—বেশ তো। অল্প-বেশি যা মন চায় খাবেন। সে তো আপনার অর্ডার-মাফিক। কিন্তু ড্রিঙ্কস কী নেবেন? দাঁড়ান, রুম-বেয়ারাকে ডাকি।

বোতাম টিপে রুম-সার্ভিসকে ডাকলেন। বাসু-সাহেবের দিকে টেলিফোন রিসিভারটা বাড়িয়ে ধরেন। বাসু ফোন করতে ধরল সুজাতা। বাসু জানতে চান, কৌশিক কি ফিরেছে?

—হ্যাঁ, এইমাত্র ফিরেছে। আপনার মক্কেলকে নিরাপদ স্থানে নামিয়ে দিয়ে। বিস্তারিত বলব?

—না। বাড়ি গিয়েই শুনব বরং। আর তোমার মামিমা?

—আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন।

—তাহলে শোন। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও। আমি অ্যারাউন্ড এগারোটা নাগাদ ফিরব; কিন্তু খেয়ে নিয়ে। বিশেও যেন আহারাদি মিটিয়ে নেয়।

—বুঝলাম। তা আপনি নৈশাহার করছেন কোথায়?

—কৈলাসে।

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখেন। দেখেন ইতিমধ্যে রুম-সার্ভিস বেয়ারা এসেছে। মহাদেব তাকে ঘরে খাবার নিয়ে আসার অর্ডার দিচ্ছে। নিজে কী পানীয় নেবে এবং খাদ্য, তা বলা হয়েছে। এবার বাসু সাহেবের দিকে ফিরে বলে, অব্ আপ্ ফরমাইয়ে।

বাসু রুম-সার্ভিস বেয়ারাকে বললেন, হুইস্কি, সোডা, ফিশ্ ফিঙ্গার, এক পীস নান আর চিকেন উইথ ক্যাপসিকাম।

—ডেসার্ট স্যার?

—না, আমার চাই না।

—কী হুইস্কি আনব স্যার? ব্ল্যাক-লেবেল?

—কী দরকার? ইন্ডিয়া নাম্বার ওয়ানই নিয়ে এস না।

ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিল মহাদেব। বিলাইতি না পীইয়ে সে ছাড়বেই না। নিজের জন্য সে ইতিপূর্বে 'রম' অর্ডার দিয়েছিল। সেটা বাতিল করে একটা পুরো বোতলই আনতে বলল। ব্লাক-লেবেল।

বাসু বললেন, আমি কিন্তু দু-পেগের বেশি খাব না।

—খাবেন না। বাকি প্রসাদটুকু না হয় আমিই শেষ করব। আজ না হলে কাল।

খাবারের অর্ডার নিয়ে রুম-বেয়ারা চলে যাবার পর মহাদেব দরজায় ছিটকানি দিয়ে ওঁর মুখোমুখি বসল। বলল, এবার বলুন?

—মাধবীকে আমি খুঁজে বার করেছি। তার সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছে। ও যে ঘটনার কাছাকাছি সময় ঐ রোহিণী-ভিলায় ছিল এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু ব্যাপারটায় সে যে কতটা জড়িয়ে পড়েছে তা এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কলকাতায় এসে মাধবী এক বান্ধবীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। সে একাই থাকে। তার বাড়িতে গিয়ে তার সামনেই আমি মাধবীর দেখা পাই। মেয়েটির নাম সুরঙ্গমা পান্ডে। কলকাতার মেয়ে নয়। সেও মাধবীর মতো লোভে পড়ে ফেঁসেছে। একইভাবে সে কলকাতায় এসেছিল টাকাটা উদ্ধার করতে।

—ও কোথাকার মেয়ে?

—টাটানগর।

—তাহলে হয়তো ঐ মেয়েটিই অনীশের বাড়ির বাথরুমে আত্মরক্ষা করছিল। সেও 'ফিল্ম কন্ট্রাক্টের' কথা বলে থাকতে পারে—আই মীন প্রতিবেশিনী যা শুনেছেন।

—না। সে সম্ভাবনা নেই। অনীশ খুন হয়েছে অ্যারাউন্ড রাত পৌনে নয়টায়। সুরঙ্গমা সে-সময় আকাদেমি অব ফাইন আর্টস্-এ ওর কাজিনের সঙ্গে থিয়েটার দেখছে। থিয়েটার ভেঙেছে পৌনে নয়টায়। তারপর ওর কাজিন ওকে নিজের গাড়ি করে পৌঁছে দিয়েছে। এটা ওর বজ্রবাঁধুনি অ্যালেবাঈ। আমি ভেরিফাই করে দেখেছি। তবে সুরঙ্গমা মেয়েটি ভাল। সে মাধবীকে সবরকম সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত।

—মধুর, আই মীন মাধবীর কোনো বিপদ নেই তো?

—সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ শ্রবণান্তে আপনি যদি প্রশ্ন করেন জানকী কার পূজ্যপাদ পিতৃদেব, তাহলে কী জবাব দেব?

মহাদেব ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বললে, সরি, স্যার! আপনার প্রশ্নটা আমার মাথার এক বিঘৎ উপর দিয়ে চলে গেল।

বাসুকে ব্যাখ্যা দিতে হলো না। তার আগেই কেউ নক্ করল দরজায়। মহাদেব গিয়ে দরজা খুলে দিল। রুম-অ্যাটেন্ডেন্ট তার সহকারীকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। পানীয় আর খাদ্য সাজিয়ে দিল টেবিলে। তাকে বিদায় করে ফিরে এসে মহাদেব অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করল, অনীশের ব্যাপারটা বলুন। কী করে কী হলো। আপনি গিয়ে কী দেখলেন?

—কী করে কী হলো তা আমি জানি না। আমার জানার কথাও নয়। কারণ, আমি ওর ঘরে গিয়ে পৌঁছানোর আগেই কেউ ওকে খুন করে গেছে। আমি যখন পৌঁছাই ওর সদর দরজা তখন ভিতর থেকে বন্ধ। রাত নটা বাজতে দশ-বারো হবে। আমি তিন-চার বার কল-বেল বাজাই—কোনো সাড়া জাগে না। দরজায় দুম্ দুম্ করে কিল মারি, তাতেও কেউ সাড়া দেয় না। ভিতরটা একেবারে নিস্তব্ধ। অথচ ঘরে আলো জ্বলছে।

মহাদেব ইতিমধ্যে দুটি গ্লাসে পানীয় ঢেলেছে। নিজেরটা তুলে নিয়ে বললে, চিয়ার্স। ভিতরে আলো জ্বলছে কী করে বুঝলেন? সদর-দরজায় কি ফ্রস্টেড-গ্লাসের প্যানেল?

বাসুও তাঁর পানীয়টা তুলে নিয়ে বললেন, চিয়ার্স! না, দরজা মজবুত সেগুন কাঠের। কিন্তু উপরে গ্রিল্ড্ ট্রান্সম্ ছিল। তা দিয়েই বোঝা যাচ্ছিল ঘরে আলো জ্বলছে। তাছাড়া আমি 'কী-হোল' দিয়ে দেখে নিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে আমি যখন ফিরে আসছি তখন নজর হলো ঐ প্রতিবেশিনী মহিলা এক পুলিশ-সার্জেন্টকে নিয়ে আসছেন। আমি তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে আবার কল-বেল বাজাতে শুরু করলাম।

—কেন?

—আমার আশঙ্কা হয়েছিল, রুদ্ধদ্বার কক্ষের ভিতর কিছু একটা রহস্য আছে। কে

জানে—হয়তো অনীশ খুন হয়ে পড়ে আছে—তাই আমি চাইনি যে, সার্জেন্টটা আমাকে চিনে রাখুক—ঐ মৃত্যুশীতল কক্ষ থেকে নির্গত শেষ ব্যক্তি হিসাবে।

—আই সী! তারপর?

—সার্জেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করল, ঐ অ্যাপার্টমেন্টে কে থাকে? আমি বললাম, আমি যদ্দুর জানি, অনীশ আগরওয়াল নামের একজন বোম্বাইয়ের ফিল্মওয়ালা। বললাম, তাকে আমি চিনি না, নাম-ঠিকানা জেনে দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু যে কারণেই হোক ও দরজা খুলছে না। তাই ফিরে যাচ্ছি। সার্জেন্ট আমাকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে—অনীশকে আমি কতদিন ধরে চিনি, কী কারণে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম ইত্যাদি। আমি মূল কথাটা এড়িয়ে সত্য জবাব দিই। নিজের কার্ডটা সার্জেন্টকে দিয়ে বলি প্রয়োজন হলে আমাকে ফোন করতে।...তা কার্ড দেখে সার্জেন্ট আমাকে চিনতে পারল। ও তখন দারোয়ানকে ডেকে কেয়ারটেকারকে খবর দিতে হুকুম করল। বলল, ঐ অ্যাপার্টমেন্টের ডুপ্লিকেট-চাবি নিয়ে কেয়ার-টেকার যেন ইমিডিয়েটলি চলে আসে।

একটা ফিস ফিঙ্গার চিবাতে চিবাতে মহাদেব বলে, আর আপনি?

—আমি তৎক্ষণাৎ সুযোগ বুঝে কেটে পড়লাম। নিচে কৌশিক গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তার গাড়িতেই।

—আই সী। তাহলে মাধুকে কোথায় দেখলেন?

—সে তো যখন আমি রোহিণী-ভিলার দিকে যাচ্ছি, তখন। মাধবী তখন রোহিণী-ভিলা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছিল।

আর এক সিপ্ কণ্ঠনালীতে ঢেলে দিয়ে মহাদেব বলল, আই সী। তার মানে, আপনি যখন চলে আসেন তখনো সার্জেন্ট ডুপ্লিকেট 'কী' দিয়ে দরজাটা খোলেনি?

বাসু-সাহেব তাঁর গ্লাসটা তুলছিলেন ঠোঁটে। মাঝপথে থেমে গিয়ে বলেন, হোয়াই ডু য়্যু-আস্ক দ্য কোশ্চেন?

মহাদেব বললে, আগে ভোজনপর্বটা সমাধা করা যাক, স্যার। আপনি কি কিছু ডেসার্ট ডিশ্ নেবেন?

—নো থ্যাঙ্কস। কিন্তু হঠাৎ ও-প্রশ্নটা কেন জানতে চাইলেন, বলুন তো?

মহাদেব নিঃশব্দে আহার-কার্য সমাধা করতে থাকে। বাসু তাগাদা দেন; কী হলো? কিছু বলছেন না যে?

—বলছি। ভোজনটা শেষ হোক।

বাসু তাঁর গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন। নান-রুটি দিয়ে আর একটু মাংস মুখে তুললেন। তারপর ন্যাপকিনে হাত মুছে নিয়ে গ্লাসের তলানিটুকু কণ্ঠনালীতে ঢেলে দিলেন।

মহাদেব বললেন, প্লীজ হ্যাভ অ্যানাদার পেগ ফর দ্য রোড, স্যার।

—নো, থ্যাঙ্কস! আমার পরিমিত ডোজ পান করেছি। এবার আমার প্রশ্নটার জবাব দিন।

মহাদেবও ন্যাপকিনে মুখটা মুছে নিয়ে বললে, মিস্টার বাসু। এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্লীজ লিস্‌ন কেয়ারফুলি। ইটস্ ইম্পর্ট্যান্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট! জীবন-মরণের প্রশ্ন!

বাসু ওর বক্তব্যটা আন্দাজ করেছেন। সে কী বলতে চায়, কেন বলতে চায়, আর কোথায় সে বাসু-সাহেবের স্টেটমেন্টে একটা বিরাট অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছে। ভুলটা ওঁরই। এ বিষয়ে ওঁর সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। অভিজ্ঞ ব্যারিস্টারের এতবড় ভ্রান্তি নিতান্ত ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু ভুলটা হবার একটা বিশেষ হেতুও আছে। এই মুহূর্তটার আগে মহাদেবকে উনি প্রতিপক্ষ

হিসাবে দেখেননি। সে তো ক্লায়েন্টের তরফের লোক। সেই তো মাধবীর তরফে রিটেইনার দিয়ে গিয়েছিল।

বাসু গম্ভীর হয়ে বললেন, বলুন, মিস্টার জালান। আপনার যদি কোনো বক্তব্য থাকে তা বলুন। আমি শুনে রাখি।

—ইয়েস, শুনে রাখুন। তিন পেগ হুইস্কিতে আপনিও মাতাল হননি, আম্মো হইনি। প্রথম কথা, আপনি পরিষ্কারভাবে এটা বুঝে নিন যে, এ কেস-এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মাধবী মঞ্জরী বড়ুয়া, অ্যান্ড নান্ এল্স্। তাকে আমি ভালোবাসি, নিজের জানের চেয়েও বেশি। সুতরাং তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হোক এটা আমি কোনোমতেই—আই রীপিট — 'কোনক্রমেই' বরদাস্ত করব না।

বাসু এখনো গম্ভীর। বলেন, একথা আপনি প্রথম দিনেই বলেছেন। এই শর্তেই আমি আপনার রিটেইনার গ্রহণ করেছি।

—অল রাইট। দ্বিতীয় কথা, আয়াম এ ফাইটার। আমি জানকবুল লড়ে যাব। মাধবীকে রক্ষা করার প্রয়োজনে আমি সবকিছু স্যাক্রিফাইস্ করতে প্রস্তুত। সে জন্য যদি অন্য কেউ এ 'কেস'-এ বেকাদয়াদ পড়ে যায়, তাতে আমি ভ্রূক্ষেপ করব না।

বাসুর ভ্রূকুঞ্চন হয়। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোনো পরিবর্তন হয় না। বলেন, আপনি এখনো কোনো নতুন কথা বলেননি, মিস্টার জালান।

মাথা ঝাঁকিয়ে মহাদেব বলেন, নো স্যার! বলেছি! য়ু আর ইন্টেলিজেন্ট এনাফ্ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমি কী নতুন কথা বলেছি। বেশ, না হয় আরও স্পষ্ট ভাষায় বলি! মাধবীকে বাঁচাতে গিয়ে আমি যদি দেখি অন্য কেউ মার্ডার-চার্জে ফেঁসে যাচ্ছে তাহলে আমি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করব না। আই কেয়ার টু ফিগ্স্ হু দ্য ডেভিল গেটস্ দ্য পাঞ্চ!

বাসু আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, হ্যাভ য়ু ফিনিশড, মিস্টার হোস্ট? আপনার আর কিছু বলার আছে?

—আছে! বসুন। আমার বক্তব্যটা শেষ হয়নি। আপনি অকুস্থলে পৌঁছানোর কতক্ষণ আগে খুনটা হয়েছে আন্দাজ করতে পারেন?

—তা আমি কেমন করে জানব? দু-মিনিট হতে পারে, দশ মিনিট হতে পারে।

—রীগর মর্টিস তখনো শুরু হয়নি?

—আপনি 'রীগর মর্টিস্' বোঝেন? না শুরু হয়নি।

মহাদেব ইতিমধ্যে সিগ্রেট ধরিয়েছে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, কিছু মনে করবেন না ব্যারিস্টার সাহেব, গাঁ থেকে এসেছি বলে আমি আইনের বিষয়ে একেবারে গেঁয়ো নই।

বাসু বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মিস্টার জালান। আমরা পরস্পরকে ঠিকই চিনতে পেরেছি। এরপর থেকে কেউ আর কাউকে আন্ডারএস্টিমেট করব না।

—তাহলে আমায় যুক্তি-নির্ভর ঘটনা-পরম্পরার একটা ব্যাখ্যা দিন। অ্যাজুমিং মাধু খুনটা করেছে। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে, সে একটা রিভলভার হাতে নিয়ে দেখা করতে যায়। দ্যাটস অ্যাবসার্ড। তাকে আমি ফ্রক-পরা অবস্থা থেকে চিনি। সে কোনোদিন কোনো রিভলভার হাতে করেনি। ওদের বাড়িতে রিভলভার নেই। ওর বাবার একটা দোনলা বন্দুক অবশ্য আছে। ফলে সে কোথায় পাবে অমন একটা রিভলভার?...অল রাইট, যুক্তির খাতিরে ধরে নেওয়া গেল যে, কোনো-না-কোনো সূত্র থেকে সে একটা রিভলভার যোগাড় করে ছিল...

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বাসু বলেন, একটা কথা। আপনি গুয়াহাটির লোক। অনেক

'খবর রাখেন। আপনি জানেন, মাধবীদের বাড়িতে কোনো রিভলভার নেই। আপনার নিজের কি আছে?

জালান বিচিত্র হাসল। উঠে গিয়ে অ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে সামনে রাখল। স্প্রিং-লক খুলে দেখালো—উপরেই তোয়ালের উপর রাখা একটি পয়েন্ট টু টু মার্কিন রিভলভার। বলল, এক নম্বর কথা, মাধু কলকাতা আসার পর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। সে কোথায় উঠেছে আমি এখনো জানি না। দু-নম্বর কথা, পোস্ট-মর্টামে অনীশের দেহে বুলেটটা খুব সম্ভবত পাওয়া যাবে, আপনার কোনোরকম সন্দেহ থাকলে একটা কম্পারেটিভ মাইক্রোস্কোপ স্টাডি করাবেন।

বাসু বললেন, অল রাইট। এবার বলুন, ডক্টর বড়গোঁহাই-এর কি কোনো রিভলভার লাইসেন্স আছে?

—সরি। আমি জানি না। ধরা যাক, আছে। মাধু সেটা হাত করেছে। ধরা যাক, সেটা সে গুয়াহাটি থেকে দমদমে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। ধরা যাক, সেটা হাতব্যাগে নিয়েই সে অনীশের ঘরে ঢোকে। ও. কে.? এবার আপনি প্রশ্নটা অন্য দিক থেকে দেখুন। অনীশের ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু ছিল না। জানুয়ারি মাসের সন্ধ্যারাত্রের শীতে নিম্নাঙ্গে ছিল শুধুমাত্র ড্রয়ার। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, লোকটা 'রেপ' করতে যাচ্ছিল ঐ মেয়েটিকে—যে ওর বাথরুমে ঢুকে আত্মরক্ষা করেছে। কেমন তো? সেক্ষেত্রে কি মেয়েটি মাধবী বড়ুয়া হতে পারে? যে মাধবীর হাতে ডক্টর বড়গোঁহাইয়ের লোডেড রিভলভার? ওর হাতে উদ্যত রিভলভার দেখলে অনীশ কি জামাকাপড় আদৌ খুলত? কুকুরের মতো কেঁউ কেঁউ করত না? দেয়ারফোর : অনীশের বাথরুমে যদি কোনো মেয়ে ব্যারিকেড রচনা করে থাকে তবে সে রিভলবারধারিণী মাধবী বড়ুয়া নয়।

বাসু বললেন, অনীশের গায়ে যে কোনো জামা ছিল না, অথবা নিম্নাঙ্গে শুধু আন্ডারওয়ার ছিল, এটা কেমন করে জানলেন?

জালান তার নিঃশোষিত সিগ্রেটের স্টাম্প থেকে একটি নতুন সিগ্রেট ধরাতে ব্যস্ত ছিল। বিচিত্র হেসে বললে, ও-প্রসঙ্গ থাক।

—থাকবে কেন?

—ওটা আমার রঙের টেক্কা, বাসু-সাহেব! আপাতত সেটা মুলতুবি থাক। কোনো একটি বিশেষ সূত্র থেকে ঐ অভ্রান্ত তথ্যটা জেনেছি। যে কথা বলছিলাম, আমি প্রমাণ করেছি যে, বাথরুমে আটক-পড়া মেয়েটি মাধবী বড়ুয়া হলে তার এক্তিয়ারে কোনো রিভলভার ছিল না। মেয়েটি যেই হোক— প্রথম কথা, তার এক্তিয়ারে কোনো রিভলভার থাকতে পারে না, কারণ তা থাকলে সে অফেন্স নিত, অনীশ খেলত ডিফেন্সে! এবার ধরা যাক, মেয়েটি যখন বাথরুমে তখন খোলা দরজা দিয়ে একজন কেউ ঢুকে অনীশকে গুলি করে। সে-ক্ষেত্রে কী হবে? মেয়েটি বাথরুম থেকে ফায়ারিঙের একটা শব্দ শুনবে, একটা দেহপতনের শব্দ। আততায়ীর পলায়নের শব্দ। তারপর সব শুনশান। স্বতই মেয়েটি দরজা একটু ফাঁক করে দেখবে। মৃতদেহটা দেখতে পাবে নিশ্চিত। আততায়ীকে দেখতেও পারে, নাও পারে। সে-ক্ষেত্রে সেই মেয়েটি নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবে, জমাট রক্তের এলাকাটা এড়িয়ে। সে যদি 'রোহিণী-ভিলা' থেকে বেরিয়েই কারও মুখোমুখি পড়ে যায়, তবে স্বাভাবিকভাবেই ভয়ে সিঁটিয়ে যাবে।

বাসু বলেন, তার মানে আপনি বলতে চান যে, মাধবীই আটক ছিল বাথরুমে। সে মৃতদেহটা দেখেছে বলেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেছিল। সে-ক্ষেত্রে প্রশ্নটা এই : দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ হলো কী করে? মাধবী বা অন্য মেয়েটি যখন ছুটে বেরিয়ে যায়, তখন তো মৃত অনীশ আগরওয়াল ছাড়া ঘরে কেউ ছিল না?

মহাদেব নিঃশব্দে বার-কতক সিগ্রেটে টান দিয়ে বললে, সমস্যাটা নিয়ে আমি গভীরভাবে ভেবেছি মিস্টার বাসু। এটার পাঁচরকম বিকল্প সমাধান হতে পারে :

এক : অনীশ যখন প্রথম ঘরে ঢোকে তখন দরজাটা খোলা রাখে। কারণ তার সঙ্গে সুরঙ্গমা অথবা মাধবী কিংবা অন্য কোনো মেয়ের হয়তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। যাতে সে পাড়া না জাগিয়ে আসতে পারে তাই। কিন্তু সে ইয়েল-লকের ডোর-নবটা মেঝের সঙ্গে আলম্ব করে রেখেছিল। যাতে দরজাটা টেনে দিয়ে কেউ বেরিয়ে গেলেই তা ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে যাবে।

দুই : অনীশ দরজাটা খোলাই রেখেছিল; কিন্তু লক-নবটা জমির সমান্তরালে ছিল। মেয়েটি, যদি মাধবীই হয়, লক-নবটা ভার্টিকাল করে দিয়ে দরজাটা টেনে দেয়। এ সম্ভাবনা খুবই কম—কারণ পলাতকার এসব দিকে খেয়াল না থাকারই কথা। সে তখন প্রাণভয়ে পালাচ্ছে।

তিন : মেয়েটি আততায়ীর নিষ্ক্রমণের পরে অ্যাপার্টমেন্ট ত্যাগ করে। সে আততায়ীকে লক-নবটা ভার্টিকাল করতে দেখেছিল বাথরুম থেকে। তাই কায়দাটা জানে। সে নবটা প্রথমে হরিজন্টাল করে দোর খোলে, তারপর ভার্টিকাল করে দরজাটা টেনে বেরিয়ে যায়।

চার : আততায়ী মেয়েটির পরিচিত। মেয়েটি তাকে বাঁচাতে চাইছে। দুজনে যুক্তি করে দরজাটা ভিতর থেকে লক করার ব্যবস্থা করে পালায়। যাতে মৃতদেহ আবিষ্কারে দেরি হয়।

পাঁচ : আপনি যখন ওখানে পৌঁছান তখন দরজাটা আদৌ বন্ধ ছিল না। আপনি ঘরের ভিতর গিয়েছিলেন। মৃতদেহকে দেখেছেন। লক্ষ্য করেছেন, বুলেটটা বুকের বাঁ-দিকে লেগেছে। লক্ষ্য করেছেন, অনীশের ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ এবং নিম্নাঙ্গে আন্ডারওয়্যার। আপনি নিজেই দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেন। লক করেন।

মহাদেব থামল। সিগ্রেটের ছাইটা ঝেড়ে হাসিহাসি মুখে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললে, দ্যাটস্ অল্, মি লর্ড !

বাসু বললেন, এই পাঁচটি বিকল্প সম্ভাবনার মধ্যে আপনার কোনটিকে সবচেয়ে সম্ভাব্য বলে মনে হয়?

—চতুর্থটি এবং পার্টলি পঞ্চমটি !

—অর্থাৎ?

—বাথরুমে মাধবীই ছিল। নিরস্ত্র। আত্মসম্মান রক্ষা করতে ছিটকিনি বন্ধ করে দুর্গ রচনা করেছিল। সে-সময় সদর দরজাটা খোলাই ছিল। আততায়ী ঘরে ঢোকে। অর্ধ-উলঙ্গ অনীশকে গুলি করে। মাধবী তা দরজা ফাঁক করে দেখে। আততায়ীকে চিনতে পারে। নাম ধরে ডাকে। আততায়ী থমকে দাঁড়ায়। তারপর দুজনে দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। লক-নব তখন জমির সমান্তরাল। অর্থাৎ দরজাটা তালাবন্ধ হয় না। ওরা একসঙ্গে যায় না। মাধবী লিফ্‌টে করে নামে। আগে পোর্টিকোতে পৌঁছায়। আপনাকে দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। আপনি যখন লিফ্‌টে করে উঠছেন তখন আততায়ী দেওয়াল সেঁটে লুকিয়ে পড়ে। লিফ্‌ট ওকে ক্রশ করে উপরে উঠতেই সে বাকি সিঁড়ির ধাপকটা পার হয়ে নেমে যায়। আপনি এসে দরজাটা বন্ধ দেখেন, কিন্তু লক্-করা নয়। হয়তো বার-কতক বেল বাজান। সাড়া না পেয়ে দরজাটার ডোর-নব ঘুরিয়ে দেখেন। দরজা খুলে যায়। আপনি ভিতরে যান। তাই আমাকে তখন টেলিফো[illegible]তে পেরেছিলেন, গুলিটা বুকের বাঁ-দিকে বিদ্ধ হয়েছে। বলতে পেরেছিলেন,

অনীশের ঊর্ধ্বাঙ্গ ছিল নিবাবরণ, নিম্নাঙ্গে আন্ডারওয়্যার। আপনিই লক্-নবটা ভার্টিকাল করে টেনে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। সার্জেন্টের মুখোমুখি হন।...মিস্টার বাসু, ধীরস্থিরভাবে ভেবে দেখুন—এছাড়া বিকল্প কোনো সমাধান হতে পারে না, পারে না!

বাসু বললেন, আপনার ডিটেকটিভ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু এত কথাই যখন বললেন তখন আততায়ীর নামটা উহ্য রাখলেন কেন?

—বাঃ! আমি কেমন করে জানব, খুনটা কে করেছে?

—জানবার কথা হচ্ছে না। সবটাই তো অ্যাকাডেমিক ডিস্‌কাশান। প্রব্যাবিলিটি। যুক্তি-নির্ভর বিশ্লেষণ। সে-ক্ষেত্রে আততায়ীর নামটাও কি অনুমান করতে পারেন না?

সোজা হয়ে উঠে বসল মহাদেব। হঠাৎ বোতলের ছিপিটা খুলে আবার কিছুটা হুইস্কি ঢালল পাত্রে। সোডা নিল না। কয়েক টুকরো বরফ ফেলে দিল শুধু। একচুমুক ব্ল্যাক-লেবেল-অন্-রক্‌স্ পান করে বলল—বুল্‌স্ আই হিট করেছেন আপনি! আততায়ী আর কেউ হলে মাধবী তার নামটা বলে দিত। জ্ঞাতসারে আততায়ীকে রক্ষা করত না। 'নাউ শী ইজ অ্যান অ্যাসেসারি আফটার দ্য ফ্যাক্ট'! তাকে বাঁচাতেই হবে। একটিমাত্র পথ। আততায়ীকে পুলিশ ধরতে না পারলেও আপনি তাকে চিহ্নিত করুন! ধরিয়ে দিন!

বাসু বললেন, লোকটা প্রেমের বাজারে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কোনো পক্ষপাতিত্ব করছেন না তো?

মহাদেব শ্রাগ করল। আর এক সিপ্ পান করল। তারপর বলল, য়ু মে সার্চ মি! আপনি একটিমাত্র যুক্তি দেখানঃ কেন মাধু লোকটাকে আড়াল করতে চাইছে, যদি না সেই স্কাউন্ড্রেলটা হয়? আপনি একটিমাত্র যুক্তি দেখান—আমার থিয়োরিকে অপ্রমাণ করে—যাতে জ্ঞাত তথ্যগুলো জিগ্‌স্-ধাঁধার মতো খাঁজে খাঁজে মিলে যাবে।

বাসু ঘড়ি দেখে বললেন, অনেক রাত হয়ে গেছে। এরপর ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল হবে।

মহাদেব বললে, আপনার কোনো অসুবিধা হবে না, স্যার। হোটেলের গাড়ি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে। আমি বলে দিচ্ছি।

টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সেই মতো নির্দেশ দিল। তারপর রিসিভারটা স্বস্থানে নামিয়ে রেখে বললে, হোটেলের সামনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। W.B.F 9678। আপনি নিজের নামটা বললেই আপনাকে নিউ আলিপুরে পৌঁছে দেবে। গুড-নাইট, স্যার।

বাসু উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, গুড-নাইট!

মহাদেব বললে, আপনাকে নিচে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারলাম না বলে মার্জনা চাইছি। আয়াম সরি...র্‌রিয়ালি সরি! একটু বেশি পান করা হয়ে গেছে।

বাসু বললেন, দ্যাটস্ অলরাইট। হ্যাভ সুইট ড্রীমস্!

দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ কী ভেবে ঘুরে দাঁড়ালেন, বললেন, বাই দ্য ওয়ে মিস্টার জালান, মাধবীর ঠিকানাটা কি আপনি এখনো জানেন না?

—না। আপনি তো জানালেন না।

—বললাম না এজন্য যে, সে এখন ওখানে নেই। কোন হোটেলে কী নামে উঠেছে তা আমিও জানি না।

মহাদেব জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, হাউ স্যাড! দ্য লেডি ইন ডিস্ট্রেস্-এর পাত্তা না জানে তার প্রিন্স চার্মিং, না তার লীগ্যাল অ্যাডভাইসার!

আট

পরদিন। শনিবার সকাল। প্রাতরাশের টেবিলে আজ কৌশিক অনুপস্থিত। কিন্তু রানী দেবী যোগদান করতে পেরেছেন। ডাক্তার ডাকতে হয়নি। টোট্‌কা-ওষুধেই সামলে নিয়েছেন। বাসু সুজাতাকে প্রশ্ন করলেন, সাত-সকালে তোমার কর্তাটি কোথায় গেল?

সুজাতা টোস্টে জ্যাম মাখাতে মাখাতে বললে, সাত-সকাল নয় মামু, ছয়-সকাল! বেড-টি পর্যন্ত না খেয়েই বেরিয়েছে।

—আমার গাড়িটা নিয়ে তো?—জানতে চাইলেন বাসু।

—না, ওর মোটর-সাইকেলে।

ইতিমধ্যে কৌশিক একটা মোটর-বাইক কিনেছে। আশা রাখে, বছর-দুয়েকের মধ্যেই সেটা বেচে দিয়ে একটা গাড়ি কিনবে। ওদের বিজনেস বেশ জমে উঠেছে। কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গে ক্রাইমের বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে।

বাসুর 'এগ-পোচ' খাওয়ার সুদিন গেছে। কোলেস্টেরল। কিছুটা ডাক্তারবাবুর পরামর্শে, কিছুটা রানী দেবীর দাপটে। তিনি ফলের পাত্রটা টেনে নিলেন, —পেঁপে, কলা, ঘরে-করা ছানা, জ্যামমাখানো টোস্ট আর বিস্কিট—অখ্যাদ্য! উপায় নেই। বললেন, এবার বল, সুজাতা, কাল রাত্রে কৌশিক আমার মক্কেলকে কোথায় নামিয়ে দিয়ে এল।

—হোটেল 'সোনার বাঙলা', মনোহরপুকুর রোডে। নতুন হোটেল। রুম 3/3। এই তার কার্ড। টেলিফোন ঘরে-ঘরে নেই। তবে রিসেপ্‌শানে ফোন করলে বোর্ডারদের ডেকে দেয়।

বাসু কার্ডখানা নিয়ে ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরটা দেখে রানীর দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরলেন। কথাবার্তা কিছু হলো না। রানী জানেন, তাঁর শ্রুতিধর স্বামীর আর প্রয়োজন হবে না ঐ ঠিকানা বা টেলিফোন নম্বরের। তিনি সেটা হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন। বাসু বললেন, বিকালে মাধবীর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে।

বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ একটা টেলিফোন এল। রানী দেবী আজ রিসেপ্‌শানে বসেছেন। তিনিই ধরলেন। ফোন করছে নিউ আলিপুর পোস্ট-অফিস থেকে ঃ মিস্টার পি. কে. বাসুর নামে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাফ আছে। পড়ে শোনাব, না লোক মারফৎ পাঠাব? আমাদের টেলিগ্রাফ পিয়ন দুজনেই বেরিয়ে গেছে। আজ আবার শনিবার তো। তাই জানতে চাইছি।

রানী বললেন, পড়েই শোনান?

—'লীভিং অ্যাজ পার য়োর ইন্সট্রাকসান্স্ এএএ চেক দ্যাট অ্যালেবাঈ' এছাড়া প্রেরকের নামের শুধু আদ্য-অক্ষর 'M'—এম ফর মার্ডার।

রানী চমকে ওঠেন, কী বললেন? 'এম ফর...?'

—আয়াম সরি। আই মীন 'এম ফর ম্যাড্রাস!' কাল রাত্রে হিচককের ঐ বইটা ভি.সি.পি.-তে দেখেছি। তাই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

রানী টেলিফোন মেসেজটা একটা চিরকুটে লিখে বিশের হাতে লাইব্রেরি ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বাসু সেখানে বুঁদ হয়ে কী একটা বই পড়ছিলেন। সেটা হাতে নিয়েই উঠে এলেন এঘরে। রানীকে বললেন, এর মানেটা কী হলো? এ কেস্‌-এ অ্যালেবাঈ বলতে তো ঐ একটাই—সুরঙ্গমা পান্ডের। মানে ওর কাজিন ব্রাদারের। সেটা তো যাচাই হয়ে গেছে। তাছাড়া 'লীভিং অ্যাজ পার য়োর ইন্সট্রাকসান্স্' মানেটা কি হলো? ধর তো 'সোনার বাঙলা' হোটেলকে। রুম থ্রি-বাই-থ্রি। 'এম' তো নির্ঘাৎ 'মাধবী'—হোটেলের নাম 'মঞ্জরী'।

পরপর সাতটা নম্বর ডায়াল করে রানী কী-যেন শুনলেন। তারপর টেলিফোনেই বললেন, ঐ থ্রি/থ্রি ঘরে একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন?...

তারপর ও-প্রান্তের প্রত্যুত্তরটা শুনে নিয়ে টেলিফোনটা ক্র্যাডেলে নামিয়ে রাখলেন। বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, হোটেল-রিসেপ্‌শান বলছে, আজ সকাল দশটা দশে ঐ থ্রি/থ্রি-রুমের বোর্ডার মঞ্জরী বড়ুয়া চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন। কোনো ফরোয়ার্ডিং অ্যাড্রেস্ না-রেখে। সম্ভবত কোনো নার্সিংহোমে।

—নার্সিংহোমে? কেন? কী হয়েছে মাধুর?

—রিসেপ্‌শান জানে না। বাচ্চা-টাচ্চা হবে বোধহয়।

বাসু শুধু বললেন, যা-বাব্বা!

রানী বলেন, তুমি নিশ্চয় বলেছিলে, হোটেল থেকে এক পাও না বার হতে! আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, তোমার যতগুলি ঐ বয়সের ক্লায়েন্ট এসেছে তাদের কেউই তোমার কথা শোনে না। এটা বোধহয় এ-যুগের ঐ 'উইমেন্স-লিব'-এর হাওয়া।

বাসু বললেন, অহেতুক মাথা গরম করে তো লাভ নেই। স্বয়ং সীতা দেবীই লক্ষ্মণের গণ্ডী মানেননি। তিনি ছিলেন ত্রেতা যুগের। 'উইমেন্স-লীব্'-এর হাওয়াটা তখনো চালু হয়নি। তুমি বরং এই নম্বরটা একবার ডায়াল করে দেখ তো?

ডেস্কপ্যাডে পর পর সাতটা সংখ্যা লিখে দিলেন। এটা সঞ্চিত ছিল ওঁর মস্তিষ্কের কোন গ্রে-সেল এর খাঁজে! ঐ সাতটা গাণিতিক সংখ্যার পর্যায়ক্রমে কেউ ওঁকে মুখে বলেনি, লিখে জানায়নি। তবে ওঁর উপস্থিতিতে একটি তরুণী তার ম্যানিকিওর-করা আঙুলে ধীরে ধীরে টেলিফোন-যন্ত্রের 'দশচক্রে' ডায়াল করেছিল গতকাল রাত্রে। একবারমাত্র তা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল বৃদ্ধের। তাই ভোলেননি।

রিঙিং-টোন হতেই রানী যন্ত্রটা বাড়িয়ে ধরলেন বাসু-সাহেবের দিকে। একটু পরেই ও-প্রান্ত থেকে শোনা গেল, ইয়েস। ভার্গব স্পিকিং।

বাসু বললেন, মিস্টার রামলগন ভার্গব, আর্কিটেক্ট?

—ইয়েস। আপনি কে?

—ক্লায়েন্ট। সল্ট-লেক সেক্টার থ্রি-তে একটা চার কাঠা প্লটে বাড়ির প্লান-ডিজাইন করাতে চাই। ডিটেইলস্ সাক্ষাতে। আপনি কখন টাইম দিতে পারবেন?

—আমি বর্তমানে ফ্রি। আপনি কোথা থেকে বলছেন? কতক্ষণ লাগবে আমার অফিসে আসতে?

বাসু ওর ঠিকানাটা জেনে নিয়ে বললেন, আধঘন্টার মধ্যেই আসছি।

আধঘন্টার মধ্যেই রামলগন ভার্গবের ডেরায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। ডুপ্লেক্স-টাইপ দ্বিতল বাড়ি। অর্থাৎ একতলায় তাঁর অফিস, দ্বিতলে রেসিডেন্স। অবশ্য বর্তমানে ভার্গব-গৃহিণী আছেন একটি নার্সিংহোমে। সন্তান গরবিনী। কম্বাইন্ড-হ্যান্ডের মাধ্যমে দিন-গুজরান করছেন রামলগন। বাসু গাড়ি পার্ক করে এসে বেল বাজাতে রামলগন তাঁকে নিয়ে এসে বসালেন তাঁর চেম্বারে। ওঁর কার্ড দেখে বললেন, ইয়েস, মিস্টার বাসু। আপনি কি আপনার প্লটের প্লানটা সঙ্গে করে এসেছেন?

বাসু বললেন, না! সল্ট লেক-এ আমার কোনো বাড়ি তৈরি করার প্রস্তাব আপাতত নেই!

ভার্গব রীতিমতো বিস্মিত হয়ে বলে, এক্সকিউজ মি স্যার, আপনি কি একটু আগে—

—ইয়েস! আমিই ফোন করে আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করেছিলাম, এই আধঘন্টা-

খানেক আগে। সম্পূর্ণ ভিন্ন হেতুতে। না হলে আপনি আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতেন না। আমার কার্ড দেখেই বুঝেছেন যে, আমি একজন ক্রিমিনাল-সাইড ব্যারিস্টার! আমি এসেছি একটা 'মার্ডার-কেস'-এর তথ্য সংগ্রহ করতে।

ভার্গব চাপা গর্জন করে ওঠে—হাউ ডেয়ার য়ু...?

বাসু তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, সফ্‌টলি মিস্টার ভার্গব! আস্তে কথা বলুন। আপনি কি এটা উপলব্ধি করেছেন যে, আমি একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে লালবাজার হোমিসাইডস্কোয়াডে টেলিফোন করার আধঘন্টার ভিতর একটা পুলিশভ্যান এখানে পৌঁছে যাবে? এবং ঐ বাংলা প্রবচনটা কি আপনার জানা আছে? 'ব্যাঘ্রস্পর্শে অষ্টাদশ বিস্ফোটক!'

দুরন্ত বিস্ময়ে ভার্গব শুধু নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। কথা যোগায় না তার মুখে।

বাসু বলেন, ইয়েস। আপনার বিরুদ্ধে চার্জ হবে ঃ 'অ্যান অ্যাসেসরি আফটার দ্য ফ্যাক্ট'। আপনি জেনে-শুনে একজন হত্যাকারীকে ফল্‌স্ অ্যালেবাঈ দিচ্ছেন।

—হত্যাকারী?

—এক্‌জ্যাক্টলি!

—কে সে?

—আপনার গার্ল ফ্রেন্ড সুরঙ্গমা পান্ডে, ইফ্ শী নট বি য়োর কাজিন।

—কী করেছে সুরঙ্গমা?

—মার্ডার! আপনাকে অ্যালেবাঈ রেখে। কাল রাত্রে সওয়া নয়টা নাগাদ একটা টেলিফোন পেয়েছিলেন, নিশ্চয় মনে আছে আপনার—পি.জি. হাসপাতালের এর্মাজেন্সি থেকে? ওটা আমিই করেছিলাম। হাসপাতাল থেকে নয়। ঐ অ্যালেবাঈটা ভেরিফাই করতে।

রামলগন প্রায় দশ সেকেন্ড নির্বাক কী যেন ভাবল। তারপর বলল, কে খুন হয়েছে?

—বেটার আস্ক য়োর কাজিন সিস্টার।

রামলগন দ্বিরুক্তি না করে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে কী যেন কথোপকথন করল। তারপর ধারক-অঙ্গে যন্ত্রটা নামিয়ে রেখে বললে, সুরঙ্গমা জামশেদপুরে ফিরে গেছে।

—ন্যাচারালি। পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াতে।

ভার্গব পুনরায় বলে, কিন্তু খুনটা হয়েছে কে?

—বলছি! তার আগে আমার কতকগুলো প্রশ্নের জবাব দিন। প্রথম কথা, সুরঙ্গমার অনুরোধে আপনি তাকে একটা ফল্‌স্ অ্যালেবাঈ দিতে রাজি হয়েছিলেন। তাই নয়?

—সার্টেনলি নট!

—অলরাইট। কাল সন্ধ্যেবেলা কোথায় থিয়েটার দেখলেন?

—অ্যাকাদেমি অব ফাইন আর্টস-এ।

—কী ড্রামা?

—'আলোকছন্দার পুত্র-কন্যা'—মনোজ মিত্রের।

—টিকিট দুটো কেটেছিল কে? কবে?

—আমিই। বুধবার।

—আপনার স্ত্রী তো নার্সিংহোমে। তার বাচ্চা হয়েছে কবে?

—দ্যাটস্ নান্ অব্ য়োর বিজনেস।

—অলরাইট। কাল আপনি সুরঙ্গমাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন, না কি সে নিজেই 'হল'-এ চলে এসেছিল।

—সে নিজেই 'হল'-এ চলে এসেছিল।
—তারপর? শো ভাঙার পর? যে যার বাড়ি চলে গেলেন?
—নো, স্যার! আমি ওকে ট্যাক্সি করে ওর ইন্টালি অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরি।
—ট্যাক্সি করে কেন? আপনি গাড়ি নিয়ে যাননি?
—না। গাড়িটা কাল সকালে স্টার্টিং-ট্রাবল্ দিচ্ছিল। টিউনিং করতে দিয়েছিলাম।
—সে কথাটা আপনার কাজিন সিস্টারকে জানাননি?
—হোয়াট ডু য়ু মীন?
—কাল সুরঙ্গমা আমাকে জানিয়েছে, থিয়েটার ভাঙার পর আপনি তাকে নিজের গাড়িতে ইন্টালির বাসায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। ট্যাক্সিতে নয়।
ভার্গব নতনেত্রে চুপ করে রইল।
কাল আপনারা দুজনে একত্রে থিয়েটার দেখেননি, তাই নয়?
ভার্গব মুখটা উঁচু করল। বলল, কে খুন হয়েছে, আদৌ কেউ খুন হয়েছে কি না তা আপনি এখনো বলেননি।
বাসু পাইপ-পাউচ বার করে টেবিলে রাখলেন। বললেন, আপনার টেলিফোনে এস.টি.ডি. নিশ্চয় আছে। জামশেদপুরে একটা টেলিফোন করুন না? বোনটা নিরাপদে পৌঁছাল কিনা সেটাও তো জানা দরকার!
ভার্গব ইতস্তত করল। তারপর টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা তুলে নিল।
—কী হলো? নম্বরটা মনে নেই?
—নম্বরটা আছে, জোনাল কোড নম্বরটা চেক করব।
দেখে নিয়ে ভার্গব ধীরে ধীরে দশ-বারোটা ডিজিট ডায়াল করল। বাসু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন ঘূর্ণ্যমান 'দশচক্রের' দিকে। ওপাশ থেকে সাড়া জাগল। ভার্গব আত্মপরিচয় দিল। ও-প্রান্তে কে কী বলল শুনতে পেলেন না বাসু। ভার্গব বলল, তুমি যে জামশেদপুরে ফিরে যাচ্ছ তা তো আমাকে জানিয়ে গেলে না?...অলরাইট, তুমি কি মিস্টার পি. কে. বাসু, ব্যারিস্টারকে চেন?...বুঝলাম। উনি বলছেন, তুমি নাকি ওঁকে বলেছ যে 'আলোকছন্দার পুত্র-কন্যা'..কী? অলরাইট, অলরাইট, 'অলকানন্দার'—তারপর তোমাকে নাকি আমি আমার নিজের গাড়িতে ইন্টালিতে পৌঁছে দিয়েছি?...কী? আশ্চর্য! তোমার মনে পড়ছে না? আমি ট্যাক্সি ধরলাম!...বাঃ মনে নেই মানে? গতকাল রাত্রের কথা মনে নেই? তোমার মাথায় কি গোবর ঠাশা?
ক্র্যাডেলে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল।
বাসু ইতিমধ্যে পাইপটা ধরিয়েছেন। বললেন, কী হলো? কে খুন হয়েছে তা বলল সুরঙ্গমা?
—না বলেনি। কারণ সে প্রশ্ন আমি করিইনি।
—আই সি। তাহলে আমিই সেটা বলি। খুন হয়েছে একটা অ্যান্টিসোশ্যাল। বেগবাগানে। রোহিণী-ভিলায়। ডিটেল্স্ আজকের কাগজে দেখে নেবেন। আমার ধারণা : সুরঙ্গমা পান্ডে খুনটা করেনি। কিন্তু ঠিক খুনের সময়েই সে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল ঐ লোকটার সঙ্গে। একটা মারাত্মক এভিডেন্স রয়ে গেছে ঐ ঘরে, যা পুলিশের হাতে পড়েছে। এজন্য সুরঙ্গমা জড়িয়ে পড়তে পারে। তাকে পুলিশ অ্যারেস্টও করতে পারে। বিশেষ, পুলিশ একটা 'মোটিভ' খাড়া করতে পারবে—একটা ফিল্ম কন্ট্রাক্ট। সুরঙ্গমা আমার ক্লায়েন্ট নয়; কিন্তু সে যখন খুনটা করেনি, তখন তার অ্যালেবাঈটা পাকা হলে আমার আপত্তি নেই। 'ডুডও খাব,

টামাকও খাব'—এ আবদার তো পুলিশে মানবে না। সুতরাং ট্যাক্সিটাই বহাল থাক। কারণ গাড়ি যে রিপেয়ার গ্যারেজে আছে তার মালিক বা মিস্ত্রিকে পুলিশে কাঠগড়ায় তুলতে পারে। তাই নয়?

ভার্গব গোঁজ হয়ে বসে রইল।

—আপনাকে আর একটা অ্যাডভাইজ দেব, কিছু মনে করবেন না তো, মিস্টার ভার্গব?

রামলগন ওঁর চোখে-চোখে তাকালো। বলল, বলুন?

—আমি বুড়ো মানুষ, এটা তো মানবেন। তখন আমি আপনার বেটারহাফের প্রসঙ্গ তোলামাত্র আপনি ফোঁস করে উঠলেন; 'দ্যাটস্ নান্ অব য়োর বিজনেস'। তাই ইতস্তত করছি। ব্যাপারটা আপনার স্ত্রী-সংক্রান্ত।

রামলগন গম্ভীরভাবে বলল, বলুন?

—আমার মনে হচ্ছে শতকরা নাইন্টি নাইন পার্সেন্ট চান্স, আপনি কাল সন্ধ্যায় ভিজিটিং আওয়ার্সে আপনার স্ত্রীর নার্সিংহোমে ছিলেন। পুলিশগুলো বড় অভদ্র হয়, জানলেন মিস্টার ভার্গব? ঠিক খোঁজ নিয়ে ঐ নার্সিংহোমে গিয়ে হাজির হবে। আর আপনার স্ত্রীর একটা জবানবন্দি নেবার চেষ্টা করবে। তাই আমার পরামর্শ স্ত্রীকে জানিয়ে রাখুন, কাল সন্ধ্যায় আপনি নাসিংহোমে যাননি—থিয়েটার দেখেছেন। কেমন?

ভার্গব হেসে ফেলল। বলল, সুরঙ্গমা সত্যিই আমার কাজিন। আমার নিজের মাসতুতো বোন। স্ত্রী তাকে ভালভাবেই চেনে। সুরঙ্গমা খুব ডাকাবুকো—কিন্তু খুনটুন করবে না! ওর কোনো বিপদ নেই তো?

—'নেই' কেমন করে বলি? মাসতুতো বোনের মাথায় গোবর ঠাশা, এদিকে মাসতুতো দাদার স্মৃতিশক্তিও দুর্বল। রাতারাতি তার স্মৃতিতে 'অলকানন্দা' হয়ে যায় 'আলোকছন্দা'।

ভার্গব আবার হেসে ফেলে।

নয়

কৌশিক চেম্বারে ঢোকামাত্র বাসু ধমকে ওঠেন, ছয়-সকালে কোথায় গেছলে?

—ছয়-সকালে! মানে?

—আস্ক য়োর বেটারহাফ! আমি বললাম, সাত-সকালে...

সুজাতাও এসেছে কৌশিকের পিছন পিছন। দুজনেই বসল দুটি চেয়ার দখল করে। বাসু মাঝপথেই থেমে গেলেন। প্রশ্ন করেন, কী ব্যাপার? তোমরা দুজনেই এত গম্ভীর? 'এনিথিং সিরিয়াস?'

কৌশিক হাসিমুখে বললে, সেটাও আমাদের প্রশ্ন। এই এথিক্যাল প্রশ্নটা সত্যিই সিরিয়াস কি না!

বাসু তাঁর চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন, 'এথিক্যাল' প্রশ্ন? কী ব্যাপার? একটু বিস্তারিত বল, শুনি।

কৌশিকই বুঝিয়ে বলতে থাকে, দেখুন মামু! আপনিই আমাদের দুজনকে এবাড়িতে এনে বসিয়েছেন। আমরা তিনজনে এ পর্যন্ত যৌথভাবে দশ-পনেরটা 'কেস' সমাধান করেছি। কোনো কনফ্লিক্ট কোনদিন হয়নি। না বিজনেস, না পারিবারিক। কিন্তু এতদিনে 'সুকৌশলী' বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আপনার মাধ্যমে না-এসে অনেক পার্টি ইদানীং সরাসরি

আমাদের দ্বারস্থ হয়েছে, হচ্ছে। তারমধ্যে কোনো কোনোটি নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছি—সেগুলো ক্রিমিনাল কেস-এর এক্তিয়ারভুক্ত হলে তো বটেই। কোনো কোনোটি আমরা নিজেরাই সলফ্ করেছি। 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' জাতীয় নন ক্রিমিনাল-কেসগুলো। কিন্তু ধরুন, যদি এমন 'কেস' হঠাৎ আসে যেখানে আপনার প্রফেশনের সঙ্গে সুকৌশলীর স্বার্থের বিরোধ হচ্ছে, সে-ক্ষেত্রে...

বাসু ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, দ্যাটস্ অ্যাবসার্ড!

কৌশিক ঝুঁকে পড়ে বলে, কেন অবাস্তব, কেন অসম্ভব?

—যেহেতু আমি চিরকাল ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে, সত্যশিবসুন্দরের পক্ষে। তোমরাও তাই।

কৌশিক বলে, একটু প্র্যাকটিকাল-স্তরে নেমে আসুন, মামু! কোনো ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে তার গোপন কথা জানায় তাহলে এথিক্যাল কারণে তা আপনি আমাদের জানাতে পারেন না, কেমন?

—ইয়েস! সেটা যদি প্রিভিলেজড্ কম্যুনিকেশন হয়। মক্কেল যদি বিশ্বাস করে তার গোপন কথা আমাকে বলে থাকে।

—এবার ওর কনভার্স কেসটা ভাবুন। আমাদের কাছে কোনো ক্লায়েন্ট এসে সুকৌশলীকে তার গোপন কথা জানালো। আমরা কি তা...

কথাটা শেষ হলো না কৌশিকের। বাসু-সাহেব মাঝপথেই বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, সার্টেনলি নট! গোয়েন্দা সংস্থা হিসাবে তোমাদের নিজস্ব গোপনীয়তা থাকতেই পারে। তা আমাকে জানাবে কেন?

—কিন্তু ধরুন সেটা যদি আপনার কোনো কেস-সংক্রান্ত হয়?

বাসু-সাহেবের চট্-জলদি জবাব, লুক হিয়ার, কৌশিক। এখানে কোনো এথিক্যাল কনফ্লিক্টের প্রশ্ন উঠতে পারে না। তোমার কাছে কোনো ক্লায়েন্ট এসে যখন 'সুকৌশলী'র সার্ভিস চাইবে তখন তোমরা সমঝে নেবে সেটা 'আমার-দেওয়া' পূর্বতন কোনো কেসের সঙ্গে সম্পৃক্ত কি না। তা যদি হয়, তুমি তার কেস নেবে না, বলবে যে, তুমি আমার এজেন্ট হিসাবে কাজটা আগেই নিয়েছ। আমি যেমন কাল রাত্রে সুরঙ্গমার অফারটা নিতে পারিনি। তাকে বলেছিলাম—অনীশ আগরওয়াল মার্ডার-কেসে মাধবী ইতিপূর্বেই আমার ক্লায়েন্ট হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি।

কৌশিক বলে, ধরুন পাত্র-পাত্রী এক, কেসটা ভিন্ন? সে-ক্ষেত্রে?

বাসু তাঁর দশটা আঙুলে গ্লাসটপ-টেবিলে টরে-টক্কা বাজাতে থাকেন। মুখে কিছু বলেন না।

কৌশিক তাগাদা দেয়, সে-ক্ষেত্রে?

বাসু বলেন, আর একটু স্পেসিফিক হতে পার না?

সুজাতা কৌশিকের দিকে ফিরে বললে, আমি বলব?

—বল! পার্টির আইডেন্টিটি ডিস্ক্লোজ না করে।

সুজাতা বলল, আজ ভোরবেলা কৌশিকের কাছে একটি মহিলা এসেছিলেন। নাম-ধাম বা দৈহিক বর্ণনা দেব না। তিনি দাবী করছেন যে, তিনি ডক্টর বড়গোঁহাই-এর বিবাহিতা পত্নী। শুধু দাবী করছেন নয়, প্রমাণও দিয়েছে। তাঁর আশঙ্কা আপনার ক্লায়েন্ট মহাদেব জালান তাঁর স্বামীকে একটি মামলায় আসামীরূপে ফাঁসাতে চাইছে। সে চাইছে তার স্বামীকে বাঁচাতে। কৌশিকের মনে হয়েছে, আমরা কেসটা নিলে হয়তো আপনার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। কৌশিক কেসটা শুনেছে, কিন্তু কোনো প্রফেশনাল 'ফি' নেয়নি। সে মেয়েটিকে বলেছে বেলা

একটায় আসতে। তখন সে জানাবে, ডক্টর বড়গোঁহাইকে বাঁচাবার জন্য যে সব তথ্য মামলায় উঠতে পারে তা সুকৌশলী সংগ্রহ করে দিতে স্বীকৃত কি না। এখন আমরা জানতে এসেছি—এথিক্যাল পয়েন্ট থেকে—'সুকৌশলী' এ কেসটা নিলে কি অন্যায় করবে?

বাসু বললেন, প্রথম কথা, ডক্টর বড়গোঁহাই বিবাহিত এটাই আমার কাছে একটা শকিং নিউজ।

—শকিং কেন?

—কারণ আমার মনে হয়েছিল মাধবী আর বড়গোঁহাই দুজনেই আনম্যারেড! পরস্পরকে ভালবাসে। ওরা দুজনে পরস্পরকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। সে যাই হোক, এক্ষেত্রে তোমরা দু'জনে যদি মনে কর—মেয়েটি ডক্টর বড়গোঁহাই-এর বিবাহিতা স্ত্রী, এবং মহাদেব জালান তাকে অন্যায়ভাবে ফাঁসাতে চাইছে, তাহলে সে-কেস নিশ্চয়ই নিতে পার। কারণ তা আমার প্রচেষ্টার পরিপন্থী নয়। ডক্টর বড়গোঁহাই নির্দোষ হোক বা না হোক, তোমরা দুজন এবং আমি একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করলেও একই দিকে—নিজ-নিজ বিশ্বাসমতো 'সত্যশিবসুন্দরের' পক্ষে।

কৌশিক বলল, আপনি আমাকে বাঁচালেন, মামু!

—বাঁচানো না-বাঁচানোর প্রশ্ন নেই। বড়গোঁহাই যদি বিবাহিত হয়, তার স্ত্রী যদি তাকে বাঁচাতে চায় এবং সে যদি নির্দোষ হয়, তবে তুমি-আমি তো একই পথে...

—কিন্তু মিস্টার মহাদেব জালান...

—হ্যাঙ হিম। হি ইজ নট মাই ক্লায়েন্ট।

সুজাতা আর কৌশিক চলে যেতেই বাসু-সাহেব ইন্টারকমে রানী দেবীকে ডেকে পাঠালেন। ব্যাপারটা কোনদিকে গড়াচ্ছে তা বললেন। তারপর বললেন, তুমি এই নম্বরে একটা ডায়াল কর তো? এটা 'ক্যালকাটা কন্‌ফিডেন্সিয়াল ডিটেক্‌টিভ সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর অফিস। দেখ, ওখানে মহম্মদ ইস্‌মাইল বলে কোনো এমপ্লয়ী আছে কি না।

রানী তাঁর অভ্যস্ত আঙুলে ডায়াল করলেন। ও-পক্ষের বক্তব্য শুনে নিয়ে বাসুকে জানালেন, আছেন। তবে মহম্মদ ইস্‌মাইল ওঁদের এমপ্লয়ী নন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের পার্টনার। নাও, কথা বল।

বাসু টেলিফোন-রিসিভারটা নিয়ে বলেন, হ্যালো, মহম্মদ ইস্‌মাইল কি আছেন?

—আছেন। আপনি কে কথা বলছেন?

—তাঁকে বলুন পি. কে. বাসু বার-অ্যাট-ল কথা বলতে চান।

একটু পরেই লাইনে এলেন ইস্‌মাইল : আদাব অর্জ, বাসু-সাহেব। সোচতা হ্যয় কি বিশ বরিষ হো গয়ে?

—তা হবে। আমি নতুন করে প্র্যাকটিশ শুরু করার পর আর আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। তাই জানি না যে, আপনি 'ক্যালকাটা কন্‌ফিডেনশিয়াল ডিটেক্‌টিভ সার্ভিসের' একজন মালিক হয়ে গেছেন ইতিমধ্যে।

—কৈসে জানবেন, স্যার? আপনি তো নতুন বেহেস্তি হুরীকে নিকা করেছেন; 'সুকৌশলী'। তাই আমাদের খবর নেন না!

—তা বলতে পারেন। রে-সাহেবের আমলে আমাদের সব কাজ তো আপনারাই করতেন। তবে আজ একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে ফোন করছি। এটা 'সুকৌশলী'কে দিয়ে হবে না।

—ফরমাইয়ে সা'ব। আমরা জানকবুল লড়ে যাব।

—আপনি তো জানেন আমার এই নিউ আলিপুরের ইউ-শেপ বাড়ির একটা প্রান্তে আমার চেম্বার, অপরপ্রান্তে 'সুকৌশলী'র অফিস। ঐ অফিসে অ্যারাউন্ড বেলা একটা নাগাদ একজন মহিলা আসবেন। ক্লায়েন্ট বিবাহিতা। বয়স আন্দাজ পঁচিশ। সম্ভবত একাই আসবেন। সুজাতাকে নিশ্চয় চেনেন, তার সঙ্গে কনফিউজ করবেন না। ওদের অফিসে দুপুরবেলা ক্লায়েন্টের ভিড় হয় না। মনে হয়, লোকেট করতে পারবেন। নাম মিসেস্ বড়গোঁহাই। অন্তত সে তাই বলছে। এর বেশি কিছু ইনফরমেশান দিতে পারছি না। আপনি সাড়ে বারোটা থেকে ঐ অফিসটা নজরবন্দি করুন। মেয়েটিকে ফলো করার ব্যবস্থা করুন। যতক্ষণ না বারণ করছি তাকে 'শ্যাডো' করার ব্যবস্থা করুন। আমি তার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাই। কলকাতার ঠিকানা, অতীত ইতিহাস, সত্যিই ভদ্রমহিলার স্বামী ডক্টর বড়গোঁহাই কি না। এছাড়া টেলিফটো-লেন্সে দূর থেকে তোলা দুটি ফটো। একটা সামনে থেকে, একটা পাশ থেকে।

ইস্মাইল বলল, পেয়ে যাবেন। আজ 'সুকৌশলী'-অফিসে বেলা বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে ঐ উমরের যত মহিলা আসবেন সক্কলের ফটোই কাল সকালের মধ্যে পাবেন। ওঁর কলকাতা অ্যাড্রেসও তাই। তবে 'পাস্ট হিস্ট্রি' সংগ্রহ করতে কুছু টাইম লাগবে।

—ন্যাচারালি। আপনি আমার অফিসে টেলিফোন করবেন না। আমিই সুবিধামতো ফোন করে জেনে নেব। এটা শুধু আপনার আমার মধ্যে।

—ও. কে. স্যার! প্লীজ ইউজ য়োর কোড-নাম্বার! ইয়াদ আছে?

—আছে!

বিকেলবেলা কৌশিক আবার এল। বলল, একটা দুঃসংবাদ আছে, মামু—

—দুঃসংবাদ? কার? তোমার না আমার? নাউ দ্যাট উই আর ফাইটিং ইচ আদার।

—আমার। আপনার পক্ষে অবশ্য সুসংবাদ।

—হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা বলবে, না সেটা তোমার 'সুকৌশলী'র কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল খবর?

—সুকৌশলীর গোপন খবর হলে আর আপনার কাছে যেচে জানাতে আসব কেন? 'মার্ডার-ওয়েপনটা' সম্ভবত খুঁজে পাওয়া গেছে। অন্তত লালবাজারের হোমিসাইড সেক্‌শানের তাই বিশ্বাস। পুলিশ সংবাদটা গোপন রেখেছে। তাই কাগজে ছাপা হয়নি। ঘর সার্চ করার সময় একটা পয়েন্ট টু-টু স্প্যানিশ রিভলভার পাওয়া গেছে। তাতে কারও ফিঙ্গার-প্রিন্ট নেই। চেম্বারে পাঁচটা বুলেট, শুধু ব্যারেলের সামনেরটা এক্সপেন্ডেড। জিনিসটা পাওয়া গেছে অনীশ আগরওয়ালের আলমারির পিছনে। অর্থাৎ আলমারি আর দেয়ালের মাঝখানে যে তিন ইঞ্চি ফাঁক, সেখানে।

বাসু বলেন—পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেছে?

—পুলিশে পেয়েছে বোধহয়। না হলে আজ-কালই পাবে। মৃত্যু বুলেট-উন্ডে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে দেহের ভিতর লেড-বলটা পাওয়া না গেলে বলা যাবে না, ঐটাই মার্ডার-ওয়েপন কি না।

বাসু বলেন, রবি কী বলছে?

—রবি ইদানীং নজরবন্দী হয়ে পড়েছে—কেস আপনার হলে। ওর উপর-মহল সন্দেহ করছেন, রবি গোপনে আপনাকে সব খবর সাপ্লাই করে!

—আই সী! না না, রবির কোনো ক্ষতি হোক, এ আমি চাই না।

সুজাতা তাগাদা দেয়, তুমি মামুকে ও-কথাটা বলবে না? মিসেস বড়গোঁহাই তোমাকে দুপুরে যা বলে গেল?

বাসু বলেন, অসুবিধা থাকে তো থাক না।

কৌশিক বলে, না। এটা তো দুদিন পর প্রকাশ হয়ে পড়বেই। এ কোনো গোপন কথা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে এই ঃ ডক্টর বড়গোঁহাই-এর একটা পয়েন্ট টু-টু রিভলভার ছিল...

—'ছিল'? মানে এখন নেই? খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

—এখনকার কথা মিসেস বড়গোঁহাই বলতে পারছেন না। কারণ তাঁর স্বামীও নিরুদ্দেশ! আজ সকাল থেকে।

—সে কী! রাজাবাজারে 'পথিক হোটেলে' খোঁজ নিয়ে দেখেছ?

—হ্যাঁ। মিসেস বড়গোঁহাই নিজে গিয়ে জেনেও এসেছেন।

—হ্যাং য়োর মিসেস বড়গোঁহাই! তোমরা নিজেরা খোঁজ নিয়ে দেখেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ সকালে সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন কেউ জানে না।

—হুঁ! বুঝলাম। সুকৌশলীর পক্ষে এটা নিতান্তই দুঃসংবাদ। ওর আত্মগোপন করার ব্যাপারটা।

—এবং রিভলভারটা। যদি সেটা বড়গোঁহাই-এরই হয়।

—হবে না। হতে পারে না। বড়গোঁহাই এতবড় ইডিয়ট নয় যে, নিজের নামে লাইসেন্সকরা-রিভলভারটা খুন করার পর ঐ অনীশ আগরওয়ালের আলমারির পিছনে লুকিয়ে রেখে যাবে।

—সেটাও ভেবেছি আমরা। ডক্টর বড়গোঁহাই খুনটা করলে রিভলভারটা ওখানে না ফেলে কলকাতার রাস্তায় যে-কোনো ম্যানহোলে ফেলে দিয়ে থানায় রিপোর্ট করতেন যে, সেটা চুরি গেছে। এটাও যেমন সত্য তেমনি ওটাও মিথ্যা নয়, রিভলভার চুরি হয়ে যাবার পর তিনি থানায় রিপোর্ট তো করেনইনি বরং আত্মগোপন করেছেন।

—আ-হা-হা! তুমি ধরে নিচ্ছ কেন যে, অস্ত্রটা ডক্টর বড়গোঁহাই-এর। দ্বিতীয় কথা, হয়তো এটা আত্মাগোপন মোটেই নয়। উনি গুয়াহাটি ফিরে গেছেন।

—মিসেস বড়গোঁহাই বললেন...

—আগে প্রমাণিত হোক, উনিই মিসেস বড়গোঁহাই...

—বাঃ! উনি ম্যারেজ রেজিস্টারের সার্টিফিকেটের ফটোস্ট্যাট কপি দেখালেন যে।

—কোথায় বিয়েটা হয়েছিল? কবে?

—গুয়াহাটিতে। বছর দুই আগে।

—কই? মাধবীকে নিমন্ত্রণ করেননি তো!

বাহুল্যবোধে এরা নীরব রইল।

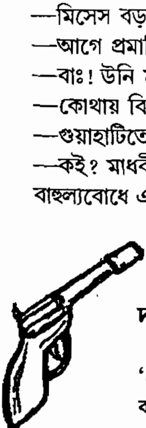

দশ

মনোহরপুকুর রোডে বাসু-সাহেব যখন পৌঁছালেন তখন বেলা তিনটে। 'সোনার বাঙলা' হোটেল খুঁজে বার করতে অসুবিধা হলো না। গাড়িটা পার্ক করে উনি এলেন রিসেপ্‌শান কাউন্টারে। একটি বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বাঙালী মহিলা বসেছিলেন কাউন্টারে। উত্তরটা জানাই আছে, তবু বাসু ঐ প্রশ্নটাই করলেন, থ্রি/থ্রি ঘরের মিস্ মঞ্জরী বড়ুয়া কি ঘরেই আছেন?

মহিলাটি নির্নিমেষ নয়নে বাসু-সাহেবকে যাচাই করলেন। খাতাপত্র না দেখেই বললেন, না, মিস্ বড়ুয়া আজ সকালে চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন। বেলা সওয়া দশটা নাগাদ।

—চেক-আউট করে! কী সর্বনাশ! কোনো ফরোয়ার্ডিং আড্রেস রেখে যায়নি?

—আজ্ঞে না!

বাসু স্বগতোক্তি করলেন, তবে তো ঝামেলা হলো। কী পাগল মেয়ে, আমাকে একটা খবর দিয়ে হোটেল ছাড়বে তো?

মহিলা প্রশ্ন করেন, কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনি কি ব্যারিস্টার?

—হ্যাঁ, মা। ঐ মঞ্জরী আমার ক্লায়েন্ট। তাকে বলেছিলাম এই হোটেলে আমার জন্য অপেক্ষা করতে!

মহিলাটি বললেন, আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি 'কাঁটা-সিরিজের' ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু! তাই নয়? কাগজে আপনার ছবি দেখেছি।

—তা আমি তো সেটা অস্বীকার করছি না...

—একটু কফি খাবেন, স্যার?

—কফি। এইমাত্র তো ঘোল খাওয়ালে, মা। তারপর কফি ?

—বাঃ! আমার কী দোষ? আপনার ক্লায়েন্ট যদি আপনার কথা না শোনে!

—তা বটে !

—আপনি যদি আমাদের হোটেলের আপ্যায়নে এক পেয়ালা কফি পান করতে রাজি হন তাহলে আপনাকে দু-একটা ক্লু দিতে পারি!

—'ক্লু'! কীসের ক্লু?

—মিস্ বড়ুয়া কোথায় যেতে পারেন!

—তুমি তো আচ্ছা মেয়ে! বেশ, কফির অর্ডার দাও। শুনি তোমার ক্লু।

মহিলাটি বেয়ারাকে ডেকে দু পেয়ালা কফি আর বিস্কিটের অর্ডার দিয়ে বললেন, আমার আরও একটা আবদার আপনাকে মানতে হবে কিন্তু...

—অটোগ্রাফ তো? দাও খাতা।

—আজ্ঞে না। অটোগ্রাফ জমানোর বাতিক আমার নেই। কৌশিকবাবু কাঁটা-সিরিজের একটি বইতে একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন—সংস্কৃত শব্দ—আমি তার মানে বুঝিনি। আমি সংস্কৃত আদৌ পড়িনি। বরাবর মিশনারি কনভেন্টে পড়েছি। আপনি যদি কথাটার মানে বলে দেন...

—আমিও ম্যাট্রিক পাশ করার পর—অর্থাৎ 1940 এর পর আর সংস্কৃত পড়িনি। পড়েছি আইন। তবু বল, তোমার কী অনুপপত্তি।

—'অনুপপত্তি' মানে?

—মানে 'ব্যাসকূট'। তাও বুঝলে না? আন্‌নোন স্যাংস্কৃট্ ওয়ার্ড!

—ও! শুনুন। 'অ-আ-ক খুনের কাঁটায়' একটা শব্দ আছে "বেচারাথেরিয়ামৈঃ নমঃ"। 'নমঃ' মানে তো প্রণাম করি। 'বেচারাথেরিয়ামৈঃ' মানে কী?

—তুমি সুকুমার রায়ের লেখা 'হেঁশোরামের ডায়েরি' পড়েছ?

—না।

—তুমি সুকুমার রায়ের নামটা অন্তত শুনেছ?

—হ্যাঁ। বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বাবা।

—না! বরং বলব, সত্যিজিৎ রায় হচ্ছেন ক্ষণজন্মা সুকুমার রায়ের সুযোগ্য পুত্র। তা সে

যাই হোক। ঐ 'হেঁশোরামের ডায়েরি'তে আছে 'বেচারাথেরিয়াম্'। 'হস্'-অন্ত কথা, শব্দটা যে ব্যবহার করেছে সে ভেবেছিল যে, 'বেচারাথেরিয়াম্' শব্দটা 'নরঃ' শব্দের অনুরূপ। এখন নর শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে হয় 'নরৈঃ'। সেই হিসাবে ও লিখেছিল, 'বেচারাথেরিয়ামৈঃ'। তা থেকে বোঝা গিয়েছিল লোকটা সংস্কৃতে আমারই মতো পণ্ডিত। প্রথম কথা, 'বেচারাথেরিয়াম্' 'হস্'-অন্ত যুক্ত শব্দ। তার শব্দরূপ 'নরঃ' শব্দের মতো হবে না। দ্বিতীয় কথা, পত্রলেখকের মতে 'বেচারাথেরিয়াম্' মাত্র একজন, ফলে বহুবচন হবে না। তৃতীয়ত, 'নমঃ' ক্রিয়াপদে যাঁকে প্রণাম করা হচ্ছে তাঁর চতুর্থী বিভক্তির একবচন হবে। যেমন গণেশায় নমঃ, বাস্তুপুরুষায় নমঃ।

কিন্তু 'সরস্বতৈ নমঃ' তো বলি আমরা?

—তা বলি। তুমি কি এক কাপ কফি পীইয়ে গোটা সংস্কৃত ব্যাকরণটা আমার কাছ থেকে শিখে নিতে চাও, মা? 'সরস্বতী' শব্দটা 'নদী' শব্দের মতো হবার কথা। 'নরঃ'শব্দের মতো নয়।

এই সময় কফি এসে পড়ায় প্রসঙ্গটা মুলতুবি থাকল।

বাসু কাপটা টেনে নিয়ে বললেন, তোমার নামটা জানা হয়নি?

—রমলা। রমলা সেনগুপ্তা।

—তা, মা রমলা। এবার বল—কী 'ক্লু'র কথা বলছিলে?

—আপনি নিশ্চয় জানেন যে, আপনার ক্লায়েন্টের আসল নাম মাধবী বড়ুয়া, মঞ্জরী নয়?

বাসু পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বার করে বললেন, হুঁ! সংস্কৃত না জানলেও তুমি একটি পাক্কা বাস্তুঘুঘু।আমার মক্কেলের নাম আমার জানার কথা, তুমি কী করে জানলে সেটাই প্রশ্ন।

—আমার বাড়ি শিলং। বছরখানেক হলো এই 'সোনার বাঙলায়' রিসেপশানিস্টের কাজটা পেয়েছি। শিলঙে টি.ভি.তে. আমরা প্রায়ই গুয়াহাটি স্টেশন ধরতাম। কাল রাত প্রায় সওয়া দশটা নাগাদ ওকে একা আসতে দেখে আমি রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম। ও একটা সিঙ্গল-সীটেড রুম বুক করল, ছদ্মনামে। তারপর আমার কাছ থেকে একটা কার্ড চেয়ে নিয়ে বাইরে ট্যাক্সিওয়ালাকে দিতে গেল। দুরন্ত কৌতূহলে আমি উঠে গিয়ে দেখলাম। না ট্যাক্সি নয়। প্রাইভেট কার। চালক রীতিমতো সুদর্শন একজন যুবক। কিন্তু অভদ্র।

—অভদ্র! কেন? তাকে অভদ্র মনে হলো কেন তোমার?

—তার উচিত ছিল স্যুটকেসটা হোটেল রিসেপশান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। মাধবীকে ধকলটা সহ্য করতে না দেওয়া।

—আই সী। তারপর?

—আমি যে ওকে চিনতে পেরেছি তা বলিনি। রুম-বেয়ারার সঙ্গে ঘর দেখে এসে ওর পছন্দ হয়েছিল আগেই। এবার জানতে চাইল, আমাদের টেলিফোনে এস. টি.ডি. আছে কি না। আমি জানালাম, না নেই। তবে কাছেই S.T.D স্টেশন আছে। আমি রুম-বেয়ারাকে সঙ্গে দিতে পারি। মাধবী রুম-বেয়ারাকে নিয়ে ফোন করতে গেল। বোধহয় গুয়াহাটিতে। একটু পরে ফিরেও এল। রাতে আর কিছু হয়নি। আমি এই হোটেলের দোতলায় একাই থাকি। সচরাচর সকাল সাতটায় কাউন্টারে নেমে আসি, বেড-টি দেবার ব্যবস্থাটা হেড-কুক আর বেয়ারার,দল নিজেরাই করে। সকালবেলা যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি—অ্যারাউন্ড পৌনে সাতটা, তখন সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলাম মাধবী কাকে যেন ফোন করছে। ওটাতে পে-ফোন-এর ব্যবস্থা। মুদ্রা ফেলে ফোন করা যায়। আপনার কাছে স্বীকার করব—আমার কৌতূহল রুচিবোধকে অতিক্রম করে গেল। মাধবীকে আমি চিনি, বহুবার তার

গান শুনেছি—সে কেন শহর কলকাতায় এসে ছদ্মনাম হোটেলে উঠেছে? তারচেয়েও বড় বিস্ময় সে কেন ট্যাক্সি করে এল না, আর সবচেয়ে অবাককরা কাণ্ড সেই সুদর্শন যুবকটি ওর স্বামীর ছদ্মপরিচয়ে কেন আমার হোটেলে রাত কাটালো না।

—অলরাইট! অলরাইট! আড়ি পেতে কথা শোনার যথেষ্ট যুক্তি দেখিয়েছ। কী শুনলে তাই বল?

—ন্যাচারলি একদিকের কথাই আমি শুনেছি। ও নিজের হোটেলের নাম আর টেলিফোন নম্বরটা জানাল। তারপর কিছুক্ষণ শুনে বললে...দ্যাটস্ ইম্পসিব্‌ল! তুমি ভাল করে খুঁজে দেখ। গাড়িতেই আছে।...কী? ড্যাশবোর্ডটা খোলা ছিল না বন্ধ? ...দ্যটস্ অ্যাবসার্ড! যাক, পরে কথা হবে। লোকজনের যাতয়াত শুরু হয়েছে...না, ঘরে নেই, লাউঞ্জে এই একটাই টেলিফোন...

—তারপর?

—তারপর ও নিজের ঘরে চলে গেল। ঘরে বসেই ব্রেকফাস্ট খেল। তারপর অ্যারাউন্ড নয়টা নাগাদ ওর একটা টেলিফোন এল। মহিলা কণ্ঠ। আমি জানতে চাইলাম, 'কী নাম বলব?' মেয়েটি বললে, 'বলুন ওঁর অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান ফোন করছেন।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি ওঁর অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান?' ও বললে, না, আমি তাঁর নার্স।' একটা স্লিপে তাই লিখে মাধবীর ঘরে পাঠিয়ে দিলাম বেয়ারার হাতে। ও তৎক্ষণাৎ নেমে এল। আমি খবরের কাগজটা আড়াল করে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। কিন্তু এবার ও কথা বলছিল খুব ফিস্‌ফিস্ করে, নিচুগলায়। দু-একটা টুকরো কথা কানে এল।...'ফু প্রমিস্ অন য়োর ওয়ার্ড অব অনার?'...'অ্যাকুইটাল হতে পারে না? কেন?'...ইত্যাদি। বেশ অনেকক্ষণ ডাক্তার-পেশেন্ট কথা হলো—তা প্রায় পাঁচ মিনিট। কিন্তু তার ভিতর অসুখ-বিসুখ, ওষুধপত্র জাতীয় কোনো কথা শুনতে পেলাম না। তারপর একসময় কথোপকথন শেষও হলো। মনে হলো, মেয়েটি যেন আর এ জগতে নেই। এই মনোহরপুকুর রোডের হোটেল, আমার উপস্থিতি কোনো কিছুই যেন ওর খেয়াল নেই। তারপর ও সামনের লেডিজ টয়লেটে ঢুকে গেল। প্রায় দশ মিটি পরে যখন বার হয়ে এল তখন ওর চোখ দুটো ফোলাফোলা, টকটকে লাল। মাথার সামনের চুলগুলো থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে সে আমার কাছে এগিয়ে এল। বললে, 'আমার বিলটা রেডি করুন। আমি এখনি চেক-আউট করব।' আমি না বলে পারলাম না, 'কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার মায়ের বয়সী না হলেও দিদির বয়সী। কী হয়েছে আপনার? হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে কেন? কোথায় যাবেন আপনি?' ও মুখটা নিচু করে বললে, 'একটা নার্সিংহামে। আমি কলকাতায় থাকি না। কলকাতায় এসেছি একটা অপারেশন করাতে। ডাক্তারবাবু বললেন এখনি ভর্তি হতে।' আমি জানতে চাইলাম, 'কোন নার্সিংহোমে?' ও বোধহয় আমার প্রশ্নটা খেয়াল করে শুনল না, অথবা জবাবটা এড়িয়ে যেতে চায় বলে ভান করল যেন শুনতে পায়নি। বললে, 'ঐ ফোল্ডারটা কিসের বিজ্ঞাপন?' আমি 'সোনার বাঙলা রিসর্ট'-এর ফোল্ডারটা ওকে ধরিয়ে দিলাম।

বাসু-সাহেবও ফোল্ডার-হোল্ডার থেকে বিজ্ঞপ্তিটা তুলে নিলেন। নীলরঙের একটি সুদৃশ্য ফোল্ডার। মাঝখানে একটা অর্ধচন্দ্রাকার চিত্র—একটা বাঙলা চারচালা খড়ের ঘরের পাশে একজোড়া নারকেল গাছ। নিচে ইংরেজি হরফে লেখা 'সোনার বাঙলা রিস্‌র্টস্'।

মহিলাটি বলতে থাকেন, আমি মাধবীকে বললাম, 'বম্বে রোডে সাঁকরাইল রেল-স্টেশনের কাছে 'ধূলাগড়ি' গ্রামে আমাদের একটা হলিডে রিসর্ট আছে। এটা তারই বিজ্ঞাপন। মাধবী সেটা নাড়াচাড়া করে বললে, 'এখন ওখানে ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে?' আমি বলি, 'কেন বলুন তো? কার জন্য? আপনি তো নার্সিংহোম যাচ্ছেন অপারেশন করাতে।' মাধবী চট্-জলদি

জবাব দিল, 'আমার এক দিদি-জামাইবাবুর জন্য। ওরা টাটানগর থেকে এসেছে আমার অপারেশনের জন্য। কিন্তু যেখানে আছে...আপনি কাইন্ডলি দেখুন না ফোন করে, ওখানে একটা ডবল্-বেড রুম পাওয়া যায় কি না।' বুঝলাম, সবটাই ধাপ্পাবাজি। ওর দিদি-জামাইবাবু তো অনায়াসে এই হোটেলেই থাকতে পারে, ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে ধূলাগড়িতে থাকতে যাবে কেন? কিন্তু ও হচ্ছে খদ্দের! ওর মিথ্যে কথা ধরিয়ে দেওয়ার দায় আমার নয়। আমি ধূলাগড়িতে ফোন করলাম।

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, ধূলাগড়ি গাঁয়ে ফোন আছে?

—গাঁয়ে থাক-না-থাক, আমাদের 'সোনার বাঙলা রিস্‌টস্'-এ আছে, 669-0837; তারপর যা বলছিলাম শুনুন। ওর কথামতো আমি 'ধূলিগড়ি'-তে ফোন করলাম। ঘর পাওয়া গেল। তারপর মাধবী কাকে যেন ফোন করল—ওর ভগ্নীপতিকেই বোধহয়। এবার ও এত ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলল যে, কিছুই শুনতে পেলাম না। না পেলেও আন্দাজ করলাম ও নির্ঘাৎ সেই সুন্দরমতো ছেলেটিকে— যে মাধবীকে কাল রাত্রে পৌঁছে দিয়ে গেছিল তাকেই ফোন করে ধূলাগড়ি যেতে বলল। তাহলে আমার হোটেল কী দোষ করল বুঝলাম না।

বাসু বললেন, তুমি খুবই বুদ্ধিমতী। ধূলাগড়িতে আর একবার ফোন কর তো মা, অ্যাট মাই কস্ট। জেনে নিয়ে আমাকে বল, আজ বেলা এগারোটার পর মাধবীর বর্ণনার সঙ্গে মেলে এমন কোনো মেয়ে একা অথবা যুগলে চেক-ইন করেছে কি না।

রমলা তৎক্ষমাৎ টেলিফোনটা টেনে নিল। ইতিমধ্যে বোর্ডাররা আসছে যাচ্ছে, চাবি দিচ্ছে, চাবি নিচ্ছে। প্রশ্নও করছে, নানান জাতের। রমলা খুবই করিৎকর্মা। যান্ত্রিকভাবে ডিউটি বজায় রেখে বাসু-সাহবের সঙ্গে আলাপচারিতা চালিয়ে যাচ্ছিল। ফোনে ও-প্রান্তে সাড়া জাগতেই রমলা জানতে চাইল, কৌন? প্রীতম ভেইয়া ক্যা?

ও-প্রান্তে নিশ্চয়ই ইতিবাচক স্বীকৃতি হলো। কারণ এরপর রমলা পাঞ্জাবি-ঘেঁষা চোস্ত হিন্দিতে যা বলে গেল তার মর্মার্থ ঃ শোন প্রীতম, আজ সকাল নটা চল্লিশ মিনিটে এখান থেকে একটি মেয়ে 'সোনার বাঙলা, ধূলাগড়ি'-র ঠিকানা সংগ্রহ করে ট্যাক্সিতে রওনা হয়েছে। বয়স বাইশ-চব্বিশ। মাথায় বব্‌কাট চুল, খুব ফর্সা। উচ্চতা পাঁচ চার হবেই। চোখে সানগ্লাস। কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। সঙ্গে একটা গ্রে-রঙের মিডিয়াম সাইজ ভি. আই. পি. স্যুটকেস। পরনে হলুদ রঙের মুর্শিদাবাদী, লাল পাড়। ঐ লাল রঙের ম্যাচিং ব্লাউস। মেয়েটি একাও যেতে পারে, তার স্বামীর সঙ্গেও যেতে পারে—তবে ওর সিঁথিতে সিঁদুর নেই। সে কি পৌঁছেছে?..কী? নাম? কী বাজে কথা বলছ প্রীতম! নাম তো সে যা-ইচ্ছে নিতে পারে।...না, না, পুলিশ কেস নয়। পারিবারিক অশান্তি। শ্বশুরবাড়িতে নববধূর লাঞ্ছনা, এই আর কি।...তাই বল? ওরা ঘরে আছে? দুজনেই? আল রাইট, জাস্ট হোল্ড অন—

টেলিফোনের কথামুখে হাত চাপা দিয়ে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলে, কপোত-কপোতী দুজনেই আছে। মক্কেলের সঙ্গে কথা বলবেন? ওরা নাম লিখিয়েছে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সমীর সেন।

বাসু বললেন, না। তুমি শুধু প্রীতমকে বল যে, ওদের দুজনের যে কেউ চেক-আউট করলে যেন আমার রেসিডেন্সে একটা টেলিফোন করে জানায়। আমার কার্ডখানা রাখ। আমি কে জানতে চাইলে বল, ঐ মেয়েটির বাবা। 'বধূহত্যা'র বিরুদ্ধে সতর্কতা নিচ্ছি আমি। ও. কে.?

রমলা সেই মতো প্রীতমকে জানিয়ে দিল।

লাইনটা কেটে দেবার পর বাসু ওর দিকে একটি একশ' টাকার নোট আর একটি নামাঙ্কিত কার্ড বাড়িয়ে ধরলেন।

রমলা বলল, নোটটা কেন?

—টেলিফোন আর তোমার সার্ভিস-চার্জ। কফির দাম দিচ্ছি না।

রমলা রাজি হলো না। বলল, আমি আপনার ফ্যান। আজকের ভারতব্যাপী দুর্নীতির বাজারে আপনি যে 'সত্যমেব জয়তে' মন্ত্রটা সার্থক করতে চাইছেন তাতেই আমরা কৃতজ্ঞ। তবে একটা কথা, বর্তমান কেসটা কী, তা আমি জানি না, শুধু জানি মাধবী আপনার মক্কেল। এই 'ফুল'টা যদি কোনো দিন 'কাঁটা হয়ে ফুটে ওঠে তবে আমাকে একটা অটোগ্রাফড় কপি পাঠিয়ে দেবেন।

বাসু হাসলেন। বললেন, সুন্দরভাবে কথাটা বলেছ। দেব! এবার আমার বাড়িতে একটা ফোন কর দিকি।

ফোন ধরলেন রানী। বাসু বললেন, জরুরী প্রয়োজনে হঠাৎ একটু কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে। ফিরতে রাত হতে পারে। তবে রাত্রে ফিরব এবং বাড়িতেই ডিনার করব। ইতিমধ্যে কোনো খবর জমেছে?

—তা জমেছে। জমে পাথর হয়ে গেছে। মিস্টার জালান ঘণ্টাখানেক আগে এসেছেন। তুমি বাড়ি নেই শুনে ফিরে যাননি। পাথর হয়ে রিসেপশানে বসে আছেন। তোমার সঙ্গে তাঁর নাকি অত্যন্ত জরুরী কিছু কথা আছে। আমাকে বলে রেখেছেন, তুমি এলেই যেন তাঁকে খবর দিই। এবং টেলিফোন করলেও।

—তা তুমি কোথা থেকে কথা বলছ?

—তোমার চেম্বার থেকে। সুজাতা-কৌশিকও বেরিয়ে গেছে। একা বসে ঘর পাহারা দিচ্ছি। তুমি মিস্টার জালানের সঙ্গে কথা বলে ওঁকে বিদায় করার ব্যবস্থা কর। তাহলে একটু শুতে যেতে পারি।

—হ্যাং দ্যাট মহাদেব জালান। ও বসে থাকতে চায় থাকুক। বিশেকে বল বাইরের ঘরে...

হঠাৎ বাসু-সাহেবের কানে ভেসে এল ভারী পুরুষালী কণ্ঠ : এক্সকিউজ মি, মিস্টার বাসু। আমি আপনাকে 'রিটেইন' করেছি। আমার কথাও কিছু কিছু আপনাকে শুনতে হবে বইকি।

বাসু গম্ভীর হয়ে বলেন, আপনি লাইনে এলেন কেমন করে?

—খুব সহজে। আপনার রিসেপশান-এক্সটেনশানটা ক্র্যাডেলে থেকে উঠিয়ে নিয়ে।

—ব্যাট দ্যাট য়ু কান্ট ! য়ু শূডন্ট! আপনি ভিজিটার।

—আপনিও তেমনি ব্যারিস্টার! জজ-সাহেব নন। আপনারও কোনো অধিকার নেই ঐ রায় দেবার, 'হ্যাং দ্যাট মহাদেব জালান!'

বাসু টেলিফোনের মাউথ-পীসে বলেন, রানী, তুমি লাইনে আছ!

—আছি।

—নোটবুক পেন্সিল হাতে নাও। মিস্টার জালানের সঙ্গে আমার যে কথোপকথন হচ্ছে তা নোট করে যাও।

—এতক্ষণ তাই করে যাচ্ছি।

—অলরাইট! বলুন মিস্টার জালান, কী বলতে চান?

—আপনি বলছিলেন কলকাতার বাইরে যাচ্ছেন, তার আগে একবার বাড়ি হয়ে যান। আমার অনেক কথা আছে।

—সরি! তা সম্ভবপর নয়। আপনার যা বক্তব্য টেলিফোনেই সংক্ষেপে বলুন। আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।

—পাঁচ নয়, দশ।

—এটা মাছের বাজার নয়!

—আই নো। আমি বলতে শুরু করলে আপনি কিন্তু বলবেন 'দশ নয় পনের'। শুনুন

স্যার, প্রথম খবর হচ্ছে—অনীশ আগরওয়ালের আলমারির পিছনে একটা যন্তর পাওয়া গেছে নিশ্চয় শুনেছেন। সেটার লাইসেন্স-হোল্ডার কে তা পুলিশে জানতে পেরেছে।

—কে সে?

—এই দেখুন, স্যার! আপনি প্রশ্ন করে আমার বরাদ্দ পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাব্‌লা মারছেন। ইয়েস! আপনি যা আশঙ্কা করেছেন তাই, গুয়াহাটির সেই ডাক্তারবাবুই। দু নম্বর খবর, পথিক হোটেলের চিড়িয়া চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছে। পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। তিন নম্বর খবর হচ্ছে পুলিশ পোস্টমর্টাম রিপোর্ট পেয়েছে। অনীশের দেহের ভিতর ফেটাল বুলেটটা পাওয়া গেছে! সিরিয়ালি চার নম্বর খবর যেটা আপনি জানতে চাইবেন, তার জবাব : 'না'।

বাসু বলেন, কী জানতে চাইব আমি?

আপনার ন্যাচরাল নেক্সট কোশ্চেন হবে : ব্যালাসট্রিক এক্সপার্ট কি টেস্ট-বুলেট ছুঁড়ে কম্পারেটিভ মাইক্রোস্কোপের পরীক্ষায় জেনেছে যে, অনীশের হৃদপিণ্ডে আটকে থাকা ফেটাল বুলেটটা ঐ বড়গোঁহাই-এর রিভলভার থেকে ছোঁড়া কি না। তাই : না?

—তার জবাব, 'না'?

—আজ্ঞে না। তা বলছি না আমি। বলছি কি, পুলিশ এখনো ব্যালাস্‌ট্রিক্ এক্সপার্ট-এর রিপোর্ট পায়নি।

—আপনি অত কথা জানলেন কি করে?

—পয়সা খরচা করলে বাঘের দুধ ভি পাওয়া যায়। যায় না?

—ঠিক জানি না। বাঘের দুধ কিনতে কখনো বাজারে যাইনি। কিন্তু আপনি কি আর কিছু বলবেন—

—আলবাৎ! এতক্ষণ তো শুধু ইনফরমেশান দিচ্ছিলাম। এবার আমার প্রপোজালটা দাখিল করি? আমার প্রস্তাবটা—

—করুন!

—পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, মাধুর বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ উঠতেই পারে না। তবে কিছু মাইনর অফেন্সের চার্জ উঠবে। মৃতদেহ দেখার পরে পুলিশে খবর না দেওয়া—এমনকি মার্ডারারকে আড়াল করার চেষ্টা করা। সে বাবদে আপনাকে আগেই রিটেইন করেছি। কেস শেষ হলে আপনার নায্য বিল যা হবে তা আমি মিটিয়ে দেব। এখন আপনাকে আর একটা প্রস্তাব দিচ্ছি : আপনি এই কেস-এ ডক্টর শান্তনু বড়গোঁহাই-এর ডিফেন্সও দিন। আমি মিসেস বাসুর কাছে আপাতত পাঁচ হাজার টাকা রিটেইনার দিয়ে যাচ্ছি। ও.কে.?

বাসু বিস্মিত হয়ে বলেন, এ কী বলছেন আপনি! ডক্টর বড়গোঁহাই তো আপনার রাইভাল! আই মীন মাধবীর ব্যাপারে। আপনি তার জন্য...

বাধা দিয়ে মহাদেব বলে ওঠে, প্লীজ মিস্টার বাসু। দ্যাটস্ নান অব য়োর বিজনেস। আপনাকে আমি 'রিটেইন' করেছি, আপনার যাবতীয় ফীজ, এক্সপেন্সেস্ আমি মিটিয়ে দিতে চাইছি—কেন চাইছি তা জানাতে আমি বাধ্য নই।

বাসু বললেন, কিন্তু এইমাত্র আপনি যে ইনফরমেশন দিলেন...

—আই নো, আই নো স্যার! বেকসুর খালাস এক্ষেত্রে হতে পারে না। ব্যালাসট্রিক্ এক্সপার্ট যদি প্রমাণ করেন ডক্টর বড়গোঁহাই-এর রিভলভার থেকেই ফেটাল বুলেটটা ছোঁড়া হয়েছে, তাহলে আপনি তো বটেই আপনার গুরু এ. কে. রে. বার-অ্যাট-ল-ও ওকে বেকসুর খালাস করে আনতে পারবেন না। ওর যদি ফাঁসি না হয়, যাবজ্জীবন না হয়, তাহলেই আমি মেনে নেব আপনি সাক্সেস্‌ফুল। দীর্ঘ-মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড ঠেকানো যাবে না!

—আপনি কেন হঠাৎ এভাবে আমাকে এনগেজ করতে চাইছেন, বলুন তো?

—প্লীজ স্যার। ডোন্ট আস্ক দ্য সেম কোশ্চেন ওভার অ্যান্ড ওভার এগেন।

—কিন্তু দুজনকে আমি কীভাবে ডিফেন্ড করতে পারি? আদালতে ওরা হয়তো জবানবন্দিতে পরস্পরের ঘাড়ে দোষ চাপাবে...

আবার ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দেয় মহাদেব, প্লীজ স্যার। আপনি শুধু বিচক্ষণ ব্যারিস্টারই নন। মনুষ্যচরিত্র আপনি ভালমতো বোঝেন। আদালতে ওরা যদি পরস্পরবিরোধী জবানবন্দি দেয় তবে দেখবেন, তার একটাই উদ্দেশ্য—অপরাধটা নিজের নিজের কাঁধে টেনে নেওয়া। ইন ফ্যাক্ট মাধু যাতে সেই মারাত্মক ভুলটা না করতে পারে এটাই আপনাকে দেখতে হবে। মাধু আপনার কথা শুনবে—বিশেষ যদি বুঝতে পারে আপনি ডক্টর বড়গোঁহাইকে বাঁচাতেই চাইছেন। ফাঁসির দড়ি থেকে নামিয়ে যাবজ্জীবন; যাবজ্জীবন থেকে নামিয়ে দীর্ঘ-মেয়াদী; সশ্রম থেকে বিনাশ্রমে।

বাসু একটু চিন্তা করে বললেন, এটাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য?

মহাদেব বলে, ইয়েস স্যার! না হলে সেই স্কাউন্ড্রেলটার প্রতি আমার দরদ কেন উথলে উঠবে বলুন? মিসেস বাসুকে তাহলে আপাতত পাঁচ হাজার টাকা ক্যাশ 'রিটেইন্যার' দিয়ে যাই—অন্ বিহাফ অব ডক্টর বড়গোঁহাই?

বাসু টেলিফোনের কথামুখে বলেন, রানু তুমি লাইনে আছ তো?

—আছি!

—মিস্টার জালানকে রসিদটা দিয়ে দাও।

—তুমি দুজনের ডিফেন্সের দায়িত্বই নিচ্ছ?

—তাই নিচ্ছি!

boiRboi.net

এগারো

বিদ্যাসাগর সেতু পার হয়ে উনি রওনা হলেন, গেস্টকিন উইলিয়ামস্ কারখানাকে বাঁয়ে রেখে। আন্দুল রোডে আজ ভিড় আছে। শনিবারের অপরাহ্ন। কলকাতা ছেড়ে অনেকেই সপ্তাহান্তিক অবকাশ কাটাতে চলেছে। কেউ খড়গপুর, কেউ কোলাঘাট, কেউ দীঘা। প্রায় বিশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে আলমপুরের মোড়ে এসে পড়লেন বম্বে রোডে। বম্বে রোড ধরে কিছুটা এগিয়েই ধূলাগড়ি গ্রাম। 'সোনার বাঙলা রিসর্টস্'-এর বিজ্ঞাপন এবং বাহারে গেট নজরে পড়বেই! গেট দিয়ে ঢুকবার মুখে বাসু আঁৎকে উঠলেন। পরক্ষণেই বুঝলেন, না! যে লোকটা ব্যাটনটা বগলে নিয়ে অ্যাটেনশান-ভঙ্গিতে ওঁকে স্যালুট করেছিল তার পোশাক প্রায়-পুলিশের মতো হলেও নেপালী কিশোরটি ঐ প্রতিষ্ঠানের দ্বারপাল মাত্র।

বাসু একটু ভিতরে নিয়ে গিয়ে উল্টোদিকে মুখ করে গাড়িটা পার্ক করলেন, যাতে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে নম্বরটা সহজে নজরে না পড়ে এবং গাড়ি না ঘুরিয়ে চট করে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

কাউন্টারের কাছে এগিয়ে এসে দেখলেন একটি তরুণ পাঞ্জাবি ছেলে বসে আছে। বাসু সরাসরি তার কাছে গিয়ে বললেন, এক্সক্যুজ মি, আপ্ প্রীতম সিংজী হাঁয়, ন?

ছেলেটা সোজা হয়ে বসল। রীতিমতো অবাক হয়ে বলল, আপ্‌কো কৈসে মালুম?

—বহ্ আপকো মনোহরপুকুর রোড প্যে যো ব্রাঞ্চ হ্যয়, উস্‌মে মেরি ভাতিজাকা লেড়কি কাম করতি— রম্‌লা, রমলা সেনগুপ্তা।

—অব সম্‌ঝা। বৈঠিয়ে। আপকা বেটিকি তালাস মে অ্যায়ে হেঁ?

বাসু বসলেন। লক্ষ্য করে দেখলেন প্রীতম ছাড়া কাউন্টারের কাছাকাছি আর কেউ নেই। হিন্দিতে জানতে চাইলেন, ওঁর মেয়ে-জামাই কি ঘরে আছে?

প্রীতম জানালো মিসেস সেন বেরিয়েছেন; কিন্তু মিস্টার সেন ঘরেই আছেন।

বাসু হিন্দিতে জানতে চান, মিসেস সেন কি চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন?

প্রীতম জানালো, মিসেস সেনের চেক-আউট করার সওয়াল উঠছে না, কারণ ঘর 'বুক' করেছেন মিস্টার সেন। তবে হ্যাঁ, মিসেস সেন তাঁর গ্রে-রঙের স্যুটকেস নিয়ে যাননি। অটো-রিক্‌শায় চেপে বাজারের দিকে গেছেন—লোকাল মার্কেট থেকে কিছু খরিদ করতে। কারণ যাবার আগে প্রীতমকে প্রশ্ন করেছিলেন বাজার কোনদিকে। ডাক্তারখানা আছে কি না সেখানে, ইত্যাদি।

বাসু বললেন, ওর ঘরে ফোন আছে?

—জী হাঁ। উনহোনে 'ব্রাইডাল স্যুট' বুক কিয়া। উস্‌মে টেলিফোনভি হ্যায়। এ. সি. ডিলক্স রুম।

—ওকে একবার ফোন করুন তো?

—ক্যা নাম বাঁতাউ?

—বহ্ রিসিভার উঠানে সে মুঝকো দেনা।

প্রীতম মিস্টার সেনের ঘরে রিং করল। একটু পরেই টেলিফোনটা বাড়িয়ে ধরল বাসু-সাহেবের দিকে। বাসু টেলিফোনে প্রশ্ন করলেন, মিস্টার সেন? সমীর সেন কহ্‌তে হেঁ ক্যা?

—ইয়েস! আপ কৌন? রিসেপ্‌শান?

বাসু এবার শাদা বাঙলায় বললেন, আজ্ঞে না। আপনি আমাকে চিনবেন না, আমার দরকারটা ছিল মিসেস সেনের সঙ্গে। উনি কি আছেন?

—না। কিন্তু আপনি কে? চিনি-না-চিনি আপনার একটা পিতৃদত্ত নাম তো আছে।

—তা আছে। আপনার পিতৃদত্ত নামটা যেমন সমীর সেন, আমার পিতৃদত্ত নামটা তেমনি শান্তনু বড়গোঁহাই। তা মিসেস সেন কখন ফিরবেন?

এবার ও-প্রান্তে নীরবতা।

—কী হলো সমীরবাবু? শুনতে পেলেন না?

ও-প্রান্ত এবার বললেন, সে...ইয়ে...কলকাতায় ফিরে গেছে!

—খুব ভাল কথা। তাহলে এই মওকায় আপনার সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা সেরে নেওয়া যাক। আমি আসছি আপনার ঘরে। ব্রাইডাল স্যুটটা তো?

—বাট্...বাট্...হু আর য়ু? কে আপনি?

—এখনি বললাম না—আমার নাম ডক্টর শান্তনু বড়গোঁহাই? গুয়াহাটির!

একটু পরে হোটেলের ও-প্রান্তে নির্জন 'ব্রাইডল স্যুইট'-এর দ্বিতলে উঠে এলেন বাসু। দরজায় নক করামাত্র সেটা খুলে গেল। খোলা দরজার সামনে ডঃ বড়গোঁহাই যেন ভূত দেখল।

—আপনি! এখানে!

বাসু বললেন, 'ম্যাক্‌বেথে'-এর উক্তিটা এখানে সুপ্রযুক্ত হতো, ডক্টর! —দাউ কান্স্‌ট সে দ্যাট আই ডিড্ ইট!'

বড়গোঁহাই-এর মুখে জবাব ফোটে না। বাসুই ধম্‌কে ওঠেন, দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ান। বসুন ঐ খাটে। না, আমি ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা নই। তবু একই প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করব—কেন আপনি এ কাজ করলেন? কেন? কেন? কেন?

বড়গোঁহাই দু পা পিছিয়ে গেল। বোধকরি ওর চরণযুগল আর দেহভার বইতে পারছিল না। ধপ্‌ করে বসে পড়ল খাটে। বললে, বিশ্বাস করুন, বাসু-সাহেব, আমি অনীশ আগরওয়ালকে হত্যা করিনি।

বাসু একটা চেয়ার দখল করে বসলেন। অনেকক্ষণ একটানা ড্রাইভ করে এসেছেন। ধূমপান করা হয়নি। পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বার করে বললেন, মার্ডার-কেসটার কথা পরে হবে। আপাতত জবাব দিহি করুন—বিবাহ না করে একটি কুমারী মেয়েকে 'সিডিউস্' করে কেন এনে তুলেছেন এই 'মধুচন্দ্রিমা-কক্ষে'? নাম ভাঁড়িয়ে। স্বামী-স্ত্রীর মিথ্যা পরিচয় দিয়ে?

শান্তনু বললে, এটাও বিশ্বাস করুন, স্যার। পরিকল্পনাটা আমার নয়। ওর।

—ন্যাকা! আপনি কচি খোকা! জানেন না যে, আপনাদের দুজনকেই পুলিশে হন্যে হয়ে খুঁজছে? এই অবস্থায় কেন আপনি আমার মক্কেলকে এখানে ফুস্‌লে এনেছেন?

—প্লীজ, মিস্টার বাসু! এভাবে বলবেন না। একবার বলেছি, আবারও বলছি, এই 'ধূলাগড়ি' গ্রামের 'সোনার বাঙলা রিসর্টস্'-এর নামই আমি জানতাম না। মাধুই আমাকে টেলিফোন করে সাঁকরাইল স্টেশনে চলে আসতে বলে। আমরা দুজনে দুটি পৃথক লোকাল ট্রেনে চলে আসি। সেখান থেকে একটা অটো-রিক্‌শায়—

—কিন্তু 'পথিক হোটেল' থেকে চেক-আউট করে চলে এলেন কেন?

—বাঃ! সেটা তো আপনারই ইন্সট্রাকশানে!

—আমার ইন্সট্রাকশানে? মানে?

—না! আপনার নিজের নয়। কিন্তু আজ সকাল সাতটার সময় আপনার সেক্রেটারি, মানে মিসেস বাসু তো আমাকে টেলিফোন করে বলেছিলেন, ইম্মিডিয়েটলি 'পথিক হোটেল' ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে!

—তাই নাকি? কেন?

—কেন মানে? আপনি জানেন না কেন?

—লুক হিয়ার ডক্টর, সময় কম। পুলিশে আপনাকে সত্যিই খুঁজছে। আমি যেভাবে আপনাকে 'ট্রেস' করেছি একক প্রচেষ্টায়, পুলিশ বাহিনী তা যে-কোনো মুহূর্তে সম্পন্ন করতে পারে। সুতরাং সময় নষ্ট না করে বলে যান মিসেস বাসু আপনাকে কী বলেছিলেন এবং আপনি তাঁর ইন্সট্রাকশান মোতাবেক কী কী করেছিলেন?

—উনি আমাকে বললেন যে, পুলিশে আমার হারানো রিভলভারটা ট্রেস করেছে। তাতে নাকি একটা ডিস্‌চার্জড বুলেট। অথচ আমার কাছে থেকে যখন ওটা খোয়া যায় তখন ছয়টাই তাজা বুলেট ছিল। উনি আমাকে বললেন, অবিলম্বে আত্মগোপন করতে। কারণ পথিক হোটেলের অ্যাড্রেসটা অনেকেই জানে। বললেন, শহর বা শহরতলী অঞ্চলে ছদ্মনামে উঠতে। আরও বললেন, মাধুকেও পুলিশে খুঁজছে। সে আছে মনোহরপুকুরের সোনার বাঙলা হোটেলে। টেলিফোন নাম্বারটাও বললেন। এবং বললেন, আপনি বলেছেন সেও যেন ঐ হোটেল ত্যাগ করে অন্য কোনো হোটেলে চলে যায়। মিসেস বাসু এ-কথাও বলেছিলেন যে, আপনার বাড়ির টেলিফোনটা হয়তো পুলিশে ট্যাপ করেছে। তাই আপনাকে যেন কোনো কারণেই আমরা ফোন না করি।

—ওয়ান্ডারফুল অ্যারেঞ্জমেন্ট! তা আপনি কী করলেন?

—আমি তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিতে নিতেই রুম-বেয়ারা এসে বলল, ফোনে আবার কেউ আমাকে ডাকছে। এবার ফোন করেছিল মাধবী, সে জানালো সে কোন্ হোটেলে কী নামে উঠেছে। আমি বললাম, তা আমি ইতিমধ্যে জেনে গেছি। ওকে জানালাম আপনার ইন্সট্রাকশান—শহরতলীর কোনো হোটেলে পালিয়ে যেতে। আমার রিভলভারটা খোয়া যাওয়ার কথাও বললাম। তবে পুলিশে যে সেটা পেয়েছে তা আর জানাইনি। ও নার্ভাস হয়ে যাবে আশঙ্কায়।

—বুঝলাম। তারপর?

—তারপর বেলা সাড়ে নটা নাগাদ ও আবার ফোন করল। এই 'ধূলাগড়ি হলিডে রিসর্টস্'-এর খবরটা দিল। বলল, যে-কোনো লোকাল ট্রেনে এসে আমি যেন সাঁকরাইল স্টেশনের আপ প্লাটফর্মে অপেক্ষা করি। ও একই সময়ে রওনা দিচ্ছে। আমরা যেই আগে পৌছাই সে অপেক্ষা করবে স্টেশনে।

—বাট হোয়াই দিস্ 'ব্রাইডাল সুইট'?

—বিশ্বাস করুন। সেটাও আমার ইচ্ছায় নয়। মাধুর ইচ্ছাতেই।

—আপনি কি ওকে বিয়ে করবেন?

—যদি আমার ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড না হয় এবং আমি জেল থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত মাধবী যদি অপেক্ষা করে।

—আপনি কি অনীশ আগরওয়ালকে খুন করেছেন?

—সে তো এইমাত্র বললাম, করিনি, করিনি, করিনি।

—আপনি কি বিবাহিত?

—বেগ য়োর পার্ডেন?

—আপনি বছর দুই আগে রেজিস্ট্রি মতে একটি মেয়েকে বিবাহ করেননি?

—এসব কী বলছেন আপনি! সার্টেনলি নট!

—রিভলভারটা গুয়াহাটি থেকে কেন এনেছিলেন? কী করে খোয়া গেল?

—এনেছিলাম আত্মরক্ষার্থে। অনীশ আগরওয়াল লোকটা মারাত্মক হবে আশঙ্কা করে। আর ওটা খোয়া গেছে— যদ্দূর সম্ভব—আমার ঐ 'রেন্ট-আ-কার' গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে।

—ড্যাশবোর্ডের ড্রয়ারটা তালাবন্ধ ছিল না?

—না...মানে...

—কোথায়? কখন নজরে পড়ল আপনার?

ডক্টর বড়গোঁহাই জবাব দেবার আগেই লাফ দিয়ে উঠে পড়েন বাসু। জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখেন। বলেন, আয়াম অ্যাফ্রেড ওরা এসে গেছে।

—ওরা?

—পুলিশ! শোন শান্তনু! তুমি আমার মক্কেল! কিন্তু মাধুকে বাঁচাতে আমি বাধ্য হয়ে ঐ নেকড়েগুলোর মুখে তোমাকে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হচ্ছি। ওরা মিনিট তিন-চারের মধ্যেই এসে যাবে। তোমাকে অ্যারেস্ট করবে। তুমি বলবে, মাধবী তোমার সঙ্গে এসেছিল কিন্তু রাগারাগি করে কলকাতায় ফিরে গেছে। অনীশ আগরওয়ালের হত্যাকাণ্ড বিষয়ে কোন প্রশ্নের জবাব দেবে না। বলবে, আমি তোমার অ্যাটর্নি। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি ও বিষয়ে কোনো কথা বলতে পার না।

—বাট্ স্যার, আপনি তো আমার অ্যাটর্নি নন। আপনি তো মাধুর অ্যাটর্নি।

—নো। তোমরা দুজনেই আমার মক্কেল! সেটা প্রমাণ করার দায় আমার। এখন মাধুর স্যুটকেসটা আমাকে দাও।

ভাগ্যক্রমে সেটা খোলা ছিল। বাসু ড্রেসিং টেবিল থেকে টপাটপ কিছু মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী তুলে নিয়ে তাতে ভরে দিলেন। ওয়াড্রবটা খুলে মেয়েদের পোশাক-আশাক অতি ক্ষিপ্রগতিতে তুলে স্যুটকেসটা বন্ধ করলেন। তালাবন্ধ করা গেল না। সেটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন করিডোরে। পর পর তিনটে ডোর-নব ঘোরাবার চেষ্টা করলেন। কোনোটাই খুলল না। চতুর্থটার ক্ষেত্রে ডোর-নব ঘুরল। ডবলবেড রুম। বেশ বোঝা যায়, প্রাগ্‌বর্তী বোর্ডার বিদায় হওয়ার পর ঘরটা এখনো ঝাড়-পোঁছ করা হয়নি। বিছানাটা অপরিষ্কার। সয়েলড তোয়ালেটা টেবিলের উপর। বাসু চট্-জলদি ঢুকে গেলেন সেই ঘরে। বৃদ্ধ মানুষ, স্যুটকেসটা বইতে পরিশ্রম হয়েছে। বসে পড়লেন খাটের উপর। ওয়ালেট বার করে তার গর্ভ থেকে একটা 'সরব্রিট্রেট' টাবলেট বার করে জিবের তলায় রাখলেন।

বিশ সেকেন্ডও হয়নি। করিডোরে ভারী কিছু বুটের শব্দ। সিঁড়ির দিক থেকে 'ব্রাইডাল সুইটের' দিকে এগিয়ে গেল। বাসু মাধবীর স্যুটকেসটা ওয়াড্রবে ঢুকিয়ে দিলেন। হাত দিয়ে বিছানার চাদরটা টান-টান করে দিলেন। দরজার ভিতর দিকে তালায় গা-চাবিটা ঝুলছিল। সেটা পকেটস্থ করে দরজা তিন সেন্টিমিটার ফাঁক করে দেখলেন। ত্রিসীমানায় কাউকে দেখা গেল না। টুপ্ করে বাইরে এসে দরজাটা টেনে দিলেন। তারপর নিঃশব্দে নেমে এলেন নিচে। কাউন্টারের কাছে একজন কন্সটেব্‌ল্ খৈনি ডল্‌ছিল। বাসু তাকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। এগিয়ে গেলেন কাউন্টারে। চাবিটা হস্তান্তরিত করে বললেন, পুলিশনে উ শালা দামাদকো পাকড় লিয়া। ইয়ে কুঞ্চি রাখিয়ে। ম্যয় বাহারকা তরফ য্যা-রহা হুঁ। মেরি লেড়কি কী তালাস মে। কিসিকো কুছ না বাতানা।

প্রীতম সিং তার বাম চক্ষুটা নিমীলিত করল।

বাসু-সাহেব দেখাদেখি তাঁর দক্ষিণ চক্ষুটা নিমীলিত করে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন।

বারো

দোতলায় পুলিশের তাণ্ডব চলছে। উনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। গাড়িটা বার করে রাস্তায় পড়লেন। নেপালী দ্বারপালটি অভ্যাসমতো তার ব্যাটনটা বগলে নিয়ে স্যালুট ঝাড়ল। বাসু-সাহেব ওকে একটা পাঁচ টাকার মুদ্রা ড্রাইভারের সীটে বসেই হাত বাড়িয়ে দিলেন। লোকটা ক্ষুণ্ণ হলো, তবু নিল হাত পেতে। বাসু বললেন, আধুলি নেহীরে, পাঁচ রুপেয়া! কুৎকুতে ছোট দুটো চোখ বিস্ময়ে টইটুম্বুর। ও বোধহয় ইতিপূর্বে পাঁচ টাকার মুদ্রা দেখেনি। উল্টে-পাল্টে দেখে একগাল হাসল। আবার স্যালুট বাজাল।

বাসু গাড়িটা নিয়ে অতি ধীর গতিতে রাস্তার বাঁ-দিক ঘেঁষে আলমপুর মোড়ের দিকে চলেছেন—যাতে ওদিক-থেকে আসা কোনো সাইকেল-রিক্‌শা হুস করে ওঁকে অতিক্রম করে যেতে না পারে। একটু এগিয়েই ডান হাতি একটা রাস্তা—সাঁকরাইল স্টেশন রোড। ঐ রাস্তায় দশ মিটার ঢুকে গাড়িটা পার্ক করলেন। মুখটা থাকলো বড় রাস্তার দিকে ফেরানো। নেমে এসে বনেটটা খুলে উপরে তুলে নিলেন। তারপর পাইপ ধরিয়ে গিয়ে বসলেন পিছনের সীটে।

ভাবখানা—ওঁর গাড়িটা বিগড়েছে; ড্রাইভার গেছে স্পেয়ার-পার্টস-এর খোঁজে। এমন জায়গায় গাড়িটা পার্ক করা হলো যেখান থেকে বড় রাস্তা নজরে পড়ে। অর্থাৎ 'সোনার বাঙলা রিসর্টস্' থেকে পুলিশভ্যানটা যখন কলকাতা ফিরে যাবে তখন উনি দেখতে পাবেন। আবার স্টেশন বাজার থেকে মাধবী যখন রিক্শা নিয়ে ফিরবে তখন তাকেও ধরতে পারবেন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। মিনিট কুড়ি পরেই পুলিশ ভ্যানটা কলকাতা-মুখো চলে গেল। সম্ভবত আন্দুল রোড ধরে বিদ্যাসাগর ব্রিজের দিকে। বাসু গাড়ি থেকে নেমে এসে বনেটটা নামিয়ে দিয়ে চালকের আসনে এসে বসলেন। এখন মাধবীর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা অদ্ভুত পাখির ডাকে উনি এ-পাশ ফিরলেন। পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু সুরেলা মিষ্টি আওয়াজ। হঠাৎ যেন বাল্যকালে ফিরে গেলেন। পাখিটা ওঁর খুবই পরিচিত—মানে ওর সুরটা; অথচ কী আশ্চর্য! শহুরে জীবনের ঘূর্ণিপাকে সমাজবিরোধীদের পিছনে ছুটতে ছুটতে সেই বাল্যজীবনের সব সৌকুমার্য কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। বাসু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। জনমানবের দেখা পেলেন না। পাখিটাকেও না। অপরাহ্ণ ঘনিয়ে আসছে। বাসুর দুরন্ত বাসনা হলো পাখিটাকে দেখবেন চিনবেন।তিনি রাস্তার 'বার্ম' বরাবর প্রায় হামা দিয়ে ঝোপ-জঙ্গলটার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন। অনেক-অনেক অপরাধীকে এভাবে কায়দা করে চমকে দিয়েছেন; এবার পারলেন না। মগডালে-বসা পাখিজোড়া টের পেল। কুরুর্‌রুং... করে শব্দ তুলে একের-পিছে-এক উড়ে গেল!

বাসু ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অরিয়ল! বেনেবউ!' বাসন্তী রঙের একটা ঝিলিক তুলে পলাতকা কর্তা-গিন্নি পশ্চিম আকাশের দিকে উড়ে গেল। বহুদূরে একটা তেঁতুল গাছের মগডালে গিয়ে বসল। আবার শুরু হলো তাদের 'কৃষ্ণ কোথা'? অথবা 'খোকা হোক'! বহু-বহুদিন পরে দেখলেন ঃ বেনেবউ। শুনলেন তাদেয় বাল্যস্মৃতি বিজড়িত কণ্ঠস্বর।

এতক্ষণে নজর গেল পশ্চিমাকাশের দিকে। সোনা-গলানো রোদে অবগাহন করে অপরাহ্ণ যেন সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চে প্রণাম করতে এসেছে। গোটা পশ্চিম আকাশটা লালে-লাল। যেন কারা ওখানে একটু আগে ফাগ-আবীরে রঙদোল খেলেছে মেঘের রাজ্যে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বাসু-সাহেবের।

প্রকৃতি এই চিরপুরাতন রঙের খেলা খেলে চলেছে নিত্যিদিন। বউ-কথা-কও গাঁয়ে-গঞ্জে আজও 'কৃষ্ণ কোথায়' খুঁজে ফেরে, আর ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু তখন বাতানুকূল-করা চেম্বারে বসে শিভাস রিগ্যালের সঙ্গে ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর পাঞ্চ করতে থাকেন!

হঠাৎ নজর হলো স্টেশনের দিকে থেকে একটি রিকশা এগিয়ে আসছে। ত্রিচক্র-যান। এতদূর থেকে মানুষজন ঠাওর হচ্ছে না। তবে একক-সওয়ারির পরনে ঐ 'বউ-কথা-কও' রঙের শাড়ি। ওঁর মনে পড়ে গেল—রমলা বলেছিল 'হলুদরঙের মুর্শিদাবাদী'। তার মানে মাধবী এখানে এসে পোশাক বদলাবার সময় পায়নি।

নির্জনতার সুযোগে বৃদ্ধ বাসু-সাহেব যেমন হামা দেবার 'বার্ড-ওয়াচিঙে'র চেষ্টা করেছিলেন, ঠিক তেমনি গুয়াহাটি দূরদর্শনের জনপ্রিয়া গায়িকা এই গ্রাম্য পরিবেশে গলা ছেড়ে গান ধরেছে।

এই রোখকে! রোখ্‌কে!

গান ও রিক্শা একই সঙ্গে থামল। না হলে রিকশাটা বৃদ্ধ পথচারীকে চাপাই দিয়ে ফেলত হয়তো।

দুরন্ত বিস্ময়ে মাধবী বলল, আপনি! এখানে?

বৃদ্ধ বললেন, উঃ কদ্দিন পরে দেখা! সেই তোর বিয়ের পরে আর দেখিনি। আমি তো এখানেই থাকি রে, নাতনি। হুই যে শিবমন্দিরটা দেখা যাচ্ছে, ওর পিছনবাগে। তুই কোথায় এসেছিলি? 'সোনার বাঙলায়'? কর্তার সঙ্গে—না, না, সে হবে না। তোর দিদার সঙ্গে দেখা করে যেতেই হবে। আমি তোকে গাড়ি করে হোটেলে পৌঁছে দেব। আয়।

মাধবী কি বলবে, কী করবে, বুঝে উঠতে পারে না। তার ধারণা শহরের ক্লেদাক্ত কলকোলাহলকে পিছনে ফেলে ওরা দুটিতে এসে আত্মগোপন করেছে এই সুদূর পল্লীপ্রান্তে। একটি 'মধুচন্দ্রিমা-কক্ষে'—ব্রাইডল সুইট'এ। ও কোথাও কোনো সূত্র রেখে আসেনি। পুলিশ, গোয়েন্দা, বাসু-সাহেব অথবা সেই হাড়-জ্বালানী জালান ওর খোঁজ পাবে না। অন্তত সাত-সাতটি দিবস রজনী। তা হলো না! প্রথম রাত্রির আগমন মুহূর্তে—সন্ধ্যায়—এসে আর্বিভূত হলেন ওর সলিসিটার। মাঝ সড়কে দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় প্রলাপোক্তি করে চলেছেন। এক নাগাড়ে। যেন উনি সাঁকরাইলের আদি বাসিন্দা।

বাসু রিক্‌শাওয়ালাকে বলেন, ওহে, কত ভাড়া ঠিক করে সওয়ারি উঠিয়েছিলি রিক্‌শায়?

রিক্‌শাওয়ালা এই উট্‌কো ঝামেলায় বিরক্ত। বলে, স্টেশান বাজার থেকে 'সোনার বাঙলা' হোটেল-তক্ পুরো পাঁচ টাকা রফা হয়েছিল। কিন্তু আপনি তো মাঝরাস্তা থেকে মস্তানপার্টির মতো দিদিকে ছিন্তাই করে নিলেন। ভাড়ার কথা কী বলব বলুন?

বাসু বললেন, এ কী একটা কথা হলোরে, দাদুভাই? তুই রিক্‌শা চালাস। আর, আমি হোমিওপ্যাথির ওষুধ বেচি—কিন্তু আমরা দুজন তো একই গাঁয়ের বাসিন্দা? আমার একটা বিবেচনা থাকবে না? নে, ধর—ভাঙানি দিতে হবে না। তবে মালগুলো আমার গাড়িতে তুলে দে, দাদু।

একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরেন রিক্‌শাওয়ালার দিকে।

রিক্‌শাওয়ালা রীতিমতো বিস্মিত। সে বিনা বাক্যব্যয়ে মাধবীর সওদা করা মালপত্র বাসু-সাহেবের গাড়িতে তুলে দিয়ে নোটটা কপালে ঠেকিয়ে বুকপকেটে রাখল। প্রস্থান করল।

মাধবী তার মুলতুবি প্রশ্নটাই পেশ করল আবার। বললে, আপনি এখানে এলেনই বা কী করে আর ঐ শিবমন্দিরের পিছনে...

বাসু বলেন, না না, শিবমন্দিরের পিছনে আমার কোনো বাড়িটাড়ি নেই। 'দিদা'-র গল্প, হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারির আষাঢ়ে গল্প সে ঐ রিক্‌শাওয়ালাকে বিভ্রান্ত করতে। তুমি জান না, ইতিমধ্যে পুলিশ এসেছে—হোমিসাইড স্কোয়ড—তারা ডক্টর বড়গোঁহাইকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। পুলিশ তোমাকেও অ্যারেস্ট করতে এসেছিল। কিন্তু শান্তনু বলেছে, তুমি রাগারাগি করে কলকাতায় ফিরে গেছ। গোয়েন্দা-পুলিশ সেটা অবিশ্বাসও করতে পারে। তখন লোকাল রিক্‌শাওয়ালাদের মধ্যে খোঁজখবর নেবে। তাই ঐ রিকশাওয়ালাটাকে একটু গুলিয়ে দিলাম আর কি! এসে গাড়িতে উঠে বস।

মাধবী বললে, সোনার বাঙলা রিস্‌টয়ে-এ পুলিশ রেড করেছে?

—হ্যাঁ। শান্তনুকে ঐ নেকড়েগুলোর মুখে ফেলে দিয়ে আমি এখানে এসে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, মাধবী। বিশ্বাস কর, আমার কোনো দ্বিতীয় পথ খোলা ছিল না। শান্তনু যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে, কোনো প্রশ্নের জবাব না দেয়, তবে ওরা তোমাকে ধরতে পারবে না।

মাধবী বললে, আমাকে ধরতে না পারাই কি আপনি নিজের চরম সাফল্য মনে করেন?

—না, তা করি না। কিন্তু এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতে হবে, মাধবী। আর সেটা এই মাঝসড়কে সম্ভবপর নয়। তুমি গাড়িতে উঠে এস। এ জায়গাটা নিরাপদ নয়।

—তাহলে কোথায় যাচ্ছি আমরা?

—চুপচাপ বসে থাক। একটু পরেই দেখতে পাবে।

মাধবীকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে উনি স্টেশন বাজারের দিকে ফিরে গেলেন। গাড়িটা পার্ক করলেন একটি বড় স্টেশনারি দোকানের পাশে, যার কাউন্টারে একটা টেলিফোন নজরে পড়ল। মাধবীকে নির্দেশ দিলেন গাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসে থাকতে। একটা খবরের কাগজ বাড়িয়ে ধরে বললেন, মুখটা যতদূর সম্ভব কাগজের আড়ালে রাখতে পারলেই ভাল হয়।

মাধবী জবাব দিল না। উনি গেলেন দোকানে। দোকানদারকে খুশি করতে কিছু হাবিজাবি জিনিস কিনলেন, যা নিত্যপ্রয়োজনীয়—টুথপেস্ট, মাথার তেল, শেভিং ক্রীম। মাধবীর জন্য একটা আঙ্কল চীপ্‌স্। তারপর প্রশ্ন করলেন, একটা লোকাল ফোন করতে পারি?

—করুন। দু টাকা লাগবে।

বাসু রিসিভারটা তুলে নিয়ে সোনার বাঙলা রিস্‌টস্-এ ফোন করলেন। যথারীতি প্রীতম সিংজী ধরল ও-প্রান্তে। বাসু জানালেন যে, কন্যার সাক্ষাৎ তিনি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন। উনি হোটেলে ফিরতে চান। আরও জানতে চাইলেন, কলকাতা থেকে যে উটকো ঝামেলা এসেছিল তারা বিদায় হয়েছে কি না। প্রীতম নিজে থেকেই জানালো তারা চলে গেছে; আর কোনো সেপাই-টেপাই বসিয়ে রেখে যায়নি। উনি বললেন, তাহলে এখনি ওঁরা দুজন ফিরে আসছেন। একটা ঘর ওঁর জন্য রিজার্ভ রাখতে।

দোকানিকে সওদা আর দূরভাষণের দাম মিটিয়ে অচিরেই ফিরে এলেন। নেপালী ছেলেটি বাগিয়ে স্যালুট করল আবার। যে-ঘরের ওয়ার্ড্রবে উনি মাধবীর স্যুটকেসটা রেখে গিয়েছিলেন সেই দ্বিতলের ঘরটিই ভাড়া নিলেন। নিজের নামে। জানতে চাইলেন, ব্রাইডল-সুইট ছাড়া অন্য কোনো ঘরে টেলিফোন আছে কি?

প্রীতম বলল, জী নেহি। লেকিন এন্তাজাম হো জায়েগা।

প্রতি ঘরেই প্লাগ পয়েন্ট আছে। টেলিফোনের লাইনও টানা আছে। প্রীতমের ব্যবস্থাপনায় একটি টেলিফোন রিসিভার ঐ ঘরে এনে বসিয়ে দিল।

বাসু মাধবীর কাছে জানতে চাইলেন, তোমাকে পই পই করে বারণ করেছিলাম মনোহরপুকুর রোডের সোনার বাঙলা হোটেল থেকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে রাস্তায় নামবে না। কেন তুমি অবাধ্য হলে, মাধবী?

মাধবী অবাক হলো। বলল বাঃ! সে তো আপনারই ইন্সট্রাকশানে! আপনি বললেন না যে, এ হোটেল ছেড়ে শহরতলীর কোনো আস্তানায় গিয়ে গা-ঢাকা দিতে? শুধু আমাকে কেন, শান্তনুকেও তো আপনি তাই বলেছিলেন!

—আমি! কখন? কীভাবে?

—না, আপনি নিজে বলেননি। টেলিফোন করেছিলেন মাসিমা, আই মীন মিসেস বাসু। আজই সকালে। উনি আরও বললেন গোয়েন্দা-পুলিশ হয়তো আপনার লাইনটা ট্যাপ করেছে। কোনো কারণেই যেন আমি আপনাকে রিং ব্যাক না করি।

—বাঃ! তা তুমি আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর চিনতে পারলে?

—না, তা পারিনি। অনেক সময় টেলিফোনে তা বোঝাও যায় না। তাছাড়া আপনি ছাড়া, মানে আপনি আর কৌশিকদা ছাড়া আমার টেলিফোন নাম্বার তো আর কেউ জানেন না। আমার তাই আদৌ কোনো সন্দেহ হয়নি। কেন? ফোনটা মাসিমা করেননি?

—ফর য়োর ইন্‌ফরমেশন, না!

—সেকি! তাহলে কে করতে পারে?

—দ্যাটস্ অ্যা মিলিয়ান-ডলার কোশ্চেন! তুমি কাল রাত্রি দশটায় ঐ হোটেলে চেক-ইন করেছিলে। কৌশিক আর আমি শুধু তোমার হোটেলের নাম বা নম্বর জানি। এক্ষেত্রে কীভাবে তুমি এমন ভুতুড়ে 'কল' পেতে পার?

—আপনি কিছুই আন্দাজ করতে পারছেন না?

—তা পারছি। আন্দাজ! সিদ্ধান্ত নয়। কিন্তু তার আগে আমার কতকগুলো প্রশ্নের জবাব দাও, মাধবী। তুমি একটি টেলিফোনে নির্দেশ পেলে চুপিচুপি সেই হোটেল ছেড়ে শহরতলীর কোনো হোটেলে আত্মগোপন করলে। তোমার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী তুমি ধরে নিয়েছিলে যে, সে নির্দেশ আমারই, আমার প্রাইভেট-সেক্রেটারির মাধ্যমে দেওয়া। কেমন তো? সে-ক্ষেত্রে তুমি একা-একাই পালিয়ে গেলে না কেন?

—তাই যেতাম। জিনিসপত্র প্যাক আপ্ করে একটা টেলিফোন করলাম শান্তনুকে। সে বললে, সেও মাসিমার কাছ থেকে ঐরকম একটা নির্দেশ পেয়েছে। তার কিছুক্ষণ আগে এই ধূলাগড়ির বিজ্ঞাপনটা দেখেছি। আমিই ওকে সাজেস্ট করলাম সেখানে যেতে। দুজনেই পৃথক পৃথক রওনা হব। অবিলম্বে। সাঁকরাইল স্টেশনে নেমে যে আগে পৌঁছাবে সে অপেক্ষা করবে দ্বিতীয়জনের জন্য।

—ঠিক আছে। এবার তাহলে একটা ব্যক্তিগত ডেলিকেট প্রশ্ন করি, সচরাচর ক্রিমিনাল কেস-এ এজাতীয় রোমান্টিক প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু এক্ষেত্রে উঠছে। হোটেলে উঠে 'ব্রাইডাল সুইট'টা বুক করার প্রস্তাবটা কে প্রথমে দিয়েছিল? তুমি না ডক্টর বড়গোঁহাই?

মাধবী নতমস্তকে নীরবে রইল।

ঠিক তখনি দরজায় কে যেন নক্ করল। বাসু মাধবীকে বললেন, কুইক! বাথরুমে ঢুকে যাও।

মাধবী এক লাফে স্নানাঘরে ঢুকে দরজা টেনে দেবার পর বাসু সদর দরজা খুললেন। এসেছে রুম-বেয়ারা। তোয়ালে-সাবান, দুটো বেডশীট ইত্যাদি নিয়ে। রুম-বেয়ারা জানতে চাইল, ডিনারের অর্ডার দেবেন কিনা। বাসু বললেন, পরে। লোকটা চলে গেল। বাসু বাথরুম-দরজায় টোকা দিতে বার হয়ে এল মাধবী। বললে, বাপ্‌রে! এত ঘাবড়ে গেছিলাম!

বাসু সে কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, আমার প্রশ্নটার জবাব মুলতুবি আছে, মাধু। 'ব্রাইডাল সুইটটা' বুক করার প্রস্তাবটা কার? শান্তনুর না তোমার?

এবার ও মুখ তুলে বলল, আপনার এ-প্রশ্নটা ইর্‌লিভেন্ট হয়ে যাচ্ছে না কি? এটা আমাদের দুজনের প্রাইভেট ব্যাপার—

—নো, মিলেডি! প্রশ্নটা অত্যন্ত রেলিভেন্ট! শান্তনু না তুমি? কে ঐ ফুলশয্যা-কক্ষের জন্য এক্সট্রা চার্জ দিতে রাজি হয়ে প্রথম প্রস্তাবটা তুলেছিল?

হঠাৎ কী যেন একটা পরিবর্তন হলো মাধবীর। কোথা থেকে সাহস সঞ্চয় করে বৃদ্ধের চোখে চোখে তাকিয়ে বললে, হ্যাঁ, আমি স্বীকার করব। প্রস্তাবটা আমিই দিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, আরও বলব—তাতে ঘোরতর আপত্তি ছিল শান্তনুর। আমি কর্ণপাত করিনি।

বাসু বললেন, সিটি বাজানোটা আমার আসে না। হাততালিই দিই—কী বল? এই সিকোয়েন্সে তুমি একটা গানও ধরে দিতে পার, মাধবী, 'প্যার কিয়া তো ডরনা ক্যা'?

মাধবী জ্বলন্ত একজোড়া চোখে তাকিয়ে থাকল নির্বাক।

বাসু বললেন, যা হোক। বোঝা গেল ব্যাপারটা। শান্তনু তোমাকে ফুসলে আনেনি, তুমিই তাকে সিডিউস করেছ! এবার তোমার অ্যাটর্নিকে কি জানাবে—কী কারণে ঐ নির্বাচন? আই মীন 'ফুলশয্যা-কক্ষ'? অবিবাহিত পুরুষ-রমণীর?

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। তিন-পা পিছিয়ে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ে খাটে। অস্ফুটে বলে, উঃ! কী নিষ্ঠুর আপনি! হিউম্যান সেন্টিমেন্ট বলে আপনার অন্তরে কোনো কিছু কি নেই? এভাবে ব্লান্ট প্রশ্ন করতে আপনার সঙ্কোচ হচ্ছে না!

—না, হচ্ছে না। কারণ আমার উদ্দেশ্যর সূচীমুখে একটি মাত্র লক্ষ্য ঃ প্রবলেমটা সলভ্ করা।

—প্রবলেম! কী প্রবলেম?

—সমস্যা তো একটাই মাধবী, সে-রাত্রে অনীশকে কে খুন করেছিল।

—তার সঙ্গে এই ধূলাগড়ি রিস্‌টস্-এর 'ব্রাইডাল সুইট'-এর কী সম্পর্ক?

—অতি নিবিড় সম্পর্ক! যাক্ ও-কথা। তুমি যখন প্রশ্নটার জবাব দিতে সঙ্কোচবোধ করছ, তখন ও প্রশ্ন থাক। তুমি বরং একটা মামুলি প্রশ্নের জবাব দাও : তুমি নিশ্চয় ডক্টর বড়গোঁহাইকে বিবাহ করার মনস্থির করেছ?

এবার দেরি হলো জবাবটা দিতে। তারপর ধীরে ধীরে দুদিকে মাথা নেড়ে নিঃশব্দে জানালো : না।

—না? তুমি ওকে বিয়ে করতে রাজি নও? কেন? যেহেতু সে বিবাহিত?

চমকে উঠে মাধবী এবার বলে, কে?

—শান্তনু বড়গোঁহাই?

মাধবী ধমকে ওঠে, কী বকছেন স্যার, পাগলের মতো? শান্তনু বিবাহিত! তাকে আমি হাফপ্যান্ট পরে ড্যাং-গুলি খেলতে দেখেছি। গুয়াহাটিতে পাশাপাশি পাড়ায় থাকি— সে বিয়ে করলে আমি জানতে পারব না? ও বিবাহিত এমন উদ্ভুটে কথাটা কে বলেছে আপনাকে?

—তাহলে কিন্তু আমাকে সেই অশালীন প্রশ্নটায় আবার ফিরে আসতে হচ্ছে, মাধবী। অর্থাৎ—সেই 'ব্রাইডাল সুইট'-এর প্রসঙ্গে। তুমি যদি ওকে বিয়ে করতে রাজি না থাক তাহলে কেন গিয়ে তুলেছিলে ঐ 'মধুচন্দ্রিমা কক্ষে'? তুমি নিজেই বলেছ, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে?

আবার নতনয়না হলো মেয়েটি। আঙুলে আঁচলের খুঁটটা জড়াতে থাকে। বাসু-সাহেবের মনে হলো সাক্ষীর একটা জোরালো কৈফিয়ৎ আছে; কিন্তু কিছুতেই সেটা প্রকাশ করে বলতে পারছে না। এমন কাণ্ড মাঝে মাঝে আদালতে হতে দেখেছেন। তখন ঘুরপথে সত্যে উপনীত হতে হয়। আবার তাগাদা দেন, কী হলো? বল?

—আমি আপনাকে বলব না। বলতে পারি না। আমি...আমি যে 'ওয়ার্ড অব অনার' দিয়ে বসে আছি। এ জীবনে কখনো কাউকে সে-কথা বলব না। এখন যদি আত্মরক্ষা করতে আপনার কাছে স্বীকার করি, তাহলে আমি নিজের কাছে নিজেই ছোট হয়ে যাব।

বাসু বললেন, আই অ্যাপ্রিশিয়েট। এটা উইমেন্‌স্-লিব্-এর যুগ! পুরুষ একাই কেন 'নাইটহুড-শিভালরি' দেখাবে? অর্থাৎ ঐ প্রফেশনাল সমাজবিরোধীর দল, যারা গায়ের জোরে অথবা টাকার জোরে আমাদের সর্বস্ব বেআইনীভাবে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—আমাদের টাকা-পয়সা মা-বোনদের—ক্রমাগত 'বিলো-দ্য বেল্ট' আঘাত করে যাচ্ছে—আমরা তাদের বিরুদ্ধে সেভাবে প্রত্যাঘাত করতে পারব না। কেন? কারণ ওরা যে অ্যান্টিসোশ্যাল; আর আমরা সত্যশিবসুন্দরপন্থী। অলরাইট, মাধু! তোমাকে স্বমুখে কিছুই স্বীকার করতে হবে না। কী ঘটেছে তা আমিই বলব। যে-কথাটা স্বমুখে স্বীকার করতে তোমার বাধছে, তা আমিই বলে যাচ্ছি।

তুমি শুধু শুনে যাও। যদি ঠিক ঠিক আন্দাজ করতে পারি তাহলে তুমি 'হাঁ-না' কিছুই বলবে না। উঠে গিয়ে এক গ্লাস জল গড়িয়ে আমাকে এনে দেবে। ও. কে.?

মাধবী প্রশ্নটা বুঝল কী বুঝল না বোঝা গেল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। বাসু বললেন, তুমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছ, শান্তনুই এই হত্যাটা করেছে, কারণ, মার্ডার ওয়েপনটা পাওয়া গেছে মৃতব্যক্তির আলমারির পিছনে। সেটার লাইসেন্স ডক্টর বড়গোঁহাই-এর নামে। হত্যা উদ্দেশ্য যদি না থাকবে তাহলে সেটা গুয়াহাটি থেকে বেগবাগানে এসে পৌঁছাবে কী করে? এবং ঐ ঘরে? শতকরা নাইন্টি পার্সেন্ট চান্স 'ফেটাল' বুলেটটা ঐ রিভলভার থেকে নিক্ষিপ্ত। মোটিভও স্পষ্ট! ডাক্তার তোমাকে ভালবাসে—অনেকেই তা জানে। অনীশ তোমার সর্বনাশ করেছে। ফলে শান্তনু প্রতিশোধ নিতে এই কাজ করেছে। প্রশ্ন হতে পারে রিভলভারটা সে ওখানে ফেলে আসবে কেন? প্রসিকিউশান বলবে, দরজা খুলতে গিয়েই ও সার্জেন্টকে দেখতে পায়। তাই হাতে-নাতে ধরা-পড়ার চেয়ে ও সেটা আলমারির পিছনের ফাঁকে ফেলে পালায়...

মাধবী বাধা দিয়ে বলে, আপনি তাই বিশ্বাস করেন?

—না না, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা এখানে উঠছে না। আমি বলতে চাইছি, তুমি এই ঘটনাপরম্পরা, এই যুক্তির বিন্যাস করে সিদ্ধান্তে এসেছিলে খুনটা করেছে শান্তনু। তুমি অনীশের ঠিকানা না জানালেও শান্তনু তোমাকে অনুসরণ করে এসে ওর আস্তানাটা জেনেছে। তুমি আরও জানতে সুরঙ্গমার পাক্কা অ্যালেবাঈ আছে—

—আছে?

—আছে কি নেই, তুমি সঠিক জান না। হয়তো জান, নেই। কিন্তু সুরঙ্গমার সঙ্গে যেহেতু শান্তনুর আলাপ-পরিচয় নেই, তাই ওর অ্যালেবাঈ না টিকলেও প্রমাণ করা যাবে না যে, সুরঙ্গমা ঐ বিশেষ রিভলভারে অনীশকে খুন করেছে!... তুমি নিজে করনি, তা তুমি জান। আমি করিনি, যেহেতু শান্তনুর রিভলভার আমার হস্তগত হতে পারে না। মহাদেব জালান করতে পারে না—একই কারণে, তাছাড়া ঘটনামুহূর্তে সে ট্যাক্সি নিয়ে নিউ আলিপুর থেকে হোটেল ডিউকে যাচ্ছে অথবা হোটেল থেকে আমার বাড়ি আসছে। উপরন্তু অনীশের বাড়ির অবস্থান জানার কোনো সুযোগ সে পায়নি। ফলে 'নেতি নেতি' করতে করতে—তোমার মতে অবশিষ্ট থাকল সেই দুর্ভাগা, যাকে তোমার ভাষায়, যার সঙ্গে তোমার বেণী দুলিয়ে স্কিপিং-করা যুগ থেকে একটা 'কাফ-ল্যভ' গড়ে উঠেছিল।

পাইপটা ধরিয়ে নিতে উনি থামলেন। মাধবী প্রস্তরমূর্তির মতো চুপ করে বসে রইল খাটে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাসু শুরু করেন, লেডি-ইন-ডিস্ট্রেস্ যখন মুক্তির কোনো পথই দেখতে পাচ্ছেন না, তখন ম্যান্ডেলিন বাজাতে বাজাতে এসে হাজির হলেন কাহিনীর খলনায়ক! তোমাকে বললেন, শান্তনুর ফাঁসি হবেই! তবে তিনি তাঁর আকাশচুম্বী প্রভাব খাটিয়ে—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক—ফাঁসির দড়ির বদলে যাবজ্জীবনের ব্যবস্থাপনা করে দিতে পারেন, যদি—

—যদি? জানতে চায় মাধবী।

—তুমি তো সেটা জানই, মাধবী। উনি তোমাকে শর্তসাপেক্ষে শহরের সেরা লিগ্যাল অ্যাডভাইসের এন্তাজাম করে দিতে রাজি হলেন, যদি তুমি ঐ ভল্লুকাকৃতি প্রৌঢ়টিকে বরমাল্য দিতে স্বীকৃত থাক। তুমি শান্তনুকে ভালবাস। তীব্রভাবে ভালবাস। তুমি শ্যামার উত্তীয়কে চেন: তুমি টেইল অব টু সিটিজ-এর সিডনি কার্টনকে চেন! প্রেমের জন্য প্রাণ দেওয়া তোমার কাছে

নতুন কথা কিছু নয়। তুমি রাজি হয়ে গেলে। মেনে নিলে ঐ চক্রান্তকারী ভালুকটার দাবী! বন্যার ভাষায় "সেথা মোর তিলে তিলে দান, করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করি পান।"

বাসু থামলেন। মাধবী দু হাতে মুখ ঢাকল। শব্দ হচ্ছে না কিছু, কিন্তু ওর পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে। নিষ্ঠুরকণ্ঠে বাসু বললেন, তুমি কি জান, মাধু? ফাঁসির আসামীকে ফ্যাঁসিমঞ্চে নিয়ে যাবার আগে তার ইচ্ছামতো লোভনীয় কিছু খাবার খাওয়ানো হয়? আহা! লোকটা তো মরেই যাচ্ছে—একমুঠো ভালোমন্দ কিছু খেয়ে যাক! সেই কারণেই কি তুমি এখানে এসে 'ব্রাইডল সুইট' টা বুক করেছিলে, মাধবী? নবমীর বলির পাঁঠাকে একমুঠো দূর্বাঘাস খাইয়ে তৃপ্ত করতে...

—শাট আপ!—মাধবী সোজা হয়ে বসেছে। তার টিপটা ধেবড়ে গেছে। চোখ দুটো ফুলো ফুলো। মাথার চুল অবিন্যস্ত।

বাসু থমকে থেমে গেলেন। মাধবী বললে, আপনার একটুও দয়া-মায়া নেই? আমার বিড়ম্বিত দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের আগে, মাত্র একটা সপ্তাহ আমি ওর জন্যে চুরি করে নিয়ে অঞ্জলি ভরে ওকে দিতে এসেছিলাম, আর আপনিসেটাকে এভাবে দুপায়ে মাড়াচ্ছেন!

—আয়াম সরি মাধবী! এভাবে দুপায়ে না মাড়ালে সত্য কথাটা স্বীকার করতে না! যাক, আমার যেটুকু জানার ছিল তা জানা হয়ে গেছে। আন্দাজ ঠিকই করেছিলাম—হঠাৎ কেন মহাদেব জালান আমাকে এনগেজ করল ডক্টর বড়গোঁহাইয়ের তরফে। কিন্তু সেটা কনফার্ম করে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। ঠিক আছে মাধবী, তুমি মুখে-চোখে জল দিয়ে তৈরি হয়ে নাও। আমরা এবার ডিনারে যাব। ঐ ওয়াড্রবের ভিতর স্যুটকেসটা আছে। ইচ্ছা করলে পোশাকটা বদলেও নিতে পার।

মাধবী বাথরুমে চলে গেল মুখে-চোখে জল দিতে।

বাসু এবার টেলিফোন করলেন নিজের বাড়িতে। একবার বাজতেই ও-প্রান্তে থেকে ভেসে এল, ব্যারিস্টার বাসু'জ চেম্বার।

কণ্ঠস্বর শুনেই চিনেছেন। বললেন, শোন রানু। আমি অনেক দূর থেকে কথা বলছি। হয়তো রাতে ফিরতে পারব না। কোনো খবর আছে?

হেড-পিসে ভেসে এল রানীর কণ্ঠস্বর, আয়াম সরি, স্যার। মিস্টার পি. কে. বাসু এখন কলাকাতায় নেই। কাল-পরশুর মধ্যে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারছি না...

বাসু বললেন, বুঝেছি! তোমার নাকের ডগায় বসে আছেন বোধকরি তেন্যরা, যাঁদের স্পর্শ করলে অষ্টাদশ বিস্ফোটক হয়? তাই কি?

—একজ্যাক্টলি!

—অলরাইট! মনে হচ্ছে তুমি আউটার রিসেপ্শানে বসে ফোনটা অ্যাটেন্ড করছ...তাই নয়?

—ইয়েস।

—সে-ক্ষেত্রে তুমি কি আমার প্রাইভেট চেম্বারে চলে আসতে পার? এক্সটেনশান টেলিফোনের প্লাগটা খুলে দিয়ে?

রানী বললেন, হ্যাঁ, নেক্সট উইক হলে হতে পারে। আপনি লাইনটা ধরে থাকুন। মিস্টার বাসুর অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্যাডটা ওঁর চেম্বারে আছে। আমি সেখানে গিয়ে, সেটা দেখে, আপনাকে পরের সপ্তাহে একটা সুবিধামতো তারিখ দিতে পারি। প্লিজ হোল্ড অন।

রিসেপ্শান কাউন্টারে বসে থাকা দুই পুলিশ অফিসার আর মহাদেব জালানের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলেন। বললেন, প্লীজ এক্সকিউজ মি!

তারপর হুইল চেয়ারে পাক মেরে উনি চলে গেলেন চেম্বারে। ঠিক তখনই বিশু একটা বড় ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঢুকল। আগন্তুকদের চা-বিস্কিটে আপ্যায়ন করতে।

মিসেস বাসু এঘরে এসে এক্সটেনশান লাইনের প্লাগ-পয়েন্টটা খুলে দিলেন। বললেন, এবার বল? এখন আমি তোমার প্রাইভেট চেম্বার থেকে বলছি।

—রিসেপশানে কেউ রিসিভার তুললে আমাদের কথাশুনতে পাবে না তো, সেবারের মতো?

—না।তুমি কোথা থেকে বলছ?

—কলকাতার বাইরে, সাঁকরাইলের কাছাকাছি একটা হোটেল থেকে। এখানকার টেলিফোন নম্বরটা লিখে নাও। ফর এমারজেন্সি ফোন : শোন, আজ রাতে আর ফিরতে পারছি না। কাল সকালে ফিরব। ওঘরে কে কে আছে?

—দুজন পুলিশ অফিসার। মনে হচ্ছে লালবাজার হোমিসাইড স্কোয়াডের ইন্সপেক্টার। ওরা সারাদিনে বার-তিনেক এসেছিল তোমার খোঁজে। আমাকে জানিয়ে রেখেছে, লালবাজার হোমিসাইডের বড়কর্তা তোমাকে খুঁজছেন। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। এ খবরটা তুমি সশরীরে আসামাত্র অথবা টেলিফোনে যোগাযোগ করামাত্র যেন তোমাকে জানিয়ে দিই।

—তা দিও। আমি শরীরে ফিরেও আসিনি, টেলিফোনও করিনি। এ টেলিফোনটা তো একজন নেক্সট-উইক-ক্লায়েন্টের।

—হ্যাঁ, পুলিশ ইন্সপেক্টর দুজন মনে হলো তা বিশ্বাস করেছে; কিন্তু জালান করেনি।

—জালান? সেই জালান! এখনো জ্বালাচ্ছে?

—প্রায় সরাদিনই বসে আছে। মাঝে মাঝে অর্পণার স্টেশনারি দোকানে উঠে যায় ফস্টি-নস্টি করতে, মাঝে মাঝে মোড়ের মাথার রেস্তোরাঁয় যায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে; কিন্তু বাড়ির উপর সারাদিনই নজর রাখেছে।

—আই সী? কৌশিক আর সুজাতা কোথায়?

—ওরা বেরিয়েছে। রাতে ফিরবে বলে গেছে। কোথায় গেছে বলে যায়নি।

—অলরাইট। একটা ইন্সট্রাকশন দিচ্ছি। ভাল হয়, তুমি যদি শর্টহ্যান্ডে নোট নিয়ে নাও। কাগজ পেন্সিল নিয়েছ?...অলরাইট। নম্বর ওয়ান : রামলগন ভার্গব, আর্কিটেক্টকে ফোনে ধর। ওর নম্বরটা মনে নেই, কোথাও লেখাও নেই। কিন্তু টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে পাবে। ঠিকানা : 'সল্টলেক সেক্টার টু' । তাকে ধরতে পারলে তোমার পরিচয় দিয়ে আমার নাম করে জানতে চেয়ো ওর মাসতুতো বোন সুরঙ্গমার পাণ্ডের টেলিফোন নম্বরটা কত। সে এখন সম্ভবত জামশেদপুরে আছে। ভার্গব যদি তোমার আইডেন্টিটিতে সন্দেহ প্রকাশ করে তাহলে বল, "আপনার যে বোনের সঙ্গে 'অলোকাছন্দার পুত্রকন্যা' থিয়েটার দেখেছিলেন—অলোকানন্দার'নয়। মনে পড়েছে?" এ-কথাতেই সে মেনে নেবে যে, তুমি মিসেস বাসু।

মিসেস বাসু বলেন, অলরাইট। ধর, আমি ভার্গবের কাছ থেকে সুরঙ্গমার টেলিফোন নম্বরটা পেলাম। তারপর?

—নম্বর টু : তুমি সুরঙ্গমাকে আজ রাত্রে জামশেদপুরে এস.টি.ডি. ফোন করবে। জানতে চাইবে—দিস্ ইজ্ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট : 'ঘটনার রাত্রে অর্থাৎ শুক্রবার রাত নটা নাগাদ মাধবী বড়ুয়া সুরঙ্গমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসার পর এবং রাত সাড়ে নটা নাগাদ আমার সঙ্গে মেজানাইন ঘর ছেড়ে চলে আসার মধ্যে মাধবীকে কি কেউ টেলিফোন করেছিল? যদি করে

থাকে তাহলে সে কি তার আইডেন্টিটি জানিয়েছিল?' প্রশ্নটা বুঝেছ?...অলরাইট প্রশ্নটা পড়ে শোনাও তো?

মিসেস বাসু প্রশ্নটা পড়ে শোনালেন। বাসু বললেন, কারেক্ট! এবার শোন : জবাবে ও যা বলবে তা শর্টহ্যান্ডে নোট করে ট্র্যান্সক্রাইব করে আমার জন্য রেখে দিও। আরও একটা কথা, সুরঙ্গমা তোমাকে চেনে না। সে জবাব দিতে অস্বীকারও করতে পারে। তখন তার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বল, আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার শেষ কথোপকথন হয়েছিল এই রকম উনি বলেছিলেন—'তুমি কি একটা ছোট হাতব্যাগে তোমার কোনো দামী জিনিস—জিনিসটার নাম উচ্চারণ না করে—আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে চাও?'' আর আপনি জবাবে বলেছিলেন, ''বাবার সেই জিনিসটা আমি জামশেদপুর থেকে আনিনি, মিস্টার বাসু।''—এই কথায় সে মেনে নেবে যে তুমি মিসেস পি. কে. বাসু। এনি কোশ্চেন?

—হাঁ। ডিনারের আগে মনে করে আধখানা সরবিট্রেট খেও। তোমার ওয়ালেটের বাঁ-দিকের খোপে আছে!

বাসু বললেন, যা বাব্বা! কী কথার কী জবাব! এনিথিং এল্‌স্?

—হ্যাঁ! দু পেগের বেশি মদ খেও না, রাতে! ওখানে ভাল হুইস্কি পাবে না। দেশী মদ!

লাইনটা কেটে দিলেন রানু।

তের

টেলিফোনটা ক্র্যাড্‌লে নামিয়ে রাখতেই মাধবী বললে, আপনি এত ঘুরপথে তথ্যটা যাচাই করছেন কেন, মেসোমশাই? আমাকেই তো সরাসরি জিগ্যেস করতে পারতেন সে রাত্রে আমি কোনো টেলিফোন পেয়েছিলাম কি না।

—তা পারতাম। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, কোনো অ্যান্টিসোশ্যালকে এ বিষয়েও হয়তো তোমার 'ওয়ার্ড অব অনার' দেওয়া আছে।—সেই মহানুভব ব্যাক্তিটি, যিনি অর্থমূল্যে তোমার প্রেমাস্পদের যাবজ্জীবনের এন্তাজাম করে নিজেই তোমার হাত থেকে বরমাল্য গ্রহণে আগ্রহী।

মাধবী বললে, না! তা নয়। আপনিযে সময়ের কথা বলছেন সেই সময়ের মধ্যে সুরঙ্গমার মেজানাইন ফ্লোরে আমার একটা টেলিফোন সত্যিই এসেছিল। কিন্তু তখন আমি বাথরুমে। স্নান করছি। সুরঙ্গমা রিসিভারটা তুলে নিয়ে 'হ্যালো' বলে। ও-প্রান্তবাসী জানতে চায়, গুয়াহাটির মিস্ মাধবী বড়ুয়া আছেন কি না। সুরঙ্গমা সে-কথার জবাব না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করেছিল, 'আপনি কে বলছেন?' লোকটা বিরক্ত হয়ে বলে, 'কী মুশকিল! উনি কি এই অ্যাড্রেসে এখন আছেন?' সুরঙ্গমা বলেছিল, 'হ্যাঁ আছেন। স্নান করছেন। আপনার নম্বরটা বলুন—ও বেরিয়ে এসে আপনাকে রিঙব্যাক করবে।' তখন সেই লোকটা বলে, 'আমি নিজেই আধঘন্টা পরে ফোন করব।'

বাসু বললেন, এত কথা তুমি জানলে কী করে?

—আপনি টেলিগ্রাফ পিয়নের ছদ্মবেশে কলবেল বাজানোর মাত্র দু-তিন মিনিট আগের ঘটনা এটা। টেলিফোন লাইন কেটে দিয়ে সুরঙ্গমা বাথরুমের বাইরে থেকেই আমাকে তা জানিয়েছিল। আমি জানতে চেয়েছিলাম, লোকটা কি ডক্টর শান্তনু বড়গোঁহাই? ও বললে, নাম জানায়নি। আধঘন্টা পরে ফোন করবে বলেছে।

—তারপর?

—তারপর আবার কী? তারপর তো আপনার ঝটিকার বেগে নাটকীয় আর্বিভাব। আমাদের সবকিছু ভেস্তে গেল। আমাদের আপনি ডানে-বাঁয়ে তাকালে দিলেন? ঝড়ের বেগে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন।

—তার মানে লোকটা দ্বিতীয়বার ফোন করেছিল কি না তা তুমি জান না? লোকটা কে—তাও না?

—কী করে জানব? ততক্ষণে হয়তো আপনার সাকরেদ আমাকে রবীন্দ্রনাথের মিস্‌কোট শোনাচ্ছেন।

—রবীন্দ্রানাথের মিসকোট মানে?

—'হে মাধবীদেবী, দ্বিধা কেন?'

—আই সী!

বাসু আবার উঠে এসে টেলিফোনের ক্র্যাডলটা তুলে কতকগুলি নম্বর ডায়াল করলেন। ও-প্রান্তে সাড়া জাগতেই জানতে চাইলেন, ক্যালকাটা কনফিডেনশিয়াল ডিটেকটিভ সার্ভিস?

একটি মহিলা কণ্ঠে ইংরেজিতে জবাব হলো, বলছি। কাকে চাইছেন?

—মিস্টার মহম্মদ ইস্‌মাইল। আছেন?

—আছেন। কে কথা বলতে চাইছেন বলব?

—নাম নয়, আমার পার্মানেন্ট মেম্বারশিপ নম্বরটা বলুন ঃ পি. এক্স. এল. 721.

একটু পরেই ইস্‌মাইল-সাহেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আদাব ব্যারিস্টার-সা'ব। হুকুম ফরমাইয়ে।

বাসু বললেন, আবার নতুন কী হুকুম ফরমাইস করব? আমার পুরনো কেসের কতদূর কী হয়েছে বলুন। রিপোর্ট?

—সে তো কম্‌প্লিট। দুদুটি হাফ-পোস্টকার্ড ফটো তিন-তিন কপি প্রিন্ট করেছি। একটা ফ্রন্ট-ভিয়ু, একটা সাইড-ভিয়ু। টেলি-ফটো লেন্সে। পার্টি বিলকুল আন্‌জাদ করেনি। ওর ডিটেইলড ব্যাক-গ্রাউন্ড ভি টাইপ করে রেখেছি। ওর প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসও জানা গেছে। ওখানে মেয়েটা নজরবন্দি হয়ে আছে। বিলকুল নয়া চিড়িয়া। ইনএক্সপিরিয়েন্সড! টের পায়নি ও নজরবন্দি হয়ে গেছে।

—ভেরি গুড! মেয়েটি বিবাহিতা?

—কী মজাক উড়াচ্ছেন ব্যারিস্টার সা'ব। কল-গার্ল কী বারে মে বহ্ সওয়াল তো ইর্‌রেলিভান্ট ঔর অ্যাবসার্ড হ্যয়, মি লর্ড!

—কল গার্ল?

—জী সা'ব!

ইস্‌মাইল জানালো মেয়েটির পিতৃদত্ত নামটা জানা যায়নি। তবে রেডলাইট এরিয়ায় ওর নাম 'মমতাজ'। যখন সে মুসলমানী সাজে। হিন্দু চরিত্র অভিনয় করতে হলে শেষের বর্গীয় 'জ'-টাকে জবাই করে। আপাতত সে ডক্টর বড়্‌গোঁহাই-এর স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করছে। তাই সুকৌশলীকে জানিয়েছে তার নাম মমতা বড়্‌গোঁহাই। চৌরঙ্গীর বিখ্যাত শাহজাহাঁ হোটেলের সঙ্গে অ্যাটাচড। কখনো ক্যাবারে গার্ল, কখনো কল-গার্ল। মাঝে মাঝে কাজের অ্যাসাইমেন্ট পেলে—সচরাচর ডিভোর্স মামলায় কাউকে ফাঁসাবার প্রয়োজনে অভিনয়ও করে। দিন চার-পাঁচ ও সেঁটে আছে গুয়াহাটির এক কাপ্তেনের সঙ্গে, তার নামটা এখনো জানা যায়নি। শনিবার রাত্রেও সে ছিল লিন্ডসে স্ট্রিটের ডিউক হোটেলে—রুম নম্বর 205 রবিবার সকালে

সে চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছে। এখন আছে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছাকাছি একটা হোটেলে—মমতা বড়গোঁহাই পরিচয়ে।

বাসু বললেন, ভেরি গুড। আয়াম পার্ফেক্টলি স্যাটিসফায়েড। শুনুন মিঃ ইস্‌মাইল। নম্বর ওয়ান ঃ ফটো ছয়খানা একটা খামে ভরে সীল করে আমার বাড়িতে, আমার মিসেস-এর হাতে ডেলিভারি দেবার ব্যবস্থা করুন। আজ রাত দশটার মধ্যে। ঐ খামটার ভিতরেই থাকবে টাইপ-করা কাগজটা—আই মীন, এ পর্যন্ত সংগৃহীত ঐ কলগার্লের বায়োডাটা। খামটা যেন মিসেস বাসু ভিন্ন আর কারও হাতে ডেলিভারি না দেয় আপনার মেসেঞ্জার পিয়ন। দ্বিতীয় কথা ঃ বালিগঞ্জ ফাঁড়ির ঐ হোটেলে মেয়েটিকে নজরবন্দি করে রাখুন। প্রয়োজনে তিন-শিফটে। সে যেন পালিয়ে যেতে না পারে। তৃতীয়ত, আপনি যদি কোনো অ্যাডভান্স পার্ট-পেমেন্ট চান তাহলে আমার বাড়িতে বিল পাঠিয়ে দেবেন।

ইস্‌মাইল বললেন, আপনার এক নম্বর আর দু নম্বর নির্দেশ মোতাবেক কাজ হাসিল হবে। তিন নম্বরটা মুলতুবি থাকবে, স্যার, কাজ যতক্ষণ না তামাম শুধ্ হচ্ছে।

শুভরাত্রি জানিয়ে লাইন কেটে দিলেন বাসু।

এবং তখনই আবার টেলিফোন তুলে লিন্ডসে স্ট্রিটের ডিউক হোটেলের রিসেপ্‌শানকে চাইলেন। ও-প্রান্তে সাড়া জাগতেই উনি 207 নম্বর ঘরের বোর্ডার মহাদেব জালানকে চাইলেন—জেনে বুঝে যে, ঘরে কেউ নেই। রিসেপ্‌শানও সে কথাই জানাল। বাসু তারপর বললেন, মিস্টার জালানের সেক্রেটারি—কী যেন নাম মেয়েটির—ঐ 205 নম্বর ঘরটা বুক করেছেন। তিনি কি আছেন?

রিসেপ্‌শান একটু সময় নিয়ে বলল, না, সরি। 205 নম্বর ঘরটা এখন ভেকেন্ট। ঐ মহিলা আজ সকালে চেক-আউট করে চলে গেছেন।

বাসু বললেন, লুক হিয়ার স্যার, আমি ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু কথা বলছি; মিস্টার মহাদেব জালান আমার ক্লায়েন্ট। ঐ সেক্রেটারি-মহিলা, যিনি আজ সকালে 205 নম্বর ঘর থেকে চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন ওঁর নামটা মনে পড়েছ না। কাইন্ডলি জানাবেন, রেজিস্টার দেখে?

—স্যিওর, মিস্টার বাসু। একটু লাইনটা ধরে থাকুন।

একটু পরে রিসেপ্‌শান ক্লার্ক জানাল, যিনি 205 নম্বর ঘর ছেড়ে আজ চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন তাঁর নাম, জুলি মেহতা।

বাসু বললেন, ক্যারেক্ট! জুলি, জুলি, এতক্ষণে মনে পড়েছে। থ্যাঙ্কস্।

—য়ু আর ওয়েলকাম।

বাসু ঘড়ি দেখে মাধবীকে বললেন, রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। চল, ডিনার খেয়ে আসা যাক। আগে থেকে অর্ডার দেওয়া নেই। যা পাওয়া যাবে, তাই খেতে হবে। উপায় কী?

মাধবী বললে, ঠিক আছে, মেসোমশাই, আপনি খেয়ে আসুন। আমার একদম খিদে নেই।

বাসু এগিয়ে এসে ওর খোঁপায় হাত রাখলেন। বললেন, আই নো, আই নো! আরে, আমিও তো মানুষ! আমি কি বুঝি না? কী ভেবেছিলে, আর কী হয়ে গেল। কিন্তু উপায় কী, বল? তবু জীবনধারণ তো করতে হবে। টাকার জোরে যারা আমাদের মাথায় পয়জার মারতে চায় তাদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়ে দেখতে হবে তো? খালি পেটে লড়াই চলে না। চল আমার সঙ্গে কিছু খেতে যদি সত্যিই না ইচ্ছে করে একটু সুপ-টুপ খেয়ে নিবি। আমার কিন্তু বেশ খিদে পেয়েছে, মাধু। তুই খেতে না চাইলে...

মাধবী তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। শাড়িটা পালটাতে উৎসাহ বোধ করে না। মুখ-চোখে জল দিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে বিনা প্রসাধনেই এগিয়ে এসে বলে, চলুন।

অল্পই আহার করলেন দুজনে। বাসু আজ ড্রিংক্স আদৌ নিলেন না। তাঁরও উৎসাহের অভাব। তবে আহারের পূর্বে সরবিট্রেট সেবনে ভুল হলো না।

আহারান্ত দুজনে ফিরে এলেন সেই ঘরে—মাধবীর ঘরে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, কাল ভোর সাড়ে ছয়টায় বেড-টি দিতে বলেছি। তারপর ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা রওনা হব। ও. কে.? গুডনাইট।

মাধবী বললে, সে কী? আপনি কোথায় শোবেন?

—পাশের ঘরটায়।

—কেন? আমার কিছু অসুবিধা হবে না। আপনি আমার বাবার বয়সী।

বাসু বললেন, না মাধবী। সম্ভবত আমি তোমার 'গ্র্যান্ড-পা'-র বয়সী। বয়সের ফারাক ব্যাপারটা কিছু নয়। আমাকে এ ব্যবস্থা করতে হচ্ছে অন্য কারণে। আমার গুরু বলতেন, নিজের কাছে সৎ হলেই শুধু চলবে না, অসৎ লোকেরা যাতে তোমার আচরণে তোমাকে অসৎরূপে চিহ্নিত করার সুযোগ না পায়, তাও তোমার দেখা উচিত।

মাধবী বলে, আপনি মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন? এ-টা জানতাম না তো? কে আপনার গুরু?

—মন্ত্র নিয়েছি। তবে তুই যে অর্থে 'গুরু' বুঝেছিস্, আমি সে অর্থে বলিনি। আমার গুরু ঃ ব্যারিস্টার এ. কে. রে. যাঁর কাছে এককালে এই ওকালতি বিদ্যায় শিক্ষানবিসি করেছি।

মাধবী বললে, একটু দাঁড়ান মেসোমশাই...

—আবার কী?

—আপনার ও-কথার জবাবে 'গুডনাইট' বললে আমার মন মানবে না। আপনাকে একটা প্রণাম করব।

বাসু হেসে ওঠেন, বেশ তো! নাতনি দাদুকে পেন্নাম করবে তাতে আপত্তি করব কেন? কর না পেন্নাম।

মাধবী প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজ থেকে কিন্তু আমি আপনাকে 'দাদু' ডাকব। আর 'মেসোমশাই' নয়।

—তাই ডাকিস্।

পরদিন প্রাতরাশ-টেবিলে বাসু বললেন, আমরা একটু পরেই কলকাতায় ফিরব। নিশ্চয় বুঝতে পারছ, পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। আমি ভান করছি যেন তথ্যটা আমার জানা নেই। মানে, জেনে-শুনে তোমাকে লুকিয়ে রাখা আমার পক্ষেও আইনত অপরাধ : 'অ্যাসেসারি আফটার দ্য ফ্যাক্ট।'

মাধবী বাধা দিয়ে বললে, তাহলে এ বিপদের ঝুঁকি আপনি নিচ্ছেন কেন?

—ওটা আমার স্বভাব, মাধু! আমি ঐভাবেই খেলাটা খেলি। যাক, যে কথা বলছিলাম। যদি কোনক্রমে পুলিশ তোমাকে চিনতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ অ্যারেস্ট করবে। সে-ক্ষেত্রে—আগেই বলেছি—আবারও বলছি, পুলিশের কোনো প্রশ্নের জবাব দেবে না। প্রতিটি প্রশ্নের একই জবাব হবে : 'আমার সলিসিটার পি. কে. বাসুকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি জবাব দেবেন।' ওরা লোভ দেখাবে, ভয় দেখাবে, কিন্তু তুমি ঐ একটা পয়েন্টে স্টিক্ করে থাকবে। পারবে না?

—পারব। এ আর শক্ত কী?

—এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ, মাধু! কতবার আমার কত মক্কেল যে কথা দিয়েও সে-কথা রাখতে পারেনি তার ইয়ত্তা নেই।

—আমার ক্ষেত্রে তা হবে না। দেখে নেবেন।

—ভেরি গুড। তাহলে, এবার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও। এসব তথ্য হয়তো পরে জেনে নেবার সুযোগ আমি পাব না। তাছাড়া প্রাথমিক তথ্যগুলো জানা না থাকলে সমাধানে পৌঁছানোটা কঠিনতর হয়ে পড়ে।

—আপনি প্রশ্ন করুন।

এক নম্বর প্রশ্ন : ঘটনার রাত্রে রোহিণী-ভিলার সামনে আমি তোমার পায়ে শাদা সোয়েডের জুতো দেখেছিলাম। আমার ভুল হতেই পারে না। অথচ তোমাকে নিয়ে যখন সুরঙ্গমার বাড়ি থেকে বের হয়ে এলাম তখন তুমি বলেছিলে যে, তোমার কোনো শাদা সোয়েডের জুতো নেই। কেন মিথ্যে কথা বলেছিলে, মাধবী?

মাধবী হাসল। বলল, আপনিও ভুল দেখেননি, আমিও মিথ্য কথা বলিনি। আমার একজোড়া কালোরঙের জুতো আর একজোড়া স্লিপার আমি গুয়াহাটি থেকে নিয়ে এসেছিলাম। জুতোর স্ট্র্যাপটা বেমক্কা ছিঁড়ে গেল। মেরামতি করা হয়ে ওঠেনি। সুরো আমাকে তার একজোড়া সোয়েডের জুতো পরতে দেয়। আমাদের দুজনের পায়ের একই মাপ। ঐ শাদা সোয়েডের জুতোজোড়া সুরঙ্গমার।

—কিন্তু আমাকে মহাদেব জালান যে বলেছিল তুমি তার উপস্থিতিতে একদিন গুয়াহাটি বাজারে ঐ শাদা সোয়েডের জুতোজোড়া কিনেছিলে।

—হ্যাঁ, সেও ও বিষয়ে মিছে কথা বলেনি। সে-জুতোজোড়া গুয়াহাটিতেই আছে। সৌখিন জুতো। সবসময় ব্যবহার করি না। তাই সে-জোড়া আনিনি।

—অলরাইট! অলরাইট। অথঃ উপানহানুপপত্তির সমাধান হলো।

—তার মানে?

—শাদা বাঙলায় 'শ্যু প্রবলেম সল্‌ভড।' দ্বিতীয় প্রশ্ন : তুমি টেলিগ্রাম করে আমাকে জানিয়েছিলে, সুরঙ্গমার অ্যালেবাঈটা যাচাই করে দেখতে। কেন? তুমি কি মনে কর যে, অপরাধটা সেই করেছে?

—না, দাদু। না! অ্যান এম্‌ফ্যাটিক নো! শুনুন বলি :

মাধবী ওঁকে বুঝিয়ে বলল, রোহিণী-ভিলা থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ইন্টালিতে ফিরে এসে সে যখন কলবেল বাজালো তখন সুরঙ্গমা ছিল বাথরুমে। ফলে ও ঘরে ঢুকতে পারেনি। কিন্তু ওর জামায়, জুতোয় রক্তের দাগ। সিঁড়ির মধ্যে সে ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল সুরো ওকে দরজায় লাগানো গা-তালার একটা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে রেখেছে। তাই দিয়ে দরজা খুলে ও মেজানাইন ঘরে ঢোকে। একটু পরেই বাথরুম থেকে সুরো বেরিয়ে এসে বলে, 'এ কী! তোমার জামা-জুতোয় রক্ত লাগল কী করে?' মাধবী বলেছিল, 'পরে বলব! আগে এগুলো ধুয়ে আসি।' সুরঙ্গমা ওকে বাধা দেয়। বলে, 'না, বল! কী হয়েছে?' তখন মাধবী ওর কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয় বাস্তবে কী ঘটেছিল—

এইখানে বাধা দিয়ে বাসু বললেন, জাস্ট এ মিনিট। সে-ক্ষেত্রে আরও আগে থেকে ঘটনার বিবৃতি দিতে হবে, মাধু। আমি এখনো জানি না, তোমার জামা-কাপড়ে রক্ত কী-ভাবে লাগল, তুমি অনীশের ঘরের ভিতরে আদৌ ঢুকেছিলে কি না তা আমি জানি না। গিয়েছিলে! তাই নয়!

মাধবী নত নয়নে, অস্ফুটে কিন্তু পরিষ্কারভাবে স্বীকার করল, হ্যাঁ।

—তুমি ওকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিলে?

—হ্যাঁ!

—তুমি নিজেই ওকে গুলিটা করনি?

মাধবী চমকে মুখ তুলে তাকায় এবার। বলে, নিশ্চয় না!

—তুমি কি ওর বাথরুমে ব্যারিকেড রচনা করেছিলে? 'ফিল্ম কন্ট্রাক্ট' নিয়ে কিছু চিৎকার করে বলেছিলে?

—না! সেটা আমি নই। সুরো! আমাকে রোহিণী-ভিলায় যেতে বারণ করে সুরো নিজেই সেখানে যায়। ও ভীষণ দুঃসাহসী। ভাল ক্যারাটে জানে। অনীশের সঙ্গে ওর বচসা হয়। তর্কাতর্কি চরমে উঠলে অনীশ হঠাৎ ওকে আক্রমণ করে বসে। ওর ব্লাউজ ধরে টান মারে। তখন সুরো ওকে একটা ক্যারাটে-পাঁচে ভূতলশায়ী করে বাথরুমে ঢুকে যায়। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরো একটা ফায়ারিঙের শব্দ শোনে। পরমুহূর্তেই সব শুনশান হয়ে যায়। দশ থেকে পনের সেকেন্ড পরে ও বাথরুমের ছিটকিনিটা সরিয়ে উঁকি মারে। দেখে অনীশ রক্তের মধ্যে পড়ে আছে আর যে লোকটা গুলি করেছে সে সদর দরজা দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে—

—তাকে সুরঙ্গমা দেখেছে?

—পিছন থেকে। পুরুষমানুষ। কালচে অথবা ব্রাউন কিংবা গ্রে রঙের প্যান্ট ছিল তার পরনে। পুরো এক সেকেন্ডও সে ওকে দেখেনি। পিছন থেকেও। যাই হোক, তারপর সুরো দেখতে যায় অনীশ বেঁচে আছে কিনা। ওর মনে হয় অনীশ আগরওয়াল মৃত। পরমুহূর্তেই ও সদর দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে আসে।

—লক করে দিয়ে? আই মীন, লক-নবটা তখন জমির সমান্তরালভাবে ছিল, না লম্বভাবে?

—তা আমি জানি না। জিজ্ঞেস করিনি। সম্ভবত সুরো নিজেও তা জানে না। তখন কি এসব কথা কারও খেয়াল হয়?

—খেয়াল না হলেও তোমার বোঝা উচিত যে, সে দরজাটা লক করে যায়নি!

—কেন? কি করে আন্দাজ করছেন?

—যেহেতু তোমার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী, তুমি তারপর ঐ ঘরে ঢুকেছ। অনীশকে মৃত অবস্থায় দেখেছ। সুরো তার আগেই চলে গেছে। সুরঙ্গমা দরজাটা লক করে গেলে তুমি ও-ঘরে ঢুকতে পারতে না। তুমি নিজেও লক করে যাওনি। কারণ সে-ক্ষেত্রে আমিও ও-ঘরে ঢুকতে পারতাম না।

—তা ঠিক।

—এবার বল, তুমি কেমন করে রোহিণী-ভিলায় গেলে? ট্যাক্সিতে?

—না! সুরো প্রায় সাতটা নাগাদ বেরিয়ে যায়। তারপর আমি শান্তনুকে তার হোটেলে ফোন করি। ও গাড়ি নিয়ে চলে আসে। আমরা দুজনে বার হই। আমি ওকে বলি, পার্কসার্কাস চল প্রথমে। আমি জানতাম শান্তনুর গাড়ির ড্যাশবোর্ডে তার লোডেড রিভলভারটা আছে। আমি জিজ্ঞেসও করেছিলাম, 'ওটা কেন নিয়ে এসেছ?' ও বলেছিল, 'লোকটা ডেঞ্জারাস। আত্মরক্ষার অস্ত্রটা সঙ্গে থাকা ভাল।' আরও বলেছিল, সুযোগ পেলে ও অনীশ আগরওয়ালকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবে।

—আই সী! তারপর?

—আমি অনীশ আগরওয়ালের ঠিকানাটা ওকে জানাইনি। জানাতাম, কিন্তু ও যখন উত্তেজিত হয়ে ফস্ করে বলে বসল, 'লোকটাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারা উচিত।' তখন আমি অনীশের ঠিকানাটা ওকে জানাইনি। বিশেষত যখন দেখলাম ওর গাড়ির ড্যাশবোর্ডে একটা রিভলভার আছে।

—তাহলে তুমি কী করলে?

—বাংলাদেশ মিশনের কাছে ওকে গাড়িটা পার্ক করতে বললাম। ও গাড়িটা রুখল। আমি ওকে চলে যেতে বললাম। বললাম, আমি ট্যাক্সি করে ফিরে যাব। ও কিছুতেই শুনছিল না। তখন ওকে বললাম, আমি একটু টয়লেটে যাব। সামনে একটা রেস্তোরাঁ ছিল। তাতে ঢুকে গেলাম। সেখানে লেডিজ টয়লেট ছিল। আমি ওয়েটারকে ডেকে তার হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, 'তোমাদের রেস্তোরাঁর পিছন থেকে কোনো দরজা আছে?' লোকটা বলল, 'আছে।' আমি বললাম, 'আমাকে দেখিয়ে দাও, আমি সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব। আর শোন, ঐ যে শাদা রঙের অ্যাম্বাসাডারে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন না, উনি একটু পরে খোঁজ নিতে এলে বল যে, আমি বাড়ি ফিরে গেছি। কেমন?' লোকটা ভুল বুঝল। আমাকে বললে, 'দিদি! ও কি আপনার পিছনে লেগেছে? বিরক্ত করছে? ওর ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করে দেব?' অনেক কষ্টে তাকে বোঝাই যে, অ্যাম্বাসাডারে বসে থাকা ভদ্রলোক আমার বন্ধু, শত্রু নন। সে যা হোক, শান্তনুকে ওখানে ছেড়ে আমি একটু এগিয়ে যাই। পানের দোকানে জিগ্যেস করে জেনে নিই কোনটা রোহিণী-ভিলা। লিফ্‌টম্যান ছিল না। আমি হেঁটেই উপরে উঠি। অনীশের ঘরে বার দুই কলবেল বাজাই। সাড়া দেয় না কেউ। তারপর হাতল ধরে ঘোরাতেই সেটা ঘুরে গেল। আমি ঘরে ঢুকি। ঘরে আলো জ্বলছিল। সামনে খালি গায়ে মরে পড়ে ছিল অনীশ। আমি টের পাইনি যে, আমার জামা বা জুতোয় রক্ত লেগেছে। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে আমি প্রায় ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেই আপনার মুখোমুখি পড়ে যাই।

—অলরাইট! এবার বল, ঐ সুরঙ্গমার অ্যালেবাঈটার কথা।

—আমরা দুজনেই পরস্পরের কাছে স্বীকার করেছিলাম যে, মৃতদেহটা দেখেছি। ঘরেও ঢুকেছি। আমাদের আঙুলের ছাপ কোথাও পড়েছে কি না জানি না। আমরা দুজনেই দুজনকে সাহায্য করতে স্বীকৃত হলাম। ও বলল, 'দ্যাখ মাধু, তোকে কেউ সন্দেহ করবে না। তুই কালকের নেক্সড অ্যাভেইলেব্‌ল্ ফ্লাইটে গুয়াহাটি ফিরে যা। তোর বয়ফ্রেন্ড-এর ফোন এলে আমি বলব যে, তুই ফিরে গেছিস। কিন্তু আমি একটা বিপদে পড়ে গেছি।' আমি জানতে চাইলাম, 'সেটা কী?' ও বললে, 'দুপুরে অনীশকে একটা ফোন করেছিলাম। ও ঘরে ছিল না। দারোয়ানের কাছে আমার টেলিফোন নম্বরটা দিয়ে বলেছিলাম অনীশ আগরওয়াল ফিরে এলে তাকে বলতে, যেন এই নম্বরে ফোন করে। তার মানে দারোয়ানের নোটবুকে আমার টেলিফোন নম্বরটা আছে। ইন্‌ভেস্টিগেটিং পুলিশ অফিসারের জেরায় সেটা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। তাই আমার একটা পাক্কা অ্যালেবাঈ বানিয়ে রাখা ভাল। তাহলে আমি স্বীকার করব যে, হ্যাঁ, ফোনটা আমি করেছিলাম। অনীশ রিঙব্যাক করেনি। আর অনীশের মৃত্যুমুহূর্তে আমি থিয়েটার দেখছি।

বাসু বললেন, বাকিটা বুঝেছি। তখনি টেলিফোনে ও দাদার সঙ্গে অ্যালেবাঈটা তৈরি করে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নাটকটা দুজনেই একসঙ্গে দেখেছে। বেশ কিছুদিন আগে। ওটার শো ঐ দিন হচ্ছে তাও জানা ছিল।

—সে-ক্ষেত্রে তুমি আমাকে অ্যালেবাঈটা যাচাই করতে বললে কেন? টেলিগ্রামটা যখন করেছিলে তখন কি তোমার মনে হয়েছিল সুরঙ্গমাই খুনটা করেছে?

—না দাদু! সুরঙ্গমা নয়। সুরঙ্গমা ঐ রিভলভারটা পাবে কোথায়? কিন্তু তবু আমার মনে হয়েছিল আপনার সব কথা জানা থাকা উচিত। তাই ও-কথা লিখেছিলাম।

বাসু জানালা দিয়ে দূর দিকচক্রবালের দিকে তিন-চার সেকেন্ড স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে

থাকলেন। তারপর আবার মাধবীর দিকে ফিরে বললেন, শান্তনু কি তোমার কাছে কনফেস্ করেছে? জাস্ট এ মিনিট...শান্তনুও আমার ক্লায়েন্ট।

—জানি। জালান আপনাকে এনগেজ করেছে। শান্তনুর ফাঁসি যদি না হয় তাহলেই আমি ঐ লোকটাকে আজীবন বরদাস্ত করতে স্বীকৃত। তার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।

—শান্তনু যদি তোমার কাছে স্বীকার করে থাকে তাহলে তুমি নিঃসঙ্কোচে আমাকে সে-কথা বলতে পার। সেটা 'প্রিভিলেজড কনভার্সেশন'। সে-ক্ষেত্রে আমি আর হত্যাকারীকে অহেতুক খুঁজতে সময় নষ্ট করব না। হয়তো শান্তনুকে পরামর্শ দেব 'গিলটী প্লীড' করে মেয়াদী শাস্তি নিতে। ও যদি আত্মরক্ষার্থে গুলি করে থাকে তাহলে যাবজ্জীবন না হতেও পারে। কারণ যে লোকটা মারা গেছে পুলিশের মতে সে একটা অ্যান্টিসোশ্যাল। র‍্যাকেটিয়ার! বিচারক তার প্রতি অহেতুক সহানুভূতিশীল হবেন না।

মাধবী নত নেত্রে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, না! সে আমার কাছেও স্বীকার করেনি। কিন্তু...কিন্তু...

হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল মেয়েটি।

বাসু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, থাক থাক। বুঝেছি। তোমার বিশ্বাস শান্তনুই তোমাকে অনুসরণ করে অনীশের আস্তানায় পৌঁছায়। ঐ রেস্তোরাঁর ব্যাক ডোর দিয়ে পালিয়ে তুমি ওর চোখের আড়ালে যেতে পারনি। তাই তো?

মাথা নেড়ে মাধবী জানালো সেটাই তার ধরাণা।

—অলরাইট। আপাতত এই পর্যন্ত। লেটস্ মুভ অন।

জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে বিল মিটিয়ে রওনা হচ্ছেন, হঠাৎ বাহাদুর ছুটতে ছুটতে এসে বললে, সা'ব আপ্‌কো টেলিফোন।

আবার নেমে এলেন গাড়ি থেকে। কাউন্টারের কাছে আসতেই প্রীতম জানালো, 'হ্যাঁ, কলকাতা থেকে একটা ফোন এসেছে। আপনি ঐ কোণার ফোনটা নিয়ে কথা বলুন।'

বাসু রিসেপশান লাউঞ্জের একান্তে এসে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বললেন, বাসু স্পিকিং—

—সকাল থেকে তোমার ফোন প্রত্যাশা করছিলাম। তুমি করলে না দেখে আমিই করছি।

—থ্যাঙ্কু, রানু। বল, কী খবর? প্রথম কথা, কোন ঘর থেকে বলছ? এক্সটেনশান লাইনগুলো...

—ঠিক আছে। তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। সবকয়টা প্লাগ খুলে দিয়েছি। আমি বেডরুম থেকেই বলছি।

—বল?

—প্রথম খবর, ভার্গবকে ধরতে পেরেছি। তার মাধ্যমে জামশেদপুরে সুরঙ্গমাকেও। দুজনেই আমাকে বিশ্বাস করেছে। বলেছে সব কথা। সুরঙ্গমা বলেছে ঘটনার রাত্রে মাধবীর দু-দুটি ফোন এসেছিল রাত নটার পর। দুটিই পুরুষকণ্ঠ। দুটি একই ব্যক্তির। প্রথম ফোনটা যখন আসে তখন মাধবী বাথরুমে। তাই সুরঙ্গমা জানতে চেয়েছিল লোকটির নাম, বা টেলিফোন নম্বর। লোকটা জানায়নি। বলেছিল, কিছুক্ষণ বাদে আবার ফোন করবে। তা সে করেছিল। অনেক রাত্রে। তার অনেক আগেই তোমরা ওর ফ্লাট ছেড়ে চলে গেছ। সুরোর ধারণা, লোকটার নাম শান্তনু বড়গোঁহাই। মাধবীর বয়ফ্রেন্ড। কিন্তু সঙ্কোচেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক নামটা সে প্রকাশ করেনি।

—আই সী। আর কোনো খবর?

—হ্যাঁ। একজন স্পেশাল মেসেঞ্জারের হাতে তোমার নাম লেখা একটা কন্‌ফিডেনশিয়াল লেফাফা পেয়েছি। মনে হয়, তার মধ্যে ফটো আছে। অথবা পোস্টকার্ড মাপের কোনো শক্ত কাগজ।

—ও কে.! আর কোনো খবর?

—হ্যাঁ। কৌশিক তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায়। জরুরী ব্যপার। কী কথা তা আমায় বলেনি।

—কৌশিক কোথায়?

—পাশের ঘরে। ডেকে দেব?

—দাও।

একটু পরেই কৌশিক এল লাইনে। বাসু বললেন, বল কৌশিক।

—এক্সট্রীমলি সরি, মামু। যে মেয়েটা আমাদের কাছে...

—মিসেস শান্তনু বড়গোঁহাই?

—হ্যাঁ, সেই পরিচয়ে আমাদের 'সুকৌশলী'তে এসেছিল সে মেয়েটার সঙ্গে ডক্টর বড়গোঁহাই-এর বিয়ে আদৌ হয়নি।

—বল কি! তুমি যে বললে, সে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেটের জেরক্স কপি দেখিয়েছিল।

—তা দেখিয়েছিল। সেটা জাল। আমরা আমাদের ফেডারেশনের মাধ্যমে গুয়াহাটি য়ুনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারা জানিয়েছে, ডক্টর বড়গোঁহাই নিঃসন্দেহে অবিবাহিত। অন্তত যে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেটের ফ্যাক্স-কপি আমরা পাঠিয়েছিলাম, সেটা জাল।

—আই সী! কী নাম মেয়েটার? এখন কোথায় আছে?

—নামটা জানা যায়নি, তবে মেয়েটা 'কলগার্ল'। কমিশন বেসিসে ডিভোর্স কেস-এ লোকজনকে ফাঁসাতে নানারকম অভিনয় করে। কোথায় আত্মগোপন করেছে জানা যাচ্ছে না। ও বুঝে নিয়েছে যে, আমরা ওর স্বরূপটা ধরতে পেরেছি। তাই আত্মগোপন করেছে। আমরা তাকে ট্রেস করার চেষ্টা করছি।

বাসু পুনরায় বললেন, আই সী! উডয়্যু পারমিট মি টু সাজেস্ট সামথিং?

—আজ্ঞে?

—আমার একটা পরামর্শ শুনবে? ও বাবদে আর খরচপত্র কর না। মেয়েটির নাম, ধাম, বায়োডাটা, ফটো সবই আমার সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। সে এখন কোথায় আছে তাও জানি। সেখান থেকে সে পালাতেও পারবে না। কারণ সেখানে সে নজরবন্দি হয়ে আছে। অহেতুক কেন খরচপত্র করবে?

কৌশিক একটু দম ধরে তারপর বলল, আমরা কি আপনার কোনো কাজে লাগতে পারি না? আমি আর সুজাতা।

—আয়াম সরি : নো! নট ইন্ দিস কেস্। এ তদন্তে আমি অন্য একটি গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য নিয়েছি। তারাই সব তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছে! আচ্ছা, এখনকার মতো এই পর্যন্তই। ঘন্টা-দুয়েকের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব নিউ আলিপুরে।

—আমরা? আপনি কি একা নন?

—না! আই এঞ্জয় দ্য কোম্পানি অব মাই 'উইনসাম্ ম্যারো', ইফ্ য়ু হ্যাপন্ টু রিমেমবার ওয়ার্ডসওয়ার্থস্ 'য়্যারো ট্রিলজি'!

চৌদ্দ

বাসু-সাহেব প্রথমেই এলেন ধর্মতলার একটি বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। বহুদিনের পুরনো দোকান। বিরাট আয়োজন। মালিক মুসলমান। আজ রবিবারেও দোকান খোলা। ওরা বন্ধ রাখেন জুম্মাবারে। মাধবীকে বলাই ছিল—সে সোজা লেডিজ-সেক্‌শানে গিয়ে পছন্দমতো একটি রেডিমেড বোরখা কিনে নিল। ট্রায়াল-রুমে গিয়ে ট্রায়াল দিয়ে দেখে নিল, ঠিকমতো গায়ে ফিট করেছে কিনা। তারপর বেরিয়ে এসে বাসু-সাহেবকে বললে, অব্ চলিয়ে বড়ি আব্বা।

বাসু ওকে পিছনের সীটে বসিয়ে এসে উপস্থিত হলেন লিন্ডসে স্ট্রীটে। গাড়িটা পার্ক করতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল একটা অ্যাটাচি হাতে মহাদেব জালান হোটেল থেকে বার হয়ে আসছে। উনি গাড়িটা রাস্তার বাঁ-দিকের কার্বের ধারে পার্ক করলেন। এটা 'নো-পার্কিং জোন'। তা হোক। ডিউক হোটেলে বেশ খানদানি ব্যবস্থা। মহাদেবকে ছোটাছুটি করতে হলো না, দ্বারপালই তার হয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে দিল। মহাদেব দরোয়ানকে টিপস্ দিয়ে উঠে বসল ট্যাক্সিতে। গাড়িটা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

বাসু-সাহেব স্টার্ট বন্ধ করেননি। ধীরে গতিলাভ করলেন। ঐ একই দরোয়ানের নির্দেশে গাড়ি পার্ক করে নেমে এলেন। মাধবীকে বললেন, তুমি আগে যাও হোটেলে। রিসেপ্‌শান লাউঞ্জে ফাঁকা কোনো জায়গা দেখে বসে থাক। আমি মিনিট দশ-পনেরর মধ্যে ফিরে আসব। ইতিমধ্যে কেউ যদি তোমাকে কোনো প্রশ্ন জিগ্যেস করে—আশা করি করবে না—তাহলে উর্দু ঘেঁষা হিন্দিতে জবাব দিও। কেউ বেশি কৌতূহল দেখালে এমন অভিনয় করো যেন তুমি তার কথা বুঝতে পারছ না। ও কে.?

বোরখার ভিতর থেকে মাধবী অস্ফুটে বলে, দিমাক কেঁাউ খরাপ কর রহে হেঁ বরি আব্বা? যাইয়ে না! দশ-মিনিটকে সওয়াল হ্যয় না?

বাসুও নিম্নস্বরে বললেন, যা ব্বাব্বা! তুমি যে আমার উপরেই এক্সপেরিমেন্ট ঝাড়তে শুরু করলে!

মাধবী গিয়ে বসল রিসেপ্‌শান-কাউন্টারের একটা সোফায়। বাসু-সাহেব এগিয়ে গেলেন কাউন্টারের দিকে। ভাগ্য ভাল, সেই পরিচিত মহিলাটিই ছিলেন। ইংরেজিতে 'সুপ্রভাত' জানিয়ে বললেন, বলুন স্যার, কী সাহায্য করতে পারি?

বাসু বললেন, প্রথম কাজ হচ্ছে বেবির অটোগ্রাফ খাতায় সই দেওয়া। কথা ছিল তুমি সেটা এনে তোমার ড্রয়ারে রেখে দেবে। এনেছ?

—স্যিওর!

ড্রয়ার থেকে একটি সুদর্শন অটোগ্রাফ খাতা বার করে দিলেন ভদ্রমহিলা। বাসু খাতাটা উল্টে-পালটে দেখে নিলেন মেয়েটির নাম। একটি আশীর্বাণী লিখে খাতাটা ফেরত দিয়ে বললেন, যাক আসল কাজটা সম্পন্ন হলো। এবার ফালতু কাজগুলো শেষ করি। দেখ তো মা, দুশো সাত নম্বরে জালান আছে কিনা—মহাদেব জালান।

ভদ্রমহিলা বললেন, দু-তিন মিনিটের জন্য আপনার ক্লায়েন্টকে মিস করেছেন। এইমাত্র চাবিটা জমা দিয়ে উনি বেরিয়ে গেলেন। এন্ট্রেন্সের মুখে দেখা হয়নি?

—তাহলে কি আর তোমাকে এ ফালতু প্রশ্ন জিগ্যেস করি? আচ্ছা ওর হাতে কি একটা অ্যাটাচি ছিল? লক্ষ্য করেছিলে?

—হ্যাঁ ছিল, লক্ষ্য করেছিলাম আমি।

—তাহলে মামলার কাগজপত্রগুলো নিয়েই বেরিয়েছে। আমার কাছেই গেছে তাই। যা-হোক দুশো পাঁচে দেখ তো জুলি আছে কি না, জুলি মেহ্‌তা?

মহিলা বললেন, তিনিও কি আপনার মক্কেল?...না, কিছু ভুল হচ্ছে আপনার। 205 আছেন একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক।

—তাহলে জুলি বোধহয় চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছে। যাহোক, আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কেলের তরফে পেমেন্টটা ক্লিয়ার করে রাখা। মহাদেব আর জুলি মেহ্‌তার। জুলির পেমেন্ট কি হয়ে গেছে।

মহিলা খাতাপত্র দেখে বললেন, না। মিস্ জুলি মেহ্‌তার নামে 205-ঘরটা বুকড হয়নি। দুটোই বুক করেছিলেন মিস্টার মহাদেব জালান।

বাসু বললেন, ন্যাচারালি। জুলি হচ্ছে ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি। মিস্টার জালান কি এখন চেক-আউট করছেন? সে-ক্ষেত্রে ওঁর ঘরের মালপত্র...

—না, না, আজকের দিন ইনক্লুড করে ওর যা বিল হয়েছে সেটা আমি পেমেন্ট করে যাব, ব্যস। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমাদের হয়তো ঈভনিং ফ্লাইটে দিল্লি যেতে হবে। কেসটা সুপ্রীম কোর্টে গেলে। আমাদের দুজনকেই। আজ হাইকোর্টে যা ডেভেলপমেন্ট হয় তার উপর সেটা নির্ভর করছে। আমাদের দুজনরেই টিকিট কাটা আছে। আমি চাইছি, ফুল পেমেন্টটা করে যেতে। যাতে বিকালে ফিরে এসে পাঁচ-দশ মিনিটে মহাদেব প্লেন ধরতে যেতে পারে।

মহিলা খাতাপত্র দেখে বললেন, 205-এর পেমেন্ট করা নেই। সেটাও তো ইনক্লুড করে দেব?

—নিশ্চয়ই।

—একটু বসুন স্যার, বিলটা বানিয়ে দিচ্ছি। ক্যাশ দেবেন?

—না। চেকে অথবা ক্রেডিট কার্ডে, অ্যাজয়ু প্লীজ।

বাসু অপেক্ষা করলেন। কম্পুটারে বিলটা তৈরি হতে মিনিট পাঁচেক লাগল। সেটা দেখে বাসু বললেন, এস. টি. ডি. টেলিফোন কলগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আছে; কিন্তু 'লোকাল-কল'-এর ডিটেলস্ তো নেই।

মহিলা বললেন, লোকাল কলের টোটাল তো মাত্র বাইশ টাকা, স্যার?

—সব এভিডেন্স। কোনও পার্টি যেন বলতে না পারে যে আমার মক্কেল সময়মতো তাকে টেলিফোনে খবর দেয়নি। তুমি এক কাজ কর মা : তোমাদের টেলিফোনরেজিস্টার দেখে এই ভাউচারের পিছনেই লিখে দাও। চারটে কলম কর : ডেট, টাইম, ডিউরেশন আর 'নম্বর কল্‌ড্'। কত ইউনিট বা টাকা উঠেছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

মহিলা বললেন, তাহলে আপনাকে আরও মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হবে, স্যার।

—ন্যাচারালি। আমি অপেক্ষা করছি।

বাসু একটা স্টাফ্‌ড চেয়ারে এসে বসলেন। রিসেপ্‌শানিস্ট একটি জুনিয়ার মেয়েকে নির্দেশ দিলেন টেলিফোন রেজিস্টার দেখে ঐ ভাউচারের পিছনে 'লোকাল কল'-এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে। মিনিট পাঁচ-সাত পরে মেয়েটি ভাউচারটা বাড়িয়ে ধরল. অস্ফুটে বলল, আমকেও একটা অটোগ্রাফ দেবেন, স্যার? আমার অটোগ্রাফ খাতাটা অবশ্য সঙ্গে নেই। আমার ডায়েরিতে?

বাসু বললেন, দেব। একটি শর্তে।

মেয়েটি অবাক দৃষ্টিতে তাকালো। বাসু বললেন, তুমিও আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবে, ঐ যে হিসেবটা লিখলে তার তলায়!

অটোগ্রাফ বিনিময় করে উনি ভাউচারখানা কোটের পকেটে রাখলেন। দৃকপাতমাত্র না করে। চেক লিখে দিলেন, রসিদ নিলেন। তারপর ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে দ্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘটনাচক্রে ঠিক একই সময়ে লাউঞ্জের দূরতম প্রান্তে-বসা একজন পর্দানসীন মুসলমান মহিলাও ঐ সময় এগিয়ে গেলেন নির্গমন দ্বারের দিকে।

গাড়িটা চলেছে লিন্ডসে স্ট্রিট থেকে নিউ আলিপুরের দিকে। একটু ফাঁকা মতো জায়গায় এসে বাসু-সাহেব গাড়িটাকে রাস্তার কার্ব ঘেঁষে দাঁড় করালেন। মাধবী বলল, কী হলো? এনি প্রবলেম?

বাসু বললেন, না। প্রশ্নটা 'এনি প্রবলেম' নয়, প্রশ্নটা 'এনি সল্যুশান'?

কোটের ভিতর পকেট থেকে বার করলেন ভাউচারটা। একনজর দেখেই আপনমনে বললেন ঃ থ্যাঙ্ক গড!

মাধবী অবাক হয়ে বলে, হঠাৎ ও-কথা?

—এইমাত্র একটা পরশপাথর কুড়িয়ে পেলাম যে!

গাড়িটা অবশেষে ওঁর বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পৌছালো। বাসু পর্দানসীন মেয়েটিকে নিয়ে 'সুকৌশলী'র উইঙের দিকে এগিয়ে গেলেন। কৌশিক-সুজাতা দুজনেই উপস্থিত। গাড়ির শব্দে এদিকে তাকিয়েছে। দুজনেই বার হয়ে এসেছে।

বাসু সুজাতাকে বললেন, এঁকে ভিতর বাড়িতে—না, আমার প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে গিয়ে বসাও। ভিতর দিকের দরজা দিয়ে। কৌশিক! গাড়ির ডিকিতে একটা স্যুটকেস আছে ওটা নামিয়ে গাড়িটা গ্যারেজ কর। এই নাও চাবি।

তারপর মাধবীর দিকে ফিরে বললেন, ইধর পাধারিয়ে মাইজী—

মাধবী ওঁর নির্দেশমতো সুকৌশলীর অফিসে ঢুকল। সুজাতা ওকে ভিতরে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে গাড়ির ডিকি থেকে মাধবীর ভি. আই. পি স্যুটকেসটা নামিয়ে এনেছে কৌশিক। বাসু-সাহেবের পাশ দিয়ে যাবার সময় অস্ফুটে ওঁর কানে-কানে বলল, ঐ পর্দানসীন বেহেস্তী হুরীই কি আপনার 'উইনসাম ম্যারো'? ঈয়া আল্লাহ্!

বাসু বললেন, জ্যাঠামো কর না।

এবার নিজের অফিসের ভিজিটার্স-রুমে প্রবেশ করলেন বাসু-সাহেব। সেখানে একাই বসে আছেন রানী দেবী। বললেন, এস। ঐ বোরখা-পরা মহিলাটি কে? ওকে সুজাতাদের অফিসেই বা নিয়ে গেলে কেন?

—কী করব? জানি না তো—এখানে জ্বালান বসে আছে কি না। অথবা হোমিসাইডের কেউ!

—তার মানে ঐ মহিলাটি...?

—মহিলা নয়, ও মাধবী!

—মাধবী! সর্বনাশ! ওকে এ বাড়িতে এনে তুলেছ? কোনো হোটেল-মোটেলে...

—হোমিসাইড কলকাতা শহরের সব কটা হোটেল-মোটেল খুঁজবে, শুধুমাত্র আমদের এই নিউ আলিপুরের বাড়িটা বাদে। এটাই তাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। ভাল কথা, মহাদেব জালান আজ সকালে আসেনি?

—এসেছে। তাকে আমি আর বাইরের ঘরে বসাইনি। কিছু ম্যাগাজিনপত্র দিয়ে তোমার

ল-লাইব্রেরিতে বসিয়ে দিয়েছি। সেখানকার টেলিফান রিসিভারের প্লাগটা এখান থেকে খুলে দিয়ে।

—কী চায় লোকটা?

—তোমার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে। তুমি ফিরে এসে পুলিশের সঙ্গে কথা বলার আগে, একেবারে নাছোড়বান্দা। তাই ওকে ল-লাইব্রেরিতে ডাম্প করে দিয়েছি।

—বেশ করেছ।

—মাধবীকে তুমি পেলে কোথায়?

—'ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড'—সাঁকরাইলের কাছাকাছি 'ধুলাগড়ি'নামে একটা গ্রামে। সেখানে খুব সুন্দর একটা গ্রাম্য পরিবেশের মোটেল গড়ে উঠেছে। ওরা দুজনে আগুপাছু সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, শান্তনু আর মাধবী—একটা 'ব্রাইডাল সুইট'-এ।

—'ব্রাইডাল সুইট'! মানে?

—হনিমুন-রুম, মধুচন্দ্রিমা-নীড়, ফুলশয্যা-কক্ষ—যা খুশি বলতে পার।

—তার মানে মাধবী ইতিমধ্যে শান্তনুকে বিয়ে করেছে?

—আজ্ঞে না, তা করেনি। হিসেবে ভুল হলো তোমার। করবেও না। আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ তো? আমিও প্রথমটা তাই হয়েছিলাম। পরে বুঝলাম 'হনিমুন-রুমে' একটা বিয়োগান্ত নাটকের শেষ যবনিকা পড়তে চলেছিল। আমি মাঝখান থেকে গিয়ে উপস্থিত হওয়ায় সব বানচাল হয়ে গেল।

—মানে?

—মহাদেব জালান ঐ হতভাগিনীটাকে কোণঠাসা করতে করতে এমন একটা অবস্থায় এনে ফেলেছে যখন ওর সামনে আর দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই। বাধ্য হয়ে সে জালানকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। শান্তনুকে বাঁচাতে। কিন্তু হাড়িকাঠে মাথাটা পেতে দেবার আগে ওর বিড়ম্বিত বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভে কুমারী জীবনের একটা সপ্তাহ সে তার প্রেমাস্পদকে উপহার দিতে চেয়েছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল রানী দেবীর। নিঃশব্দে তিনি উঠে গেলেন। টেবিলের টানা ড্রয়ার থেকে একটা সীলমোহর করা খাম বাসু-সাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, এটা ইস্‌মাইল সাহেব পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বাসু খামটা খুলে ছবিগুলো দেখছিলেন। রানী জানতে চান, কার ফটো ওগুলো?

খামে ছবিগুলো ভরতে ভরতে বাসু বলেন, ওর অষ্টোত্তর শতনাম আছে। কোনটা শুনতে চাও বল? হিন্দু সাজলে মমতা; মুসলমান সাজলে 'মমতাজ'; সুকৌশলীকে বোকা বানাতে চাইলে, মিসেস বড়গোঁহাই!

রানী বলেন, বুঝলাম। তুমি এখন কী করবে স্থির করেছ? মহাদেব জালানের ইচ্ছানুসারে...

বাসু তাঁর অভ্যস্ত লব্‌জে চাপা গর্জন করে ওঠেন, হ্যাঙ হিম!

আশ্চর্য! তৎক্ষণাৎ ও-পাশের ল-লাইব্রেরির দরজাটা খুলে গেল। সে শব্দে দুজনেই ওদিকে ফেরেন। উন্মুক্ত দ্বারপথে দাঁড়িয়ে আছে মহাদেব জালান। বলে, কতবার এককথা বলব, ব্যারিস্টার সাহেব? আপনি জজ নন! ফাঁসি দেবার এক্তিয়ার আপনার নেই। যতই কেন না খিস্তি-খেঁউড় করুন মক্কেলের উদ্দেশ্যে।

বাসু ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিলেন?

—উপায় কী? আপনি তো মক্কেলের সঙ্গে কোনো কথাই বলতে চান না।

—লুক হিয়ার, মিস্টার জালান। আপনি আমার মক্কেল নন। আপনি আমার মক্কেলের তরফে টাকা দিয়েছেন এইমাত্র। আপনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি দয়া করে এ ঘব ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

—দয়া করে? কিন্তু কার প্রতি দয়াটা করব? আপনার না সেই মেয়েটার, যে নির্লজ্জের মতো বিয়ের আগেই ফুলশয্যা-ঘরে শুয়ে পড়তে চায়? আপনি ভুলে যাচ্ছেন মিস্টার বাসু, রঙের টেক্কাটা আমি এখনো খেলিনি। আমার নির্দেশ অনুযায়ী না চললে আমিও সেই টেক্কাখানা টেবিলে নামিয়ে দেব।

বাসু বলেন, একটা অন্তিম শো-ডাউন ক্রমশ অনিবার্য হয়ে পড়ছে, এই কথাই কি বলতে চান?

জালান একটা সিগ্রেট ধরিয়ে আরাম করে বসল। বলল, আপনার মধ্যে একটা লড়াকু তেজ আছে। সেটাকে আমি শ্রদ্ধা করি বাসু-সাহেব। কিন্তু ভুল করবেন না! আমিও বাঘের বাচ্চার মতো লড়তে জানি। জীবনে অনেক লড়াই খতম করেছি। কখনো হারিনি।

বাসু তাঁর টেবিলের এক কোণায় বসে বললেন, এসব আজে-বাজে খোশগল্প করার সময় আমার নেই। আপনি জীবনে কোনো দিন লড়েননি। ফাটকা বাজারে যারা শেয়ার ধরে আর ছাড়ে তাদের সমগোত্রীয় আপনি হতে পারেন মাত্র। তাকে 'লড়াই' বলে না। পরের দুর্বলতা বুঝে নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে বাঘ, সে লড়াই করে না—শিকার ধরে মাত্র। আপনি ঠিক কি চান, এককথায় বলুন দেখি?

—ডক্টর বড়গোঁহাইকে পুলিশ ধূলাগড়ি গ্রাম থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসেছে—এটা বোধহয় আপনার জানা। সে পুলিশের কোনো প্রশ্নের জবাব দেয়নি। বলেছে আপনি তার সলিসিটার। আপনার অনুপস্থিতিতে সে নাকি কোনো কথা বলবে না। তাই পুলিশ আপনাকে খুঁজছে। আপনি যদি চান যে, 'রঙের টেক্কা'টা আমি টেবিলে নামাবো না, তাহলে আপনার মক্কেলকে ইন্সট্রাকশান দিন। যেন 'গিল্‌টি প্লীড' করে! যা শাস্তি হয়, তা সে যেন মাথা পেতে নেয়।

বাসু বললেন, এ-কথা তো আপনি আগে বলেননি?

—না, বলিনি। এখন বলছি। কারণ পরিস্থিতিটা এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

বাসু বললেন, আয়াম সরি! মক্কেলের স্বার্থ কীভাবে দেখব, তা আমিই স্থির করব।

—আমি আপনাকে শেষবারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি, মিস্টার বাসু। আপনি যদি ঐ জিদ্দিবাজি না ছাড়েন তাহলে আমি রঙের টেক্কাখানা—

—হ্যাঙ য়োর রঙের টেক্কা!

ঠিক তখনই বাইরের দিকের দরজায় কে যেন জোরে করাঘাত করল এবং একই সঙ্গে বেজে উঠল কল বেল।

বাসু এগিয়ে গিয়ে খুলে দিলেন সদর দরজা।

খোলা দরজার ওপাশে দুজন পুলিশ অফিসার। একজন যুবক, বোধহয় হোমিসাইড-এর সাব-ইন্সপেক্টর; দ্বিতীয়জন তার 'বস'-স্থানীয়, প্রৌঢ়, পোড়-খাওয়া সংসারাভিজ্ঞ আরক্ষাপুঙ্গব। প্রৌঢ়ই বললেন, যাক শেষ পর্যন্ত আপনার দর্শনলাভের সৌভাগ্য হলো, স্যার? আমার নাম ইন্সপেক্টর মজুমদার, বলাবাহুল্য হোমিসাইডের; আর এ ছোকরা জয়ন্ত ভৌমিক, আমার সহকারী।

বাসু বললেন, মিনিট পাঁচেক আগে বাড়ি ফিরেছি। এসেই শুনলাম, কাল সারাদিন আপনারা দুজন আমার তত্ত্ব-তালাশ নিতে বারে বারে এসেছেন। কী ব্যাপার?

—আজ্ঞে না, ব্যাপার তেমন কিছু নয়। ব্যারিস্টার-সাহেবের কাছে মানুষজন আসে কেন? কিছু আইন-সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে, তাই নয়? আমরাও তাই কাল বারে বারে এসেছি। আপনার মন্দিরের দোরগোড়া থেকে ফিরে গেছি।

বাসু বললেন, তাই বুঝি? আসুন, বসুন। আইন-সংক্রান্ত পরামর্শ দেব বইকি!

মজুমদার ভ্রূকুটি করে বললেন, ঐ লোকটা কে? কাল থেকে দেখছি গুড়ের নাগরির কাছে মাছির মতো সেঁটে বসে আছে?

বাসু সংক্ষেপে বললেন, আমার মক্কেল একজন।

—মক্কেল? কী চায় লোকটা?

বাসু বললেন, ওঁকেই প্রশ্ন করে দেখলে শোভন হয় নাকি? মক্কেল কী চায় তা কি আমি আগ্‌বাড়িয়ে পুলিশকে জানাতে পারি? আমার দিক থেকে সেটা যে 'প্রিভিলেজড তথ্য'।

জালান চোখ তুলে আগন্তুক দুজনকে মনে মনে জরিপ করে নিল। সিগ্রেটটা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। তার দগ্ধাবশেষ থেকে নতুন একটা ধরিয়ে নিয়ে নিশ্চুপ বসেই রইল। পুলিশ দুজনও তাকে দেখল। আর ভ্রূক্ষেপ করল না।

মজুমদার বললেন, আমরা আর বসব না। আপনিই বরং দয়া করে একটু গা তুলুন স্যার। যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। লালবাজারের হোমিসাইড-বিভাগের বড়কর্তারা আমাদের মাধ্যমে আপনাকে সেখানে পদধূলি দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বাসু বললেন, এ তো আমার পক্ষে গৌরবের কথা। তবে কি জানেন ইন্সপেক্টর মজুমদার, আমি মফস্বল থেকে এইমাত্র ফিরেছি। আমার সেক্রেটারি সবেমাত্র জানাচ্ছিলেন অনেকগুলি জরুরী কেস জমে আছে। এখনি তো ঠিক আমি হেড কোয়ার্টার্সে আসতে পারব না। সরি।

মজুমদার এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনি কথাটার অর্থ বুঝে উঠতে পারেননি। হেড কোয়ার্টার্সে আপনাকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য নয়, জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আমরা নিতে এসেছি।

বাসুও গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনিও আমার কথাটার গুরুত্ব বুঝে উঠতে পারেননি। আমার নাম পি. কে. বাসু—ভিখারী পাশওয়ান নয়। ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছেন?

মজুমদার স্থিরদৃষ্টিতে ওঁর দিকে দশ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, না, ওয়ারেন্ট আমরা নিয়ে আসিনি; কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে ওয়ারেন্ট বানিয়ে নিয়ে আসতে আধঘন্টাও লাগবে না আমাদের।

—সেটাই ভাল। আপনারা ওটা বানিয়ে আনুন। আমিও আধঘন্টাখানেক সময় পেলে জরুরী কাজগুলো সেরে ফেলতে পারি। কেমন?

মজুমদার এবার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, আপনি আমার অপরিচিত নন, মিস্টার বাসু। আপনার কীর্তিকাহিনী আমার অজানা নয়; কিন্তু এবার পরিস্থিতিটা একটু অন্যরকম। আমরা নিশ্চিতভাবে খবর পেয়েছি যে, ইতিমধ্যে আপনি সজ্ঞানে কিছু বে-আইনি কাজ করে বসে আছেন। বড়কর্তা সে-বিষয়েই আপনার একটা স্টেটমেন্ট নিতে চান—এ জন্যই আপনাকে আলোচনার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। আপনি বাধ্য করলে আমাদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা লিখিয়ে আনতে হবে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে সেটা 'পরামর্শ' পর্যায়ে থাকবে না, 'প্রসিকিউশন' পর্যায়ে চলে যাবে। আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে আপনাকে হেড কোয়ার্টার্সে নিয়ে যাবার জন্য। কীভাবে যাবেন সেটা আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

বাসু বললেন, আপনি প্রথমেই বলেছিলেন, উকিল-ব্যারিস্টারের কাছে মানুষ আসে আইনের বিষয়ে পরামর্শ নিতে। ভেবেছিলাম, সেটা রসিকতা। এখন দেখছি, তা নয়। আইন সংক্রান্ত কিছু পরামর্শ আপনাদের সত্যিই দরকার। ওয়ারেন্টটা যতক্ষণ না বানিয়ে নিয়ে আসতে পারছেন ততক্ষণ আপনারা দুজন আমাকে লালবাজারে নিয়ে যেতে পারবেন না।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান প্রৌঢ় মজুমদার। প্রায় চিৎকার করে ওঠেন, রসিকতার একটা সীমা আছে, মানুষের সহ্যক্ষমতারও। ভৌমিক! লালবাজারের হেড কোয়ার্টার্সে একটা ফোন কর তো!

ভৌমিক কিন্তু পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েই রইল।

বাসু পাইপ-পাউচ বার করতে করতে বললেন, এটা আমার প্রাইভেট টেলিফোন। এখান থেকে ফোন করতে হলে দু'টাকা চার্জ লাগবে। সেটা কে দিচ্ছেন? মিস্টার মজুমদার না ভৌমিক ? নাকি সদাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার?

কেউ কোনো জবাব দিল না।

বাসু এদিকে ফিরে বললেন, রানু, লালবাজারের হোমিসাইডকে ধর তো। লাইনটা পেলেই মজুমদার-সাহেবকে দিও।

রানী তৎক্ষণাৎ হুইল-চেয়ারে একপাক দিয়ে এগিয়ে আসেন। নম্বর তাঁর মুখস্ত। অভ্যস্ত আঙুলে ডায়াল করতে থাকেন। বাসু পুলিশ অফিসার দুজনের দিকে ফিরে বললেন, দুটোর যে-কোনো একটা পথে আমাদের চলতে হবে। এক নম্বর : আপনারা ফিরে যান। আমার যখন সময়-সুযোগ হবে তখন টেলিফোনে জানিয়ে আমি লালবাজারে আসব। দ্বিতীয় পথ, ঐ যেটা বলছিলেন : ওয়ারেন্ট ইস্যু করিয়ে আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া। যেটাই করা হোক, ঠিক আইন-মোতাবেক হওয়া চাই।

মজুমদার বললেন, শুনুন স্যার, আপনি এখনো জানেন না, পুলিশ কতদূর জানে। আমরা জানি, অনীশ আগরওয়াল হত্যা মামলার দু-দুজন সন্দেহজনক আসামীকে আপনি আপনার সেক্রেটারির মাধ্যমে শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা সাঁকরাইলে গিয়ে লুকিয়ে বসেছিল আপনারই নির্দেশে। তাদের মধ্যে একজনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি, কিন্তু দ্বিতীয়জনকে আবার আপনি সরিয়ে ফেলেছেন, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে। এসব হচ্ছে 'অ্যাসেসারি আফটার দ্য ফ্যাক্ট'। তাই বড়কর্তা কোনো 'অ্যাকশান' নেবার আগে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান। আর আপনি জিদ্দিবাজি করে...

কথার মাঝখানে রানী বলে ওঠেন, মিস্টার মজুমদার! লালবাজার হোমিসাইড স্কোয়াডের হেড কোয়ার্টার্সকে পাওয়া গেছে। নিন, কথা বলুন—টেলিফোনটা বাড়িয়ে ধরেন।

প্রচণ্ডভাবে মাথা ঝাঁকি দিয়ে মজুমদার বললেন, ও হেল! কেটে দিন লাইনটা।

রানী তাঁর স্বামীর দিকে তাকালেন। বাসু সহাস্যে বললেন, একটা ফোন কল বেহুদ্দো খরচ হলো। কী আর করা যাবে? লাইনটা কেটে দাও, রানী। ওঁরা বুঝতে পেরেছেন, ওভাবে ভড়কি দেওয়া যাবে না।

মজুমদার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান। বলনে, অলরাইট! চলে এসো ভৌমিক! আমরা ওয়ারেন্টটা বানিয়ে নিয়েই আসব।

দুজন নির্গমনদ্বারের দিকে চলতে শুরু করে। ঠিক তখনি মহাদেব জালান হঠাৎ বলে ওঠে, ইট্‌স্ দ্য ল্যাস্ট চান্স, মিস্টার বাসু! আপনি কি আমার প্রস্তাবে রাজি?

পুলিশ অফিসার দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে দোরগোড়ায়। ওরা জানে, বক্তা কে। তাই ঘুরে দাঁড়ায়।

বাসু এগিয়ে আসেন জালানের দিকে। দৃঢ়স্বরে দাঁতে দাঁত দিয়ে বলেন, একবার বলেছি, বারবার বলেছি, এই শেষবার বলছি, আপনি আমার মক্কেল নন! আমার মক্কেলের স্বার্থ দেখতে আমি যা খুশি তাই করব। এই অনীশ আগরওয়াল হত্যাকাণ্ডে আমার চোখে আপনি 'জাস্ট স্যান্টা ক্লজ'! আপনি প্রাথমিক টাকার যোগান দিয়েছেন, ব্যস! দ্যাটস অল। আপনার কাছ থেকে ওরা দুজন এবং আমি আর কিছু প্রত্যাশা করি না। এ-কেসের সঙ্গে—আমার দৃষ্টিতে—আপনি সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত! যাদের আপনি ফাঁদে ফেলতে চান তাদের দুজনকেই আমি বাঁচাব, কারণ আগরওয়ালকে কে, কীভাবে, কেন হত্যা করেছে তা আমি জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। এখন শুধু এভিডেন্সগুলো সাজিয়ে তোলাই আমার শেষ কাজ!

মহাদেব জালান একমুখ ধোঁওয়া ছেড়ে বললে, অফিসার্স! আপনারা যদি কাইন্ডলি ঐ দরজাটা খুলে বাসু-সাহেবের প্রাইভেট চেম্বারে পদার্পণ করেন তাহলে ওখানে দেখতে পাবেন এমন একজনকে, যাকে আপনারা পরশু থেকে খুঁজছেন; মিস্ মাধবী বড়ুয়া।

মজুমদার অবাক হয়ে তাকালেন। জালানের দিকে। বাসু-সাহেবের দিকে। তারপর ওঁর প্রাইভেট-চেম্বারের দিকে একপদ অগ্রসর হতেই বাসু গর্জে ওঠেন, বিনা ওয়ারেন্টে আপনি যদি ঐ দরজাটা খোলেন...

কথাটা তাঁর শেষ হয় না, মজুমদার ঝাঁপিয়ে পড়েন দরজাটার উপর। বাসু সেদিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করতেই এতক্ষণ যে লোকটা পাথরের মূর্তির মতো খাড়া দাঁড়িয়ে ছিল সেই ভৌমিকও ঝাঁপিয়ে পড়ল বাসু-সাহেবের উপর। বাহুবেষ্টনীতে পিছন থেকে বৃদ্ধ মানুষটিকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে ফেলে।

মজুমদার ইতিমধ্যে খুলে ফেলেছেন বাসু-সাহেবের প্রাইভেট চেম্বারের একপাল্লার দরজাটা। ভিতরে বসেছিল বোরখা-পরা একটি খানদানি ঘরানার মুসলমান মহিলা। সে একলাফে ওদিকের দরজার হাতলটা চেপে ধরে। মজুমদার গর্জন করে ওঠেন, পালাবার চেষ্টা করলে আমি কিন্তু ফায়ার করব, মিস্ বড়ুয়া!

বাস্তবে তাঁর ডান হাতে সার্ভিস রিভলভার।

বাসু বসে পড়লেন একটি চেয়ারে। ভৌমিক তার বজ্রবাঁধুনি আলিঙ্গন থেকে ইতিমধ্যে বাসু-সাহেবকে মুক্তি দিয়েছে। রানী হতাশভাবে এলিয়ে পড়েছেন তাঁর হুইল-চেয়ারে। বাইরের খোলা দরজা দিয়ে ইতিমধ্যে কক্ষে প্রবেশ করেছে কৌশিক আর সুজাতা। মজুমদার তার আগেই উদ্যত রিভলভার হাতে ঢুকে গিয়েছিলেন বাসু-সাহেবের চেম্বারে। দৃঢ়মুষ্টিতে একটি তরুণীর হাত ধরে তিনি ফিরে এলেন। মেয়েটির পরিধানে একটা মুসলমানী বোরখা—কিন্তু মুখের সামনে পর্দাটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

মজুমদার বললেন, মাই গড! শী ইজ দ্য ফিউজিটিভ ইনডীড!

কেউ কোনো প্রতিবাদ করল না।

মজুমদার পুনরায় প্রশ্ন করলেন—ঐ মেয়েটিকেই—আপনিই কি গুয়াহাটির মিস্ মাধবী বড়ুয়া?

মাধবী বললে, আমার বিষয়ে আপনার যদি কোনো জিজ্ঞাস্য থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে মিস্টার পি. কে. বাসুকে সে প্রশ্ন করবেন। উনি আমার সলিসিটার।

—ওয়েল মিস্টার সলিসিটার! এঁর নাম কি মিস্ মাধবী বড়ুয়া?

বাসু অপ্রয়োজনবোধে জবাব দিলেন না।

মজুমদার পকেট থেকে দুটো দুই টাকার নোট বার করে টেবিলে রাখলেন। বললেন, আপনার প্রাইভেট টেলিফোন দুবার ব্যবহার করা বাবদ এই চারটে টাকা রাখলাম। আমি আবার হোমিসাইডকে ফোন করছি, মিস্টার বাসু।

ভৌমিক আগ্‌বাড়িয়ে বললে, আমি করব?

—না! তুমি ততক্ষণ এই মহিল্যাটিকে একটা স্টেনলেস স্টিলের মকরমুখী বালা পরিয়ে দাও!

ক্লান্ত বাসু মাথাটা তুলে জানতে চান, এই অসভ্যতার কি সত্যিই কোনো প্রয়োজন আছে?

মজুমদার নাম্বারটা ডায়াল করতে করতে মাঝপথে থেমে পড়ে বললেন, ইয়েস স্যার! অনেক লীগ্যাল অ্যাডভাইস দিয়েছেন—সেজন্য ধন্যবাদ! আমি হেড কোয়ার্টার্সে ফোন করছি জানতে, আপনাকেও হ্যান্ড-কাফ্ পরিয়ে নিয়ে যেতে হবে কি না! আপনি যে জেনে-বুঝে একজন পলাতক আসামীকে লুকিয়ে রেখেছিলেন এটা এখন এসট্যাবলিসড! আমার জ্ঞাত তথ্য। তাই আপনাকে অ্যারেস্ট করার জন্য ওয়ারেন্ট নিস্প্রয়োজন। আমি শুধু হেড কোয়ার্টার্স-এর কাছে জানতে চাই।—আপনাকেও হ্যান্ড-কাফ্ পরানো হবে, না হবে না।

জালান খুক্ খুক্ করে হেসে ওঠায় মজুমদার সেদিকে ফিরে বললেন, সাইলেন্স! শেয়ালের মতো খক্ খক করে হাসবেন না।

পনের

বাসু-সাহেবের ক্লান্ত ভাবটা এতক্ষণে কেটে গেছে। মাধবীকে লড়াই ময়দানের বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন—পারলেন না। ক্লান্তিটা সেই ব্যর্থতাজনিত—খণ্ডযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি। যুদ্ধটা তা বলে শেষ হয়নি। আগরওয়াল হত্যা মামলার সমাধান উনি করে ফেলেছেন। মনে মনে। কাউকে এখনো কিছু জানাননি। প্রকৃত আসামীকে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু ও-পক্ষ তাঁর কোন্ চালে কী চাল দেবে তা তো বলা যাচ্ছে না—তাই শেষ কিস্তিতে কীভাবে মাৎ করা যাবে তার স্পষ্ট ধারণা হয়নি এখনো।

চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বাসু বললেন, শুনুন ইন্সপেক্টার মজুমদার। আমি লালবাজারে যেতে চাই না, কিন্তু এখানে এই ঘরে বসেই একটা জবানবন্দি দিতে চাই—একটা স্বীকারোক্তি। আপনি কি অনুগ্রহ করে শুনবেন?

—ও তাই নাকি? আপনি একটি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে এতক্ষণে রাজি হয়েছেন? কী আনন্দের কথা! কিন্তু সেটা আপনাকে হেড কোয়ার্টার্সে গিয়েই দিতে হবে, ব্যারিস্টার-সাহেব, এখানে বসে নয়।

—না। এখানে বসে। হোমিসাইড নয়, আপনি ভবানীভবনে ক্রাইম সেক্শানে মিস্টার সমরেন্দ্র নন্দী আই. পি. এস্.কে টেলিফোনে পান কি না দেখুন। তিনি কেসটা জানেন। তাঁকে এখানে চলে আসতে বলুন। তাঁর সাক্ষাতেই আমি কন্‌ফেশটা করব।

মজুমদার ইতিপূর্বেই ক্র্যাডেলে টেলিফোন যন্ত্রটা বসিয়ে রেখেছিলেন। বললেন, দুর্ভাগ্যবশত চাকাটা এখন ঘুরে গেছে বাসু-সাহেব। আপনার আক্রমণাত্মক খেলাটা শেষ হয়ে গেছে যে-মুহূর্তে আপনার প্রাইভেট চেম্বার থেকে ফেরারি আসামীকে আমরা গ্রেফতার করতে পেরেছি। এখন আমাদের অফেন্সসিভ খেলা শুরু হয়েছে। আপনি ডিফেন্সে।

বাসু-সাহেব সমরেন্দ্র নন্দীর নামোচ্চারণমাত্র রানী দেবী তাঁর চাকা দেওয়া চেয়ারে চলে গেছেন পাশের ঘরে—বাসু-সাহেবের একান্তকক্ষে। সুজাতা আর কৌশিক দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। মাধবী কিন্তু বসে আছে একটা চেয়ারে। তার মুখে একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের ব্যঞ্জনা। তার প্রতিজ্ঞা : সে কিছুতেই কিছু বলবে না! তার একমাত্র প্রত্যুত্তর, অনুগ্রহ করে আমার সলিসিটারকে জিজ্ঞাসা করুন।

বাসু বললেন, লুক হিয়ার, ইন্সপেক্টর মজুমদার! ইতিপূর্বেই বলেছি, আমি একটা জবানবন্দি দিতে ইচ্ছুক। একটা স্বীকারোক্তি। এ ঘরে। এই চেয়ারে বসে। সাত-আট জন সাক্ষীর সামনে আমি সে কথা বলেছি। আপনি সেই কন্‌ফেশানটা শুনবেন? না, শুনবেন না? আমার সেই স্বীকারোক্তি?

—আলবাৎ শুনব। তবে এখানে নয়। হেড কোয়ার্টার্সে! আপনাকে আমি গ্রেফতার করেই নিয়ে যাচ্ছি। একটা কগ্‌নিজিবল অফেন্স করায়। মাধবী বড়ুয়াকে পুলিশ খুঁজছে এ-কথা খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে—সবাই জানে! আপনি তার সলিসিটার; ফলে আপনিও তা জানতেন। সেই ফেরারি আসামীকে আমরা খুঁজে পেয়েছি আপনার প্রাইভেট চেম্বারে। সুতরাং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিষ্প্রয়োজন। আমি শুধু হেডকোয়ার্টাসের কাছে জানতে চাই—এ-ক্ষেত্রে আপনাকে হাতকড়া পরানো হবে, না, হবে না।

নাটকীয়ভাবে পিছন ফিরে তিনি আবার তুলে নিলেন টেলিফোন যন্ত্রটা। কানে লাগালেন। বার-কতক খট্‌খট্ করলেন। তারপর বললেন, এ কি! এটা ডেড্ হয়ে গেল কি করে?

বাসু বললেন, সম্ভবত আমার সেক্রেটারি পাশের ঘরে গিয়ে প্লাগ কানেক্‌শানটা খুলে দিয়েছেন। উনি যে প্রতিবন্ধী নন—পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এখনও রুখে দাঁড়াতে পারেন, তারই সামান্য একটা প্রমাণ দিলেন, এই আর কি!

মজুদার বুনো-মোষের মতো গিয়ে ধাক্কা দিলেন বাসু-সাহেবের প্রাইভেট রুমের দরজায়। দেখা গেল সেটা ভিতর থেকে বন্ধ।

বাসু বললেন, এবার কী করবেন পুলিশ-সাহেব? দরজা ভেঙে আমার আপত্তি সত্ত্বেও ট্রেসপাস—নাকি বাইরের কোনো টেলিফোন বুথ থেকে হেড কোয়ার্টাসকে ফোন করা?

মজুমদার এতক্ষণে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। বেশ জোরের সঙ্গে বলেন, দ্বিতীয়টা। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক, ভৌমিক। এঁদের দুজনের কেউ যেন না পালায়।

নির্গমনদ্বারের দিকে এক-পা আগাতেই বাসু বলেন, যাবার আগে একটা কথা শুনে যান, মিস্টার মজুমদার। আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে লালবাজারে নিয়ে গেলে আমি ওঁদের বলব যে, নিজের বাড়িতে বসে আমি একটা সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি করতে স্বীকার করেছিলাম—পাঁচ জন সাক্ষীর সামনে। কিন্তু দুজন দাম্ভিক নির্বোধ পুলিশ অফিসার আমাকে সেই কনফেশন করতে দেয়নি। আমি আরও বলব, লালবাজারে আমি কোনো কথার জবাব দেব না। প্রসিকিউশানের হিম্মৎ থাকে তো আমাকে দোষী প্রমাণ করুক!

মজুমদার থমকে গেলেন। তার সহকর্মী বললে, স্যার...

বাসু তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, একজ্যাক্টলি! য়ু আর রাইট, ইয়াংম্যান! আমার সলিসিটার যদি প্রমাণ করতে পারেন যে, আমি কলকাতার বাইরে থাকার সময় আমার অজ্ঞাতসারে মাধবী বড়ুয়া আমার প্রাইভেট অফিসে ঢুকেছিল, তাহলে আমাকে হাতকড়া পরিয়ে অহেতুক অপমান করার জন্য তোমার সহকর্মীর চাকরি নিয়েও টানাটানি হতে পারে। সেটা অবশ্য নির্ভর করবে হাইকোর্ট-বার-অ্যাসোসিয়েশান কীভাবে রিয়্যাক্ট...

মাধবী হঠাৎ বলে ওঠে, সেটাই তো ঠিক। আমি যে ওখানে লুকিয়ে ছিলাম তা তো আপনি জানতেনই না—

বাসু ধমকে ওঠেন, তুমি কোনো কথা বল না, মাধবী।

মাধবী মাঝপথেই থেমে যায়।

বারান্দার দিক থেকে এই সময় হুইল-চেয়ারে পাক মেরে ঘরে ফিরে এলেন রানী দেবী। স্বামীকে সম্বোধন করে বললেন, ও-ঘর থেকে আমি ভবানীভবনে ফোন করেছিলাম। মিস্টার নন্দী তোমাকে চেম্বারে অপেক্ষা করতে বললেন। উনি নিজেই আসছেন। তোমার জবানবন্দিটা শুনতে।

মজুমদার গুটি গুটি নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসলেন। বললেন, আপনি কি নিজে থেকে একটা কন্‌ফেশান, মানে জবানবন্দি দিতে চান?

বাসু বললেন, ফর দ্য এন-এথ্ টাইম আই রিপীট, ইয়েস স্যার!

—কীসের জবানবন্দি?

—সেটা ক্রমশ বুঝতে পারবেন, বলতে শুরু করি তো আগে।

মজুমদার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বাসুকেই বললেন, এঁরা সবাই এঘরে থাকবেন?

বাসু বলেন, সেটাই আমার ইচ্ছা। তোমরা দুজন বস, কৌশিক আর সুজাতা। আর রানী তুমি তোমার নোটবইটা তুলে নাও। আমি জবানবন্দি শুরু করার পর ওঘরে যে-কেউ যে-কেন কথা বলবেন, তা নোট করে নিও। পরে এটা আদালতে প্রয়োজন হতে পারে এভিডেন্স হিসাবে।

তারপর সকলের উপর চোখ বুলিয়ে বলেন, যদিও আপনাদের কারও কোনো হলফ নেওয়া নেই তবু কেউ জ্ঞাতসারে কোনো মিছে কথা বলবেন না। আমরা যা লিপিবদ্ধ করতে যাচ্ছি তা ভবিষ্যতে অনীশ আগরওয়াল মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথি হতে চলেছে।

মজুমদার বললেন, ভূমিকা থাক, এবার শুরু করুন।

রানী তাঁর নোটবই ও ডট পেনটা তুলে নিলেন।

বাসু শুরু করলেন তাঁর স্বীকারোক্তি।

অনীশ আগরওয়ালের নামটা আমি প্রথম শুনি মিস্টার মহাদেব জালানের কাছে শনিবার সকালে, যে শনিবার রাত্রে অনীশ খুন হয়। মিস্টার জালান হাজার টাকা রিটেইনার দিয়ে মাধবী বড়ুয়ার তরফে আমাকে এনগেজ করেন। লক্ষণীয়, তখনো কিন্তু কোনো আইনত অপরাধ সংঘটিত হয়নি। সম্ভবত আসামী বাদে—যদি এটা ডেলিবারেট মার্ডার হয় শুধু সে-ক্ষেত্রেই—আর কেউ জানত না যে, অনীশ আগরওয়াল অচিরেই খুন হতে চলেছে।

মহাদেব রুখে ওঠে, আপনি কী বলতে চাইছেন?

—ফ্যাক্ট! তথ্য! সত্যঘটনা! এ পর্যন্ত যা বলেছি তাতে আপনি কি প্রতিবাদ করছেন? করলে কোন বিষয়ে? এক : আপনি কি রিটেনশান মানি দেননি, মাধবীর তরফে? দুই : তখনো কোনো আইনত অপরাধ কি সংঘটিত হয়েছিল? তিন : কেউ কি তখন জানত যে অনীশ অচিরেই...

মজুমদার বলেন, আপনি ওঁর সঙ্গে আর্গু করবেন না, প্লীজ! আপনি নিজের স্বীকারোক্তিটা দিতে থাকুন!

—অলরাইট! মিস্টার জালান যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তখন তিনি জানতেন না, অনীশ আগরওয়াল কোথায় আছে। এমনকি তিনি এ-কথাও জানতেন না, মাধবী বড়ুয়া

কোথায় আছে। তাই মিস্টার জালানের অনুরোধে আমি ওঁকে সুকৌশলী প্রাইভেট এজেন্সির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—ঐ শনিবারের সকালেই—যাতে সুকৌশলী অনীশ আগরওয়াল এবং মাধবী বড়ুয়ার সন্ধান যোগাড় করতে পারে।

মজুমদার বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, এ জবানবন্দি তো আদৌ স্বীকারোক্তির মতো শোনাচ্ছে না?

বাসু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি আমার কথা শুনতে চান, না, না? আপনি চাইলে আমি চুপ করেই থাকব।

ভৌমিক বলে ওঠে, স্যার, ওঁকে বাধা দেবেন না। উনি কী বলতে চান চুপচাপ শুনেই যান না।

মহাদেব এই সময় বলে ওঠে, একটা কথা! উনি কী বলছেন না বলছেন, তাতে আমাকে কিন্তু কোনোভাবেই জড়াতে পারবেন না। মানে, পরে যেন বলবেন না—আপনি তখন কেন প্রতিবাদ করেননি?

মজুমদার বলেন, আপনি চুপ করুন।

জালান রুখে ওঠে, না, চুপ করব না। আমার কোনো লীগ্যাল অ্যাডভাইসার এখানে নেই। তাই আমি চুপচাপ শুনে যাচ্ছি—

মজুমদার তাঁর সহকর্মীর দিকে ফিরে বলেন, ওকে চুপ করিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমার।

ভৌমিক নিঃশব্দে এগিয়ে জালানের টাইটা চেপে ধরে বললে, স্যারের কথাটা কানে গেছে? আপনি যদি আর একটা কথা উচ্চারণ করেন তাহলে ট্যাক্সি চেপে হোটেলে নয়, অ্যাম্বুলেন্সে চেপে হাসপাতালে যেতে হবে আপনাকে। বুঝেছেন?

মজুমদার বলেন, আপনি শুরু করুন, মিস্টার বাসু।

—হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। মিস্টার জালান তাঁর হোটেলে ফিরে যাবার পর সুকৌশলী ডিটেকটিভ এজেন্সি ঐ দুজনের—মানে অনীশ আর মাধুরীর তল্লাশ করতে থাকে। ইতিমধ্যে লিন্ডসে স্ট্রিট-এর 'হোটেল ডিউক' থেকে মিস্টার জালান আমাকে টেলিফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চান। আমি ওঁকে রাত আটটার সময় আসতে বলি। উনি সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ আমার বাড়িতে এসে হাজির হন। আমি বিরক্ত হই। বলি, 'আমি তো আপনাকে আটটার সময় আসতে বলেছিলাম।' উনি অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, 'অলরাইট। আমি আটটার সময়েই ঘুরে আসব। আমি না হয়, ঐ পার্কে গিয়ে আধঘন্টা বসে থাকি।' তাতে আমি আপত্তি করে বললাম, 'পার্কে ঐভাবে বসে থাকলে আপনার ঠাণ্ডা লাগতে পারে, আপনি বরং আমার বাইরের রিসেপ্শান ঘরেই বসে থাকুন।...মিনিট দশ-পনের পরে কৌশিকের টেলিফোন এল। আমি চেম্বারে বসে কলটা অ্যাটেন্ড করলাম। এই টেলিফোনের একটা এক্সটেনশান আছে আমার রিসেপ্শানে, যেখানে আমার সেক্রেটারি সচরাচর বসেন, আর একটি আমার বেডরুমে। যেহেতু ঘটনার রাত্রে আমার সেক্রেটারি অসুস্থা ছিলেন, আমার বেডরুমে শুয়ে ছিলেন, তাই বেডরুমের প্লাগটা আমি খুলে রেখেছিলাম। সে যাই হোক, আমি চেম্বারে বসে কৌশিকের টেলিফোন অ্যাটেন্ড করলাম। ও জানালো, মাধবীকে সে ট্রেস করতে পেরেছে। মাধবী আছে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে ইন্টালি মার্কেটে। সেই বান্ধবীর মাধ্যমে আগরওয়ালকেও ট্রেস করা গেছে। এখানে বলে রাখা যেতে পারে, টেলিফোনে কৌশিক কিন্তু মাধবীর অ্যাড্রেসটা জানায়নি, কিন্তু তার বান্ধবীর নাম যে সুরঙ্গমা তার উল্লেখ করেছিল। আর বলেছিল যে, আগরওয়াল আছে বেগবাগানের কাছে একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে। তার নাম 'রোহিণী-ভিলা'। অনীশের রুম নম্বর 2/3; অর্থাৎ দোতলায় তিন নম্বর ঘর। কৌশিক আরও বলেছিল,

রোহিণী-ভিলায় ঘরে ঘরে ফোন নেই। তবে দরোয়ানের টুলের পাশে একটা ফোন আছে। বাইরে থেকে কেউ কোনো বোর্ডারকে কিছু মেসেজ পাঠালে তা দারোয়ান ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয় ...

মজুমদার হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, এত বিস্তারিত বিবরণের কি কোনো প্রয়োজন আছে, মিস্টার বাসু? 'কন্‌ফেকশান' মানে স্বীকারোক্তি—গোটা মহাভারত রচনা নয়।

ভৌমিক তৎক্ষণাৎ বাধা দেয়, প্লীজ স্যার! আপনি কথা দিয়েছিলেন, কোনো রকম বাধা দেবেন না।

মজুমদার গা এলিয়ে বসলেন। বললেন, অলরাইট, অলরাইট ! বলে যাচ্ছেন বেদব্যাস, লিখে যাচ্ছেন গণেশজী, অফিস স্টেশনারি ওঁদের, আমি কেন বাধা দিই? হোক, পুরো অষ্টাদশপর্বই হোক।

মহাদেব জালান তার সিগ্রেটের কার্টনটা বাড়িয়ে ধরল। মজুমদার তা থেকে একটা স্টিক তুলে নিয়ে ধরালেন। মৌজ করে শুনতে থাকেন।

বাসু কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, ঠিক ঠিক বলছি তো? কিছু মিস্ করছি না?

কৌশিক এ কামরায় প্রবেশের পর একটি কথাও বলেনি। একটা প্রচণ্ড মানসিক অপরাধবোধে সে ভুগছিল। সে আর সুজাতা। সেই অজানা মেয়েটা ওদের বিপথে পরিচালিত করেছে। দারুণ অভিনয়ক্ষমতা মেয়েটার! কেঁদে কেটে ওদের হৃদয় জয় করে ফেলেছিল। ওরা ধরে নিয়েছিল, সে সত্যি মিসেস শান্তনু বড়গোঁহাই। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন আজ ক্যালকাটা-বারের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার। একটা নগণ্য ইন্সপেক্টার তাঁর হাতে হাতকড়া পরিয়ে লালবাজারে নিয়ে যেতে চাইছে। কৌশিক এবার সোজা হয়ে বসে বললে, আমার মনে হচ্ছে, সামান্য একটু 'ডিটেইলস' বাদ দিয়ে গেলেন স্যার। আমি বলেছিলাম, 'বাইরে থেকে মেসেজ এলে দারোয়ান সেটা বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে লিফটম্যানের হাতে বোর্ডারকে পাঠায়।' তখন আপনি জানতে চেয়েছিলেন 'বিশেষ বোর্ডার অর্থে?' আর আমি এক্সপ্লেন করেছিলাম, 'যারা দরাজ হাতে দরোয়ানকে সেজন্য বকশিস্ দেয়।'

বাসু সোৎসাহে বলে ওঠেন, কারেক্ট। 'বিশেষ-বিশেষ' বোর্ডার! গট দ্যাট করক্‌টেড, রানু?

রানী তাঁর খাতায় নিবদ্ধদৃষ্টি অবস্থাতেই নির্বিকারভাবে বললেন, 'কারেকশানের' দায় আমার নয়। যে-যা বলছেন এখানে লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মহাভারত রচনা করার অপরাধে ঋষি বেদব্যাস এবং তাঁর স্টেনোগ্রাফার হিসাবে কাজ করায় গণেশজী ইতিমধ্যেই অ্যাকিউজড্ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছেন। আই রিপীট—সংশোধন করার দায় আমার নয়।

বাসু আবার শুরু করেন, ইয়েস! যে কথা বলছিলাম—

আমি কৌশিককে টেলিফোনে বললাম, 'এখন রাত সাতটা পঞ্চাশ। আমি রাত পৌনে নটা নাগাদ বেগবাগানে ঐ বাঙলাদেশ মিশনের কাছে পৌঁছাব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর'।...তারপর আমি বাইরের ঘরে এসে দেখলাম, মিস্টার জালান একমনে একটা বই পড়ছেন। ওঁকে বললাম, একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে এক্ষুণি বের হতে হবে। ফিরতে আমার ঘণ্টাখানেক লাগবে। আমি ঐ সময় মিস্টার জালানের কাছে কিছু কাগজপত্র আর ফটো চাই—এগুলো তাঁর আগেই নিয়ে আসার কথা ছিল। উনি বললেন, সেগুলো উনি ভুল করে নিয়ে আসেননি। নিজেই বললেন, ট্যাক্সি নিয়ে উনি লিন্ডসে স্ট্রিটে চলে যাবেন এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঐসব কাগজপত্র হোটেল থেকে নিয়ে আসবেন। হিসাবমতো, আমার বাড়ি থেকে 'ডিউক হোটেল' যাওয়া-আসায় ঐ রকমই সময় লাগার কথা।

মহাদেব জালান হঠাৎ বলে ওঠে, মিস্টার বাসু, আপনি কি আপনার স্বীকারোক্তিতে ঐ কথাটা জানাবেন যে, পুলিশ মৃতদেহ আবিষ্কার করার আগেই আপনি অনীশ আগরওয়ালের মৃতদেহটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন? আপনি কি আরও বলবেন যে, পাশের ঘরের সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা একজন পুলিশ সার্জেন্টকে নিয়ে উপস্থিত হবার পূর্বমুহূর্তে আপনি মৃতের ঘর থেকে বার হয়ে এসেছিলেন? দরজার লক্-নবটা অ্যাডজাস্ট করে? অর্থাৎ আপনি ডাউন-রাইট মিথ্যে কথা বলেছিলেন পুলিশ সার্জেন্টকে?

মজুমদার সোজা হয়ে বসলেন এতক্ষণে। বললেন—আপনি এসব কথা জানলেন কেমন করে?

জালান যেন খুশিতে ফেটে পড়ছে—রঙের টেক্কাখানা টেবিলে নামিয়ে দিয়ে। এ পিঠটা সে নির্ঘাৎ কোলপাঁজরে টেনে নেবে। বলতে থাকে, তার কারণ রাত পৌনে দশটা নাগাদ ঐ ব্যারিস্টার সাহেব তাঁর বাড়িতে ফোন করেন। তার আগেই আমি হোটেলে থেকে কাগজপত্রগুলো নিয়ে ফিরে এসেছি। সেই পুলিশ সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করে আপনারা দেখবেন—ডুপ্লিকেট চাবি এনে দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে ওদের পৌনে দশটাই হয়ে গেছিল। তার প্রায় আধঘন্টা আগে বাসু-সাহেব রোহিণী-ভিলা ছেড়ে চলে যান। উনি বাড়িতে টেলিফোন করায় সেটা ধরেছিলেন মিসেস মিত্র—ঐ সুজাতা দেবী। পরে তিনি আমাকে টেলিফোনটা দেন। মিস্টার বাসু তখন—সেই পৌনে দশটায় আমাকে হত্যাকাণ্ডের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিলেন। লোকটা উবুড় হয়ে পড়ে আছে, বুলেট উন্ড। তার পরনে শুধু আন্ডারওয়ার! কী করে? পুলিশও হয়তো তখন সেসব তথ্য জানতে পারেনি!

মজুমদারের সঙ্গে ভৌমিকের দৃষ্টি বিনিময় হলো।

মজুমদার রানী দেবীকে প্রশ্ন করেন, ওঁর কথা সব আপনি লিখে নিয়েছেন?

রানী সংক্ষেপে বললেন, প্রতিটি শব্দ।

মজুমদার সোৎসাহে বলেন, বলুন মিস্টার জালান। আর কি বলবেন?

জালান বলল, আমি কেন বলব? জবানবন্দি তো দিচ্ছেন বাসু-সাহেব। তিনি স্বীকারোক্তি করতে চেয়েছিলেন বলে, জাস্ট ওঁকে মনে করিয়ে দিলাম একটা ছোট্ট 'ডিটেল্স্'!

মজুমদার বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, ইয়েস?

বাসু নির্বিকারভাবে বলে চলেন, যে-কথা বলছিলাম; ঠিক পৌনে নটার সময় আমি রোহিণী-ভিলায় পৌঁছাই। দরোয়ান তার টুলে বসে ছিল না। আমি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাই। অনীশ আগরওয়ালের দরজায় বার তিন-চার কলবেল বাজাই। কেউ সাড়া দেয় না। অথচ দেখতে পাচ্ছিলাম—ট্রান্সমের ফোকর দিয়ে—ভিতরে আলো জ্বলছে। আমি দরজার হ্যান্ডেলটা ঘোরাতেই দরজাটা খুলে গেল। সেটা লক করা ছিল না। আমি ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম, অনীশ আগরওয়াল মরে পড়ে আছে। খালি গা, পরনে আন্ডারওয়্যার। নাড়ি দেখলাম। লোকটা নিঃসন্দেহে মারা গেছে। আমি নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বার হয়ে এলাম—ইয়েস, ডোর-নবে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে দিয়ে। ঠিক সেই সময় লিফ্‌টের খাঁচায় একজন পুলিশ অফিসারের হেলমেট দেখতে পেয়েই আমি দরজার লক-নবটা খাড়া করে দিয়ে দরজাটা টেনে দিই। ভিতর থেকে দরজাটা লক্‌ড হয়ে যায়। পুলিশ অফিসারটি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি কতক্ষণ এসেছি। আমি তাকে বলেছিলাম, 'এইমাত্র। দরজার বেল বাজাচ্ছি, কেউ খুলছে না!'

বাসু-সাহেব থামলেন। কক্ষে আলপিনপতন নিস্তব্ধতা। শুধু রানু দেবীর কলমের খস্ খস্ শব্দটা শোনা যায়। আর এয়ার কুলারের আওয়াজটা।

মজুমদার ইতস্তত করলেন না। তিনি এতই উত্তেজিত যে, অনুমতিও নিলেন না। জালানের হস্তধৃত সিগ্রেটের কার্টনটা টেনে নিয়ে একটা সিগ্রেট ধরালেন। জালান তাতে অগ্নিসংযোগ করে দিল। মজুমদার একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এক্সকিউজ মি, মিস্টার বাসু। আমি ঢের ঢের ব্যারিস্টার দেখেছি। তবে আপনার মতো একটিও দেখিনি। আপনি কি বুঝতে পারছেন যে, আপনার এই জবানবন্দি মিস্টার জালানের কোলাবোরেশনের ভিত্তিতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। আপনাকে বাকি জীবন জেলখানার গরাদের ওপারে কাটাতে হবে। এ একেবারে নির্ঘাৎ?

বাসু বললেন, আপনি যদি দয়া করে ঐ-সব জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য বিতরণ বন্ধ করেন তাহলে আমি আমার জবানবন্দিটা শেষ করতে পারি।

মজুমদার বলেন, পান্ডিত্যপ্রকাশ বন্ধ করে আপনি আপনার জবানবন্দিটা তাড়াতাড়ি শেষ করুন, মশাই। এ পর্যন্ত যা বলেছেন বাকি জীবন জেলখাটার পক্ষে তাই যথেষ্ট!

জালান আগবাড়িয়ে বলে, অফিসার্স! আপনারা যদি একটু বুঝবার চেষ্টা করেন তাহলে 'রিয়ালাইজ' করবেন ঐ দরজাটার উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। ব্যারিস্টার-সাহেব যদি ঐ ঘরে ঢুকতে না পেরে থাকেন, দরজাটা বন্ধ থাকায়—তাহলে ধরে নেওয়া যায় অপকীর্তিটি শান্তনু বড়গোঁহাইয়ের। খুনটা করে পালাবার সময় বাসু-সাহেবকে এগিয়ে আসতে দেখে, তাই তাড়াতাড়ি হাতের যন্ত্রটা আলমারির ফাঁকে ফেলে খালি হাতে লিফ্ট দিয়ে নেমে যায়। আর যদি বাসু-সাহেব ও-ঘরে ঢুকে থাকেন—দরজাটা খোলা পেয়ে, তাহলে অবশ্য...

ভৌমিক গর্জে ওঠে, আপনার মতামত আপনার নিজের মনেই রাখুন। কোনো কথা বলবেন না।

মজুমদার বলেন, নিন, শুরু করুন ব্যারিস্টার-সাহেব, আপনার 'অমৃতসমান' জবানবন্দি। আমরা কজন পুণ্যবান শ্রোতা শুনে ধন্য হই।

বাসু-সাহেব শুরু করতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই বেজে উঠল ডোরবেলটা। কৌশিক একলাফে এগিয়ে গেল। সদর দরজাটা খুলে দিল।

ঘরে প্রবেশ করলেন ভবানীভবনের অপরাধ-বিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়ার অফিসার সমরেন্দ্র নন্দী আই. পি. এস.। চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে সবাইকে দেখে নিলেন। পুলিশবিভাগের শিষ্টাচার মোতাবেক মজুমদার ও ভৌমিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বাসু বললেন, হ্যালো নন্দী। এস, বস।

নন্দী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলেন, এখানে কী হচ্ছে? কোনো নাটকের রিহার্সাল? আমাকে মিসেস বাসু টেলিফোনে...

মজুমদার এতক্ষণে আবার জমিয়ে বসেছেন তাঁর চেয়ারে। নন্দীর কথার মাঝখানেই বলে ওঠেন, স্যার, এই মেয়েটিই হচ্ছে গুয়াহাটির মাধবী বড়ুয়া, যাকে আজ দু-তিনদিন ধরে আমরা গরু-খোঁজা খুঁজছি। প্রায় আধঘন্টা আগে ঐ ফেরারি আসামীটিকে ব্যারিস্টার পি. কে. বসুর চেম্বার থেকে গ্রেপ্তার করা গেছে।

সমরেন্দ্র মাধবীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর মজুমদারের দিকে ফিরে বললেন, কেসটা আমার জানা। ঐ মেয়েটি কি ভায়োলেন্ট? হ্যান্ড-কাফ্ পড়ানোর কী প্রয়োজন হয়েছিল?

—এটা একটা মার্ডার কেস, স্যার! আর সে বিষয়ে মিস্টার পি. কে. বাসু একটা কন্‌ফেশান করছিলেন এতক্ষণ!

—কী করছিলেন?

—একটা স্বীকারোক্তি দিচ্ছিলেন, মানে অপরাধের কন্‌ফেশান।

—কোন অপরাধের স্বীকারোক্তি?

—এই মার্ডার কেস সংক্রান্ত স্বীকারোক্তিই, এ পর্যন্ত উনি স্বীকার করেছেন যে, অনীশ আগরওয়ালের প্রতিবেশিনী সেই সার্জেন্ট দত্তরায়কে নিয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হবার আগেই উনি অনীশের ঘরে ঢুকেছিলেন। মৃতদেহটি দেখেছিলেন। নিজেই তারপর দরজাটা লক্ করে দিয়ে বেরিয়ে আসেন। আর তারপর সার্জেন্ট দত্তরায়কে ডাহা মিছে কথা বলেন। বলেন, যে উনি প্রথম এসে দরজাটা বন্ধই দেখেছিলেন। ঘরে যে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে একথাটা পুলিশকে রিপোর্ট পর্যন্ত না করে উনি কেটে পড়েন!

সমরেন্দ্র নন্দীর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। তিনি বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখেন। বাসু নির্বিকার! তারপর রানীর দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, আপনি এসব কথা ডিক্‌টেশানে লিখে যাচ্ছেন? কেন?

—উনি তাই চাইছেন বলে!

সমরেন্দ্র এবার বাসুকে প্রশ্ন করেন, ব্যাপারটা কী হচ্ছে?

বাসু বললেন, আমি একটা স্বীকারোক্তি করতে চাইছিলাম। ইন ফ্যাক্ট করছি—কিন্তু এই পুলিশ অফিসার দুজন আমাকে ক্রমাগত বাধা দিচ্ছেন।

সমরেন্দ্র সবিস্ময়ে বলেন, কনফেশানে আপনি কী বলছেন?

—আমাকে জবানবন্দিটা শেষ করতে দিলে তা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

সমরেন্দ্র বললেন, অলরাইট! চলুক যা চলছিল!

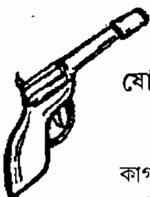

ষোল

বাসু পুনরায় শুরু করেন তাঁর অসমাপ্ত জবানবন্দি :

অনীশের ঘরে ঢুকে মৃতদেহটা আবিষ্কার করার আগে আমি টেবিলের উপর কাগজ-চাপার তলায় একটা চিরকুট আবিষ্কার করি। মনে হলো, নিচের দরোয়ান সেটা পাঠিয়েছে দুপুরবেলা, জানাতে যে, জনৈকা সুরঙ্গমা দেবী টেলিফোন করে অনীশবাবুর খোঁজ করছিলেন। অনীশ যেন বাড়ি ফিরে তাঁর নম্বরে রিঙব্যাক করে। নম্বরটা ছিল 24-9378; টেলিফোন নম্বর একবার শুনলে আমি সচরাচর ভুলি না। আমি কাগজটা ঐ কাগজ-চাপার নিচে যথাস্থানে রেখে দিয়েই ঘরের বার হয়ে আসি।...আগেই আমার বলা উচিত ছিল যে, আসবার সময় রোহিণী-ভিলার প্রবেশপথে একটি তরুণীকে দেখেছিলাম। সে ঐ অ্যাপার্টমেন্ট-হাউস থেকে বেরিয়ে আসছিল। আমার মনে হয়েছিল, মেয়েটি রীতিমতো আতঙ্কতাড়িতা। আমাকে দেখে সে ভীষণ ঘাবড়ে যায়। সার্জেন্ট দত্তরায় যে প্রতিবেশিনীর আহ্বানে খোঁজ নিতে এসেছিল সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভদ্রমহিলা বলেছিলেন যে, অনীশের বাথরুমে একটি মহিলা 'সিনেমা কন্ট্রাক্ট' সংক্রান্ত কী যেন বলছিলেন। তাই নিচে রাস্তায় নেমে এসে আমার স্বতই মনে হলো ঐ আতঙ্কতাড়িতা মেয়েটি হয় সুরঙ্গমা পান্ডে অথবা মাধবী বড়ুয়া। আমি কৌশিককে বললাম, সুরঙ্গমার ফ্ল্যাটে আমাকে নিয়ে যেতে। ঠিকানাটা না জানতাম আমি, না মিস্টার জালান। কিন্তু কৌশিক জানত।

প্রায় দশ-বারো মিনিট পরে আমি সুরঙ্গমার সেই মেজানাইন-ফ্লোর ফ্ল্যাটে পৌঁছাই। তার মিনিটখানেক আগে সুরঙ্গমা স্নান করে বাথরুম থেকে বার হয়েছে; আর শুনলাম তারপর

মাধবী বাথরুমে ঢুকেছে। স্নান করছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, ঐ বাথরুমে গীজার বা কোনো ওয়াটার-হীটার নেই। তাহলে এই জানুয়ারীর শীতে ঠাণ্ডা জলে ওরা স্নান করল কেন? দুজনেই—একের পর এক ? আমার আশঙ্কা হলো রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে কি?

এই সময় মহাদেব জালান নন্দী-সাহেবকে বেমক্কা বলে বসে, আমার একটা কথা শুনবেন, স্যার? এঁরা দুজন তো আমাকে কিছু বলতে দিতেই চাইছেন না!

সমরেন্দ্র এদিকে ফিরে বলেন, ঠিক আছে! কী বলতে চান সংক্ষেপে বলুন। জবানবন্দি দিচ্ছেন ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। আপনার যা বক্তব্য তা আমরা পরে শুনব। তবে একবার যখন বাধা দিয়েই বসেছেন তখন আপনার যা বলার আছে ঝটপট বলে ফেলুন। বারে বারে এভাবে ইন্টারাপ্ট করবেন না।

জালান বললে, বাসু-সাহেব অহেতুক একেবারে সেই 'আদি কাণ্ডে রামজন্ম, সীতা-পরিণয়' দিয়ে শুরু করেছেন। ঘটনা পর পর কী ঘটেছে আমরা প্রায় সকলেই তা জানি। আপনি অপরাধ-বিজ্ঞান নিয়ে আছেন, স্যার, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন সমস্যাটা দুটি বিশেষ বিন্দুতে সীমিত। এক নম্বর : দরজার লক-নব; দু নম্বর : অস্ত্রটা। অনীশের আলমারির পিছনে যে রিভলভারটা পাওয়া গেছে—আপনারা প্রকাশ্যে স্বীকার করুন বা না করুন—সেটাই মার্ডার ওয়েপন। ব্যালাসট্রিক এক্সপার্টের মতে, ওতে পাঁচটা তাজা বুলেট ছিল, একটি এক্সপ্লোডেড, যেটা অটোপ্সি-সার্জেন মৃতের দেহের ভিতর থেকে উদ্ধার করেছেন?

সমরেন্দ্র বাধা দিয়ে বলেন, আপনি এসব কথা কীভাবে অনুমান করছেন?

মাথা ঝাঁকিয়ে মহাদেব বললে, মেনে নিলাম স্যার, সৌজন্যের খাতিরে, পয়সা খরচ করলে কলকাতার বাজারে বাঘের দুধ পাওয়া যায় না। ছেড়ে দিন সে-কথা। আপনি নিজে তো তা জানেন? তাহলে? বিশ-বাইশ বছরের দুটো লেড়কি শীতের সন্ধ্যায় কেন স্নান করছে এসব কি রেলিভেন্ট টপিক? রিভলভারের লাইসেন্সটা ডক্টর বড়গোঁহাইয়ের নামে। তা দিয়ে সুরঙ্গমা বা মাধবী কি অনীশকে খুন করতে পারে? পারে না। পারে দুজন। এক, ডক্টর শান্তনু বড়গোঁহাই নিজে, অথবা...

—অথবা, থামলেন কেন? বলুন?

—আমার প্রশ্ন করা শোভন হবে না। আপনারা জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন স্যার, যে শনিবার রাত্রে আগরওয়াল খুন হয়, সেদিন বেলা আড়াইটার সময় শান্তনু ডাক্তার ঐ বাসু-সাহেবের চেম্বারে গিয়ে দেখা করেছিল কিনা, এবং সে সময় তার হাতে একটা ছোট্ট অ্যাটাচি ছিল কি না!

সমরেন্দ্রকে প্রশ্নটা পেশ করতে হলো না। বাসু নিজে থেকেই বললেন, হ্যাঁ দুটো অনুমানই সত্য। ঐ দিন দুপুরে ডক্টর বড়গোঁহাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এবং তার হাতে একটা অ্যাটাচি ছিল। সো হোয়াট?

সমরেন্দ্র জালানের দিকে ফিরে বলেন, তা থেকে কী প্রমাণ হয়?

মহাদেব সবিনয়ে বললে, না স্যার, প্রমাণ করার দায় আমার নয়, আমি শুধু সমস্যার অনুদ্‌ঘাটিত একটা দিক দেখাতে চাইছিলাম, এই আর কি!

সমরেন্দ্র বললেন, দ্যাটস অল! আর মাঝখানে বাধা দেবেন না। নিন মিস্টার বাসু, আপনি শুরু করুন।

বাসু বললেন, যে-কথা বলছিলাম। আমার আশঙ্কা হলো অনীশ আগরওয়ালের মৃত্যুর পর ওদের দুজনের অন্তত একজন সে ঘরে ঢুকেছে। মাধবী অথবা সুরঙ্গমা! একজনের জামাকাপড়ের রক্ত অপরজনের পোশাকে লেগেছে। অথবা ওরা দুজনেই হয়তো ঐ ঘরে

ঢুকেছে অনীশ খুন হওয়ার পর। মিস্টার জালান যে প্রশ্নটা তুলেছেন—মার্ডার ওয়েপন—সেটা তখন ছিল অজানা তথ্য। ফলে আমার মনে হয়েছিল, এদের দুজনের যে কেউ খুনটা করে থাকতে পারে। একটু তৎপর হতেই সেসময় জানতে পারি, ঘটনার সময় সুরঙ্গমার পাক্কা অ্যালেবাঈ আছে। সে তার কাজিন ব্রাদারের সঙ্গে তখন থিয়েটার দেখছিল। আমার আশঙ্কা হলো, মাধবীকে পুলিশ অচিরে অ্যারেস্ট করতে পারে। তাই কৌশিকের গাড়িতে আমার মক্কেলকে অন্য একটা হোটেলে পাঠিয়ে দিলাম। স্বনামে একটা সিঙ্গল-সিটেড ঘর নিতে বললাম!

তারপরই ঐ ইন্টালী মার্কেটের একটা দোকান থেকে আমার বাড়িতে ফোন করি। সুজাতা ধরে। বলে, মিস্টার জালান ইতিমধ্যে হোটেল থেকে তাঁর কাগজপত্র আর ফটো নিয়ে আমার বাড়ি ফিরে এসেছেন। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই। যেমন কথা হয়েছিল...

—জাস্ট এ মিনিট !—হঠাৎ আবার বাধা দেয় মহাদেব। বলে, আপনি একটা কথা মিস্ করছেন। সুজাতা দেবী আপনাকে জানিয়েছিলেন যে, ডিউক হোটেল থেকে আধঘন্টা আগে আপনার বাড়িতে আমি ফোন করেছিলাম। জানতে, যে আপনি ফিরে এসেছেন কি না।

বাসু বিরক্ত হয়ে বললেন, হঠাৎ সে-কথা কেন? আপনি কী বলতে চাইছেন?

মহাদেব কায়দা করে বলে, ফ্যাক্ট! তথ্য! সত্যঘটনা! আপনি কি প্রতিবাদ করছেন? হোটেল থেকে আপনাকে আমি ফোন করিনি? ঠিক নটা বেজে বারো মিনিটে?

বাসু বললেন, জানি না। তবে সে-কথা আপনি বলেছিলেন। তা সে যাই হোক যে-কথা বলছিলাম, আমি মিস্টার জালানকে আমার অফিসে অপেক্ষা করতে বলি। উনি রাজি হন না। কারণ রাত দশটায় ওঁর নাকি একটা জরুরী বিজনেস অ্যাপায়েন্টমেন্ট ছিল ডিউক হোটেলে। তাই উনি আমাকে ডিউক হোটেলে রাত সওয়া দশটায় দেখা করতে বললেন। তার আগে অবশ্য আমি ওঁকে টেলিফোনে জানিয়েছিলাম যে, অনীশ আগরওয়াল খুন হয়ে গেছে!

—সরি টু ইন্টারাপ্ট এগেন। আপনি সেই সময় টেলিফোনে—তখন আই. এস টি.—নটা চল্লিশ আমাকে জানিয়েছিলেন যে, আপনি অনীশ আগরওয়ালের ঘরে গিয়ে পৌঁছান রাত আটটা পঞ্চাশে। দেখেন যে, অনীশ স্টোন ডেড। বুলেট উন্ড। গুলিটা বুকের বাঁ-দিকে লেগেছে। অনীশের গায়ে কোনো জামা বা গেঞ্জি নেই। পরনে শুধু আন্ডারওয়্যার! এসব কথা আপনি আমাকে বলেছিলেন না বলেননি?

বাসু মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, কারেক্ট। ঐসব কথা আমি ঐ সময়েই বলেছিলাম।

মজুমদার বলে ওঠেন, মিসেস বাসু, আপনি টাইমিংগুলো সব নোট করেছেন তো?

রানী সংক্ষেপে বলেন, করেছি! বারে বারে একই প্রশ্ন করার দরকার নেই। আমার অসুবিধা হলে বক্তাকে থামিয়ে দেব, 'বেগ য়োর পার্ডেন' বলে।

সমরেন্দ্র বলেন, নিন, বাসু সাহেব, শুরু করুন।

—আমি ডিউক হোটেলে মিস্টার জালানের ঘরে যখন ঢুকি তখন আই. এস. টি. দশটা তের। তার মানে, আমার টেলিফোন পাবার পর মিস্টার জালান তেত্রিশ মিনিট সময় পেয়েছিলেন। অর্থাৎ ট্যাক্সিতে আসতে ওঁর যদি কুড়ি মিনিট সময় লেগে থাকে—' নিউ আলিপুর টু লিন্ডসে স্ট্রিট' যা মিনিমাম টাইম—সে-ক্ষেত্রে উনি তের মিনিট সময় পেয়েছিলেন। তার ভিতর উনি ওঁর বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্টটা সারেন, লোকটিকে বিদায় করেন, স্নান করেন, এবং গ্রে রঙের সফরি স্যুটটা ছেড়ে সফেদ পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিধান করে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। ইন জাস্ট থার্টিন মিনিট্‌স। অ্যাম আই কারেক্ট, মিস্টার জালান।

জালান কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। সমরেন্দ্র প্রশ্ন করেন—ঐ তের মিনিটের কি কোনো বিশেষ তাৎপর্য আছে, মিস্টার বাসু?

—আমি তাই মনে করি। আমার জবানবন্দিটা শেষ হলে বোঝা যাবে।

—অলরাইট। প্লীজ প্রসীড!

—মিস্টার জালান আমাকে রাতের ডিনার খেয়ে যেতে বলেন। আমি রাজি হয়ে যাই। ডিনার খেতে খেতে উনি আমাকে বুঝিয়ে দেন যে, ঘটনাচক্রে রঙের টেক্কাখানা ওঁর হাতে। অর্থাৎ আমি যে পুলিশ আসার আগে ও-ঘরে ঢুকেছিলাম এবং হত্যার কথাটা পুলিশকে বলিনি—মক্কেল হিসাবে বিশ্বাস করে এই যে কথাটা বলি—এটাই ওঁর রঙের টেক্কা। এটা যতক্ষণ ওঁর কব্জায় তখন ওঁর ইচ্ছামতো আমাকে চলতে হবে। সর্ট অব ব্ল্যাকমেইলিং আর কি!

সে যাই হোক, পরদিন সকালেই খবর পেলাম, মাধবী এবং শান্তনু তাদের হোটেল ছেড়ে পালিয়েছে। পুলিশ দুজনকেই খুঁজছে। এই নিরুদ্দেশ হওয়াটা খুবই অনভিপ্রেত পুলিশের দৃষ্টিতে। পরে দুজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, ওরা নাকি মিসেস রানী বোসের নির্দেশ মতো আত্মগোপন করেছিল। মিসেস বোস, মানে আমার স্ত্রী, আমার সেক্রেটারি এমন নির্দেশ ওদের দুজনের কাউকেই দেয়নি। ফলে ঘটনার আবর্তে এসে উপস্থিত হলো একজন অজ্ঞাত মহিলা। যে রানী বাসু সেজে রবিবার বেলা নটা নাগাদ শান্তনুকে পথিক হোটেলে, আর মাধবীকে সোনার বাঙলা হোটেলে পৃথক পৃথকভাবে টেলিফোন করে নির্দেশ দিয়েছে ফেরার হতে।

মজার কথা এই যে, মাধবী বড়ুয়া কোন হোটেলে রাত দশটার পর উঠেছে তা জানে সে নিজে, আমি আর কৌশিক। চতুর্থ কেউ নয়। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ অজ্ঞাত মহিলা কেমন করে সেই হোটেলের টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করল?

হঠাৎ মহাদেবের দিকে ফিরে বাসু প্রশ্ন করেন, বাই দ্য ওয়ে, মিস্টার জালান, আপনি কি মমতা বা মমতাজ নামে কোনো কলকাতার কলগার্লকে চেনেন?

মহাদেব নিপাট বিস্ময়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। বলল, থ্যাংক গড! কোনো কলগার্লকেই চিনি না আমি। মমতা বা মমতাজকেও নয়। হঠাৎ এ-কথা কেন?

—অথবা জুলি মেহ্‌তা নামে কোনো ফ্রি-লান্সারকে?

ভ্রূকুঞ্চন হলো জালান-সাহেবের। বললেন, জুলি মেহ্‌তা? জাস্ট আ মিনিট! হ্যাঁ, ও নামটা শোনা-শোনা। দিন কয়েক আগে এখানকার একটা 'ক্লারিক্যাল সার্ভিসিং এজেন্সিকে' ফোন করে একটা স্টেনো-টাইপিস্ট চেয়েছিলাম। আমার একটা লীগ্যাল ডকুমেন্টের ডিকটেশান নিতে। ওরা যে মেয়েটিকে পাঠিয়েছিল তার নাম জুলি। জুলি সাক্‌সেনা অথবা জুলি মেহ্‌তা ঠিক মনে নেই। সে আমাকে একটা বিরাট রিপোর্ট টাইপ করতে সাহায্য করে। কেন বলুন তো?

সে-কথায় কান না দিয়ে বাসু বলেন, দুর্ঘটনার পরদিন সকালে আরও একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে। একজন বিবাহিতা মহিলা সুকৌশলী ডিটেকটিভ এজেন্সিতে এসে সাহায্য প্রার্থনা করে। নিজের পরিচয় সে দিয়েছিল মিসেস শান্তনু বড়গোঁহাই বলে। গুয়াহাটির একজন ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেটের জেরক্স কপিও দেখায়। সে সুকৌশলীকে বলে যে, মিস্টার জালান আমাকে মাধবীর তরফে এনগেজ করছেন অনীশ আগরওয়ালের হত্যা মামলায়। সেই খুনের অপরাধে যাতে মাধবী জড়িয়ে না পড়ে তাই আমি আর মিস্টার জালান নাকি যৌথভাবে ডক্টর শান্তনু বড়গোঁহাইকে ফাঁসাতে চাইছি। মেয়েটি বলে, সে শান্তনুর সঙ্গে একই প্লেনে গুয়াহাটি থেকে কলকাতা এসেছে; কিন্তু রবিবার সকালে স্ত্রীকে হোটেলে ফেলে ডক্টর বড়গোঁহাই

ফেরার হয়েছে। যথেষ্ট টাকাকড়ি অবশ্য রেখে গেছে, যাতে শান্তনুর স্ত্রী গুয়াহাটিতে ফিরে যেতে পারে। সুকৌশলী কেসটা নিতে ইতস্তত করে। আমার পরামর্শ চায়। আমি ওদের বলি যে, ওদের প্রতিষ্ঠান আমার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত। ওরা যা ভাল বুঝবে তাই করবে।...ওরা কেসটা নিয়েছিল কি না জানি না। তবে আমি সেই মেয়েটির দুটো ফটো তুলে নেবার ব্যবস্থা করি—টেলিফটো-লেন্সে। মেয়েটি জানতেও পারেনি। একটা সামনে থেকে, একটা পাশ থেকে।

এইখানে জবানবন্দি থামিয়ে বাসু তাঁর পকেট থেকে খান-কতক ফটো বার করলেন। একজোড়া ফটো কৌশিক ও সুজাতার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, এই মেয়েটিই কি মিসেস বড়গোঁহাই পরিচয়ে তোমাদের কাছে এসেছিল?

ওরা দুজনে দৃকপাতমাত্র স্বীকার করল।

বাসু বলেন, কৌশিক তুমি কি সেই রবিবার সাত-সকালে, সরি, সাত নয়, ছয়-সকালে, এই মেয়েটিকে মাধবীর টেলিফোন নম্বরটা জানিয়েছিলে? ভবানীপুর সোনার বাঙলা হোটেলের?

কৌশিক নতনেত্রে বলে, ইয়েস। তখন আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, ঐ মেয়েটি ডাক্তার শান্তনু বড়গোঁহাই-এর বৈধ স্ত্রী। আমাদের মনে হয়েছিল মাধবী জানে না যে, ডাক্তার বড়গোঁহাই বিবাহিত। তাই মাধবীকে সে তথ্যটা জানাবার অধিকার ও দায়িত্ব আমরা মিসেস বড়গোঁহাইকে দিয়েছিলাম।

—ওয়ান উইকেট ডাউন! একটা সমস্যা মিটল। হত্যাকারী—তা সে যেই হোক—এই মেয়েটিকে অর্থমূল্যে নিয়োগ করেছিল। মেয়েটি প্রফেশনাল কলগার্ল। সচরাচর বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় অভিনয় করে লোককে ফাঁসায়।

মমতা বা মমতাজ ওর নাম। তবে উপাধিটা সাক্সেনা না মেহ্‌তা তা ঠিক জানি না। আপনি জানেন মিস্টার জালান।

বাসু-সাহেব একজোড়া ফটো—একটা সামনে থেকে, একটা পাশ থেকে তোলা—বাড়িয়ে ধরেন জালানের দিকে।

নিরুপায়ভাবে ফটো দুটি নিয়ে নির্বাক বসে থাকে জালান।

সমরেন্দ্র নন্দী প্রশ্ন করেন, কী হলো? মিস্টার জালান? এই মেয়েটিই কি আপনার টেম্পরারি স্টেনো-টাইপিস্ট জুলি কি-যেন?

জালান এতক্ষণে সামলে নিয়েছে। বলে, হ্যাঁ, অনেকটা সেই রকমই দেখতে মনে হচ্ছে বটে।

সমরেন্দ্র ঝুঁকে পড়ে বলেন, আপনি কোন্ 'ক্লারিক্যাল সার্ভিস এজেন্সির' মাধ্যমে এই মেয়েটিকে রিক্রুট করেছিলেন বলুন তো?

জালান ইতস্তত করতে থাকে। বাসু বলেন, তার প্রয়োজন হবে না সমরেন্দ্র। তুমি এই ফটো জোড়া নাও। ওর পিছনে একটা হোটেলের নাম, অ্যাড্রেস আর রুম নম্বর লেখা আছে। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছাকাছি। মেয়েটি এখন ওখানেই আছে। আমার গোয়েন্দার নজরবন্দি হয়ে। আধঘন্টার মধ্যেই ওকে অ্যারেস্ট করা যাবে।

সমরেন্দ্র ফটোটা নিয়ে তার পিছন দিকটা দেখে সেটা মজুমদারের হাতে দিলেন। মজুমদার দিলেন ভৌমিককে। বললেন, গাড়িটা নিয়ে হোটেলে যাও। মেয়েটিকে অ্যারেস্ট করেই এখানে একটা ফোন কর। তারপর এখানে নিয়ে এস। মিস্টার কৌশিক মিত্রকে দিয়ে আইডেন্টিফেকেশানটা সেরে ফেলা যাবে।

সমরেন্দ্র বলেন, শুধু কৌশিকবাবু কেন? মিস্টার জালানও বলতে পারবেন মেয়েটি জুলি সাক্সেনা অথবা জুলি মেহ্‌তা কি না।

মহাদেব কোনো কথা বলল না।

বাসু এবার জালানের দিকে ফিরে বললেন, মিস্টার জালান, একটা কথা। আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো—সেই ঘটনার রাত্রে, শনিবার, আমি যখন রওনা হয়ে পড়লাম বেগবাগানের দিকে আর তার ঠিক আগে আপনি চলে গেলেন ডিউক হোটেলে, সেইদিন হোটেলে পৌঁছে অহেতুক আমাকে একটা ফোন করেছিলেন কেন? রাত ন'টা বারোয়?

—অহেতুক কেন হবে? আমি জানতে চেয়েছিলাম আপনি ফিরে এসেছেন কি না।

—হোটেলে নিজের ঘর থেকেই ফোনটা করেছিলেন তো?

—অফকোর্স।

—আর রাত নটা সতেরয় সুরঙ্গমার ফ্ল্যাটে ফোন করেছিলেন কোথা থেকে?

—কে? আমি? কী বকছেন মশাই পাগলের মতো? সুরঙ্গমার ফোন নম্বর কি আমি জানতাম যে, ফোন করব?

—জানতেন নিশ্চয়ই। কারণ সেই রাত্রে আপনি তো সুরঙ্গমার ফ্ল্যাটে দু-দুবার ফোন করেছিলেন। প্রথমবার মাধবী যখন স্নান করছে—রাত নটা সতেরয়। দ্বিতীয়বার হোটেল থেকে রাত এগারোটা দশে, তাই নয়?

জালান বলে, কীসব যা-তা বকছেন মশাই! আপনি নিজেই তো বললেন, মাধবী কোথায় উঠেছে তা আমি জানতাম না। তাহলে আমি সুরঙ্গমা পাণ্ডের টেলিফোন নম্বর জানব কী করে?

—ঠিক যেভাবে আমি জেনেছিলাম, ঠিক যেভাবে পুলিশ জেনেছিল!

সমরেন্দ্র সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, তার মানে?

—তার মানে পুলিশ মৃতদেহ আবিষ্কারের আগে আমি ঐ ঘরে ঢুকে মৃতদেহটা প্রত্যক্ষ করেছিলাম—ফ্যাক্ট! কিন্তু আমি ও-ঘরে ঢোকার আগে মিস্টার জালান ঐ অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছিলেন—সেটাও ফ্যাক্ট! বাইরের ঘরে কাগজ-চাপা দেওয়া দরোয়ানের স্লিপটা উনিও দেখেছিলেন। তারপর অনীশের বেডরুমে ঢুকে তার দেখা পান—উর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ, নিম্নাঙ্গে আন্ডারওয়্যার। অনীশ কোনো কথা বলার আগেই জালান ফায়ার করে। অনীশ লুটিয়ে পড়ে। মার্ডার-ওয়েপনটা আলমারির পিছনে ছুঁড়ে ফেলার আগে আঙুলের ছাপ মুছে নিতে ভোলেনি। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

ঘরে আল্‌পিনপতন নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ জোরে জোরে হাততালি দিয়ে ওঠে মহাদেব জালান! তারপর অবাক হবার ভান করে বলে, এ কী! আপনারা এই আপ্তবাক্যের 'মনোলগে' হাততালি দিচ্ছেন না যে?

সমরেন্দ্র সে-কথায় কর্ণপাত না করে বাসুকে বলেন, আপনার বক্তব্যের স্বপক্ষে কোনো এভিডেন্স আছে?

—ভৌমিক জুলি মেহ্‌তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলেই তা পাবেন? এই মমতাজই, সেই মিসেস বড়গোঁহাই।

জালান রুখে ওঠে, অ্যাশুমিং তাই দেখা গেল। তাতে কী প্রমাণ হবে, মিস্টার বাসু?

—হয়তো দেখা যাবে সে ডিক্‌টেশান নিতে জানে না, টাইপিং করতেও জানে না।

—তাতেই বা কী প্রমাণ হবে? বড়গোঁহাইয়ের রিভলভারটা আমার হাতে কীভাবে এল এ প্রশ্নের জবাব তাতে মিলবে? তাছাড়া অনীশের মৃত্যুসময়—সাড়ে আটটা থেকে পৌনে

নয়টা—আপনার নিজের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী তখন আমি হয় ট্যাক্সি চেপে নিউ আলিপুর থেকে লিন্ডসে স্ট্রিটে যাচ্ছি, অথবা হোটেল থেকে আপনাকে ফোন করছি, কিংবা হোটেল থেকে নিউ আলিপুরে ফিরে আসছি! সবচেয়ে বড় কথা, অনীশ আগরওয়াল যে রোহিণী-ভিলায় থাকে এটা আমি প্রথম জানতে পারি রাত নটা চল্লিশে। যখন আপনি আমাকে টেলিফোন করে খবরটা দিলেন। তার পূর্বে আপনি নিজেই মৃতদেহটা দেখেছেন।

বাসু-সাহেব মিস্টার নন্দীর দিকে ফিরে বললেন, মিস্টার জালান তিন-তিনটি বিরুদ্ধ যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথম প্রশ্ন : বড়গোঁহাইয়ের রিভলভারটা উনি কী করে পেলেন। সেই ব্যাখ্যাটা প্রথমে দিই, মাধবী আমাকে বলেছিল, শান্তনু একটা রেন্ট-আ-কার নিয়ে তাকে বেগবাগানে পৌঁছে দেয়। তার ড্যাশবোর্ডে শান্তনুর নিজস্ব রিভলভারটা রাখা ছিল। মাধবী সেটা দেখে ভয় পায়। বিশেষত, শান্তনুর রাগের মাথায় বলেছিল—অনীশকে গুলি করে মারা উচিত। তাই অনীশের ঠিকানাটা সে শান্তনুকে জানায়নি। রোহিণী-ভিলার কাছাকাছি মাধবী নেমে যায়। বলে সে টয়লেটে যাচ্ছে। একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পিছনের দ্বার দিয়ে পালিয়ে যায়। এ পর্যন্ত যা বলছি তা ফ্যাক্ট, প্রমাণ করা যাবে। বাকিটা আমার অনুমান। জালান সে সময় রোহিণী-ভিলার কাছাকাছি। সে গাড়ি থেকে মাধবীকে নেমে যেতে দেখে। একটু পরে শান্তনুও যায় তার খোঁজে। জালান ফাঁকা গাড়িটার কাছাকাছি এসে দেখতে যায়—কী-বোর্ডে চাবিটা লাগানো আছে কি না। থাকলে, গাড়িটা চালিয়ে সে কিছু দূরে গাড়িটাকে রেখে আসত। যাতে শান্তনু আর মাধবী এসে গাড়িটা না পেয়ে কিছু খোঁজাখুজি করে। তাতে জালান মিনিট দশেক সময় পেয়ে যেত। ঐটুকু সময়ই তার পক্ষে যথেষ্ট। কারণ তার অ্যাটাচিতে তখন ছিল তার নিজস্ব লোডেড রিভলভার। আমার বিশ্বাস, সেটা এখনো ওর অ্যাটাচিতে আছে।

মহাদেব প্রতিবর্তী প্রেরণায় তার অ্যাটাচির দিকে হাত বাড়ানো মাত্র নন্দী-সাহেব ঝুঁকে পড়ে বাধা দেন। অ্যাটাচিটা নিজের দিকে সরিয়ে রাখেন। বাসুকে বলেন, প্লীজ প্রসীড।

—শান্তনু যখন মাধবীর সন্ধানে রেস্তোরাঁয় যায়—আমার অনুমান—তখন সে গাড়িটা লক করে যায়নি। কিন্তু চাবিটা নিয়ে গিয়েছিল। জালান ড্রাইভারের দিকের দরজাটা খুলে দেখে কী-বোর্ডে চাবি নেই। ড্যাশবোর্ডে আছে কিনা দেখতে সে ঐ ড্যাশবোর্ডের নব ধরে টানে। সেটা খোলা ছিল। শান্তনু এটা অত্যন্ত অন্যায় করেছিল। উত্তেজনায় সে খোলা ড্যাশবোর্ডে রিভলভারটা রেখে মাধবীর খোঁজ নিতে যায়। জালান 'ছপ্পড়-ফোঁড় জ্যাকপট' পেয়ে গেল। সে আর ডানে-বাঁয়ে তাকায়নি। আমার বিশ্বাস জালান যখন অনীশকে হত্যা করে তখন সুরঙ্গমা ছিল ওর বাথরুমে। মাধবী আসে তার পরে। আসলে মাধবী একটা প্রচণ্ড ভুল করেছিল। তার ধারণা, খুনটা শান্তনুই করেছে। তাই তার ডিফেন্সের ব্যবস্থা করতে সে জালানকে বিবাহ করতে পর্যন্ত রাজি হয়ে যায়। আমি জানি না—জালানের মূল উদ্দেশ্যটা কী। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা, অথবা শান্তনুকে নিজের সাফল্যের পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু এটুকু জানি, মাধবী একটা প্রকাণ্ড ভুল করেছে। সে ভেবেছিল, শান্তনু তাকে কোনোভাবে অনুসরণ করে অনীশের ঠিকানাটা জানতে পারে। বোকা মেয়েটা ভেবে দেখেনি যে, তাকে অনুসরণ করে শান্তনু কিছুতেই অনীশের মৃত্যুর পূর্বে তার ঠিকানায় পৌঁছাতে পারত না।

বাসু থামলেন। আবার ঘনিয়ে এল নৈঃশব্দ্য। শুধু কাগজের উপর ডট পেনের খস্‌খস্‌ শব্দ। রানী মহাভারত লিখে চলেছেন।

মাধবী বলে ওঠে, আমি একটা কথা বলতে পারি?

সমরেন্দ্র বলেন, বল?

—বাসুদাদু যা বললেন, তা সত্যিই ঘটেছিল কি না আমি জানি না, তবে এটুকু জানি যে,

গাড়ির ড্যাশবোর্ডে শান্তনুর রিভলভারটা ছিল। আর ও-কথাটাও সত্যি...মানে আমি ভেবেছিলাম শান্তনুই খুনটা করেছে। আমাকে অনুসরণ করে!

মহাদেব মাধবীর দিকে একটা আগুনঝরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, মিস্টার বাসু। আপনি একজন আইনজ্ঞ লোক। আপনি নিশ্চয় জানেন, এজাতীয় অনুমান-নির্ভর আষাঢ়ে গল্প আদালত শুনতে চান না।

বাসু বললেন, হ্যাঁ শুনেছি বটে। জজ-সাহেবরা গল্প-টল্প শুনতে ভালবাসেন না। ওঁরা চান শুধু কংক্রিট এভিডেন্স। কিন্তু এটা তো আদালত নয়। আমার আষাঢ়ে গল্পটা এঁরা যখন উপভোগ করছেন তখন শেষ করেই ফেলি। আপনি তিনটি বিরুদ্ধ যুক্তি পেশ করেছিলেন। এক নম্বর : শান্তনুর রিভলভার প্রাপ্তি, দু নম্বর সুরঙ্গমার টেলিফোন নম্বর প্রাপ্তি। অনুমান-নির্ভর দুটি প্রাপ্তিযোগেরই আষাঢ়ে গল্প শুনিয়েছি। সম্ভাব্য, যুক্তিগ্রাহ্য, অনুমান-নির্ভর ঘটনাপরম্পরা। অবশ্য স্বীকার্য : এভিডেন্স কিছু দাখিল করিনি আমি। আপনার তৃতীয় যুক্তিটা ছিল, অ্যালেবাঈ। তার জবাবটা দিই, আপনি আমার মিনিট পাঁচেক আগে ট্যাক্সি নিয়ে রওনা দেন। আমি কিছুটা দেরি করি বেডরুমে গিয়ে আমার অসুস্থা স্ত্রীর তত্ত্ব-তালাশ নিতে, পোশাক বদলাতে। আপনার অ্যাটাচিতে শুধু লোডেড রিভলভার নয় ঐ ফটোগুলোও ছিল। আপনি আদৌ ডিউক হোটেলে যাননি। সোজা বেগবাগান চলে যান। রোহিনী-ভিলায়...

সমরেন্দ্র বাধা দিয়ে বলেন, জাস্ট আ মিনিট! কিন্তু উনি অনীশ আগরওয়ালের ঠিকানাটা জানলেন কী করে?

বাসু বললেন, খুব সহজে। কৌশিক যখন শনিবার সন্ধ্যাবেলায় আমাকে ফোন করেছিল তখন আমি সেটা ধরেছিলাম খাশ কামরায়। কৌশিক রোহিণী-ভিলার অবস্থান আর অনীশের রুম নম্বরটা টেলিফোনে বলেছিল। ঐ সময় মিস্টার জালান একা বসেছিলেন আমার রিসেপশানে। কৌশিকের রিঙিং টোন একসঙ্গে দু-ঘরেই বেজেছে। আমি যেমন চেম্বারে বসে রিসিভারটা ক্র্যাডল থেকে তুলছি, মিস্টার জালানও তেমনি বাইরের ঘরে বসে তাই করছেন। কৌশিকের এবং আমার সব কথাই উনি চুপচাপ শুনে যান। এ জাতীয় অসভ্যতায় উনি অভ্যস্ত। গত তিন দিনে আমি বার দুই-তিন ওঁকে আড়ি পাততে দেখেছি। ফলে, অনীশের ঠিকানা ও রুম নম্বর উনি জানতেন।

জালান কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই বাসু-সাহেবের চেম্বারে টেলিফোনটা বেজে উঠল। কৌশিক একলাফে সে-ঘরে চলে যায়। গিয়ে দেখে বিশে তার আগে আগেই টেলিফোনটা তুলে বলছে, রঙ নাম্বার। এ বাড়িতে মজুমদার বলে কেউ থাকে না।

কৌশিক ওর হাত থেকে যন্ত্রটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, ধরুন। ডেকে দিচ্ছি।

বালিগঞ্জ-ফাঁড়ির কাছাকাছি একটা হোটেল থেকে ভৌমিক ফোন করছিল। সে জানালো হোটেলের ঘরে ফটোর মেয়েটিকে পাওয়া গেছে। সে কোনো কথা বলছে না। বলছে, তার নিজের তরফের উকিলের সঙ্গে কথা না-বলে সে কোনো প্রশ্নের জবাব দেবে না।

মজুমদার তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসতে বললেন।

এ-ঘরে এসে সংবাদটা জানালেন নন্দী-সাহেবকে।

সমরেন্দ্র বললেন, মিস্টার বাসুর জবানবন্দি থামিয়ে আমাদের কয়েকটি কাজ এখনি করতে হবে। প্রথম কাজ, মাধবী বড়ুয়ার হাতকাড়াটা খুলে দেওয়া। শী ইজ স্টিল আন্ডার অ্যারেস্ট— কিন্তু ঐ হ্যান্ড-কাফ্‌টা নিষ্প্রয়োজন। ওটা আমার ঠিক বরদাস্ত হচ্ছে না।

মজুমদার এসে নিজেই হ্যান্ড-কাফ্‌টা খুলে দিলেন।

সমরেন্দ্র বললেন, নেক্সট স্টেপ ডক্টর বড়গোঁহাই। কিন্তু সে বিষয়ে হোমিসাইড হেড কোয়ার্টার্সে ফোন করার আগে আমি মিস্টার বাসুর কাছে জানতে চাই—উনি যে অনুমান-

নির্ভর ঘচনাপরম্পরার বর্ণনা দিলেন মিস্টার জালানকে 'অ্যাকিউজ' করে, তার স্বপক্ষে কি ওঁর কোনো কংক্রিট প্রমাণ আছে?

বাসু বললেন, আছে। পর্বতপ্রমাণ প্রমাণ। শুধু কংক্রিট নয় রি-ইনফোর্সড কংক্রিট!

এক দুই করে বলে যাই :

এক নম্বর, আপনার সেই মুলতুবি প্রশ্নটা—'তের মিনিট' সময়টার কোনো সিগ্‌নিফিকেন্স আছে কিনা। সেটা এই : মিস্টার জালান সন্ধ্যাবেলা সাড়ে সাতটায় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন একটা ব্রাউন রঙের সাফারি স্যুট পরে। আমার অনুমান দ্বিতীয়বার আমার অনুপস্থিতিতে যখন আসেন তখন ওঁর প্যান্টের পায়ায় রক্তের দাগ লেগেছিল। সুজাতার তা নজরে পড়েনি—একে রাত্রিকাল, তায় ব্রাউনে লালরঙ সহজে নজরে পড়ে না। কিন্তু উনি আমার অভিজ্ঞ চোখকে ভয় পেয়েছিলেন। তাই টেলিফোনে আমাকে রাত সওয়া দশটায় ওঁর হোটেলে যেতে বলেন। ওর সঙ্গে নাকি নিজের হোটেলের ঘরে একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কোনো এক বিজনেসম্যানের। তা ছিল না। উনি তের মিনিটের ভিতর রক্তমাখা প্যান্টটা ছেড়ে স্নানান্তে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

মহাদেব বাধা দিয়ে বলে, এটাকে কি আপনার অভিধানে এভিডেন্স বলে? আমার সামান্য আইনজ্ঞানে এটা তো স্রেফ আপনার একটা অনুমান।

বাসু বললেন, ক্যারেক্ট। মামলা যখন আদালতে উঠবে, তখন দুটি এভিডেন্স আমি দাখিল করব। প্রথমটা, আপনার সেই রক্তমাখা প্যান্টটা। যেটা হোমিসাইড নিশ্চয় ইতিমধ্যে খুঁজে পাবে হোটেলে, আপনার ওয়াড্রোবে। দু নম্বর, যে অলীক সাক্ষীটিকে আপনি হাজির করবেন বিজনেস-টকের ব্যাপারে, তাঁকে আমি আদালতে বুঝিয়ে দেব 'পার্জারি কেস'-এ ক-বছরের সাজা হয়।

জালান জবাব দেয় না।

বাসু নন্দী সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, দু নম্বর, ঐ মেয়েটি। যাকে আর আধঘন্টার মধ্যে ভৌমিক এখানে নিয়ে আসছে। তাকে একজন ভাল সলিসিটার পাইয়ে দেবেন। মেয়েটি আই মীন জুলি মেহ্‌তা সম্ভবত জানে না—অর্থমূল্যে সে যাকে এ-ক'দিন সাহায্য করে আসছিল, সে একজন খুনী আসামী। ঐ সামান্য টাকার জন্য সে মার্ডার কেস-এ পার্টনার -ইন-ক্রাইম হবে না। আপনার অবগতির জন্য জানাই—ঐ জুলি মেহ্‌তা নামের মেয়েটি ডিউক হোটেলে 205 নম্বর ঘরে ক'দিন রাত্রিবাস করেছে। ঠিক পাশের ঘরটাই মিস্টার জালানের, দুশো সাত। ফর য়োর ফার্দার ইনফরমেশান—দুটি ঘরই বুক করেছেন মিস্টার জালান।

জালান গর্জে ওঠে, বাজে কথা! আপনি প্রমাণ দিতে পারেন?

বাসু বললেন, এবারকাল ডীলে রঙের টেক্কাখানা কিন্তু আমার হাতে এসেছে, মিস্টার জালান। আপনি তা এখনো টের পাননি। এবার সেটা টেবিলে নামিয়ে দিই ঃ

কোটের ইনসাইড পকেট থেকে উনি বার করে আনলেন ডিউক হোটেলের সেই পেমেন্ট ভাউচারখানা।

নন্দী-সাহেবের দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, মিস্টার জালানের অ্যাটর্নি হিসাবে আজ পর্যন্ত ওঁর সমস্ত ডিউ মিটিয়ে দিয়ে ঐ ভাউচারখানা সংগ্রহ করে এনেছি। ওতে দেখুন, মিস্টার জালান দুটি ঘরই নিজের নামে বুক করেছিলেন। আর ঐ ভাউচারের পিছনে দেখুন কতকগুলি লোকাল টেলিফোনের নম্বর। বোর্ডার 205 এবং 207 ঘর থেকে লোকাল ফোন করেছেন তার তালিকা। তার সঙ্গে লেখা আছে তারিখ, সময় এবং ডিউরেশন। নন্দী কাগজটার পিছন দিক দেখে বললেন, এই সইটা কার?

—হোটেল ডিউক-এর একজন রিসেপ্‌শানিস্ট-এর, যে মেয়েটি টেলিফোনরেজিস্টার

দেখে দেখে স্বহস্তে নম্বরগুলি লিখে দিয়েছিল, তার। একে একে লক্ষ্য করুন। নাম্বার ওয়ান : শনিবার রাত নটা বেজে বারো মিনিটে কোনো এন্ট্রি নেই। অর্থাৎ মিস্টার জালান হোটেলে যাননি। হোটেল থেকে আমাকে ফোন করেননি। তাঁর স্যুটকেসে ফটোগুলি প্রথম থেকেই ছিল। রাত নটা বারোতে তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন রোহিণী-ভিলার কাছাকাছি কোনো পাবলিক ফোন-বুথ থেকে। এটা এভিডেন্স—ওঁর অ্যালেবাঈটা নাকচ করতে। নাম্বার টু : শনিবার রাত এগারোটা দশে ওঁর ঘর থেকে একটা ফোন করা হয়েছে 24-9378-এ। ওটা সুরঙ্গমার টেলিফোন নম্বর। এতে প্রমাণ হয় জালান ও-ঘরে ঢুকেছিল, টেবিলের উপর পড়ে থাকা স্লিপটা দেখেছিল। সুরঙ্গমা নামটা ও শুনেছে কৌশিকের টেলিফোনে। এটা আমার অনুমান নয়, এভিডেন্স। এটাকে নাকচ করতে হলে জালানকে জানাতে হবে সে কোন সূত্রে রাত এগারোটায় সুরঙ্গমার টেলিফোন নম্বরটা জানতো? নাম্বার থ্রি : আদালতে মামলা উঠলে সুরঙ্গমা তার সাক্ষ্যে বলবে একই পুরুষকণ্ঠ শনিবার রাতে দুবার ফোন করে মাধবীর সন্ধানে। প্রথমবার রাত সওয়া নটা নাগাদ, দ্বিতীয়বার রাত এগারোটায়। ঐ ভাউচারে লক্ষণীয় রাত সওয়া নটা নাগাদ কোনো এন্ট্রি নেই। তার অর্থ : সেবার জালান অন্য কোনো জায়গা থেকে ফোন করে। সেখান থেকেই দু মিনিট পরে আমাকে। নাম্বার ফোর : রবিবার সকালে নটা নাগাদ দুটি এন্ট্রি আছে। ঐ নম্বর দুটিতে ফোন করলে জানা যাবে ওর একটা পথিক হোটেলের; দ্বিতীয়টা ভবানীপুরের সোনার বাঙলা হোটেলের। এ দুটি জালানের নির্দেশে মমতা বা মমতাজ বা জুলি করেছিল বড়গোঁহাই আর মাধবীকে ফেরার হবার নির্দেশ দিতে। যদি তা না হয়, তবে জালান বলুক— সে কেন ঐ দুটি হোটেলে ফোন করেছিল? কার সঙ্গে কী কথা বলেছিল। মাধবীর নম্বরটাই বা সে পেল কেমন করে? নাম্বার ফাইভ : রবিবার বেলা দশটা পঞ্চাশে দেখছি লালবাজার হোমিসাইড সেক্‌শানের ডাইরেক্ট লাইনে একটা ফোন করা হয়েছে। আমার অনুমান...

বাধা দিয়ে মজুমদার বলে ওঠেন, না, স্যার, ওটা আপনার অনুমান নয়। ওটা ঘটনা। কারণ লালবাজারে ফোনটা আমিই অ্যাটেন্ড করি। একজন অজ্ঞাত-পরিচয় মহিলা একটা টিপস্ দেন, অনীশ আগরওয়াল হত্যা মামলার আসামী সাঁকরাইল-এর কাছাকাছি ধূলাগড়ি গাঁয়ের 'সোনার বাঙলা' হোটেলে লুকিয়ে আছে। আমি আর ভৌমিকই গিয়েছিলাম ওদের অ্যারস্ট করতে ; কিন্তু তার আগেই আপনি মাধবীকে সরিয়ে ফেলেন।

তখনই বাইরে থেকে কে যেন কলবেল বাজালো। কৌশিক এগিয়ে গেল দরজাটা খুলে দিতে। মজুমদার বললেন, জাস্ট এ মিনিট। একটু অপেক্ষা করুন। মনে হচ্ছে ভৌমিকই এসেছে—ঐ জুলি মেহ্‌তাকে নিয়ে। মেয়েটি এ-ঘরে আসার আগেই আসামীকে হ্যান্ড-কাফ্‌টা পরিয়ে রাখি। না হলে ঐ মেয়েটিকে কব্জা করা মুশকিল হবে। জুলি এসেই দেখুক, তার সম্ভাব্য রক্ষাকর্তা স্টেনলেস্-স্টিলের বালা পরে বসে আছেন। আমারও ধারণা মেয়েটি 'মার্ডার-কেস' জেনে-বুঝে জালানকে সাহায্য করেনি। করবে না।

হ্যান্ড-কাফ্‌টা নিয়ে মজুমদার এগিয়ে গেলেন জালানের দিকে।

পরদিন সকালে।

সবাই ঘিরে বসেছে বাসু-সাহেবকে। বাড়ির সবাই তো আছেই, তার উপর জুটেছে মাধবী এবং সদ্যমুক্ত ডাক্তার শান্তনু বড়গোঁহাই। সমবেত প্রশ্ন : বলুন স্যার? কী করে বুঝলেন? কখন ঠিক বুঝতে পারলেন?

বাসু বললেন, কৌশিক, তুমি যদি এই জালানের কেসটা নিয়ে 'কাঁটা সিরিজে'র কোনো

গোয়েন্দা গল্প লেখ, আই মীন, 'শান্তনু-মাধবী'র প্রেমের ফুলটা যদি কোনোদিন কাঁটা হয়ে ফুটে ওঠে তাহলে বইটার নামকরণের অধিকারটা আমাকে দিও।

সুজাতা জানতে চায়, কী নাম?

—'বিশের কাঁটা'।

কৌশিক বলে, কিন্তু 'পয়েজনিঙের' কেস তো এটা নয়?

—না, না, মূর্ধণ্য-'ষ' নয়, বানানটা তালব্য 'শ' দিয়ে।

—'বিষ' নয়? বিশ?—কিন্তু বিশ সংখ্যাটাই বা এল কোথেকে?

—না-রে বাপু। তা নয়। 'বিশ' মানে এখানে 'দুই-য়ের পিঠে শূন্য' নয়। বিশের মানে 'বিশ্বনাথের'—ঐ যে হতভাগা কপাটের ফাঁকে দাঁড়িয়ে বোকার মতো হাসছে! ঐ বিশে হতভাগাই তো প্রথম ক্লু-টা আমাকে সাপ্লাই করল। তাই এক্ষেত্রে 'কাঁটা' মানেও 'কন্টক' নয়,—নির্দেশক, পয়েন্টার, ইন্ডিকেটার। যেমন ঘড়ির, ওজনদাঁড়ির বা কম্পাসের।

রানী দেবী হাসতে হাসতে বলেন, হায় রে হায়! শেষ পর্যন্ত তোমার রহস্য কাহিনীর হিরো হলো, বিশে?

বাসু বললেন, তাই হলো! বিশে 'হিরো' আর তুমি 'হিরোইন'!

খিলখিল করে হেসে ওঠেন রানী দেবী। অনেকদিন এমন করে হাসেননি তিনি। বলেন, ওমা আমি কোথায় যাব? আমি বিশের বিপরীতে হিরোইন?

—আলবাৎ! রানী যদি তাঁর ঐ চাকা-দেওয়া সিংহাসনে পাক মেরে ও-ঘরে গিয়ে প্লাগটা সময় মতো খুলে না দিতেন, তাহলে রাজার হাতে হাতকড়া পরাতো ঐ মজুমদার। যে গাধাটা শেষ দিকে আমাকে 'স্যার-স্যার' করছিল!

রানী বলেন, আচ্ছা তা না হয় হলো। কিন্তু বিশেটা হিরো হলো কোন সুবাদে?

—শোন বলি। সেই শনিবার রাত্ত তখন আটটা বা সওয়া আটটা। তুমি জ্বরের তাড়সে ঘুমাচ্ছ। জালান তার অ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে রওনা দেবার পর আমি বিশেটাকে ডেকে বললাম, শোন, আমি একটু বেরুচ্ছি। সাড়ে নটা নাগাদ ফিরে আসব। ঐ যে বাবুটি এতক্ষণ বাইরের ঘরে বসেছিলেন উনি হয়তো তার আগেই ফিরে আসবেন। ম্যাজিক-আই দিয়ে দেখে নিয়ে দরজা খুলে দিবি। ওঁকে বাইরের ঘরে বসাবি। ও তার জবাবে কী বলেছিল, জান? বললে, 'কোন বাবু? ঐ যিনি এতক্ষণ ধরে বাইরের ঘরে বসে টেলিফোন করছিলেন?' তার জবাবে আমি ওকে ধমক দিয়ে বলেছিলাম, 'তোর মাথায় কি নিরেট গোবর? কটা বাবু এতক্ষণ বসেছিল বাইরের ঘরে? একটাই তো? তার কথাই বলছি।'...বিশের উচ্চারিত ঐ একটি মাত্র পংক্তি এই গোটা রহস্যকাহিনীর পিভটাল পয়েন্ট! সেন্ট্রাল ক্লু! কী দুঃখের কথা, আমি তার তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। বোকামি তুমি একাই করনি ভাগ্নে, জুলি মেহ্‌তাকে বিশ্বাস করে, বোকামি তোমার মামাও করেছিল বিশেকে অবিশ্বাস করে! আমি তখনি বুঝতে পারিনি যে, বিশে বারান্দা থেকে স্বচক্ষে দেখেছিল ঐ বাবুটিকে 'টেলিফোন কানে' অবস্থায়! বিশের কথাটার তাৎপর্য যদি তখনই বুঝতে পারতাম তাহলে সমস্যার সমাধান অনেক-অনেক আগেই হয়ে যেত। সেটা বুঝতে পেরেছিলাম অনেক পরে। জালানকে বারে বারে বাইরের ঘরের এক্সটেনশানে আড়ি পাততে দেখে। তাই আমার প্রস্তাব : এই রহস্যকাহিনীটার নামকরণ কর 'বিশের কাঁটা'। পাঠক-পাঠিকাকে একটা বাড়তি ক্লু প্রথম থেকেই বরং দিয়ে রাখ। তারা ভাবতে থাকুক—একেবারে শুরু থেকেই—গল্পটার নাম কেন হলো : বিশের কাঁটা?

দর্পণে প্রতিবিম্বিত কাঁটা

রচনাকাল : প্রাক্ পূজা, 1999
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, 1999
প্রচ্ছদশিল্পী : গৌতম রায়
উৎসর্গ : শ্রীমতী তুলসী বিশ্বাস
শ্রীমান দেবেন বিশ্বাস

কফি পট থেকে পেয়ালায় কফি ঢালতে ঢালতে রানীদেবী আড়চোখে দেখলেন টেবিলের অপরপ্রান্তে বাসুসাহেব পকেট থেকে সেই চিঠিখানি তৃতীয়বার বার করছেন। রানু বলেন, বুড়ো বয়সে কার প্রেমপত্র পেলে বল তো? বার বার পড়েও তৃপ্তি হচ্ছে না?

—প্রেমপত্র! ও! এই চিঠিখানা? হ্যাঁ, সকালের ডাকে পাওয়া এই চিঠিখানা আমার মানসিক স্থৈর্যে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে বটে। না, এবার এ-কোন মহিলার লেখা চিঠি নয়।

পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে রানু বলেন, 'এবার মহিলার চিঠি নয়' মানে? কোন্‌বার ছিল মহিলার চিঠি?

—মনে নেই? বহুদিন আগে মেরীনগর থেকে মিস্ পামেলা জনসন আমাকে একটি দুর্বোধ্য চিঠি লিখেছিলেন।

—ও হ্যাঁ, সেই সময় *সারমেয় গেন্ডুকের কাঁটায়!*

—এবারও অবস্থা প্রায় সেইরকম। অথবা বলা যায় আরও রহস্যময়। কারণ সেবার পত্রপ্রেরকের ঠিকানাটা অন্তত চিঠির মাথায় লেখা ছিল। এবার তাও নেই।

—তাহলে তুমি জবাব দেবে কী করে?

—জবাব দিতে হবে না। পত্রলেখক বারণ করেছেন জবাব দিতে। অবশ্য বারণ না করলেও জবাব দিতে পারতাম না, ঠিকানার অভাবে।

—বুঝলাম। তা কী চান ভদ্রলোক?

—তুমি নিজেই পড়ে দেখ।

বছরের প্রথম। বৈশাখ মাস। বসন্ত বিদায় নিচ্ছে। নিউ আলিপুরের নিষ্পাদশ

প্রাসাদারণ্যের কোনও ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে একটা কোকিল সকাল থেকে একটানা ডেকে চলেছে। বেচারি এখনও বোধকরি তার সঙ্গীনিকে খুঁজে পায়নি। বাৎসরিক মিলনোৎসবটা বন্ধ আছে এই শেষ বসন্তে।

সুজাতা আর কৌশিক কয়দিনের জন্য নিউজলপাইগুড়ি গেছে। কী একটা তদন্তে। আজই সকালের ট্রেনে ফেরার কথা। ট্রেন বোধকরি যথারীতি লেট। তাই বুড়ো-বুড়ি দুজনে সকালে ব্রেকফাস্টে বসেছেন নিরালায়। দ্বারপ্রান্তে বিশে অবশ্য দাঁড়িয়ে আছে খিদমৎগার হিসেবে।

বাসুসাহেবের হাতে বিগত তিন-চার মাস কোনও উল্লেখযোগ্য কেস আসেনি। ড্রেস-রিহার্সালের কাঁটাটি সমুৎপাটনের পরে আর কেউ বাসুসাহেবের দ্বারস্থ হয়নি। সুকৌশলীর কিন্তু কাজ আসছে। অধিকাংশই মামুলী কেস। 'পাত্র-পাত্রী' ফাইলটা ক্রমশ মোটা হচ্ছে। অর্থাৎ পুত্র ও কন্যার বিবাহ প্রস্তাব পাকাপাকি হবার উপক্রম হলে উদ্বিগ্ন বাবা-মা সুকৌশলীর দ্বারস্থ হন, আজকাল। পাত্রটি ড্রাগ-অ্যাডিক্ট কি না, পাত্রীটির সঙ্গে পাড়াতুতো কোনও দাদার 'লটঘট' আছে কি না, এসব তদন্ত করে দেখতে হয়। এ-জাতীয় কেসে ফিজ কম। কাজের হাঙ্গামাও অবশ্য কম। অন্তত বোমা-পিস্তলে আহত হবার আশঙ্কা নেই। উপরন্তু ফিজ-এর অতিরিক্ত একদিন বিয়ে কিংবা বৌভাতের নিমন্ত্রণে যুগলে ভালমন্দ আহার করে আসে। তেমনি কোনও একটা কাজে ওরা দুজনে একত্রে গেছে উত্তরবঙ্গে।

বাসুসাহেব রানীদেবীর দিকে বাড়িয়ে ধরেন সকালের ডাকে পাওয়া বিচিত্র চিঠিখানি। মোটা কাগজের দামী লেফাফা। রানীদেবী ভিতর থেকে যে চিঠিখানি বার করলেন সেটাও দামী কাগজ। পত্রলেখক মোটা মোটা ইংরেজি হরফে চিঠিখানি লিখেছেন। পত্রে নিজের নাম ও ইংরেজি হরফে আংশিক ঠিকানাটার উল্লেখ আছে। পুরো ঠিকানা নয়। অনুবাদে চিঠিটি এইরূপ নেবে :

"মোহনমঞ্জিল মোহনপুর
শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বাসু,
মহিমার্ণবেষু,

এ মঞ্জিলে এমন একটি সমস্যা ঘনিয়ে উঠেছে যা অত্যন্ত সাবধানে এবং সংগোপনে সমাধান করার প্রয়োজন। আপনার কন্টকাকীর্ণ পথের বিভিন্ন মোড়ে বিচিত্র সাফল্যের বিষয়ে আমি সমধিক অবহিত। তাই সম্পূর্ণ দায়িত্বটা আপনার বিচক্ষণ হস্তেই প্রদান করতে ইচ্ছুক। অতি সম্প্রতি আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমার সম্মান এবং আমাদের পারিবারিক সুনাম ভূলুণ্ঠিত করার একটি ষড়যন্ত্র সঙ্গোপনে করা হয়েছে। আমি পুলিশ বা আইনের সাহায্য নিতে অসমর্থ এবং অনিচ্ছুক। গোপনীয়তার হেতুতে। এদিকে যা করণীয় তা আমি করছি, কিন্তু হয়তো আপনাকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে আমার সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানটি করে দিয়ে যেতে হবে। সে প্রয়োজন হলেই আমি আপনাকে টেলিফোন/টেলিগ্রাম করব। আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন। এ চিঠির উত্তর না পেলেই আমি খুশি হব। ইতি—

ভবদীয়
রায়রায় জগদীন্দ্রনারায়ণ শেঠ বাহাদুর।"

—রানীদেবী বললেন, 'রায়'-এর দ্বিত্ব প্রয়োগটা হল কী কারণে?

একটা 'রায়' হচ্ছে উপাধি; দ্বিতীয়টা 'রায়বাহাদুরের' মুণ্ডুটা। বোঝা যায় লোকটার অনেক টাকা। 'রায়বাহাদুর' উপাধি পেয়েছিল অনেকদিন আগে। প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে। ফলে যথেষ্ট বয়স। হয়তো আমার চেয়ে বয়সে বড়। এ ছাড়া বেশ দাম্ভিক। একবারও তার মনে হয়নি যে, আমি কাজটা নাও নিতে পারি। ফিজ-এর প্রসঙ্গ তোলেইনি। যেন আমি তার হুকুমে চলব!

কিন্তু নিজের ঠিকানাটা সে গোপন করল কেন? বেশ বোঝা যায়, একটা 'লেটারহেড' থেকে কাগজটা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে, আর তারপর কাঁচি দিয়ে ঠিকানাটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

—সেটা বুঝলে কেমন করে?

—লক্ষ্য করে দেখ, কাগজটার ওপরের প্রান্ত নিচের প্রান্তের সঙ্গে সমান্তরাল নয়। অর্থাৎ কাঁচি দিয়ে কাটবার আগে সেট-স্কোয়ার ধরে পেনসিলের দাগ দিয়ে দেওয়া হয়নি।

—তা তুমি কী স্থির করলে? যাবে? না যাবে না?

—বলটা এখন জগদীন্দ্রনারায়ণের কোর্টে। আগে দেখি তিনি ফোরহ্যান্ড ড্রাইভ করেন, না ব্যাকহ্যান্ড।

—অর্থাৎ টেলিগ্রাম করেন, না টেলিফোন, এই তো? টেলিফোন করলে তবু তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলার সুযোগ পাবে; কিন্তু টেলিগ্রাম করলে? যাবে?

—কোন্ চুলোয়?

—'চুলোর' নির্দেশ নিশ্চয় থাকবে টেলিগ্রামে।

বাসুসাহেব জবাব দেবার সুযোগ পেলেন না। তখনি একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো বাইরের পোর্টিকোতে। দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান বিশে ঘোষণা করে, দাদাবাবুরা এসে গেলেন মনে লাগে।

একটু পরেই স্যুটকেস আর কাঁধব্যাগ নিয়ে সুজাতা আর কৌশিক প্রবেশ করল। বাসু বললেন, কত লেট ছিল আজ, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস?

কৌশিক সেকথার জবাব না দিয়ে জানতে চায়, কফি পটে তলানিতে কিছু আছে?

এবার জবাব দেয় বিশে, ঠাণ্ডা-কফি খাবেন কেন? এক্ষুনি গরম কফি নেদিচ্ছি? আর কিছু? ডিম-টোস্ট?

সুজাতা বলল, না রে। সকালে ট্রেন লেট হচ্ছে দেখে আমরা ব্রেকফাস্ট ট্রেনেই সেরে নিয়েছি। তাই শুধু দু-কাপ কফি নিয়ে আয়। আমারটা-র।

ওরা দুজন বসল দুটি সোফায়।

রানী বলেন, তোমাদের মামু আজ সকালের ডাকে একটা মিস্টিরিয়াস চিঠি পেয়েছেন—

সুজাতা মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, 'সারমেয় গণ্ডুকের' উল্লেখ আছে নাকি তাতে?

বাসু বললেন, না নেই। তবে সেই জাতীয় রহস্যময়ই। চিঠিটা পড়ে দেখ।

সুজাতা হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে পড়ল। তারপর বাড়িয়ে ধরল তার সিনিয়ার পার্টনারের দিকে।

কৌশিকও পড়ল। দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হল। কৌশিক বললে, উই আর ইন দ্য সেম বোট, সুজাতা। মামুকে সব কথা খুলে বলতে পার।

—সব কথা মানে? কিসের কথা? জানতে চান বাসু।

—'রায় রায় জগদীন্দ্রনারায়ণ শেঠ বাহাদুর' এককালে আমাদের ক্লায়েন্ট ছিলেন। বছর তিনেক আগে তাঁর পত্নীর আহ্বানে ওই 'মোহনমঞ্জিল'-এ আমাদের দুজনকে আতিথ্য নিতে হয়েছিল—ওঁর একটা সমস্যার সমাধানে।

—আই সি! তা 'মোহনমঞ্জিল'টা কোথায়?

—মুর্শিদাবাদ বা লালগোলা লাইনে বেলডাঙা স্টেশন থেকে মাইল দশেক ভিতরে একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম 'মোহনপুর'-এ।

—মোহনপুরের মোহনমঞ্জিল? এই শ্রীল শ্রীযুক্ত 'মোহন'টি কে? জগদীন্দ্রনারায়ণের পূর্বপুরুষ?

—আপনি ঠিকই ধরেছেন মামু! কিন্তু এখনও বুঝতে পারেননি যে, ওই 'মোহন' আপনারও সুপরিচিত।

—আমার সুপরিচিত? গত শতাব্দীর দুজন 'মোহনকে আমি চিনি। দুজনেই সঙ্গীতজ্ঞ। মোহনচাঁদ বোস - 'হাফ-আখড়াই' গানের প্রবর্তক। আর একজন মোহন বৈরাগী -ঢপ কেত্তনে নাম করেছিলেন। তা ইনি কি—

—না, মামু। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ নন। অসিচালনায় দক্ষ ছিলেন। গত শতাব্দীরও নন। তার আগের শতাব্দীতে। পলাশী যুদ্ধের শহিদ -মীরমদনের সতীর্থ মোহনলাল!

বাসু রীতিমতো চমকে ওঠেন, বল কি! সেই মোহনলালের উত্তরপুরুষ এই জগদীন্দ্রনারায়ণ শেঠ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেক পরিশ্রম করে তথ্যটা আমরা অবিষ্কার করেছিলাম। সে এক মস্ত কাহিনী। শুনুন—

রানীদেবী বাধা দেন, সারারাত ট্রেনের ধকল গেছে। এখন কফিটা গিলে স্নান টান সেরে ঘরোয়া হও প্রথমে।

কৌশিক বলে, না, না, আমার কিছু ক্লান্ত বোধ হচ্ছে না মামী, ট্রেন জার্নিতে—

আবার বাধা দিয়ে রানী বলেন, তোমার ক্লান্তির কথা আমি বলিনি, কৌশিক। সুজাতা, তুমি ওঠ। অসময়ে তোমাকে আবার কফি খেতে হবে না। বদ অভ্যাসটা একেবারে ছাড়তে না পার তো, এই ক-মাস আমার কথামতো একটু সামলে চল অন্তত।

সুজাতা রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। কৌশিকও বোকার মতো মাথা চুলকায়। রানী আবার বলেন, আর একটা কথা, কৌশিক। এই নিউজলপাইগুড়িই হচ্ছে তোমাদের লাস্ট ট্রিপ। এরপর থেকে তুমি একা-একাই তোমার ওই সুকৌশলীর তদন্তে যেও। সুজাতা আর বাড়ি থেকে বের হবে না! এ-কমাস।

বাসু বলেন, কারেক্ট! কাঁটা নিয়ে কাঁটা-ছেঁড়া অনেক হয়েছে। আর কাঁটা নয়। এখন ফুল ফোটানোর সময় —'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।'

আবার ধমক দেন রানী, তুমি থাম তো! তোমাকে আর কবিত্ব করতে হবে না।

বাসুও অপ্রস্তুত! বলেন, ও আয়াম সরি!

আমি—মানে এ কাহিনীর লেখকও, 'সরি'! আমিও আপনাদের একটা জরুরি সংবাদ দিতে ভুলেছি। সেই কথা আগেই আমার বলা উচিত ছিল। একটা সুসংবাদ : 'সকল কাঁটা ধন্য করে' নিউ আলিপুরের ওই বাড়িটায় একটা গোলাপ ফুল ফোটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

এইখানে কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কী জানেন, সে সময় *নবকল্লোল* মাসিক পত্রিকায় আমার সপ্তদশতম কাঁটার কাহিনীটা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল : ড্রেস রিহার্সালের কাঁটা। সেই সময় একটি সাহিত্য-আড্ডায় এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হল। বছর চল্লিশ বয়স, কোন স্কুলে বুঝি বাংলা অথবা ইতিহাস পড়ান। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, *সোনার কাঁটা* গল্পটা আপনি কত সালে লিখেছিলেন?

বললাম, চুয়াত্তর সালে।

—তার মানে তেইশ বছর পার হয়ে গেছে। তা... ইয়ে... শারীরিক ত্রুটিটা কার? কৌশিক না সুজাতার?

আমি বলি, ওদের কোনও শারীরিক ত্রুটি আছে বলে তো আমি জানি না।

—আপনি না জানলে সেটা কে জানবে? প্রকাশক, সম্পাদক, প্রুফ-রিডার না কম্পোজিটার?

আমি হালে পানি পাই না।

উনি আবার ধমকে ওঠেন, ওদের বাচ্চা-টাচ্চা হচ্ছে না কেন? আপত্তিটা কার? যদি শারীরিক ত্রুটি না-ই থাকে? কৌশিক নয় নিশ্চয়, পুরুষ মানুষ সচরাচর এসব ব্যাপারে নির্লিপ্ত। তাহলে কার? সুজাতার? ফিগার খারাপ হয়ে যাবে? এই তো? কিন্তু তাই বলে তেইশ বছর! মাই গড! সুজাতার ন্যাকামির তো একটা সীমা থাকবে! ও কী চায়? 'ম্যানোপজ'-এর পর বাচ্চা? আপনি নিজে কদ্দুর জানেন সেটা বলুন দেখি? ওরা দুজন কি ডাক্তার দেখিয়েছে? নাকি ওরা সেই লালত্রিকোণের চক্করে পড়েছে! ওদের মতো অত্যন্ত ইন্টেলিজেন্ট কাপ্‌ল-এর বাচ্চা না হলে দেশের কী হাল হবে জানেন? হাওলা-গাওলাদের অপোগণ্ড বাচ্চায় দেশটা ভরে যাবে! আপনার সেসব খেয়ালই নেই! তেইশ বছর ধরে ক্রমাগত কাঁটার পাহাড় বানিয়ে চলেছেন! ডাইনে কাঁটা, বাঁয়ে কাঁটা, সামনে কাঁটা, পিছনে কাঁটা। একটা কাঁটা উগরে ফেলতে না ফেলতে আরেকটা কাঁটা। কী পেয়েছেন আপনি! অ্যাঁ?

সেদিনই মনস্থির করেছিলাম, বুঝেছেন? ঘুম-না-আসা-রাত্রে কৌশিক আর সুজাতাকে পাকড়াও করলাম। প্রথমটায় ওরা কিছুতেই রাজি হতে চায় না। বলে, এতে নাকি ওদের সুকৌশলীর কাজে ঝামেলা হবে। ওরা বরং প্রয়োজনে কোনও অনাথ আশ্রম থেকে সদ্যোজাত কোনও বাচ্চা এনে প্রতিপালন করবে।

আমি ওদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম, সেটা একদিক থেকে খুবই ভাল কথা। একটা অনাথ বাচ্চা মানুষ হয়ে যাবে। কিন্তু তোমাদের পরিবারে অজানা 'জিন্‌স্'-এর একটা হেরিডিটি-ফ্যাকটর এসে যাচ্ছে তো? তাছাড়া আজকাল আবার নতুন এক বখেড়া শুরু হয়ে গেছে : এইড্‌স!

কৌশিক আমাকে ধমকে ওঠে, থামুন তো আপনি! যতসব আবোলতাবোল অলুক্ষণে কথা!

সুজাতা কিন্তু আমাকে সমর্থন করলো। বলল, দাদু কথাটা কিন্তু মিছে বলেনি।

কৌশিক বলে, তার মানে তুমি রাজি?

দারুণ লজ্জা পেল সুজাতা। আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাতে বলি, তোমার কোনও অসুবিধা হবে না, সুজাতা-দিদি। বিশে তো আছেই। তাছাড়া শুনেছি, বিশের দেশের বাড়িতে এক দিদি আছে। তোমার চেয়ে বয়সে ছোট। স্বামীত্যক্তা। মানে ও নিজেই পালিয়ে এসেছে। স্বামীর মারের হাত থেকে রেহাই পেতে। যেমন মদ্যপ তেমনি নিষ্ঠুর। ছেলেপিলে নেই। তাকেও বরং আলিপুরের বাড়িতে নিয়ে আসব?

সুজাতা জানতে চায়, মেয়েটা রাজি হবে তো?

আমি হেসে বাঁচিনে। বলি, কী পাগল মেয়ে গো তুমি, সুজাতা। কলমটা তো আমার হাতে! রাজি হবে না মানে? তাকে ঘাড় ধরে আলিপুরে নিয়ে আসব। তার নাম ফুট্‌কি। সেই মেয়েটাই তোমার খোকার দেখভাল করবে!

কৌশিক আমাকে এখানে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে, আপনি নিশ্চিত জানেন, দাদু? ছেলেই হবে ওর? মেয়ে নয়?

কী বোকা ওরা! গবেট দুটো বোঝে না: কলমটা আমার হাতে। xx না xy তা স্থির করব আমিই। ভাগ্যবিধাতা নন। আমি সুজাতার দিকে ফিরে জানতে চাই : তোমার কী ইচ্ছে? খোকা না খুকু?

সুজাতা আমার দিকে তার বড় বড় চোখ মেলে তাকায়। কী লাজুক মিষ্টি দৃষ্টি! কী একটা কথা বলতে যায়—বলা হয় না। তার আগেই তোমাদের দিদা—মানে আমার গিন্নি, ও-পাশের খাট থেকে নেমে এসে আমাকে অ্যাইসা এক ঠেলা মারেন। বলেন, সারা রাত আপনমনে কী

বকবক কর বলতো? তুমিও কি আজকাল কমলাকান্ত চাটুজ্জের মতো আফিং-টাপিং ধরেছ নাকি?

ঘুমটা ভেঙে গেল। স্বপ্নটাও। কিন্তু তখনই মনস্থির করে ফেললাম। আর কাঁটা নয়, 'গোলাপ'!

সুজাতার এটা পাঁচ মাস!

দুই

স্নানপর্ব শেষ হলে মধ্যাহ্নভোজনের টেবিলে প্রসঙ্গটার পুনরবতারণ করল কৌশিক— সেই জগদীন্দ্রনারায়ণের কাহিনীটা।

প্রায় বছর-তিনেক আগে সুকৌশলীর অফিসে এসে দেখা করেছিলেন একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ। সত্তরের কাছাকাছি বয়স। কোঁচানো ধাক্কাপাড় ধুতি, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, হাতির দাঁতের সৌখিন মুঠওয়ালা ছড়ি। দেখেই বিশে আন্দাজ করেছিল খদ্দের 'রহিস' আদমি। । যত্ন করে তাঁকে বসিয়ে ভিতরে খবর দিয়ে এসেছিল কৌশিককে। আগন্তুকের সাজ-পোশাকের বর্ণনা বিশুর মুখে শুনে সুজাতা বাধ্য করেছিল কৌশিককে গেঞ্জির ওপর পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে বাইরের ঘরে যেতে। কৌশিক যুক্ত করে ভিতরের দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে দেখল, বিশে ইতিপূর্বেই ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে গেছে।

আগন্তুক উঠে দাঁড়িয়ে যুক্ত করে নমস্কার করলেন।

কৌশিক বলেছিল, বসুন বসুন—নিজেও বসে একটা সোফায়।

আগন্তুক পুনরায় উপবেশন করে বলেন, আপনাদের প্রতিষ্ঠানটার সুনাম শুনেছি। টেলিফোন নম্বরটা জানা ছিল না। তাই বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টেই চলে এসেছি।

কৌশিক কার্ড-হোল্ডার থেকে ওর নামাঙ্কিত একটি ভিজিটিং কার্ড বার করে বাড়িয়ে ধরল। বলল, টেলিফোন ডাইরেক্টরিতেই নম্বরটা পেয়ে যেতেন কিন্তু।

—তা হয়তো পেতাম, তবে 'শেয়ালদ' স্টেশনে নেমে আর ডাইনে-বাঁয়ে তাকাইনি। ঠিকানা জানা ছিল—একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলেই এসেছি।

—বেশ করেছেন। সকালে আমার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। আপনি সবিস্তারে আপনার কেসটা বলতে পারেন; কিন্তু তার আগে ওই রেজিস্টারে আজকের তারিখে আপনার নাম-ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরটা দয়া করে লিখে দেবেন।

বৃদ্ধ ইতস্তত করে বললেন, আপনি আমাদের শর্তে কেসটা নিলে তা নিশ্চয় লিখে দেব; কিন্তু তার পূর্বে—

—কী আপনার শর্তটা?

—আমাদের কেসটা নিন বা নিন, আমি যা বলব, কথা দিন, তা এই চার দেওয়ালের বাইরে যাবে না?

কৌশিক মাথা নেড়ে বলেছিল, তাহলে দুঃখিত। কথা দিতে পারছি না। আমার জুনিয়র পার্টনার এখন এই চার দেওয়ালের বাইরে আছেন, তাঁকে না-জানিয়ে—

—না, না, সেকথা বলিনি। সুজাতাদেবীকে বলবেন তো নিশ্চয়ই।

কৌশিক বুঝে নেয়, ও নিজে ওই বৃদ্ধের বিষয়ে কিছু না জানলেও আগন্তুক ওদের সম্বন্ধে

অনেক কিছু খবর রাখেন। সেকথাই বললে। গোপনীয়তা নিশ্চয়ই রক্ষিত হবে, আপনার পরিচয়টা এবার দিন।

এবার আর আপত্তি করলেন না বৃদ্ধ।

আগন্তুকের নাম : সত্যপ্রসন্ন দুগার। রায়বাহাদুর জগদীন্দ্রনারায়ণ শেঠ রায়-এর সেক্রেটারি। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ছিলেন জমিদারমশায়ের এস্টেটের দেওয়ান। এখন জমিদারী নেই -সেটা নানান ইন্ডাস্ট্রি এবং বিজনেসে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সেই সূত্রে দেওয়ানজী হয়ে গেছেন সেক্রেটারি।

জগদীন্দ্রনারায়ণ শেঠ-এর আদি নিবাস পাঞ্জাব। প্রায় তিনশো বছর আগে ওঁদের পূর্বপুরুষ সেখান থেকে চলে এসেছিলেন বহরমপুরে, জগৎশেঠের পূর্বপুরুষের সঙ্গে। গঙ্গাতীরে জিয়াগঞ্জের কাছাকাছি একটা ভূখণ্ডে। তারপর আট-দশ পুরুষ ধরে ওঁরা এই বাংলা মুলুকেই আছেন। পুরোপুরি বাঙালী 'বনে' গেছেন।

কৌশিক অনুমান করে শেঠজী পুরোপুরি বাঙালী হয়ে গেছেন কি না তা এখনও অজানা, তবে তাঁর সচিব দুগারজী যে হয়নি, তা ওই বাঙালী 'বনে যাওয়া' ক্রিয়াপদেই প্রমাণিত।

বেলডাঙা স্টেশন থেকে গঙ্গার তীর বরাবর মাইল-দশেক উত্তরে গেলে পড়বে মোহনপুর গ্রাম। জমিদারের বাড়িটা সেখানেই। বাড়িটা দুর্গের মতো, উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বয়স প্রায় দেড়-দুশো বছর। পাথর ও তল্লাটে পাওয়া যায় না, তবু বাড়িটা আদ্যন্ত বালিপাথরে চুন-সুরকির গাঁথনিতে গড়া। বোধকরি কোনও পূর্বপুরুষ গঙ্গা-ভাগীরথী দিয়ে নৌকাযোগে রাজমহল অঞ্চল থেকে এই প্রস্তরখণ্ডের আমদানি করেছিলেন। বংশের আদি পুরুষটির প্রকৃত পরিচয় জগদীন্দ্রনারায়ণ জানতেন না, তবে এই গ্রামে জমিদারীপত্তন যিনি করেছিলেন—আন্দাজ করা যায়-তাঁর নাম ছিল মোহনলাল শেঠ। কারণ গ্রামের নাম 'মোহনপুর' জমিদারবাড়ির পোশাকি নাম ছিল 'মোহনমঞ্জিল'। জমিদারের উপাধি শেঠ।

জগদীন্দ্রের পরমপূজ্য পিতৃদেবের ছিল দুইটি বিবাহ। বড় রানীমা জগদীন্দ্রের জননী। তারপর জগদীন্দ্র শেঠের জননী স্বর্গারোহণ করলে জমিদারমশাই তিন কুড়ি বছর অতিক্রম করার পর আর একটি দারপরিগ্রহ করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে সেই ছোট রানীমার গর্ভে তিনি দ্বিতীয়বার পুত্র সন্তানের জনক হয়ে পড়েন। তখন তাঁর প্রথম পুত্র সন্তান ত্রিশ বছরের যুবাপুরুষ। জগদীন্দ্র শেঠ তার পাঁচ-সাত বছর আগেই একটি সুন্দরীকে বিবাহ করেছিলেন কিন্তু তাঁদের কোনও সন্তানাদি হয়নি। জগদীন্দ্রের যখন পিতৃবিয়োগ হয় তখনও তাঁর কোনও সন্তান জন্মায়নি; দ্বিতীয়বার বিবাহ করা সত্ত্বেও। ফলে বৈমাত্রেয় ভাইকেই তিনি সন্তানসম পালন করতে থাকেন।

জগদীন্দ্রনারায়ণের পিতৃদেব ছিলেন রায়সাহেব। জগদীন্দ্র পিতৃবিয়োগের পূর্বেই রায়বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের কাছে। নিতান্ত যুবাবয়সে। স্বাধীনতার পর তিনি নতুন সরকারের সঙ্গে তেমন সুবিধা করতে পারেননি। ইংরেজ আমলের ইংরেজি কেতাই ছিল তাঁর মন্‌পসন্দ। নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা, ওঁর বৈমাত্রেয় ভাইটি হয়ে উঠল দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। পড়াশোনায় সে ভালই ছিল। ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়ে ভর্তি হল প্রেসিডেন্সি কলেজে। থাকত ইডেন হোস্টেলে। বছর দুয়েকের মধ্যে সেখানেই তার স্কন্ধে উপবেশন করল নকশালবাড়ির এক উপদেবতা। রাতারাতি ফেরার হয়ে গেল সমরেন্দ্রনারায়ণ। তিন-চার বছর সে ছিল নিরুদ্দেশ। না পুলিশ, না জগদীন্দ্রনারায়ণ—কেউই তার সন্ধান পায়নি।

তারপর একদিন। থানার বড়-দারোগা জিপে চেপে এসে হাজির হলেন মোহনমঞ্জিলে। সংবাদ গুরুতর : সমরেন্দ্রনারায়ণ গ্রেপ্তার হয়েছে। বিচারের অপেক্ষায় আছে কলকাতার

আলিপুর জেলা হাসপাতালে। হাসপাতালে? কেন? কী হয়েছে তার? হ্যাঁ। তাই—সমরেন্দ্র মরণাপন্ন! রায়বাহাদুর ছুটে গেলেন কলকাতায়। সমরেন্দ্রর তখনও জ্ঞান ছিল। পুলিশের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে সে মর্মান্তিকভাবে আহত। ডাক্তারবাবুরা হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁরা দুজনে সম্পর্কে বৈমাত্রেয় ভাই, কিন্তু শ্রদ্ধা-প্রীতি-ভালোবাসার সম্পর্কটা ছিল পিতা-পুত্রের। সমরেন্দ্র তখন চব্বিশ বছরের সুঠামদেহ যুবাপুরুষ, আর রায়বাহাদুর পক্বকেশ পঞ্চাশোর্ধ্ব।

গ্রেপ্তার হবার পর সমরেন্দ্র কোনও জবানবন্দি দেয়নি। তার শারীরিক অবস্থায় পুলিশ কোনও 'থার্ড-ডিগ্রি'র ব্যবস্থা করতে সাহস পাচ্ছিল না। ফলে, দলে আর কে কে ছিল পুলিশ সেকথা জানতে পারেনি। জগদীন্দ্র যখন হাসপাতালে এসে পৌঁছালেন তখন সমরেন্দ্রর শেষাবস্থা। সে একটা 'ডায়িং স্টেটমেন্ট' দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে—তবে কোনও ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটকে নয়, তার দাদাকে। উপায়ান্তরবিহীন হয়ে পুলিশ এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থাতেই রাজি হয়ে যায়।

সমরেন্দ্র তার একজন মাত্র সহযোদ্ধার নাম জানিয়ে যায়, বিশেষ কারণে। বলে, দলে আমরা ছিলাম চারজন। তিনজন পুরুষ, একজন মহিলা। আমিই মারাত্মক আহত হয়ে ধরা পড়ি, ওরা পালিয়ে যেতে পেরেছে।

জগদীন্দ্রনারায়ণ বাধা দিয়ে বলেছিলেন, এসব কথা আমাকে কেন বলছিস, সমু? তুই কী বলে গেলি, কার নাম করলি, পুলিশ তো এখনই আমার কাছে জানতে চাইবে—

সমরেন্দ্রও মাধপথে দাদাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, ওসব কথা আমি ভালরকমই জানি দাদা। বিশষ কারণ না থাকলে আমি এ প্রসঙ্গ তোমার কাছে উত্থাপন করতাম না। যা বলছি শোন, শেষ মুহূর্তে যে অনুরোধটুকু করছি তা রেখ—তাহলেই আমি শান্তি পাব। শোন, যেকথা বলছিলাম—দলে, আমরা ছিলাম চারজন, তার মধ্যে একজন ছিল আমার সহপাঠিনী, অতসী। প্রেসিডেন্সি কলেজেরই। তবে আমার ছিল ইকনমিক্সে অনার্স, ওর ইতিহাসে। এনকাউন্টারের সময় অতসীর পায়ে গুলি লাগে, তবু সে পালিয়ে যেতে পেরেছে।

—তুই চাস আমি ওই অতসী নামের মেয়েটার সন্ধান করি? আমি তো সাতেপাঁচে ছিলাম না, সমু। আর এ অবস্থায় আমি তাকে কী সাহায্য করতে পারি? কেনই বা করব?

—কারণ একটাই দাদা। সে তোমার ভ্রাতৃবধূ। আমার স্ত্রী।

দুঃসংবাদটায় মর্মান্তিক আহত হয়েছিলেন জগদীন্দ্রনারায়ণ। সমুর বিয়ের নানান স্বপ্ন দেখতেন তিনি—এখন ওই একটি উট্‌কো বিধবা এসে ঘাড়ে চাপবে। সমস্ত বিরক্তি আর মর্মবেদনা গোপন রেখে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, তা কেমন করে হয় রে সমু? তোরা তো পুলিশের নজর এড়িয়ে দু'তিন বছর বনে-জঙ্গলে পালিয়ে বেড়িয়েছিস। বিয়ে তুই করলি কী করে? পুরোহিত ডেকে? হিন্দুমতে?

সমরেন্দ্রর বোধহয় কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু সে নকশাল। সবরকম দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে প্রস্তুত। বলল, সেসব কথা থাক না দাদা! ধর গান্ধর্বমতে! যিনি আমাদের দলপতি—নামটা নাই বা জানলে, তিনি ওইভাবেই আমাদের বিয়েটা দিয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে! পুলিশের দৃষ্টি এড়াতে আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করতাম। এত কথা তোমাকে জানাবার ইচ্ছা আমার ছিল না। বাধ্য হয়ে আজ জানাতে হচ্ছে। বিশেষ কারণে। আমার সময় খুব কম। অতসী আহত হয়ে আত্মগোপন করে আছে। জানি না, ইতিমধ্যে গ্যাংরিন হতে শুরু করেছে কি না—

এই পর্যন্ত বলে সে থেমে পড়ে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। জগদীন্দ্রনারায়ণ আর স্থির থাকতে পারেননি। বলেন, তুই শান্ত হ সমু। আমার যতটুকু আর্থিক ক্ষমতা...

একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে মাঝখানেই তাঁকে থামিয়ে দেয় সমু। বলে, না। সে তোমার আর্থিক সাহায্য ভিক্ষা নেবে না। তার দৃষ্টিতে তুমি ফিউডালিজমের ধারক। শ্রেণীশত্রু! কিন্তু তার পেটে যে বাচ্চাটা আছে, তার কী অপরাধ, দাদা?

জগদীন্দ্রনারায়ণ বজ্রাহত হয়ে গিয়েছিলেন।

তিন

কৌশিক আগন্তুক ভদ্রলোককে বলেছিল, এসব তো অতীতের কাহিনী। বিশ বছর আগেকার কথা।

—আজ্ঞে না। চব্বিশ বছর আগেকার ঘটনা।

—না হয় তাই হল। কিন্তু আপনি আমার কাছে কী প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন? কার কাছ থেকে? জগদীন্দ্রনারায়ণ?

—আজ্ঞে না। তিনি আদৌ জানেন না যে আমি আপনার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে কলকাতায় এসেছি।

—বলেন কী! তাহলে আমাদের ক্লায়েন্ট কে? আপনি নিজে?

—আজ্ঞে তাও না। শ্রীযুক্তা শশীকলা দেবী। জমিদার গৃহিণী।

—বুঝলাম। বলে যান।

পরবর্তী ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে নিবেদন করতে থাকেন দুগারজী:

সমরেন্দ্রর মৃত্যুর পরে তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী 'কী' ছিল তা জানাতে অস্বীকৃত হওয়ায় জগদীন্দ্রনারায়ণের যন্ত্রণাটাও বড় কম হয়নি। কিন্তু তিনি নকশালদলের কারও নাম বলে দেননি। একটি নামই জানতেন তিনি: অতসী। তার কথা স্বীকার করেননি; বলেছিলেন, সমু তার সহকর্মীদের কারও নাম বলে যায়নি। সজ্ঞান মিথ্যাভাষণ! প্রায় বছরখানেক এ নিয়ে পুলিশের টানাপোড়েন চলছিল। তারপর পুলিশ বোধহয় বিশ্বাস করল তাঁর কথায়। সব কিছু থিতিয়ে গেলে জগদীন্দ্রনারায়ণ সত্যপ্রসন্নকে পাঠিয়ে দিলেন অতসীর সন্ধানে। অতসীর গ্রামের নামটা সমরেন্দ্র বলে গিয়েছিল। অতসীর কাকার নামটাও। অতসী মেয়েটি ছিল অনাথ—পিতৃমাতৃহীন। কাকার সংসারে মানুষ হচ্ছিল। ওদের গ্রামটা রামপুরহাট আর কাটোয়ার মাঝামাঝি। একটি বর্ধিষ্ণু খ্রিস্টান গ্রাম, যোসেফনগরের গা-ঘেঁষা হিন্দু পল্লী। অতসী ওই যোসেফনগর স্কুলের ছাত্রী। দুর্দান্ত রেজাল্ট করে স্কলারশিপ নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে পড়তে এসেছিল। সেখানেই সমুর সঙ্গে ওর আলাপ। দুজনে গোপনে নকশাল দলে নাম লেখায়।

অনেক খুঁজে খুঁজে কিছুটা পদব্রজে, কিছুটা গো-গাড়িতে পাড়ি দিয়ে একদিন সত্যপ্রসন্ন এসে হাজির হলেন অতসীর ভিটায়। ওর কাকা আর খুড়িমা আগন্তুককে মারতে বাকি রেখেছিল। কোনও সৌজন্যমূলক হেতুতে নয়—প্রহার করলে কথাটা গ্রামে জানাজানি হয়ে যাবে, এই ভয়ে।

নগণ্য গ্রাম। সকলেই সকলের হাঁড়ির খবর রাখে। কুমারী গ্রাম্য মেয়ের পক্ষে গর্ভিণী হয়ে পড়া এমন বৈচিত্র্যহীন গ্রাম্য পরিবেশে একটা মস্ত মুখরোচক চাঞ্চল্যকর কেচ্ছা। অতসী যে গোপনে ওই নকশাল দলে নাম লিখিয়েছিল একথা গ্রামের কুকুরগুলো পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল। তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে দু-টুকরো রুটি-মাংস নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তাই অতসীর ঠাঁই হয়নি নিজ গ্রামে। সেখানে আত্মগোপনের চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা—একথা ভাল মতো জানা ছিল তার। তবু নিতান্ত নিরুপায় হয়ে কাকার আশ্রয়েই

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে এসেছিল সেই গর্ভিণী কুমারী মেয়েটি। বুলেটটা তখনও তার ডান গোড়ালিতে বিঁধে আছে। অসাধারণ সহ্যশক্তি তার। দৈহিক এবং মানসিক। গভীর রাতে এসে পৌছাল গাঁয়ে। পাড়ার কুকুরগুলো তারস্বরে সারমেয় প্রতিবাদ করেছিল। খুড়ো-খুড়িও করেছিলেন, তবে তারস্বরে নয়, চাপা আক্রোশে, দেহান্ত-বাপের পুনরায় বাপান্ত করে, জানাজানি হয়ে যাবার ভয়ে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ! রাত ভোর হবার আগেই টাপর-তোলা গো-গাড়িতে হতচ্ছারিকে উঠিয়ে নিয়ে কাকা রওনা দিয়েছিলেন যোসেফনগর।

যোসেফনগর গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস মিস মল্লিকা মল্লিকের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্রী অতসী। নকশাল আন্দোলনের প্রতিও তাঁর গোপন সহানুভূতি ছিল। স্বাধীন ভারতের শাসকেরা দিন দিন শোষক হয়ে যাচ্ছে দেখে সেই শিক্ষাব্রতী মহিলাটি আন্তরিক ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি নিজের পক্ষপুটে—তাঁর সমূহ বিপদ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েও—ওই অসহায় মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কাকপক্ষীতেও টের পায়নি।

খুড়োমশায়ের কাছ থেকে এইটুকু সংবাদ সংগ্রহ করতে সত্যপ্রসন্নের কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। অবশেষে তিনি ভয় দেখালেন, অতসী যে গ্রামে ফিরে এসেছিল এ-তথ্যটা তাঁর জানা। খুড়োমশাই সব কথা না জানালে তিনি বাধ্য হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হবেন। তারা খুঁজে বার করুক: কোথায় গেল মেয়েটি—তখনই খুড়োমশাই নরম হলেন। ভাইঝির সম্বন্ধে যেটুকু জানা ছিল তা ব্যক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বললেন, বিশ্বাস করুন, এর বেশি আমি কিছু জানি না। বুলেটটা ওর পা থেকে বার করা গিয়েছিল কি না তাও জানি না। ওর সন্তান আদৌ হয়েছিল কি না তাও আমার জানা নেই। কী করব বলুন? আপন ভাইঝি! কিন্তু রাক্ষসী যে নকশাল হয়ে গেল!

সেই সূত্র ধরে সত্যপ্রসন্ন এসে হাজির হলেন যোসেফনগরে। সত্যপ্রসন্ন যে পুলিশের লোক অথবা 'টিকটিকি' নন, এটা ভালভাবে সমঝিয়ে নিয়ে মিস মল্লিকা মল্লিক প্রকৃত তথ্যটা জানাতে স্বীকৃত হলেন। বিশেষ, সত্যপ্রসন্ন যখন জানালেন যে, জমিদার গৃহিণী শশীকলা অতসীর সন্তানটিকে গ্রহণ করতে চান ও 'দত্তক' নিতে চান।

হেডমিস্ট্রেস মিস মল্লিক জানালেন, অতসী নির্বিঘ্নে প্রসব করেছিল। তার পায়ের ঘা-টাও সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে খবরটা যে কোনও সূত্রে হোক কিছুটা জানাজানি হয়ে যায়। পুলিশের গোয়েন্দা যাতয়াত শুরু করেছিল যোসেফনগরে। বাধ্য হয়ে অতসী পুনরায় নিরুদ্দেশ যাত্রায় রওনা হয়ে পড়ে। একটি দুগ্ধবতী ধাত্রীর সহায়তায় মিস মল্লিক অতসীর মেয়েটিকে মানুষ করে তুলছেন—

—মেয়ে? ছেলে নয়? — আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করেন সত্যপ্রসন্ন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কন্যাসন্তান। এবার বলুন, শশীকলা দেবী কি সেই শিশুটিকে নিয়ে যেতে চান এবং দত্তক নিতে চান?

সত্যপ্রসন্ন জানিয়েছিলেন, পুত্র হোক, কন্যা হোক, সেই শিশুটিকে ওঁরা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। মিস মল্লিক বলেন, আমি সম্মত। কিন্তু আমি তো অছি মাত্র। খুকুর মাকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে জানাব। এসব কথা তো চিঠিপত্রে লেখা যায় না। আপনি কি দিন পনেরো পরে আর একবার আসতে পারবেন?

—পারব। অতসী কোথায় আত্মগোপন করে আছে আপনি তাহলে তা জানেন?

—এ প্রশ্ন অবান্তর। আরও একটা কথা। আমি জানি, অতসী অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থায় আছে। বস্তুত সে একটি গৃহস্থবাড়িতে পরিচারিকা হিসেবে কাজ করে। কাপড় কাচে, ঘর ঝাঁট

দেয়, এমনকি এঁটো বাসন মাজে। অথচ আমি নিশ্চিত যে, বিপ্লবী দলে নাম না লেখালে এতদিনে সে ইতিহাসে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়ে যেত। হয়তো এম.এ. পড়ত অথবা স্কুলে শিক্ষকতা করত। আপনার জমিদারমশাই কি এক্ষেত্রে—

সত্যপ্রসন্ন বলেছিলেন, চেষ্টা করে দেখব।

শশীকলার আগ্রহাতিশয্যে জগদীন্দ্রনারায়ণ সমরেন্দ্রর শিশুকন্যাটিকে তাঁর নিজের সংসারে নিয়ে এসেছিলেন। এমন কি পরে তাকে 'দত্তক'ও নেন। নাম রাখেন অপরাজিতা।

কৌশিক জানতে চেয়েছিল, কেন? 'দত্তক' নেওয়ার প্রয়োজন কেন হল? ওঁর তো নিজের সন্তানাদি নেই—ওঁরা স্বামী-স্ত্রী গত হলে সমরেন্দ্রর কন্যাই তো সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে।

—নিশ্চিতভাবে সেকথা বলা যায় কি?

প্রথম কথা, জগীন্দ্রনারায়ণ সংবাদটা গোপন রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। আসল তথ্যটা জানতেন ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে, আর সত্যপ্রসন্ন। না, আরও একজন জানে, পরিবারের পুরাতন-ভৃত্য, দশরথ জানা। ওঁরা প্রকাশ করতে চাননি যে, ওই ফুলের মতো বাচ্চা মেয়েটি সমরেন্দ্রর সন্তান। তাতে নানান প্রশ্ন উঠতে পারে। পুলিশের কাছে দেওয়া জগদীন্দ্রের পূর্ববর্তী জবানবন্দি যে মিথ্যা ছিল এটা প্রমাণিত হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। তাঁকে নতুন করে জেরার সম্মুখীন হতে হবে, ভ্রাতুষ্পত্রীকে তিনি কীভাবে, কোথা থেকে খুঁজে পেলেন। তা থেকে স্বতই প্রশ্ন হবে : খুকীর মা কোথায়? কেন এতদিন সেই ফেরারি আসামীর সন্ধান জগদীন্দ্রনারায়ণ গোপন রেখেছিলেন। দ্বিতীয় কথা, মেয়েটি যে সমরেন্দ্রর আত্মজা এটা প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। সে শেঠ রায় বংশের সন্তান এটা প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমরেন্দ্রর বিবাহটা যে বৈধ সেটা সর্বাগ্রে প্রমাণ করার প্রয়োজন। সেই কাজটা প্রায় অসম্ভব। ফলে, ভবিষ্যতে লতায়-পাতায় সম্পর্ক ধরে কেউ না কেউ এসে সম্পত্তির দাবিদার হতে পারে। এজন্যই দত্তক নেওয়া।

কৌশিক জানতে চায়, অতসী তাহলে রাজি হয়ে গেল ওই 'শ্রেণীশত্রু'-র হাতে তার সন্তানকে তুলে দিতে?

বৃদ্ধ এককথায় জবাব দিলেন না। চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচটা মুছতে মুছতে বলেন, আপনি সেই হতভাগিনীর মানসিক যন্ত্রণার কথাটা কাইন্ডলি একবার বিচার করুন, স্যার! হায়ার সেকেন্ডারিতে সে তিনটে 'লেটার'সহ স্টার মার্কস পেয়েছিল, ইতিহাসে বি. এ.-তে ফার্স্ট পার্টে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়েছিল—তারপর আদর্শের জন্য বন্দুক হাতে পুলিশের বিরুদ্ধে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল, আহত হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আত্মগোপন করেছিল। তার পরেও সে দেশপ্রেমের 'অপরাধে' সমাজে অপাংক্তেয়। ঝি-গিরি করে গ্রাসাচ্ছাদন করছে—

বাধা দিয়ে কৌশিক বলেছিল, ঠিক আছে। বুঝলাম—

সত্যপ্রসন্ন ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আজ্ঞে না স্যার, বোঝেননি। বুঝলে ওই 'শ্রেণীশত্রু' শব্দটা ব্যবহার করে অতসীকে ব্যঙ্গ করতেন না। তাই বাকিটুকুও শুনুন। অতসী জানত যে, ওই নিষ্পাপ শিশুটি একটি পিতৃমাতৃহীনা জননীর সন্তানই শুধু নয়, সে এক ঐতিহ্যময় ধনী পরিবারের সন্তানও বটে। তাই সে রাজি হয়েছিল। কিন্তু সে ওই ধনকুবেরের তাচ্ছিল্যভরা আর্থিক দান প্রত্যাখ্যান করেছিল, একথাও সত্য।

—'তাচ্ছিল্যভরা দান' মানে?

—জগদীন্দ্রনারায়ণ ওকে বেশ কিছু টাকা অর্থসাহায্য করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন একটি মাত্র শর্তে। যদি ওই পলাতকা মেয়েটি কোনওদিন কারও কাছে স্বীকার না করে যে, জগদীন্দ্রের পালিতা কন্যার জননী সে।

—এমন শর্ত করার মানেটা কী?

—আভিজাত্যের নীলরক্তের অহমিকা হবে হয়তো। আমি ঠিক জানি না। অতসী ধরা পড়লে হয়তো তার ফাঁসিই হয়ে যেত। এক্ষেত্রে অমন শর্ত করার কোনও অর্থই হয় না। তবু তিনি অমন একটা অদ্ভুত শর্ত আরোপ করেছিলেন।

—অতসী তাতে রাজি হয়নি?

—আজ্ঞে না। সেই কথাই তো বলছি। সে ঝি-গিরিই করে গেছে! দেশের শাসকবর্গ নকশালদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। ওর সন্ধান পায়নি।

—তারপর? মেয়েটি বেঁচে আছে? ওই অতসী নামের সেই অদ্ভুত মেয়েটি?

—ও প্রশ্নটা আপনি আমাকে করবেন না, স্যার। করব আমি। আপনাকে।

—তার মানে?

—এটাই আপনার 'অ্যাসাইন্ড ওয়ার্ক'। মানে শশীকলা দেবী এটাই সুকৌশলীকে সন্ধান করে দেখতে বলেছেন।

—কিন্তু কেন? হঠাৎ এতদিন পরে সে খোঁজের কী প্রয়োজন হল? অতসী যখন মাতৃত্ব লাভ করেছিল সেটা তো আপনাদের মতে বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার কথা। আজ হঠাৎ...

—তাহলে স্যার, আপনাকে ধৈর্য ধরে আরও কিছুটা অতীত কাহিনী শুনতে হবে।

—উপায় নেই। বলে যান—

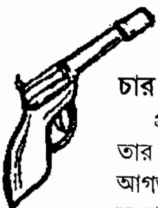

চার

প্রায় মাস-তিনেক পূর্বে, অর্থাৎ সত্যপ্রসন্ন যে-সময় সুকৌশলীর দ্বারস্থ হন তার তিন মাস পূর্বে, মোহনমঞ্জিলে অযাচিতভাবে এসে উপস্থিত হন এক পণ্ডিত আগন্তুক। ডক্টর বেণীমাধব দত্ত। সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাসের এক অধ্যাপক। সে সময়ে মুর্শিদাবাদস্থিত 'হাজারদুয়ারির' কিউরেটর। তিনি এসেছিলেন বিচিত্র একটি প্রস্তাব নিয়ে।

মোহনমঞ্জিলের খাজাঞ্চিখানায় বড় বড় সিন্দুকে আছে বিগত দুই শতাব্দীর কিছু প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ। তার হরফ ফার্সি না উর্দু অথবা প্রাচীন বাংলা, তা জানা নেই জগদীন্দ্রনারায়ণের। তবে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তাঁর পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের মতো। এজন্য খাজাঞ্চিখানার ওই রহস্যময় দলিল-দস্তাবেজ পুঁথিপত্রগুলি আজও কীটদষ্ট হয়নি। ওঁর পূর্বপুরুষেরা তাঁদের আমলে নিম, তুঁতে, তামাক পাতার সাহায্য নিতেন। ওঁরা দু-পুরুষে দায়িত্বটা অর্পণ করেছেন কীটনাশক বিচক্ষণদের ওপর। তারা প্রতিমাসে এসে পেস্টিসাইড ঔষধ স্প্রে করে যায়।

অধ্যাপক বেণীমাধব দত্ত রায়বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানালেন যে, তাঁর একজন রিসার্চ স্কলার এই জমিদারবংশ সম্বন্ধে উদ্ধার করেছে ইতিহাসের এক অকথিত অধ্যায়। এখনও সেটা প্রমাণ হয়নি। তবে সম্ভাবনা যথেষ্ট। বিচিত্র সে ঘটনা।

গঙ্গাতীরে জিয়াগঞ্জে এক প্রাচীন জমিদারবাড়ির চৌহদ্দিভুক্ত একটি মন্দিরে ওই গবেষিকা মেয়েটি আবিষ্কার করেছে ফার্সিতে লেখা একটি অতি প্রাচীন দিনপঞ্জিকা। রোজনামচার লেখক পুরুষোত্তমদাস শেঠজী ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ। তাঁর আদি নিবাস পাঞ্জাব অঞ্চলে। ধনকুবের জগৎশেঠের সমসাময়িক ব্যক্তি। সম্পর্কে জগৎশেঠের ভাইপো হতেন। প্রথম যুগে

নবাব আলিবর্দী খাঁ-সাহেবের খাজাঞ্চিখানায় অনুকারকের কাজ করতেন। পরে সে কাজে ইস্তফা দিয়ে জিয়াগঞ্জে এসে বসবাস শুরু করেন। একটি পাঠশালা খুলে স্থানীয় ছাত্রদের বিদ্যাদান করতেন। জীবনের শেষ বিশ বছর তিনি একটি দিনলিপি লিখে যান। হয়তো আরও লিখেছিলেন যার হদিস পাওয়া যায়নি। ওই বিশ বছরের মধ্যেও দুই এক বছরের ফাঁক আছে।

অধ্যাপক দত্তের একটি প্রিয় ছাত্রী সিরাজউদ্দৌল্লার ওপর রিসার্চ করে ডক্টরেট করেছে। তারপর স্বাধীন ভারত সরকার যখন মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন সে সেখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটরের কাজ পায়। অধ্যাপক দত্তের অধীনে আরও গবেষণা করে চলে। সেই মেয়েটিই নিতান্ত ঘটনাচক্রে ওই মহামূল্যবান রোজনামচাটি আবিষ্কার করে বসেছে। জিয়াগঞ্জের কাছে গঙ্গাতীরে আদিনাথজীর এক জৈনমন্দিরের ধনাগারে সেই পুঁথিগুলি সযত্নে রক্ষিত ও নিত্যপূজিত হয়ে এসেছে। দশকের পর দশক। শতাব্দীর পর শতাব্দী। মন্দির কর্তৃপক্ষ আধুনিক শিক্ষিত, যদিও ফার্সি পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করার মতো মানুষ জিয়াগঞ্জে কেউ ছিলেন না। তাঁরা মিস রমলা স্মিথকে খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও, পুঁথিগুলি ছয়মাসের জন্য দেখতে দিয়েছেন। সে নোট নিয়ে ফটোকপি বা জেরক্স করিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষকে পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়ে এসেছে।

সেই রোজনামচা থেকে জানা গেছে যে, পলাশীর যুদ্ধকালে পুরুষোত্তম দাস শেঠজীর বয়স ছিল তিন কুড়ির কাছাকাছি। তিনি ছিলেন বিপত্নীক এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। সেই বহুবিবাহের যুগেও প্রথমা স্ত্রীর প্রয়াণের পর আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি। তাঁর দেখভাল করত একমাত্র কন্যা সরযূবালা। তাঁর জিয়াগঞ্জের ভিটায় প্রতিষ্ঠিত শিউজীর মন্দিরের যাবতীয় নিত্যকর্মের দায়িত্বও ছিল শেঠজীর ওই মেয়েটার। পাঠশালায় নানান ছাত্র তাঁর কাছে 'লিখাপড়ি' শিখতে আসত। পাঞ্জাবি ঘরানার মানুষ শেঠজী। তাঁর মেয়েকে অসূর্যম্পশ্যা করে রাখেননি। জিয়াগঞ্জের গঙ্গার জলধারার মতো জীবনও চলে যাচ্ছিল মন্দাক্রান্তা ছন্দে। হঠাৎ ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ বাধার উপক্রম হল। জিয়াগঞ্জের অনেক যুবক ডাক পেয়ে চলে গেল মুর্শিদাবাদ। তার ভিতর ছিল ওঁর এক প্রতিবেশী যুবক মোহনলাল। মোহন শেঠজীর পাঠশালায় এককালে পড়াশুনা করেছে। মোহনলাল ওঁর প্রিয় ছাত্র; কিন্তু পড়াশুনার চেয়ে অসিচালনাতেই তার দক্ষতা ছিল বেশি। সুদর্শন এবং অত্যন্ত বলশালী যুবক ছিল সে। পড়াশুনা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে সে চলে গিয়েছিল মুর্শিদাবাদে। অল্পদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দীর সুনজরে পড়েছিল। নবাব তাকে দেওয়ানখানার পেশকার পদে নিযুক্ত করে দিলেন। কিন্তু পেশকারী বৃত্তি মোহনলালের পোষালো না। মসির চেয়ে অসিটাই ছিল তার কাছে প্রিয়তর। ফলে সিরাজ নবাব হয়ে তাকে ঢাই-হাজারি মনসবদার বানিয়ে দিলেন।

পুরুষোত্তম দাস শেঠজী তাঁর দিনপঞ্জিকায় লিখেছেন যে, মোহনলাল সৈন্যপত্য লাভ করেই একটা দারুণ সাফল্যলাভ করে বসে। নবাবের এক মাসতুতো ভাই ছিল পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা। বস্তুত ঘরশত্রু বিভীষণ সে। সিরাজের বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল ওই মাসতুতো ভাই শওকত জং বাহাদুর। সিরাজ মোহনলালকে পাঠিয়ে দিলেন পূর্ণিয়ার শাসনকর্তাকে শায়েস্তা করতে। মনিহারির যুদ্ধে ঢাই-হাজারি মনসবদার মোহনলাল সম্পূর্ণরূপে শওকত জংকে পরাজিত করে বন্দী করেন।

সিরাজ খুশি হয়ে মোহনলালকে প্রচুর উপঢৌকনসহ 'রাজা' অথবা 'মহারাজা' উপাধি দেন এবং আড়াই হাজারি থেকে উন্নীত করে একেবার দশহাজারি মনসবদার করে দেন। শেঠজী তাঁর ছাত্রের এই অপরিসীম সাফল্যে এত খুশি হন যে, তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে

আসেন জিয়াগঞ্জে। পিতৃমাতৃহীন রাজা মোহনলাল—তখন সে ছাব্বিশ বছরের তরুণমাত্র—বেশ কয়েক মাস তাঁর গুরুগৃহে আতিথ্য নিয়েছিলেন।

শেঠজী টের পাননি তাঁর গৃহাভ্যন্তরে মোহলালের শৌর্য-বীর্যে আরও একজন মোহিত হয়ে গিয়েছিল। অতিথিকে সকাল-বিকেল পরিচর্যা করতে করতে সেই পঞ্চদশী মেয়েটি নিজেকে হারিয়ে ফেলল।

এর কয়েক মাস পরেই যুগান্তকারী পলাশীর যুদ্ধ। নবাবের আহ্বানমাত্র রাজা মোহনলাল চলে গেলেন মুর্শিদাবাদ। সিপাহশালার মীরজাফরের অধীনে তাঁর নিজস্ব সৈন্যদলের সৈন্যপত্য দিতে।

পুরুষোদত্তমদাসজীর দিনপঞ্জিকার সঙ্গে ঐতিহাসিক হিল এবং নবাবের সরকারি ব্যবস্থাপনায় লিখিতে পণ্ডিত সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিনের বক্তব্য হুবহু মিলে যাচ্ছে। ১৭৫৭খ্রিস্টাব্দের তেইশে জুন পলাশী প্রান্তরে অস্তমিত হল ভারতের স্বাধীনতাসূর্য—সিপাহুশাল্যার মীরজাফরের চরম বিশ্বাসঘাতকতায়। সে মর্মন্তুদ কাহিনী আপনারা জানেন।

কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! এস. ওয়াজেদ আলির সেই অবিস্মরণীয় পংক্তিটি। "ভারতের সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে"। আড়াই শ বছর পার হবার পরেও আজও সত্য। পলাশী-প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকতায় যৌথভাবে শামিল হয়েছিল মুসলমান আর হিন্দু। মীরজাফর আর জগৎশেঠ। আর ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের শহিদও যৌথভাবে হিন্দু-মুসলমান। মোহনলাল আর মীরমদন। আজও হিন্দু-মুসলমান একইরকম হিন্দুস্থানের সর্বনাশ ও সেবা করছে। একদল হাওলা-গাওলায় ভারতের ধনভাণ্ডার লুট করছে। আর একদল চা- মজুমদার থেকে সফ্দার হাসমি— এই বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আত্মবলি দিয়েছে, কুরবানি হয়েছে। হিন্দু আর মুসলমান।

যুদ্ধের পরদিন গভীররাত্রে একজন অশ্বারোহী এসে পুরুষোত্তমদাস শেঠজীকে গোপনে সংবাদ দিল, পলাশী যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন মহারাজ মোহনলাল। মীরমদন ঘটনাস্থলেই গোলার আঘাতে শহিদ হয়ে যান; মোহনলাল প্রচণ্ডভাবে আহত হলেও ঘটনাস্থলে মারা যাননি। তাঁরই আদেশে দ্রুতগামী একটি ছিপ-নৌকায় তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে জিয়াগঞ্জের ঘাটে। রাজা মোহন উত্থানশক্তি রহিত; তিনি একবার তাঁর শিক্ষাগুরু পুরুষোত্তমদাসজীর পদধূলি শেষবারের মতো মাথায় নিতে চান।

বৃদ্ধ শেঠজী তিনপ্রহর রাত্রে মশালধারীর পিছন পিছন জিয়াগঞ্জের ফেরিঘাটে এসে উপনীত হলেন। আঘাটায় লাগানো আছে ছিপ-নৌকাটি। মৃত্যুপথযাত্রী মহারাজ মোহনলাল নৌকার পাটাতনে শায়িত। আর সবাইকে দূরে সরে যেতে বলে মোহনলাল গুরুজীকে কাছে ঘনিয়ে আসতে বললেন। কথা বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল তবু ধীরে ধীরে বলে গেলেন, গুরুজী, আপনি নিশ্চয় খুব অবাক হয়ে গেছেন এভাবে আপনাকে একেবারে শেষ সময়ে সংবাদ দেওয়ায়। কথাটা না বলে গেলে মরেও আমি শান্তি পাব না।

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বলেন, কী এমন গোপন কথা, মোহন?

—পলাশীর যুদ্ধে সিপাহশালার মীরজাফর যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করত তাহলে আজ আমরা যুদ্ধ জয় করে, ক্লাইভকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, জিয়াগঞ্জে ফিরে আসতাম। তাহলে তখন আপনাকে যুগলে প্রণাম করে আপনার আশীর্বাদ ভিক্ষা করতাম।

—'যুগলে'। তার অর্থ?

—আপনার কন্যা সরযূবালা আমার ধর্মপত্নী। আপনার অজ্ঞাতসারে গান্ধর্বমতে আমাদের বিবাহ হয়েছিল।

বৃদ্ধের মুখে কথা ফোটেনি।

—আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ, সরযূকে আপনি আজীবন ভরণপোষণ করবেন। আপনি জানেন, আমার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনেরা সুদূর কাশ্মীরের বাসিন্দা। আমি কপর্দকহীন অবস্থায় বঙ্গালমুলুকে পালিয়ে আসি কিশোর বয়সে। কিন্তু আজ আমি কপর্দকহীন নই। নবাব আমাকে খেতাবের সঙ্গে প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আপনাকে জানিয়ে যাই, আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মালিক আপনার কন্যা, আমার স্ত্রী সরযূবালা।

বৃদ্ধ এতক্ষণে বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়েছেন। বলেন, সে ক্ষেত্রে তোমাদের এই গান্ধর্ব-বিবাহের কথাটা গোপন রাখাই ভাল হবে না কি মোহন? গ্রামের মানুষদের মতি-গতি বোঝা ভার। সরযূ তোমার স্ত্রী জানতে পারলেই তাকে ধরে-বেঁধে নিয়ে গিয়ে সতী করবে। চিতার আগুনে পুড়িয়ে তারা পৈশাচিক উল্লাসে নাচবে।

—আজ্ঞে না। পারবে না। আপনি বাধা দেবেন।

—আমার কী ক্ষমতা, বাবা?

—অসীম ক্ষমতা আপনার। আপনি সেকথা জানেন না। আমার দুই সহচর বলভদ্র আর বিরোচন সব কথা জানে। ফলে আমার দশ হাজার সৈন্য আপনার সহায়। তাছাড়া শাস্ত্রীয় নির্দেশও আপনার স্বপক্ষে।

—'শাস্ত্রীয় নির্দেশ'! তার অর্থ?

—গর্ভবতী অবস্থায় কেউ সতী হতে পারে না, গুরুদেব! নারদীয় পূরাণে এমন বিধান আছে, আপনি তো জানেনই।

বজ্রাহত হয়ে গেলেন পুরুষোত্তমদাস পণ্ডিতজী।

পাঁচ

গল্পটা থামিয়ে এখানে কিছু কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 'মোহনলাল' ঐতিহাসিক ব্যক্তি। নিঃসন্দেহে। বস্তুত ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদ হিসেবে যৌথভাবে তিনিই প্রথম। মোহনলাল ও মীরমদন। সেই যে বিনিসুতোর মালাটা আছে না? — মঙ্গলপাণ্ডে, লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপী—চাপেকার ব্রাদার্স, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, মাস্টারদা, বিনয়, বাদল, দীনেশ—ভগত সিং, আজাদ, নেতাজী সুভাষ—তার আদ্যসূরী যৌথভাবে ওই মোহনলাল আর মীরমদন। অত্যন্ত দুঃখের কথা, বাঙালি তা মনে করে রাখেনি। শহিদ মোহনলাল আর শহিদ মীরমদনের যৌথ স্মৃতিচিহ্ন স্বাধীনতার পর আমরা বানাইনি। সে মানসিকতা ছিল না সদ্য-গদি-আসীনদের। তাঁরা অক্টারলোনি মনুমেন্টের মাথায় এক কোট লাল রঙের পোঁচড়া লাগিয়ে বলেছিলেন—ওই অক্টারলোনি মনুমেন্টটাই হল গিয়ে শহিদ মিনার। বিহারের রাজধানীতে তবু দেবীপ্রসাদের একটি অনবদ্য ভাস্কর্য আছে, কল্লোলিনী কলকাতায় নেই। হতো—যদি নেতাজী ফিরে আসতেন। কোথায় হতো জানেন? ঠিক যেখানে ছিল হলওয়েল মনুমেন্টটা, সেখানে।

অত্যন্ত দুঃখের কথা: সংসদ বাঙালি চরিতাভিধানে (ডিসেম্বর ১৯৯৮ এডিশন) তাঁর ঠাঁই

হয়নি। বিশ্বাসঘাতক 'মীরজাফর' উপস্থিত; সিরাজকে যিনি পলাশী যুদ্ধান্তে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেন সেই 'মীরকাসেম'ও আছেন। ষড়যন্ত্রকারীরা সবাই—রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, প্রেমচাঁদরা সবাই হাজির। মীরমদনেরও একটা এন্ট্রি আছে। অনুপস্থিত শুধুই হৃতভাগ্য এই—মোহনলাল!

সমসাময়িক ইতিহাসে কিন্তু তিনি স্বীকৃত। সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিনের মতে, শত্রুদের হাতে মীরজাফরের আদেশে বন্দী অবস্থায় তিনি নিহত হন।

ঐতিহাসিক 'হিল' তা মেনে নেননি। তাঁর মতে, মোহনলাল মর্মান্তিক আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হন বটে, তবে তাঁর মৃত্যু হয় অন্যত্র। অধ্যাপক তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর '*পলাশীর যুদ্ধ*' গ্রন্থে মোহনলালের মৃত্যু প্রসঙ্গে আসেননি। বলেছেন, "সেনাপতি মোহনলাল মীরজাফরের উপদেশমতো লড়াই বন্ধ করে দিতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, ওই সামান্য ব্যাপারে তাঁরা যদি পিছিয়ে যান, তাহলে তো ওইখানেই যুদ্ধ খতম। তাঁদের চূড়ান্ত হার হবে। কাল আর কিছু করে উঠতে হবে না। মোহলাল আবার ইংরেজদের আক্রমণ করার জন্য উদ্যোগী হলেন।"— ব্যস! ওইটুকুই!

তপনমোহনের '*পলাশীর যুদ্ধ*' গ্রন্থে—এখানে মোহনলাল প্রসঙ্গের ওইখানেই ইতি।

এ. টি. দেবের '*সরল বাংলা অভিধানে*' হাফ-আখরাই গানের প্রবর্তক মোহনচাঁদ বসুর জন্য দেড় কলম ঠাঁই জুটেছে। শহিদ মোহনলালের জন্য ছোট্ট দুটি প্যারাগ্রাফ। এই অভিধান মতে, নবাব মোহনলালকে রাজা খেতাব দিয়েছিলেন। অথচ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির বিশ্বকোষ মতে, নবাব তাঁকে 'মহারাজা' খেতাব দিয়েছিলেন।

কোনও সূত্রেই তাঁর বংশপরিচয় বা পিতার নামটা পাওয়া যায় না। অধিকাংশ সূত্রমতে, তিনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়। তিনি বিবাহ করেছিলেন কি না, তাঁর সন্তানাদি ছিল কি না, এসব তথ্য কোনও ঐতিহাসিক বা পণ্ডিত লিখে যাননি। '*সিরাজদ্দৌলা*' নাটকে অথবা নবীন সেনের '*পলাশীর যুদ্ধ*' কাব্যে আমরা যে মোহনলালের পরিচয় পাই তা নাট্যকার বা কবির কল্পনামাত্র। যেমন এই কণ্টকবিদ্ধ কাহিনীতে মোহনলালকে কাহিনীকার ইচ্ছামত এঁকেছেন, তবে সজ্ঞানে ইতিহাসকে কোথাও অস্বীকার না করে।

কাহিনীতে ফিরে আসা যাক এবার :

অধ্যাপক বেণীমাধব দত্তের ধারণা— মোহনপুরের জমিদারীর আদিপুরুষ সেই মহারাজ মোহনলাল শেঠ। গ্রামের নাম মোহনপুর, রাজবাড়ির নাম মোহনমঞ্জিল, জমিদারের উপাধি '*শেঠ*'। সবকিছুই ওইরকম একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী। তাই অধ্যাপক দত্তের প্রস্তাব, তাঁর ছাত্রী মিস রমলা স্মিথকে জমিদারমশাই দয়া করে অনুমতি দিন—সে ওই অতি প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ-রোজনামচা এবং হিসেবের খাতা পরীক্ষা করে দেখবে, অনুমানটা সত্য কি না।

জগদীন্দ্রনারায়ণ এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। দুরন্ত কৌতূহল হল তাঁর। মিস স্মিথ-এর বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। চুলগুলি 'বব্-কাট' ধরনের ছোট ছোট করে ছাঁটা। ধর্মে তিনি খ্রিস্টান, রোমান ক্যাথলিক। ফর্সা রঙ। টিকালো নাক, বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল একজোড়া চোখ। যদিও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, তবু তিনি শাড়ি-ব্লাউজই পরিধান করেন; শুধু ব্রাহ্ম মহিলাদের অনুকরণে কাঁধে একটা ব্রোচ। মাথায় ঘোমটা দেন না। শশীকলার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হল। অপরাজিতাও কৌতূহলী হয়ে ঘনিয়ে এল জানতে : একথা সত্যি, মিস স্মিথ? এ জমিদারীর পত্তন করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের আদি শহিদ মোহনলাল শেঠ?

মিস স্মিথ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, সেই রহস্যটাই তো ভেদ করতে এসেছি আমি। তুমি কি আশা কর, অঙ্কের ফলাফলটা ঘোষণা করে আমি অঙ্কটা কষতে শুরু করি?

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল অপরাজিতা। বলেছিল, আপনি ভারি মজা করে কথা বলতে পারেন, মিস স্মিথ।

রমলা বলেছিলেন, আমাকে এখানে বোধহয় কয়েকমাস থাকতে হবে। ফলে, তোমার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলা ভাল। তুমি আমাকে 'মাসিমা' ডেকো, কেমন?

—তা বেশ তো। আপনিও আমাকে নাম ধরে ডাকবেন, আমার নাম অপরাজিতা, জানেন নিশ্চয়।

—তার বদলে আমি যদি তোমাকে ছোট্ট করে 'খুকু' বলে ডাকি? তুমি কি রাগ করবে? আমার এক ভাইঝি ছিল—'খুকু' তাকে অকালে হারিয়েছি।

—না, করব না, যদি আড়ালে তাই ডাকেন। সবার সামনে আমাকে 'খুকু' বলে ডাকলে আমার লজ্জা করবে।

সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিলেন জগদীন্দ্রনারায়ণ। 'রায়বাহাদুর' খেতাব পেয়ে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, এস. ডি. ও., এ. ডি. এম., এস. পি.-দের নিয়ে মদ্যপানের আসর বসিয়েছিলেন। আর আজ তাঁকে শুনতে হচ্ছে, তাঁর বংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহিদ। বিরাট শহিদমালার আদ্যসূরী হচ্ছেন তাঁরই বংশের আদিপুরুষ। জগদীন্দ্রনারায়ণ রমলা স্মিথকে সবরকম সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন, কিন্তু মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন যাতে, মিস স্মিথের গবেষণা ব্যর্থ হয়। যাতে প্রমাণিত হয়, এই জমিদার বংশের আদিপুরুষ অন্য এক মোহনলাল। তার একটা বিশেষ হেতুও আছে। ইতিহাসের দর্পণে জগদীন্দ্রনারায়ণ নিজের প্রতিবিম্বটি দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু দর্পণটা সমতল নয়—উত্তল অথবা অবতল। তাই নিজের প্রতিবিম্বটা অতি কুৎসিত হয়ে গেছে! পুরুষোত্তমদাস শেঠজীর পুত্রসম ছাত্র মৃত্যুতীর্থের শেষ সোপানের ওপর দাঁড়িয়ে যেকথা বলেছিল, জগদীন্দ্রনারায়ণের পুত্রতুল্য ছোটভাইও মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে সেকথাই বলেছিল। দু'শ বছর আগে পুরুষোত্তমদাস ভয় পাননি—মোহনলালের বিধবাকে বক্ষপুটে ঠাঁই দিয়ে দেশান্তরী হয়েছিলেন। তিনি নিজে কাপুরুষ, সমুর বিধবাকে স্বীকার করে নিতে পারেননি।

তবু কৌতূহলও প্রচন্ড। রোজই তিনি এসে ঘনিয়ে বসেন। গবেষণা কতদূর অগ্রসর হল জানতে চান। অপরাজিতা তো আঠার মতো সেঁটে আছে তার মাসিমার সঙ্গে। তার দর্শনে এম. এ ডিগ্রি লাভ হয়ে গেছে। বি. এড. করতে চেয়েছিল। রায়বাহাদুর রাজি হননি। কী হবে বি. এড. করে? সে তো কোনদিন মাস্টারি করতে যাবে না। সুন্দর দেখে একটি ঘরজামাই নিয়ে আসবেন স্থির করে রেখেছেন রায়বাহাদুর। মায়, পাত্রটি পছন্দও করে বসে আছেন। ফলে, অপরাজিতা রোজ সকাল-সন্ধ্যে মিস স্মিথকে সাহায্য করতে আসত।

তারপর একদিন রহস্যজাল ভেদ করা গেল।

হ্যাঁ। মোহনপুর সেই আদি শহিদ মহারাজ মোহনলালের নামেই। মোহনমঞ্জিলও তাই। কিন্তু নবাব বাহাদুর যে উপঢৌকন ও ভূখণ্ড মহারাজ মোহনলালকে দিয়ে গিয়েছিলেন এ সম্পত্তি সেই টাকায় নয়। এই ভূখণ্ডও সেই ভূখণ্ড নয়।

কী করে জানা গেল?

ওই দুর্বোধ্য ফার্সি দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটেই তথ্যটা আবিষ্কার করলেন মিস স্মিথ।

মোহনলাল যেহেতু সিপাহসালার মীরজাফরের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ইংরেজ সেনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন, তাই গদিতে উঠে বসেই তাকে শাস্তি দিতে চাইলেন নতুন নবাব, মীরজাফর। কিন্তু শাস্তিটা দেবেন কাকে? মোহনলাল তো ফৌত হয়ে গেছে। উনি

সিরাজের গদিতে চড়ে বসার আগেই। তাই মীরজাফর ফরমান জারি করলেন ওই 'বিশ্বাসঘাতক' মোহনলালের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নবাব সরকারের খাস হয়ে যাবে। মোহনলালের ওয়ারিশরা কিছুই পাবে না। মরুক তারা, ভুখা মরুক। বেইমানের বাচ্চারা!

মীর মুন্সী নতুন নবাব মীরজাফর আলি খাঁকে কুর্নিশ করে জানিয়েছিলেন মহারাজ মোহনলালের বিবি-বাচ্চা কিচ্ছু নেই জাঁহাপনা— ভাই-ভাতিজারও কোনও পাত্তা নেই। তাঁর সম্পত্তি তো এমনিতেই খাস হয়ে যাবে।

মীরজাফর বলেছিলেন, মীর মুন্সি! তোমার মুখে ওই কথাটা যেন দ্বিতীয়বার না শুনি। বেইমান মোহনলালের 'মহারাজ' খেতাবটাও বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে!

মিস স্মিথের কাছে অতীত ইতিহাসের এই বিবরণটি শুনে রায়বাহাদুর জানতে চেয়েছিলেন, তাহলে আমাদের এই জমিদারির আদিপুরুষ —সেই মহারাজ মোহনলাল নয়?

—আজ্ঞে না, তিনিই। তাঁর নামেই এই মোহনপুর গ্রাম, তাঁর নামেই এই মোহনমঞ্জিল!

—মানে! তা কেমন করে হয়?

—তারও হদিস পেয়েছি, স্যার। কিন্তু সে তো মস্ত কাহিনী। শুনবেন?

—নিশ্চয় শুনব। বল তুমি।

—তাহলে এখন নয়। সন্ধ্যাবেলা আপনার স্টাডিতে গিয়ে বিস্তারিত জানাব। দিদি আর খুকুও শুনতে উৎসুক।

—'দিদি' আর 'খুকু' কে?

—আই মীন মিসেস শেঠ রায় আর অপরাজিতা।

ছয়

মোহনমঞ্জিল একটা দর্শনীয় স্থাপত্য। প্রায় দশবিঘা জমির কেন্দ্রস্থলে তিনতলা বাড়ি। ত্রিতলে অবশ্য একটি মাত্র বড় ঘর। রায়বাহাদুরের শয়নকক্ষ। মানুষভর উঁচু পাঁচিলে জমিটা ঘেরা। সামনে প্রকাণ্ড ঢালাই-লোহার গেট। পাশেই দ্বাররক্ষীর কুঠুরি। বাইরে বার হয়ে না এসেও সে বাঙ্কারের ছিদ্রপথে আগন্তুককে দেখতে পায়। গেট থেকে চওড়া ডাবল লেন একটা সুরকির রাস্তা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেছে। দুপাশে ফুলের কেয়ারি। কিছু দূরে-দূরে মর্মরমূর্তি। গ্রিক ও রোমান ভাস্কর্যের দেবদেবী ও উপদেবতা। অ্যাপোলো, মার্কারি, ভেনাস, বাক্কাস, ফন! সুরকির রাস্তাটা একদিক দিয়ে পোর্টিকোয় ঢুকে অপরদিক থেকে বার হয়ে এসেছে। সামনে গ্র্যান্ড স্টেয়ার্স—মিড-ভিক্টোরিয়ান যুগের শৈলীতে। সামনে একসারি কোরিস্থিয়ান কলম। চওড়া মার্বেলের বারান্দা। জানলা-দরজায় ডাবল পাল্লা। কাচের ও ভেনিশিয়ান খড়খড়ির। সামনেই বৈঠকখানা। ডাইনে স্টাডি, বাঁয়ে লাইব্রেরি তথা বিলিয়ার্ড রুম। এই তিনটি ঘরের পিছনে প্রকাণ্ড হল-কাম-ডাইনিং রুম। একসঙ্গে পঞ্চাশজন মানুষ পংক্তি ভোজনে বসতে পারে। বিরাট হলের কেন্দ্রস্থলে শুধু একটি শ্বেতপাথরের টেবিল। পাঁচ-পাঁচ দশজন, দুদিকে বসলে টেবিলের দুপ্রান্তে দুজন, একুনে বারোজনের একত্রে বসার নিত্য আয়োজন। বড় জাতের ডিনার হলে খাজাঞ্চিখানা থেকে বাড়তি টেবিল-চেয়ার নিয়ে আসতে হয়। আসবাবপত্র সবই মিড-ভিক্টোরিয়ান যুগের।

রায়বাহাদুরের শয়নকক্ষ তিনতলায়। ভোজনাগার একতলায়, প্রতিদিন তিনি এই বয়সেও দিনে দুবার ওপর-নিচ করেন। দ্বিতলেও দক্ষিণ-পূর্বে ভাল ঘর আছে; কিন্তু রায়বাহাদুর তাতে বাস করতে গররাজি। যুক্তি একটাই—এককালে দৌড়ঝাঁপ প্রচণ্ড করেছি। এ বয়সে দুবার তিনতলায় সিঁড়ি ভাঙার অভ্যেসটা ছাড়লে অথর্ব হয়ে যাব।

ওঁর জীবনযাত্রা একেবারে ঘড়ির ছকে বাঁধা। প্রত্যূষে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ। সূর্যোদয়ের আগেই প্রাতঃকৃত্যাদি সারা। সূর্যোদয় মুহূর্তে তিনি ছাদে পদ্মাসনে বসে ধ্যান করেন। তারপর সকাল সাতটায় প্রাতরাশ। সময়ের ফলমূল, একগ্লাস দুধ। চা-পানের অভ্যাস নেই; তদনন্তর দু'তিনটি সংবাদপত্র পাঠ দুটি ঘণ্টা। বেলা এগারোটায় আসে তৈলমর্দনকারী। পাক্কা একঘন্টা সে ওঁকে তেল মাখায়। তৈলমর্দনান্তে রায়বাহাদুর স্নানে যান। গৃহউদ্যান সংলগ্ন উৎসর্গীত পুষ্করিণীতে। ঠিক সাড়ে বারোটায়। ফলে বাড়ির লোকজন হয় সওয়া-বারোটার মধ্যে পুকুরে স্নান সেরে আসে, না হলে কর্তামশাই দেড়টায় স্নানান্তে ফিরে এলে। রায়বাহাদুরের ফর্মান : তিনি যখন ঘাটে স্নান করবেন তখন দশরথ জানা ব্যতিরেকে ঘাটে যারা থাকবে তারা শুধু ঘুঘু, মাছরাঙা আর গাঙশালিক। স্নানান্তে ভিজা-কাপড়টা পাষাণ রানায় ছেড়ে উনি ধুতি পরে ফিরে এসে বসবেন স্টাডিতে। তখন একজন খিদ্‌মদ্‌গার একগাদা রেকর্ড এবং সেকালের চোঙমুখ গ্রামোফোন নিয়ে প্রস্তুত থাকবে। রায়বাহাদুর তা থেকে ওঁর বাল্য কৈশোরের শ্রুত গুটিকতক রেকর্ড বেছে দেবেন। গোনা গুন্‌তি সাতটি। সপ্তম রেকর্ডটির সুর মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্যাসেজে মানে ভিতরকার বারান্দায় পেটা ঘড়িটা বেজে উঠবে : ঢং!

রায়বাহাদুর তৎক্ষণাৎ সংলগ্ন স্নানাগারে যাবেন। কোন কবিরাজ নাকি এককালে বলেছিলেন, আহারের পূর্বে ব্লাডারটাকে নিরম্বু করে ফেলতে পারলে হজম ভাল হয়। ঠিক সাত মিনিট পরে বাজবে দ্বিতীয়বার ধাতব ঘন্টা! ফাইনাল কল : ঢং

তার আগেই পরিবারের মধ্যাহ্নভোজন খানেওয়ালার দল যে যার চেয়ারে বসে যান। টেবিলের দুই প্রান্তে বসেন দু'জন : গৃহস্বামী ও স্বামিনী!

মধ্যাহ্ন আহারের জন্য বরাদ্দ পাক্কা একটি ঘণ্টা। অতঃপর মুখ প্রক্ষালনান্তে রায়বাহাদুর একটি আরাম-কেদারায় বিশ্রাম করেন। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের 'যোগনিদ্রা' বলতে পারেন। ঘুম নয়। 'ঘুম' বললে চটে যান। তারপর কিছু বইটই নাড়াচাড়া করেন। পড়েন বলে মনে হয় না। এই সময় এসে যায়— না, 'চা' নয়। গ্রীষ্মে বেলের পানা, শীতে গরম হরলিক্‌স। সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা সান্ধ্যভ্রমণ। কম্পাউন্ডের ভিতরেই। খালি পায়ে। দুর্বাঘাসের ওপর। সন্ধ্যায় টি. ভি.-তে সংবাদ শোনেন। সেটা শেষ হয় সওয়া সাতটায়। তারপর আবার উঠে যান স্টাডিতে। দেরি হয়ে গেছে—তাহোক, এবার উনি বংশের আদিপুরুষ পুরুষোত্তমদাস শেঠজীর অনুকরণে নিজের কথা লিখতে বসেন। না, দিনপঞ্জিকা নয়— আত্মজীবনী। জ্ঞান হওয়া ইস্তক তাঁর কালের কথা। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের নানান খণ্ডকাহিনী থেকে শুরু করে আজতক্। এ কাজ পাক্কা দেড়ঘন্টার। কারণ ঠিক ন'টা বাজতে সাত মিনিটে স্টাডিরুমের বাইরে পেটা ঘণ্টায় আবার একটা শব্দ হয় : ঢং!

কলমটা খাপ বন্ধ করে রায়বাহাদুর এগিয়ে যান সংলগ্ন ইউরিনালের দিকে। সেই নিত্যকর্মান্তে পাশের ঘরে ডিনার টেবিলে গিয়ে বসেন, প্যাসেজের ধাতব ঘণ্টায় দশরথ দ্বিতীয়বার ঘণ্টাধ্বনি করার পূর্বেই। প্রথম ও দ্বিতীয়বার ঘণ্টাধ্বনির মাঝখানে সময়ের ব্যবধান সাত মিনিট।

কেউ যদি সময়মতো উপস্থিত হতে না পারে তাহলে অলিখিত আইন অনুসারে সে আর

ভোজনাগারে যায় না। তার খাবারের থালা তার ঘরে রেখে আসে গৃহভৃত্যরা। পরদিন সকালটা সে কাঁটা হয়ে থাকে— কখন রায়বাহাদুরের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়। পূর্বরাত্রে সময়মতো খানা-কামরায় হাজিরা দিতে না পারার কৈফিয়ৎ দেবার ডাক পড়ে।

ডক্টর মিস স্মিথ-এর জীবনও নিয়মানুগ, তবে এমন যান্ত্রিক ছকে বাঁধা নয়। হয়তো সে জন্যই তিনি আহার-বিহারের পৃথক ব্যবস্থা করতে পীড়াপীড়ি করেছিলেন। উনি থাকেন আউট-হাউসের একটি পৃথক ঘরে। ভাল ভাল আসবাব দিয়ে সেটিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সংলগ্ন স্নানাগারও আছে। আছে একটি ছোট কিচেনেট, তাতে গ্যাস স্টোভ। মিস স্মিথ স্ব-পাক রন্ধন করেন। তবে 'বড় বাড়ি' থেকে টিফিন কেরিয়ারে প্রত্যহই তাঁর জন্য এত রান্না করা 'পদ' আসে যে শুধু ভাতটুকু ফুটিয়ে নেওয়া ছাড়া ডক্টর স্মিথ সবসময়েই গবেষণায় মগ্ন থাকেন। অপরাজিতা সময়-অসময়ে খোঁজ নিয়ে যায়। হাতে-হাতে কাজও করে। ঘরটা গুছিয়ে দেয়। টেবিলে ফুল সাজিয়ে রেখে যায়।

রায়বাহাদুরের ইচ্ছা ও ব্যবস্থাপনা মোতাবেক সেদিন সন্ধ্যাবেলা একটা নোট খাতা হাতে ডক্টর মিস রমলা স্মিথ এলেন বড়বাড়ির বৈঠকখানায়। তখন সন্ধ্যা ছয়টা কুড়ি। রায়বাহাদুর দশরথ মারফত সবাইকে সংবাদ দিয়ে রেখেছিলেন সন্ধ্যা ছয়টা পঁচিশের ভিতর বৈঠকখানায় হাজিরা দিতে। কারণ মিস স্মিথ শেঠবাড়ির জন্মকথা শুরু করবেন সাড়ে ছয়টায়।

ঘরটা বড় নয়। মাঝারি আকারের। বাইরের দিকে যে দরজাটা আছে তার রুজুরুজু অন্দরমহলের দিকে আছে একটি দরজা। তা দিয়ে ভিতরের প্যাসেজে যাওয়া যায়। ওই প্যাসেজ দিয়ে ভোজনাগারে যাওয়ার পথ। ডানদিকে মোড় ফিরে। ঠিক বাঁকের মাথায় সেই কাঁসর-ঘণ্টাটা প্রলম্বিত। যার ধাতব-নিনাদে আতঙ্কিত হয়ে গৃহবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিত্য দু'বেলা পড়ি-তো-মড়ি খানা কামরার দিকে ছুটতে থাকে।

রমলা এসে দেখলেন, মধ্যমণি ব্যতিরেকে আর সবাই সমবেত হয়েছেন। গৃহস্বামিনী শশীকলা একটি লালপাড় হালকা নীলরঙের শাড়ি পরে টেবিলের দূরতম প্রান্তে বসেছেন। এখনও তিনি ফ্রিল হাতাওয়ালা ব্লাউজ পড়েন রবীন্দ্রযুগের মতো। প্রসাধন প্রায় করেনই না, গরমের দিনে গায়ে পাউডার দেওয়াকে ধর্তব্যের মধ্যে না ধরলে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুলে চওড়া করে সিঁদুর। বিন্দি-টিপ ব্যবহার করেন না। আজীবন সিন্দুর-বিন্দু ধারণ করেছেন ললাটে। আজীবন নয়, আ-বিবাহিত জীবন।

দেওয়ানজী সত্যপ্রসন্ন দুগার বসেছেন তাঁর ঠিক পাশে। সুর্দশন, সৌখিন প্রৌঢ়। এককালে এস্টেটের দেওয়ান ছিলেন। জমিদারি খোয়াবার পর বর্তমানে তিনি শেঠরায়-এস্টেটের ম্যানেজার, কিন্তু প্রাচীন প্রথায় এখনও তাঁকে সবাই দেওয়ানজী ডাকে। তিনি শশীকলার বাল্যবন্ধু— দুজনের মধ্যে, জনশ্রুতি, কোন সুদূর অতীতে নাকি 'বাছুরে ইস্‌ক' গড়ে উঠেছিল। এটা সত্য কি না সেকথা আজ আর কেউ ভাবে না, তবে অতি দীর্ঘদিন দুগারজী এ-পরিবারের শুভাকাঙ্খী, একথা মোহনপুরের সবাই জানে।

দেওয়ানজীর বিপরীতে বসেছে সঞ্জয় দুগার। অত্যন্ত সুদর্শন যুবাপুরুষ। বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। দীর্ঘকায়, সুঠাম, মাথায় বাবরি চুল। বাবার মতো সেও সাজপোশাক সম্বন্ধে খুবই সচেতন। ছাত্র ভালই ছিল। কিন্তু টি. ভি.-তে অভিনয় করবার ফাঁদে পড়ে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। মুম্বাইতে গিয়ে সুবিধা করতে পারে না। এদিকে ওকালতির ডিগ্রিটাও পায় না। বছরখানেক সে বেকার। শোনা যাচ্ছে, আবার কলকাতায় গিয়ে নাইট-কোর্সে পড়ে আইনের উপাধিটা নিয়ে আসবে। তাকে চাকরি বা প্র্যাক্‌টিস করতে হবে না। বাবার এন্তেকাল হলে

আশা করা যায় — সে এই এস্টেটের শুধু ম্যানেজার নয়, মালিকও বনে যেতে পারে। অপরাজিতার মতিগতি বোঝা ভার; কিন্তু পিসেমশাই তাকে নেকনজরে দেখেন। কারণ তাঁর হুকুম তামিল করতে সঞ্জয় সবসময় একপায়ে খাঁড়া।

সঞ্জয়ের পাশে ওই শ্যামবর্ণ ছেলেটি ডাক্তার সলিল বসু। রমলার মতো পি. এইচ. ডি. ডিগ্রিধারী নয়, তবে সেও ডক্টর। রীতিমতো পাঁচ বছর নীলরতনে জ্যান্ত-মরা ঘেঁটে এবং কেটে এম. বি. পাশ ডাক্তার। ভালভাবে পাশ করা সত্ত্বেও সলিল শহরের মোহ ত্যাগ করে এই গ্রামে এসে প্র্যাকটিসে বসেছে। ওর বাবা সুধাময় বসু ছিলেন এই অঞ্চলের একমাত্র পাস-করা ডাক্তার। বাবার প্র্যাকটিসটা সলিল ধীরে ধীরে অধিগ্রহণ করছে। বৃদ্ধ সুধাময় আজকাল আর সকাল-সন্ধ্যা চেম্বারে এসে বসেন না। ছেলেই সেই কাজটা করে। শুধু দু-তিনটি বিত্তবান পরিবারে পুরনো ফোর্ড গাড়িটা বার করে তাঁকে রোগী দেখতে যেতে হয় আজও। মোহনমঞ্জিলে কারও শরীর বেজুত হলে অনিবার্যভাবে ডাক পড়ে সুধাময়ের। তবে ডাক্তার সুধাময়ের আদেশ অনুসারে সলিলকে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় একবার করে মোহনমঞ্জিলে আসতে হয়। একতলায় দাবা খেলার আসরে কর্তাকে এবং তিনতলায় গৃহস্বামিনীকে পেড়ে ফেলে রক্তাচাপ নিতে হয়। সেটা খাতায় লিখে রাখার দায়িত্ব অপরাজিতার। সলিল শ্যামলা হলেও সুদর্শন। তার হাসিটা বড় মিষ্টি, আর কথাবার্তা ভারি সরস, সপ্রতিভ।

এছাড়া এসেছেন কবিরাজ বলরাম মোহান্তি। আদি নিবাস কটক। তাঁর পুত্রটি মোহনপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। বিপত্নীক বলরাম এখন পুত্রের সংসারেই বাস করেন। ভদ্রলোক খুব ভাল দাবা খেলেন। আন্তজার্তিক আইনে নয়—প্রতিটি বোড়ে যে ঘরে পড়ে সেই স্থান-মাহাত্ম্যেই পুনর্জীবন লাভ করে, সবাই রানী হয়ে যায় না। বস্তুত তাঁর জীবনের রানী যেমন স্বামীকে ত্যাগ করে প্রৌঢ়ত্বের প্রথমেই স্বর্গারোহণ করেছেন, তেমনি ওঁর দাবার ছকেও রাজা-রানীর ঘরছাড়া অন্য ঘরের প্রতিটি বোড়ে রানীত্ব লাভের সৌভাগ্য বঞ্চিত। সপ্তাহে একদিন, প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় টি. ভি.-তে বাংলার সংবাদপাঠ শেষ হলে তিনি মোহনমঞ্জিলে হাজিরা দেন পুঁটুলি বগলে। রায়বাহাদুর সাড়ে-সাতটা থেকে পৌনে ন'টা পর্যন্ত তিন দান দাবা খেলেন। দু-একবার খেলা 'চটে' গেলেও 'বেস্ট-অফ-থ্রি'-তে রায়বাহাদুর প্রতি সপ্তাহেই জেতেন। কোনও-কোনওবার মোহান্তিমশাই প্রায় জিততে জিততে শেষ মুহূর্তে হেরে যান। উপায় নেই! বস্তুত রায়বাহাদুরকে আনন্দ দিতেই তিনি দাবা খেলতে আসেন। জেতার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। দাবায় জিতে আনন্দ পাওয়ার চেয়ে রায়বাহাদুরকে খুশি রেখে তাঁর করুণালাভ করা অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়।

কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে-ছ'টায় রায়বাহাদুর এসে বসলেন বৈঠকের মধ্যমণি হয়ে—ডক্টর স্মিথের বিপরীতে। সকলেই চেয়ার সরিয়ে নাড়িয়ে উত্থানোদ্যতের ভঙ্গিমা করে আবার নিজ নিজ চেয়ারে বসে পড়ে। মিস স্মিথ তা করেন না। তিনি যুক্ত করে রায়বাহাদুরকে নমস্কার করেন। রায়বাহাদুর তাঁর সোনাবাঁধানো মুঠওলা ছড়িটা বিঘত খানেক উঁচু করেন—অর্থাৎ 'প্রতিনমস্কারমুদ্রা'। মুখে বলেন, এবার শোনাও রমলা, তোমার কেচ্ছা। মহারাজ মোহনলালের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নতুন নবাব মীরজাফর বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও কীভাবে এই জমিদারির পত্তন হল?

ডক্টর মিস স্মিথ ধীরে ধীরে মেলে ধরলেন, সেই অজ্ঞাত অতীত-কাহিনী।

সাত

পলাশী-যুদ্ধের দেশপ্রেমী শহিদ মহারাজ মোহনলালের সৎকার করা হল জিয়াগঞ্জের শ্মশানে। বস্তুত গোপনে। মীরজাফর আর মীরনের ভয়ে। শ্মশানে বেচারি সরযূবালা আসতে পারেনি। তাকে আনা হয়নি। গৃহাভ্যন্তরেই সে বিধবা সাজল। তার পক্ষকাল পরে মোহনলালের দুই বিশ্বস্ত অনুচর—বলভদ্র আর বিরোচন এসে দেখা করল পুরুষোত্তমদাসের সঙ্গে। তারা পণ্ডিতজীকে পরামর্শ দিল, গোপনে জিয়াগঞ্জ ত্যাগ করে উত্তরভারতের কোনও গোপন স্থানে চলে যেতে। নতুন নবাব মীরজাফরের ভয়ে মীরমদনের বিবি-বাচ্চারা রাতারাতি পূর্ণিয়ার দিকে পালিয়ে গেছে। নবাব মোহনলালের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন। এখন তার গুপ্তচরেরা মোহনলালের পিতা-মাতা-ভাইবোন-বিবি-বাচ্চাদের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। কিছু লোককে কোতল করে নিষ্ঠুর উদাহরণ স্থাপন না করলে বেইমানদের শায়েস্তা করা যাবে না। মীরজাফরের দৃষ্টিভঙ্গিতে মোহনলাল আর মীরমদন হচ্ছে বেইমান। তারা দুজন সিপাহসালারের আদেশ অগ্রাহ্য করে পলাশী-প্রান্তরে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে! কী স্পর্ধা!

পুরুষোত্তমদাস নিতান্ত অসহায়ের মতো বলেন, কিন্তু আমি কোথায় যাব বাবা? পাঞ্জাবের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই; এই জিয়াগঞ্জেই এখন আমার দেশ, জন্মভূমি।

বলভদ্র বললে, না পণ্ডিতজী, আপনাকে পাকাপাকিভাবে জিয়াগঞ্জ ত্যাগ করে যেতে বলছি না; কিন্তু সাময়িকভাবে ভাবিজীকে নিয়ে আপনার স্থানত্যাগ করাটা নিতান্ত প্রয়োজন। মীরজাফর তার গদি বাঁচাতে চতুর্দিকেই শত্রু দেখছে। তাছাড়া মীরজাফরের পুত্র মীরন এ-বিষয়ে বাপকেও ছাড়িয়ে গেছে। সিরাজের বংশের যেখানে যে কেউ আছে, হত্যা করে চলেছে। আপনার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। কাশীধামে চৌষট্টি যোগিনী ঘাটের কাছাকাছি আমার দাদামশায়ের একটি বিরাট মোকাম আছে। অসুবিধা হবে না। দাদাজী বাবা বিশ্বনাথের একজন পুরোহিত। দিদা স্বর্গে গেছেন। ফলে ভাবিজীকে পেলে বুড়োবয়সে তাঁকে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হবে না। আমি হাতচিঠি দিয়ে দেব—

—কিন্তু কোনও যাত্রীদল কি বিশ্বনাথধামে যাবে, জিয়াগঞ্জ থেকে?

—আমি খোঁজ নিইনি। নেবও না। কারণ জিয়াগঞ্জ থেকে নৌকায় চড়া যুক্তিযুক্ত হবে না। আপনি এখানকার নামকরা পণ্ডিতজী—কেউ না কেউ চিনে ফেলতে পারে। তাদের ভিতর কেউ যদি বুঝে ফেলতে পারে যে আপনার সঙ্গিনী মহারাজের বিধবা, তাহলেই সমূহ বিপদ। আমি বরং খোঁজ নিয়ে দেখি, মুর্শিদাবাদ থেকে কোনও যাত্রীদল কাশীধামে যাচ্ছে কি না। আপনাদের দুজনকে সেখান থেকে বজরায় চড়তে হবে। এ বাস্তুভিটার জন্য চিন্তা করবেন না। আমরা দুজন এই বাড়িতেই এসে উঠব। মাস-ছয়েকের মধ্যেই সবকিছু থিতিয়ে যাবে। তখন আপনারা দুজন আবার এখানে ফিরে আসতে পারবেন।

না, ছয়মাসের মধ্যে ওঁরা কাশী থেকে বঙ্গভূমে ফিরে আসতে পারেননি। দেরি হয়েছিল আড়াই বছর। পাক্কা আড়াই বছর চুটিয়ে নবাবী করেছিল মীরজাফর আলি খাঁ। নামমহিমায় লোকটা বাংলাভাষায় বিশ্বাসঘাতকতার সমার্থক হয়ে গেছে। বিশ্বাসঘাতক তো ছিল এক ঝাঁক খ্যাঁকশিয়াল—তার ভিতর মীরন নিহত হয় বজ্রাঘাতে; দুর্লভরাম সর্বস্বান্ত হয়ে পথের ভিখারী হয়ে যায়—উন্মাদ অবস্থায় তার মৃত্যু ভয়াবহ। দুর্লভরামের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল—বেইমানির বনিয়াদে গেঁথে তুলেছিল ব্রিটিশ বণিক রাজ্য—সেই লর্ড ক্লাইভ

অর্থকৃচ্ছ্রতায় আর অপমানে কোণঠাসা হতে হতে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিল লন্ডনে, পলাশী-যুদ্ধের সতেরো বছর পরে। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ইতিহাস ভুলে গেছে; ভোলেনি ওই মীরজাফরের বেইমানিটা। বোধকরি শুধু ধন-দৌলত নয়, গদিটার লোভের জন্যই শুধু মীরজাফরই বেইমান!

বাংলাদেশের প্রজা অর্ধাহারে থেকেও সর্বোচ্চ হারে যে খাজনা দিতে পারে তার দ্বিগুণ কর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল গদি-লোভী মীরজাফর। সে প্রতিশ্রুতি রাখতে পারল না বেইমানটা। অঙ্কশাস্ত্রমতে তা সম্ভবও ছিল না। তাই গদির মোহে মাতাল মীরজাফরকে গদিচ্যুত করল ইংরেজ বেনিয়া সরকার, ১৯৬০-এ। তারপরে আরও পাঁচবছর বেঁচেছিল মীরজাফর। বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর সে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়। পরিবারবর্গ তাকে ত্যাগ করে। পথ প্রান্তে পর্ণকুটীরে ভিখারির মতো প্রাণত্যাগ করে কুবেরীর্যিত ধনের অধিকারী নবাব মীরজাফর আলি খাঁ বাহাদুর! —বেইমান নবাব!

কাশীতে বসে সে সংবাদ পেলেন পুরুষোত্তমদাসজী। নবাবের ছেলে নবাব হবে, সে জমানা আর নেই। এখন কোম্পানির রাজত্ব। নিলামের ডাকে যে সর্বোচ্চ ডাক দেবে তাকেই গদিতে বসিয়ে দেওয়া হবে। এই হল নতুন রেওয়াজ। মীরজাফরের পদচ্যুতিতে গদিতে উঠে বসলেন মীরকাসেম আলি।

মীরকাসেম আলি মীরজাফরের দামাদ। মীরজাফরের কন্যা ফতিমাকে সাদি করে তিনি বিশিষ্ট ওমরাহ হয়ে ওঠেন। পলাশীর যুদ্ধে তিনি ষড়যন্ত্র-দলে ছিলেন এমন প্রমাণ নেই; কিন্তু যুদ্ধান্তে সিরাজ যখন পলাতক, তখন শ্বশুরমশায়ের আদেশে সিরাজকে বন্দী করায় সচেষ্ট হন। পরে রাজস্ব আদায়ের ব্যর্থতায় যখন মীরজাফরের পদচ্যুতি ঘটল, তখন মীরকাসেম একটি নতুন শর্তে বেনিয়াদের প্রলুব্ধ করে গদিলাভ করলেন। ইংরেজ কোম্পানিকে তিনি মেদিনীপুর, বর্ধমান আর চট্টগ্রামের জমিদারি 'বিনামূল্যে বিক্রয়' করে দিলেন। অর্থাৎ শর্ত হল, মীরকাসেম বাংলার নবাব হবেন কিন্তু ওই তিনটি পরগণা থেকে খাজনা সরাসরি আদায় করবে বেনিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা। নবাবকে এজন্য কোনও খাজনা দেওয়া হবে না। বলা যায় ইংরেজের সরাসরি রাজ্যলাভের সেটাই সূত্রপাত।

মীরকাসেম কিন্তু দাস-মনোবৃত্তিওয়ালা শাসক ছিলেন না। ঐশ্বর্য ও বিলাসে আকণ্ঠ ডুবে থাকাকেই তিনি পরমার্থ মনে করতেন না, সিরাজ বা মীরজাফরের মতো। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মীরকাসেম বোধহয় দেশকে ভালবাসতেন, তাই বুঝতে পেরেছিলেন, ওই লালমুখো বহিরাগত পিশাচদের তাড়াতে না পারলে কী হিন্দু, কী মুসলমান—ভারতবাসীর শান্তি নেই। স্বীকার্য—তিনি সিরাজকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু প্রথম কথা, মীরকাসেমের দৃষ্টিতে প্রায় কিশোর সিরাজ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল। তার নবাবীতে রানী ভবানীর বিধবা কন্যা তারাসুন্দরী পর্যন্ত নিরাপদে পূজা-অর্চনা নিয়ে থাকতে পারতেন না। তাই সিরাজের চরিত্রের যেটা গুণ : দেশপ্রেম, দুঃসাহসিকতা—তাকে ছাপিয়ে মীরকাসেমের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল—সিরাজের মাদকাসক্তি, তার ইন্দ্রিয়াসক্ত বেলেল্লেপনা। দ্বিতীয় কথা : সিরাজকে তিনি বন্দী করেছিলেন শ্বশুরের নির্দেশে, সেনাপতির আদেশে।

মীরকাসেম বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফোর্ট উইলিয়ামের এত কাছে, মুর্শিদাবাদে বসে নবাবী করায় বিপদ আছে। তাই তিনি তাঁর রাজধানীকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন সুদূর মুঙ্গেরে। গঙ্গাতীরে প্রাচীন মুঙ্গের দুর্গকে সংস্কার করে সেখানেই সপরিবারে এবং সাংসদ বাস করতে থাকেন। ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে, নবাব তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। তাঁর শ্বশুর—মীরজাফর আলি—অঙ্গীকার করেছিল. ইংরেজ বণিক বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে

পারবে। এই একচেটিয়া অধিকার লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্ণধারেরা তাদের প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের—ফরাসি, দিনেমার, পর্তুগীজদের মাথায় চাঁদির পয়জার মারতে শুরু করেছিল মীরজাফরি জমানায়। প্রতিযোগীরা ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার আয়োজন করতে থাকে। একচেটিয়া ব্যবসা মানে ইচ্ছেমতো নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি। নতুন নবাবের কিছু করার নেই! নবাব তাঁর পূর্ববর্তী নবাব মীরজাফরের জারি-করা ফর্মান প্রত্যাহার করতে পারেন না—তাহলেই প্রত্যক্ষ সংঘাত। তাই ভালোমানুষের মতো অন্যান্য ব্যবসায়ীদেরও—ফরাসি-দিনেমারদেরও তিনি বিনা শুল্কে বাণিজ্য-অধিকার প্রদান করে বসলেন। এতে আইনত ইংরেজ কোম্পানি কিছু বলতে পারল না; কিন্তু তাদের 'বাড়াভাতে ছাই পড়ল'। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজারে সমতা ফিরে এল, যদিও রাজ সরকারের রোজগারে টান ধরল।

কিন্তু এসব ঘটনা আমাদের কাহিনীর পরবর্তীকালের। মুঙ্গেরে যখন মীরকাসেম জাঁকিয়ে বসেছেন তখন একদিন বঙ্গদেশ থেকে ওরা দুই বন্ধু কাশীতে এসে হাজির হল—বলভদ্র আর বিরোচন।

মোহনলালের পুত্র 'রাহুল'—নামটা পণ্ডিতজীই দিয়েছিলেন—তখন আড়াই বছরের শিশু। হাতে খাড়ু, মাথায় কাকপুচ্ছ। তাকে কোলে নিয়ে কত আদর করল ওরা দুজন—মোহনলালের দুই অনুচর। তারপর তারা পণ্ডিতজীকে অনুরোধ করল নোঙর তুলে ফেলতে। বলভদ্র আর বিরোচন দুজনেই ইতিমধ্যে মুঙ্গেরে চলে এসেছে। মীরকাসেমের বাহিনীতে যোগদান করেছে। ওরা খবর পেয়েছিল যে, নতুন নবাব শহিদ মীরমদনের স্ত্রীকে 'যাবৎ জীবন' অথবা'যাবন্নিকা' একটি মাসোয়ারার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নবাবের মীর মুন্সীর কানে ওরা দু'বন্ধু মোহনলালের বিধবা এবং শিশুপুত্রের প্রসঙ্গটা তুলে দেয়। নবাব তা শুনে খুশি হয়ে ওদের বলেছেন, মোহনলালের বিধবা ও শিশুপুত্রটিকে মুঙ্গেরে নিয়ে যেতে। শহিদ পিতার অবর্তমানে তার শিশুপুত্রকে তিনি কিছু 'তওবা' প্রদান করবেন।

কাহিনী দীর্ঘায়িত করে লাভ নেই। বলভদ্র আর বিরোচনের ব্যবস্থাপনায় বৃদ্ধ পণ্ডিতজী তাঁর বিগতভর্তা কন্যা ও দৌহিত্রকে নিয়ে গঙ্গার স্রোতধারা বহে চলে এলেন মুঙ্গেরে। নবাব মীরকাসেম আলি খান বাহাদুর মোহনলাল শেঠের বালকপুত্রকে 'শেঠরায়' খেতাব দিলেন। আর এই সঙ্গে মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে বেলডাঙ্গা পরগণায় একটি জমিদারি প্রদান করলেন। গড়ে উঠল মোহনপুর গ্রাম আর তার কেন্দ্রস্থলে মোহনমঞ্জিল।

এই ঘটনার পর মাত্র দুই বৎসর রোজনামচা লিখে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন পণ্ডিত পুরুষোত্তমদাস শেঠ। তিনিই ছিলেন নাবালকের তরফের অছি।

কাশীর বাজারে একরকম রঙেরেরঙের কাঠের কৌটো পাওয়া যায় দেখেছেন? কৌটো খুললেই দেখবেন তার ভিতর আর একটি কৌটো। সেটা খুলুন; আবার কৌটো! সেটা খুললে আবার কৌটো। এইভাবে ক্রমান্বয়ে কৌটোর ভিতর কৌটো।

আমাদের গোয়েন্দা গল্পটাও সেই জাতের হতে বসেছে। এতটা পথ চলে এলাম খুন-জখমের নামগন্ধ নেই, লাশ নেই, ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই, হোমিসাইড তদন্তকারী নেই—শুধু কৌটোর মধ্যে কৌটো।

বাসুসাহেবকে গল্প শোনাচ্ছে কৌশিক। কী গল্প?

না, সত্যপ্রসন্ন গল্প শোনাচ্ছেন কৌশিককে। কী গল্প?

না, অধ্যাপক বেণীমাধব গল্প শোনাচ্ছেন রায়বাহাদুরকে। কী গল্প?

না, ডক্টর মিস স্মিথ গল্প শোনাচ্ছেন সব্বাইকে!

এর তো শেষ হবে না মনে হচ্ছে। তারচেয়ে মূল কাহিনীতে সরাসরি ফিরে আসা যাক।

বাসুসাহেব কৌশিককে বললেন, এবার সংক্ষেপে জানিয়ে দাও দিকিন, রায়বাহাদুরের স্ত্রী এতদিন পরে হঠাৎ কেন অতসীর সন্ধান নিতে তোমাকে নিয়োগ করলেন?

কৌশিক বললে, বিশেষ কারণ ছিল। মিস রমলা স্মিথের কাছে ওই কাহিনীটা শোনার পরেই রাতারাতি একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেল রায়বাহাদুরের জীবনে। তিনি অন্তর্মুখী অর্ন্তলীন চিন্তায় একেবারে মূক হয়ে গেলেন। ঘড়ির কাঁটার ছন্দ মেনে জীবনযাপনের গ্লানিটুকুই স্বীকার করে নিলেন। আনন্দটুকু বিসর্জন দিয়ে। রবিবারের সন্ধ্যায় দাবা খেলা বন্ধ হল। পুকুরে স্নান বন্ধ হল। কলঘরে বালতিতে তোলা জলে স্নান শুরু করলেন। চোঙমুখ গ্রামাফোনটা নিষ্ক্রিয়। অপরাহ্ণে যে আত্মজীবনীটা লিখছিলেন দীর্ঘদিন ধরে, তা অসমাপ্ত রইল।

কেন এই আকস্মিক পরিবর্তন? একথা কে তাঁকে সাহস করে জিজ্ঞেস করবে? শশীকলা করেছিলেন, তার জবাবে রায়বাহাদুর এককথায় শুধু বলেছিলেন, 'ভাল্লাগে না'।

সত্যপ্রসন্ন গোপনে এসে দেখা করলেন শশীকলার সঙ্গে।

জানতে চান : কী হয়েছে বল তো শশী? রায়বাহাদুর রাতারাতি জীবনে এমন বীতরাগ হয়ে গেলেন কেন? মনে হচ্ছে, কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধছে রায়বাহাদুরের অন্তরে!

শশীকলা মাথা নেড়ে বাল্য-সহচরকে বলেছিলেন, তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ, সতুদা। সেদিন মিস রমলা স্মিথ-এর কাহিনীটা শোনার পর ওঁর বুকে একটা মর্মান্তিক কাঁটা বিঁধে গেছে।

—কিন্তু কিসের কাঁটা?

—দর্পণে প্রতিবিম্বিত কাঁটা।

—'দর্পণে প্রতিবিম্বিত কাঁটা!' তার মানে?

—ভেবে দেখ, দু'জনের জীবনে আড়াইশ বছর আগে-পিছে দুটি ঘটনা ঘটল, যার মধ্যে একটা আশ্চর্য যোগসূত্র আছে। এ যেন 'হিস্ট্রি রিপিট্স ইটসেল্ফ'! পণ্ডিত পুরুষোত্তমদাসজীর অজ্ঞাতসারে তাঁর কন্যা গান্ধর্বমতে বিবাহ করল মোহনলালজীকে—যে মোহনলাল দুঃশাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন। ঠিক তেমনি, তোমাদের রায়বাহাদুরের ভাইও তাঁর অজ্ঞাতসারে গান্ধর্ববিবাহ করে। অপশাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহিদ হয়ে গেল। পুরুষোত্তমদাস আর রায়বাহাদুর দু'জনেই 'পসথুমাস চাইল্ড' দুটিকে মানুষ করে তুললেন—এক যেন অপরের দর্পণ-প্রতিবিম্ব।

বাধা দিয়ে দুগারজি বলেছিলেন, না। তুমি শুধু সাদৃশ্যগুলিই দেখছ শশী, বৈসাদৃশ্যগুলিকে লক্ষ্য করছ না। বিধবা সরযূবালাকে পণ্ডিতজী সাদরে বুকে টেনে নিয়েছিলেন, অথচ রায়বাহাদুর সমুর বিধবাকে সাহায্য তো করেনইনি; অপমান করেছেন—

—না সতুদা, সমুর বিধবাকে উনি গোপনে অর্থসাহায্য করতে চেয়েছিলেন—

—কিন্তু কী মর্মান্তিক শর্তে? সেকথা বল? অতসী কোনওদিন তার মাতৃত্বের দাবি নিয়ে সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তাই নয়? সে কোনওদিন শেঠরায়-বাড়ির ছোটবউ হতে পারবে না। তাই নয়?

শশীকলা জবাব খুঁজে পাননি।

সত্যপ্রসন্ন বলে চলেন, পুরুষোত্তমদাসজী ছিলেন দরিদ্র, তবু বিধবা কন্যাকে বক্ষপুটে নিয়ে তিনি দেশত্যাগ করেছিলেন, অজ্ঞাতবাসে দিনযাপন করেছেন মোহনলালের বিধবাকে নিয়ে। অপরপক্ষে ধনকুবের রায়বাহাদুর সেই সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন উত্তরধিকার সূত্রে। ভ্রাতৃবধূ পরের বাড়ি বাসন মেজে গ্রাসাচ্ছাদন করছে জেনেও... শশীকলা বাল্যবন্ধুর মুখে হাতচাপা দিয়ে থামিয়ে দেন। বলেন, তুমি আমার একটা উপকার করবে, সতুদা? খোঁজ নিয়ে দেখবে, সেই দুঃসাহসী মেয়েটা আজও বেঁচে আছে কিনা—আমাদের খুকুর গর্ভধারিণী?

সত্যপ্রসন্ন বলেছিলেন, নাইন্টি-নাইন পার্সেন্ট চান্স : নেই। থাকুক বা না থাকুক, আমার পক্ষে পঁচিশ বছর পরে প্রকৃত সত্যটা উদ্ধার করা অসম্ভব।

—জানি! তোমাকে আমি মানস সরোবর থেকে আমার জন্য নীলপদ্ম তুলে আনতে বলছি না, সতুদা। তুমি কলকাতা চলে যাও—এই ঠিকানায় গিয়ে মিস্টার কৌশিক মিত্র অথবা তার স্ত্রী সুজাতার সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। সমস্ত ঘটনা খুলে জানাও তাদের। ওদের একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি আছে। পারলে তারাই সন্ধান নিয়ে জানাতে পারবে: অতসী বেঁচে আছে অথবা নেই। থাকলে কোথায় আছে, কী করছে?

—ধর সে সন্ধান পেলে, তারপর তুমি কী করবে?

—সন্ধানটা তো আগে পাই। তারপর সেকথা তোমাকে বলব।

বাসুসাহেব বললেন, বুঝলাম। তা তিনবছর আগে তোমরা সন্ধান করে কী তথ্য জানতে পারলে?

—প্রায় বিশ বছর আগে অতসী নামের মেয়েটি নিশ্চিতভাবে মারা গেছে!

—কী ভাবে?

—আবার পুলিশ এনকাউন্টারে। গোয়েন্দা পুলিশ ওই পরিচারিকার পরিচয় আবিষ্কার করে তাকে গ্রেপ্তার করতে যায়। পারে না। মেয়েটি তার পূর্বেই পালিয়ে যায়। নকশাল পার্টির কমরেডদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিলই। পরে বাংলা-বিহার সীমান্তে কী একটা নদীবক্ষে একটা এনকাউন্টারে ওদের গোটা দলটা মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। নৌকাটা ডুবে যায়, মৃতদেহ উদ্ধার করা যায়নি। গোয়েন্দা দপ্তর থেকে আমি খবরটা পেয়েছিলাম, সত্যপ্রসন্নের মাধ্যমে শশীকলা দেবীকে জানিয়েওছিলাম। সম্ভবত এ-সংবাদটা রায়বাহাদুরকে জানানো হয়নি। অবশ্য হয়েছিল কি হয়নি আমি জানি না। আমার জানার কথাও নয়। বাই দ্যাট টাইম আওয়ার কেস ওয়াজ ক্লোজড! শশীকলা আমাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

আট

বাসুসাহেব বলেন, কাল দুপুরের কেষ্টপুর-লোকালে রায়বাহাদুর আমাকে যেতে বলেছেন। কৌশিককে নিয়ে যাই, কি বল?

রানু বলেন, না। আমি তো বলেই দিয়েছিলাম, সুজাতার ছেলে হবার আগে ওদের আর কোনও দায়িত্ব তুমি দেবে না।

বাসু বলেন, প্রথম কথা, সুজাতার আদৌ ছেলে হবে না। হবে মেয়ে। কিন্তু আসল কথা সেটা নয়। আসল কথা হচ্ছে, আমি তো সুজাতাকে নিয়ে যেতে চাইছি না। কৌশিককে নিয়ে গেলে ক্ষতি কী?

—কী আশ্চর্য! তুমি বোঝ না কেন? কোনও একটা এমার্জেন্সি হলে আমি একা কী করে সামলাব? তোমাকে তো আমি বলেছিলাম : এই পাগল রায়বাহাদুরের কথায় নেচ না! তুমি শুনলে?

সেকথা সত্যি! রানীদেবীর প্রবল আপত্তি ছিল। কৌশিকের কাহিনী শুনে তাঁর মনে হয়েছিল এই রায়বাহাদুর লোকটা একটা মেগালোম্যানিয়াক হামবাগ!

এইখানে আবার কিছু পূর্বকথন প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। না, না, মোহনমঞ্জিলের রায়বাহাদুরের পূর্বকথন নয়, নিউ আলিপুরের বাসুসাহেবের বাড়ির কিছু পূর্বকথা :

দর্পণে প্রতিবিম্বিত কাঁটা

পূর্ববর্তী ড্রেস-রিহার্সালের কাঁটা কাহিনী রচনার সময় এক স্কুল-দিদিমণির খপ্পরে পড়েছিলাম, সেকথা আগেই বলেছি। সেই যিনি বলেছিলেন—সুজাতা-কৌশিকের এখনই একটা বাচ্চা হওয়া উচিত। দিদিমণির কাছে ধমক খেয়ে পরের সংখ্যা নবকল্লোলে আমি গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম।

সেই সময় কাহিনীর ঘূর্ণাবর্তে বাসুসাহেব বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। ড্রেস রিহার্সালের কাঁটায়। পুলিশ তখনও কাউকে অ্যারেস্ট করেনি। তাই বাসুসাহেবের কোনও মক্কেল নেই। অথচ তার আগেই জোড়াখুন হয়ে গেছে। বাসুসাহেব বন্ধুকৃত্য করতে 'সু-মটো' তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন। সম্ভাব্য চার-পাঁচ জন অপরাধীর মধ্যে ইন্দ্রকুমার জানিয়েছিল যে, খুনের সময় সে ছিল ঘটনাস্থল থেকে অনেকটা দূরে: গালুডিতে, মানে ঘাটশিলায়, সুবর্ণরেখা হোটেলে। বাসু সেই অ্যালেবাইটা যাচাই করতে সুজাতা আর কৌশিককে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ঘাটশিলায়।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে রানী বললেন, একদিক থেকে ওদের দুজনকে ঘাটশিলা পাঠানোটা ভালই হয়েছে।

বাসু জানতে চেয়েছিলেন, কোন্‌দিক থেকে?

— তোমার পাল্লায় পড়ে ওরা দুটিতে তো গোল্লায় যেতে বসেছে। দিবা-রাত্র কর্তা-গিন্নি শুধু চোর-পুলিশ খেলছে। খুন-জখম, তদন্ত-মদন্ত নিয়ে মেতে আছে। ওরা হয়তো এতদিনে ভুলেই গেছে যে, ওদের সম্পর্কটা শুধু 'সুকৌশলী'-র পার্টনার হিসেবেই শেষ হয়ে যায় না। ওরা আসলে স্বামী-স্ত্রী। যাক, দু'দিন ঘাটশিলায় ফূর্তিফার্তা করে আসুক।

বাসু হাসতে হাসতে বললেন, তা ঠিক!

—না, শুধু হাসলে হবে না। তুমি একটা জিনিস হিসেব করে দেখেছ? ওদের এতবছর বিয়ে হয়েছে অথচ আজও বাচ্চা-টাচ্চা হয়নি! কেন? বাচ্চা হয় না কেন? আপত্তিটা কার? কিসের আপত্তি?

বাসু আমতা-আমতা করে বলেন, কী আশ্চর্য! আমি তা কেমন করে জানব?

—বটেই তো! তুমি কেমন করে জানবে? বাচ্চাকাচ্চা না হবার অপরাধে ওদের তো পুলিশে ধরছে না। তাই তুমি নির্লিপ্ত! তুমি জান না; কিন্তু আমি জানি।

—কী জান?

—ওদের দুজনের মধ্যে কারও কোনও শারীরিক ত্রুটি নেই। সুজাতা আমার কাছে স্বীকার করেছে। ওদেন সন্তান হচ্ছে না কারণ ওরা সেটা চাইছে না। তাহলে নাকি ওদের সুকৌশলীর কাজের অসুবিধা হবে।

র'কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বাসু নাকি সংক্ষেপে বলেছিলেন, আই সি!

রানী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। য়ু সি নাথিং! কিছুই দেখতে পাও না তুমি। কারণ তুমি ছুঁচোর মতো অন্ধ—সাংসারিক বিষয়ে। চোর-পুলিশ খেলার বাইরে যে দুনিয়াটা আছে তার দিকে কোনদিন চোখ তুলে দেখনি তুমি! সুজাতার বয়স কত হল বল তো? এরপর 'ফার্স্ট কনফাইনমেন্ট' যে বিপজ্জনক তা কি তুমি জান না? ওদের এখনই একটা বাচ্চা হওয়া উচিত। এ সংসারে একটা চুন্নুমুন্নু এলে আমার এই বন্ধ্যাজীবন কেমন আনন্দঘন হয়ে উঠবে তা কি তুমি কোনদিন ভেবে দেখেছ?

বাসু রীতিমতো বিব্রত হয়ে বলেছিলেন, কী আশ্চর্য! তা এ বিষয়ে আমি কী করতে পারি?

—তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া! ওদের ফুলশয্যার রাত ভোর হল কি হল না তুমি কাঁটা দিয়ে ওদের খোঁচাতে শুরু করলে। তারপর থেকে ক্রমাগত কাঁটার পাহাড় বানিয়ে চলেছ।

কাঁটার পর কাঁটা। একটা শেষ হতে না হতেই আর একটা কাঁটা! কোনও বিরাম নেই—শুধু কাঁটা আর কাঁটা! তাহলে সকল কাঁটা ধন্য করে গোলাপটা ফুটবে কখন?

বাসু তাঁর পাকাচুলে আঙুল বুলিয়ে কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেনতার আগেই বেজে উঠল টেলিফোনটা।

রানু ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, ওই শুরু হয়ে গেল! ফাঁকা বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী-তে মন খুলে দুটো কথা বলব, তারও সুযোগ নেই। তার মাঝখানে শুরু হয়ে গেল : টেলিফোনের কাঁটা!

দিন-তিনেক পরে ঘাটশিলা থেকে ওরা দুজন ফিরে এল। কৌশিক আর সুজাতা। রাত তখন সাড়ে দশটা। পাড়া সুনসান। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে বেল বাজাতে বিশে এসে দরজা খুলে দিল।

কৌশিক জানতে চায়, কী রে বিশে? মামা-মামী শুয়ে পড়েছেন?

—না গো। শোয়ার ঘরে বসে গল্প-সল্প করছেন। সাহেব আজ আবার সেইটে বার করেছেন।

হাতের মুদ্রায় শিভাস রিগ্যালের বোতলটা দেখায়।

সুজাতা জানতে চায়, তুই খেয়েছিস?

—ধ্যাশ্! আমি কি ওসব খাই?

—আরে না, না, রাতের খাবার কথা বলছি।

ঠিক তখনই করিডোরের ও-প্রান্তে সুইচটা জ্বলে উঠল। হুইল চেয়ারে পাক মেরে রানু এগিয়ে আসেন। বলেন, এই তো! এসে গেছ তোমরা। রাতের খাবার ফ্রিজে রাখা আছে। তোমরা হাত-মুখ ধুয়ে নাও। বিশে ততক্ষণে খাবারটা গরম করে দেবে।

কৌশিক বলে, না, মামীমা, আমি ট্রেনেই খেয়ে এসেছি। ফ্রিজে যা রাখা আছে তা কাল সকালে সদ্ব্যবহার করা যাবে। মামু কি শুয়ে পড়েছেন?

রানু বলেন, না। তাঁর এটা থার্ড পেগ চলছে। একটু আগে উনি আমাকে বলেছিলেন, খুনিটা কে, তা উনি জানেন, কিন্তু পুলিশকে জানাতে পারছেন না।

সুজাতা বলে, কেন?

—কারণ ওঁর ধারণা গিল্টি ভার্ডিক্ট হবার মতো এভিডেন্স এখনও সংগ্রহ করা যায়নি। উনি এখন পুলিশকে নামটা জানালেই সে অ্যারেস্টেড হয়ে যাবে। সে সজাগ হয়ে যাবে।

কৌশিক বলে, লোকটা কে তার নাম আপনাকে বলেছেন? মানে যাকে উনি সন্দেহ করছেন?

—না, না, সন্দেহ নয় কৌশিক। উনি বলছেন, লোকটাকে উনি সন্দেহাতীতভাবে শনাক্ত করেছেন। যা হোক, তোমরা গিয়ে প্রাথমিক রিপোর্টটা দাখিল কর; দেখি সেই মওকায় হাতসাফাই করে বোতলটা সরিয়ে ফেলতে পারি কি না।

তিনজনে এগিয়ে আসেন বাসুসাহেবের ঘরে। স্তিমিত একটা সবুজ আলোয় গৃহকর্তা একটি ইজিচেয়ারে লম্ববান। পাশের টিপয়ে গ্লাস-বোতল-স্ন্যাক্স্-আইস কিউব।

ওদের দেখেই বাসুসাহেব বলে ওঠেন, অ্যাই যে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সুকৌশলী! গুড ঈভনিং!! আপনারা দুজন যে নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসতে পেরেছেন এতেই আমরা কৃতার্থ!

বোঝা গেল, সাড়ে-তিন পেগেই বাসু-মামুর নেশাটা জমজমাট।

রানু ইতিমধ্যে কায়দা করে হুইল চেয়ারটা টি-পয়ের ওপাশে নিয়ে গেছেন। বোতলটাও দখল করেছেন। বলেন, ওদের কাছ থেকে প্রাথমিক রিপোর্টটা এবার শুনে নাও। বিস্তারিত কাল সকালে শুনো, বরং!

বাসু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তা বেশ তো। কিন্তু... তুমি ... মানে ... ওটাকে নিয়ে যাচ্ছ কেন?

রানু ততক্ষণে বোতলটা সুজাতাকে হস্তান্তরিত করে ফেলেছেন। বলেন, তোমার বরাদ্দমতো দু-পেগ কখন শেষ হয়ে গেছে। আজ আর নয়।

প্রসঙ্গটা চাপা দিতে কৌশিক বলে ওঠে, আমাদের মিশন ইজ সাক্‌সেস্‌ফুল, বুঝলেন মামু?

বাসু চেয়ারে এলিয়ে পড়ে বলেন, রিয়্যালি? কী মিশন নিয়ে তোমরা ঘাটশিলা গেস্‌লে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সুকৌশলী?

—বাঃ! আপনার মনে নেই? ঘোষাল হত্যা মামলায় আপনি চার-চারজন সম্ভাব্য আততায়ীর কথা ভাবছিলেন। তার মধ্যে ইন্দ্রকুমারের 'অ্যালেবাইটা' যাচাই করে দেখতে আমাদের দুজনকে ঘাটশিলা পাঠিয়েছিলেন আপনি। আমরা তদন্ত করে দেখেছি—ইন্দ্রকুমার ইজ অনারেবলি অ্যাকুইটেড। তার অ্যালেবাইটা পাক্কা। তার মানে, চার-চারটে সম্ভাব্য কাঁটার ভিতর থেকে—

—কী? কী বল্লেন? কিসের ভেতর থেকে?

—সম্ভাব্য কণ্টক। কাঁটা—

ব্যস্! কোথাও কিছু নেই বোমার মতো ফেটে পড়লেন ব্যারিস্টার-সাহেব : তোমরা কি আমাকে একটুও শান্তিতে থাকতে দেবে না, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সুকৌশলী? মধ্যরাত্রে একা বসে মৌজ করছি সেখানেও হাঁউ-মাউ-খাঁউ রাক্ষসের মতো তাড়া করে এসেছ: কাঁটা-কাঁটা-কাঁটা! কী পেয়েছ তোমরা, অ্যাঁ? শুধু কাঁটা আর কাঁটা? একটা শেষ হতে না হতেই আর একটা কাঁটা! সামনে কাঁটা, পিছনে কাঁটা, হেঁটোয় কাঁটা, মুড়োয় কাঁটা! ব্যাপারটা কী? তাহলে সকল কাঁটা ধন্য করে জোলাপটা কখন ফুটবে? আমাকে সেটা বুঝিয়ে বলতে পার মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সুকৌশলী?

রানু কৌশিকের আস্তিন ধরে টানলেন। ওদের ইঙ্গিত করলেন নিঃশব্দে কেটে পড়তে তাই পড়ল ওরা।

বাইরে বেরিয়ে এসে সুজাতা বলে, মামু কি আজ একেবারে আউট? হঠাৎ জোলাপের কথা কী যেন বললেন?

রানু হাসলেন। উনি না-হয় তিন পেগের পর মুখ ফসকে কথাটা বলেছেন, কিন্তু তোমরা দুজন তো মদ্যপান করনি। তোমরা বুঝতে পারলে না, উনি 'জোলাপের' কথা বলেননি আদৌ, বলতে চেয়েছিলেন : 'গোলাপ'-এর কথা।

সুজাতা অবাক। বলে, গোলাপ! মানে?

রানু বলেছিলেন, তুমি বোধহয় এতদিনে ভুলে গেছ? 'গোলাপ' একটা ফুলের নাম! রাত হয়ে গেছে। যাও শুয়ে পড়। সময়মতো চিন্তা করে দেখ হঠাৎ গোলাপের কথা ওঁর কেন মনে পড়ল!

এ ঘটনা প্রায় মাস-ছয়েক আগেকার, ইতিমধ্যে ঘোষাল-হত্যা মামলার কিনারা হয়েছে। ড্রেস রিহার্সালের কাঁটায় তার চিন্তায়িত ইতিকথা লিপিবদ্ধও হয়েছে।

সম্ভবত কৌশিক আর সুজাতা যৌথভাবে বুঝতে পেরেছে সে রাত্রে বাসু-মামু কেন জোলাপের কথা বলেছিলেন নেশার ঝোঁকে। সেই অনুপ্রেরণাতেই হোক অথবা আমি সুজাতাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি—বিশের দিদিকে নিউ আলিপুরে নিয়ে আসব—সেটা বিশ্বাস করেই হোক ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে—

সুজাতার এটা পঞ্চম মাস। এটাই ক্রিটিকাল টাইম। রানু দেবীর মতে। তাই তিনি অনুমতি দিলেন না বাসুসাহেবের সঙ্গে কৌশিককেও বেলডাঙা হয়ে মোহনপুরে যেতে। রায়বাহাদুরের পাগলামিতে যদি তালে-তাল দিয়ে পাগলামো করতে চান তাহলে বাসুসাহেবকে তা একা-একাই করতে হবে।

নয়

কেষ্টপুর লোকালের প্রথম শ্রেণীর কামরাটায় দ্বিতীয় কোনও যাত্রী ছিল না। বাসুসাহেব সেই নির্জন কামরায় পকেট থেকে কাল-রাত্রে-পাওয়া টেলিগ্রামটা আবার বার করে পড়লেন। হ্যাঁ, এইদিনের এই কেষ্টপুর লোকালে কোনও ফার্স্টক্লাস কামরায় রায়বাহাদুর ওঁকে বেলডাঙা আসতে বলেছেন। আশ্বস্ত করেছেন যে, স্টেশনে একজন লোক ওঁকে অ্যাটেন্ড করবে এবং মোহনমঞ্জিলে নিয়ে আসবে। এর বেশি টেলিগ্রামে আর কিছু জানানো হয়নি। বাসু খুশি হতেন সকালের লালগোলো প্যাসেঞ্জারটা ধরতে পারলে। তাহলে দিনে দিনেই অকুস্থলে পৌঁছে যাওয়া যেত। কিছুটা সময় পাওয়া যেত। এ তো মনে হচ্ছে বেলডাঙায় নেমে মোহনপুর যেতে এক প্রহর রাত হয়ে যাবে।

বেলডাঙায় ট্রেনটা পৌঁছনোর কথা সন্ধ্যা সাতটা পঞ্চাশে। কিন্তু মিনিট পনের লেট করায় আটটা পাঁচে গাড়িটা এসে থামল বেলডাঙায়। বাসুসাহেব তাঁর গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটা তুলে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন। অন্যান্য কামরা থেকেও দু-চারজন যাত্রী নামল। হুইস্‌ল্ বাজিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ট্রেনটা রওনা দিল গন্তব্যস্থলের দিকে।

যারা নেমেছে তারা গেটের দিকে রওনা হয়েছে। মুঠো মুঠো জোনাকি জ্বলছে ঝোপে-ঝাড়ে। বাসুসাহেব তাঁর ব্যাগটা ওঠাবার উপক্রম করতেই পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, আপনি তো মোহনপুর যাবেন?

প্রৌঢ় একজন মানুষ। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, গায়ে হাফশার্ট। বেশ সুন্দর কাঁচাপাকা এক জোড়া মোচ আছে। এককালে হয়তো জমিদারীর নায়েব ছিল।

বাসু সরাসরি জবাব না দিয়ে প্রতি-প্রশ্ন করেন, কেন বলুন তো?

—না মানে ইয়ে, আপনি বাসুসাহেব তো? মোহনমঞ্জিলে যাবেন তো? আমিই আপনাকে নিতে এসেছি।

—অ। আপনার পরিচয়?

—আজ্ঞে। আমার নাম শ্রীধর গোঁসাই। আমাকে 'তুমি' বলবেন। রায় বাহাদুরের এস্টেটে কাজ করছি আজ চল্লিশ বছর।

—বুঝলাম। তা আমাকে চিনলে কী করে?

—আজ্ঞে ফাস্টো-কেলাস থেকে আর কেউ তো নামেনি।

—ওয়েল ডিটেকটেড। ঠিক আছে। চল।

কুলি করতে হল না। শ্রীধরই ওঁর ব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। স্টেশনের বাইরে একটা পুরাতন মডেলের কালো শেভ্রলে দাঁড়িয়েছিল। তার ড্রাইভার সেলাম করে পিছনের পাল্লাটা খুলে দিল। শ্রীধর গোঁসাই বাসুসাহেবের ব্যাগটা নিয়ে ড্রাইভারের পাশের আসনে বসল।

গাড়িটা রওনা দিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। স্টেশন-চত্বর পার হবার পর ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম্য পরিবেশে একজোড়া হেড-লাইটের আলোয় এঁকেবেঁকে চলল গাড়িটা। কিছুটা পথ এগিয়ে যাবার পরই গতিবেগ কমাতে হল। পিচমোড়া রাস্তা অতিক্রম করে গাড়িটা এবার খোঁয়া-বাঁধানো গ্রাম্য সড়কে এসে পড়েছে। পিছনে একটা গেরুয়া চালচিত্র রচনা করে এঁকে-বেঁকে চলেছে মোহনপুরের দিকে। মাঝে মাঝে দু-চার ঘর মানুষের বাস। বিজলি বাতির লাইন আসেনি। তারা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে কাজকর্ম সারছে।

অবশেষে এক সময় যাত্রা সম্পূর্ণ হল। দূর থেকে হেডলাইটের আলো পড়তেই ঢালাই লোহার গেটটা খুলে গেল। শেভ্রলে গাড়িটা এসে থামল পোর্টিকোর নিচে।

তৎক্ষণাৎ অন্তরীক্ষ থেকে আর্বিভূত হল একজন। তার হাতে পাঁচ সেলের বড় টর্চ। মোহনপুরে কিন্তু বিজলি বাতি আছে। ড্রাইভার দৌড়ে এসে পিছনের দরজাটা খুলে দিল। টর্চ-বাতিটা বোধকরি লোড-শেডিং এমার্জেন্সি বাবদ। টর্চ-হাতে-লোকটা এগিয়ে এসে যুক্ত করে নমস্কার করে বললে, আসেন স্যার, এদিকে।

হাত বাড়িয়ে শ্রীধরের হাত থেকে গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটা গ্রহণ করে গ্র্যান্ড-স্টেয়ার্স বেয়ে ওপরে উঠে এলেন ওঁরা দুজন। শ্রীধর আবার উঠে বসল গাড়িতে। গাড়িটা গ্যারেজের দিকে চলে গেল।

ওঁরা দুজন পাশাপাশি এগিয়ে এলেন বৈঠকখানার দিকে। বাসু আচমকা প্রশ্ন করেন, তোমার নাম তো দশরথ, তাই নয়? দশরথ জানা?

লোকটা থমকে থেমে গেল। অবাক হয়ে বললে, আপনি দশরথদারে চিনেন? আজ্ঞে না, আমার নাম হরিদাস, আজ্ঞে। দশরথদা আমারে বলি রাখিছিল কলকাতা থিকে একজন সাহেব আজ রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আসপেন। তাই, হুজুর, আমি টিপবাতি-হাতে ডেঁরিয়ে আছি। আসেন, স্যার।

বৈঠকখানার ভেজানো পাল্লাটা হাট করে খুলে দিয়ে লোকটা বলল, সাহেব আসি গেছেন।

বলে আর দাঁড়ালো না। ব্যাগটা নামিয়ে রেখে নিজের কাজে চলে গেল। ঘরে জোরালো নিয়ন বাতি জ্বলছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কয়েকজন লোক সেখানে উপস্থিত। বাসু তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে এক লহমার মধ্যে বুঝে নিলেন— এঁরা জানে না যে, তিনি এসময় আসবেন। সবাই অবাক হয়ে তাঁকে দেখছে।

হঠাৎ সে দলের ভেতর একজন প্রৌঢ়া—তাঁর মাথায় কাঁচা-পাকা চুলে সিন্দুর চিহ্ন, ঘোমটাটা তুলে দিয়ে এগিয়ে এলেন। যুক্ত করে নমস্কার করে বললেন, আসুন, আসুন। ভিতরে এসে বসুন। কলকাতা থেকে আসছেন নিশ্চয়—

বাসু প্রতি-নমস্কার করে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, কেষ্টপুর লোকালে। আপনি নিশ্চয় শশীকলা দেবী, তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই। কিন্তু আমি মানে......

—আমার নাম প্রসন্নকুমার বাসু। আমি যে এই ট্রেনে আসছি তা কি রায়বাহাদুর আপনাকে বলতে ভুলে গেছেন?

—না, না, ভুলে যাবে কেন? বলেছে, নিশ্চয় বলেছে। আমিই বোধহয় সেকথা ভুলে বসে আছি। আজকাল আমার কিছুই মনে থাকে না। উনি নিশ্চয় আমাকে বলেছিলেন যে, আপনি আজ সন্ধ্যায় কেষ্টপুর লোকালে আসবেন, আমি... মানে...

গৃহাভ্যন্তরে যাঁরা আড্ডা মারছিলেন তাঁরা এখনো স্বাভাবিক হতে পারেননি। তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে গৃহস্বামিনী বলেন, আপনি তো এঁদের সবাইকে চেনেন। নতুন করে কী আর পরিচয় দেব? আর ইনি হচ্ছেন মিস্টার প্রসন্নকুমার বাসু, রায়বাহাদুরের বাল্যবন্ধু!

বাসুসাহেব আন্দাজ করেন, শশীকলা অনুমান করেছেন আগন্তুক রায়বাহাদুরের বাল্যবন্ধু!

এই সময় রানী-কালার মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়িপরা একটি সুন্দরী যুবতী এগিয়ে এসে বলে, এক্সকিউজ মি স্যার, আপনি কি ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু?

বাসু হেসে বলেন, তুমি আমার নাম শুনেছ দেখছি। কিন্তু আমি যে আজ সন্ধ্যায় আসছি, সেটা তুমিও জান না। না কি তোমাকেও রায়বাহাদুর সেকথা বলে রেখেছিলেন, আর তুমি ভুলে বসে আছো?

—না স্যার। আমাকে তিনি বলেননি। জানা থাকলে আমার ভ্যানিটি ব্যাগে অটোগ্রাফ খাতাখানা নিশ্চয় থাকত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ড্যাডি আমাদের সবাইকে একটা বিরাট সারপ্রাইজ দেবে বলে খবরটা আস্তিনের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল।

—কিন্তু তিনি কোথায়? তোমার ড্যাডি?

মেয়েটি জবাব দেবার সুযোগ পেল না। তার আগেই প্যাসেজের দিক থেকে ভেসে এল একটা ধাতব ঘন্টাধ্বনি—ঢং।

বাসু চট-জলদি নিজের মণিবন্ধের দিকে তাকিয়ে দেখলেন আটটা তিপ্পান্ন। ঠিক তখনি বৈঠকখানার ভিতর দিকের দরজাটা খুলে গেল। একজন খিদমদ্‌গার—এবারও যদি ওঁর আন্দাজে ভুল না হয় থাকে তাহলে—দশরথ জানা, এসে ঘোষণা করল, আসুন আপনারা, খানা...

প্রায় পাঁচ-সেকেন্ড পরে বাক্যটা শেষ করল সে,... তৈয়ার।

ওই পাঁচটা সেকেন্ড দশরথ জানার মুণ্ডুটা সিনেমা টেকনিকের পরিভাষায় ডান-থেকে-বাঁয়ে ধীরে ধীরে 'প্যান' করছিল। বাসু লক্ষ্য করে দেখলেন, সকলেই অল্পবেশি উত্তেজিত। শশীকলা বলে ওঠেন, এমনটা তো কখনো হয়নি!

বাসু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে অপরাজিতাকে প্রশ্ন করেন, তোমার মা কী বলতে চাইছেন? কোন্ জিনিসটা হয়নি?

মেয়েটি সপ্রতিভভাবেই জবাবে বলল, আমি জ্ঞানত কখনও দেখিনি ড্যাডি ডিনারে লেট।

কক্ষে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর ভিতর থেকে একজন বৃদ্ধ বলে ওঠেন, জয় জগন্নাথ! অ্যাদ্দিনে তাহলে রায়বাহাদুর শেষপর্যন্ত মাত্ হলেন?

বাসুসাহেব তাঁর দিকে ফিরে বললেন, কেন? এর আগে তাঁকে কোনদিন মাত্ করতে পারেননি নাকি, মোহান্তিমশাই?

ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে যান। ওই সম্পূর্ণ অপরিচিত সুটেড-বুটেড সাহেবটি বোধহয় জীবনে প্রথমবার মোহনপুরে এল—তা সে হোক না কেন রায়বাহাদুরের বাল্যবন্ধু। সেক্ষেত্রে লোকটা তাঁকে এভাবে বেমক্কা 'মোহান্তিমশাই' নামে ডাকে কী করে?

মোহান্তিমশাই কিছু বলার আগে ও-প্রান্ত থেকে একটি ভদ্রমহিলা—বছর পঞ্চাশ বয়স হবে তাঁর, মাথায় বব্‌কাট চুল, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা—দশরথকে প্রশ্ন করেন, রায়বাহাদুর কোথায়? তুমি জান?

—কর্তামশাইকে ঘন্টাদুই আগে ওই পুবদিকের ঘরে, মানে পড়ার ঘরে দেখেছিলাম, আজ্ঞে। তারপর আর-তাঁরে দেখিনি।

অপরাজিতা প্রশ্ন করে, স্ট্যাডিরুমের দরজাটা কি এখন খোলা নেই? ঘণ্টার শব্দ কি ড্যাডি শোনেনি?

—আজ্ঞে দরজাটা 'আবজানো' আছে। তবে তা থাকলেও ঘণ্টার শব্দ তিনি নিশ্চয় শুনেছেন। আমি গিয়ে দেখে আসব?

শশীকলা বলেন, হ্যাঁ নিশ্চয়। দেখে এস তো—

আদেশমাত্র দশরথ ঘর ছেড়ে স্ট্যাডিরুমের দিকে এগিয়ে এল। বাসুসাহেব লক্ষ্য করে দেখলেন, সকলেই রুদ্ধশ্বাসে কী যেন একটা অলৌকিক ঘটনার প্রতীক্ষা করছে। তাদের জ্ঞানত এমন দুর্ঘটনা নাকি মোহনমঞ্জিলে কখনো ঘটেনি। নৈশাহারের আহ্বানধ্বনি কাংস-নির্ঘোষে প্রচারিত হয়ে গেল অথচ গৃহকর্তা তার পূর্বে বৈঠকখানায় এসে উপস্থিত হয়নি—সদলবলে খানা-কামরায় যাবার জন্য। বাসু আরও লক্ষ্য করে দেখলেন, কক্ষে একজন প্রৌঢ়, আরও একজন যুবতী আর তিনজন অল্পবয়সী যুবক উপস্থিত। এদের মধ্যে অনেককে উনি আন্দাজে চিনতে পারলেন।

ইতিমধ্যে দশরথ ফিরে এসেছে। সসম্ভ্রমে বললে, পড়ার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ আছে, মা-ঠাইরান।

—ভিতর থেকে বন্ধ! মানে? তুমি ধাক্কা দিয়ে দেখলে?

দশরথ দুদিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানালো, তার ঘাড়ে একটাই মাথা—তাই সে ডাকাডাকি করেনি, ধাক্কাধাক্কি করেনি।

এইমাত্র প্রশ্নটা যে করেছে—বাবরি চুল দেখে বাসু বুঝতে পেরেছেন, সে হচ্ছে সঞ্জয় দুগার—এবার সে শশীকলার দিকে ফিরে জানতে চায়, আমি গিয়ে একবার দেখে আসব পিসিমা?

শশীকলা প্রত্যুত্তর করার সুযোগ পেলেন না, কারণ তার আগেই বাসুসাহেব বলে ওঠেন, না সঞ্জয়। তুমি একা নয়। আমরা সবাই একসঙ্গে যাব। আসুন আপনারা। দশরথ, তুমি পথ দেখাও।

সবাই উত্তেরাত্তর স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে। কে ওই বৃদ্ধ আগন্তুক? যাকে অপরাজিতা ছাড়া আর কেউ চেনে না, অথচ যে একের পর একজনকে নাম ধরে সম্বোধন করছে!

বাসুসাহেব ভ্রূক্ষেপ করলেন না। দশরথের পিছু পিছু তিনি রওনা হলেন। দলের বাকি সকলেই নীরবে তাঁর অনুগমন করল। সকলের পিছনে সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা। দলটা এসে থামল স্টাডি-রুমের দোরগোড়ায়। বাসু প্রথমে হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে দেখলেন, সেটা পাক খেল বটে, কিন্তু দরজা খুলে গেল না। এবার ধীরে ধীরে দরজায় করাঘাত করলেন বাসু। ভিতরে কোন সাড়াশব্দ জাগল না। উপায়ান্তরবিহীন হয়ে এবার বেশ জোরে জোরেই দরজায় আঘাত করলেন। তবু কোন প্রতিক্রিয়া হল না। বাসু এবার হাঁটু গেড়ে মার্বেল-মেজেতে বসে চাবির ফুটো দিয়ে ঘরের ভিতরটা একবার দেখলেন। পরমুহূর্তেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে ওঠেন, উপায় নেই। দরজাটা ভেঙে আমাদের ভিতরে যেতে হবে।

এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। কেউ কথা বলে না। আগন্তুক বৃদ্ধের হুকুমটা কিন্তু মেনে নেয় অল্পবয়সী কজন। উপর্যুপরি ধাক্কায় সেগুন কাঠের পাল্লায় অবশেষে চিড় ধরল। পরের ধাক্কাতেই প্রচণ্ড শব্দ করে বর্মা-টিকের প্যানেল-দরজাটা ভেঙে পড়ল। দরজা নয়, দরজার সঙ্গে সংলগ্ন তালাটা। ফলে কপাটটা খুলে গেল ভিতরদিকে।

কেউ ভিতরে ঢুকল না। ঘরে আলো জ্বলছে। টেবিল্ ল্যাম্প। চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে

সবাই একসঙ্গে যেন বজ্রাহত হয়ে গেল! ঘরের বাঁ-দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা বড় মেহগিনিকাঠের সেক্রেটারিয়েট টেব্‌ল্। তাতেই জ্বলছিল ওই বাতিটা। দরজার দিকে মুখ করে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছেন রায়বাহাবদুর। তাঁর মাথাটা এক পাশে ঝুলে পড়েছে। শুধু মাথা নয়, শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের অনেকটা। ডান হাতটা আলগাভাবে ঝুলছে। সাদা মার্বেলের মেঝের ওপর রক্তের একটা ছোপ। ডানহাতের নিচেই পড়ে আছে একটা রিভলভার। ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। রায়বাহাদুর অর্গলবদ্ধ কক্ষে নিজের হাতে নিজের জীবনাবসান ঘটিয়েছেন। নিজের রিভলভারে।

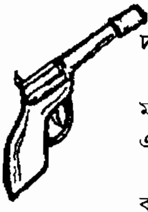

দশ

প্রথম দুই-তিন সেকেন্ড প্রবেশপথের বাইরে গোটা দলটা তড়িতাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বাসু প্রবেশ করলেন স্টাডিতে। মোহান্তিমশাই একটা স্বগতোক্তি করে বসেন, কী সর্বনাশ! রায়বাহাদুর আত্মহত্যা করেছেন!

তৎক্ষণাৎ পিছনে একটা পতনধ্বনি শুনে বাসু ফিরে দাঁড়ালেন. শশীকলার কণ্ঠ দিয়ে কোনও শব্দ নির্গত হয়নি। কিন্তু তাঁর চরণযুগল দেহভার রক্ষা করতে পারছিল না। তিনি মূর্ছিত হয়ে দোরগোড়াতেই লুটিয়ে পড়লেন।

বাসু বললেন, সঞ্জয়, ওঁকে ধরাধরি করে ভিতরে নিয়ে যাও।

কে যে ওই মূর্ছাহতা মহিলাকে সরিয়ে নিয়ে গেল বাসু আর তা দেখলেন না। তিনি এগিয়ে গেলেন চেয়ারে-বসা রায়বাহাদুরের মৃতদেহের দিকে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, তাহলে তখন আমরা যে শব্দটা শুনেছিলাম তা কোনও গাড়ির ব্যাকফায়ারের আওয়াজ নয়?...ওটা পিস্তলের শব্দ!

বাসু আবার এদিকে ফিরে দেখলেন। কথাটা বলেছে কক্ষে উপস্থিত একমাত্র অচেনা মহিলাটি। সালোয়ার পাঞ্জাবি পরা, শ্যামলা কিন্তু সুতনুকা মেয়েটির বয়স বাইশ-চব্বিশ হতে পারে। সম্ভবত এই মোহনপুরেরই বাসিন্দা। আজ রাত্রে হয়তো তারও আমন্ত্রণ ছিল সায়মাসে। সলিলের বোন কি? বুঝে উঠতে পারলেন না।

বাসু জানতে চান, থানাটা কতদূরে? টেলিফোন করা যাবে? সত্যপ্রসন্নবাবু?

সত্যপ্রসন্ন জবাবে কিছু বলার আগেই অপরাজিতা যেন আর্তনাদ করে ওঠে, না!

—না? 'না' মানে? পুলিসকে তো জানাতেই হবে।

এবার সত্যপ্রসন্ন এগিয়ে আসেন। অপরাজিতার পিঠে একটা হাত রেখে বলেন, তুমি ভিতরে যাও জিতা, দেখ, তোমার মা কেমন আছেন। তাঁর কাছে-কাছে থাক। আমরা এদিকটা সামলাচ্ছি।

অপরাজিতা শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে দ্রুতপায়ে বাড়ির ভিতর দিকে চলে যায়। সত্যপ্রসন্ন এদিকে ফিরে বাসুসাহেবকে বলেন, মোহনপুরেই থানা হেডকোয়ার্টার। টেলিফোনে খবর দিতে কোনও অসুবিধা নেই। এ বাড়িতেও ফোন আছে। থানাতেও। ফোনটা কি আপনি করবেন?

বাসু বলেন, না, আপনারা যে কেউ করুন। আমি ততক্ষণ ঘরটা খুঁটিয়ে দেখি। পুলিস আসার আগেই। তবে কোনও কিছু আমি ছোঁব না। বাই দ্য ওয়ে, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন মিস্টার দুগার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! বছর-তিনেক আগে আমি আপনার বাড়িতেও একবার গিয়েছিলাম। তখন অবশ্য আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি।

—জানি। শুনুন। আপনি এ ঘরে থাকুন। সাক্ষী হিসাবে। অর্থাৎ আমি কোনও কিছু স্পর্শ করছি না এটা লক্ষ্য রাখতে। অন্য সকলে এ ঘর ছেড়ে চলে গেলেই ভাল হয়।

কেউ কোনও প্রতিবাদ করল না। বাসুর নির্দেশটা সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিল। ধীরে ধীরে সকলে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল। সত্যপ্রসন্ন তাঁর পুত্রকে বললেন, সঞ্জয় দেখ, থানাতে বড় দারোগা হরেন্দ্র দত্ত আছেন কি না। মোট কথা থানায় খবরটা দিয়ে আমাকে জানিয়ে দিও।

সত্যপ্রসন্ন দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা করলেন, তা হল না। একবার বাইরে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে নির্জনতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর প্রশ্ন করেন, আপনি এই মর্মান্তিক সময়ে এখানে এসে উপস্থিত হলেন কি করে?

—আপনিও কি জানতেন না আমার আসার কথা? রায়বাহাদুর যে আমাকে টেলিগ্রাম করে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তা কি আপনিও জানেন না?

—ডেকে পাঠিয়েছিলেন? আপনাকে? কেন?

—সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। আপনি দরজার সামনে পাহারা দিন। আমি ততক্ষণ খুঁজে দেখি।

—কী খুঁজে দেখবেন আপনি?

—উনি ডান-কানে ফায়ার করেছিলেন, বুলেটটা বাঁ-কান দিয়ে বার হয়ে ওই দেখুন ওই আয়নাটায় আঘাত করেছিল। আয়নাটা মাকড়শার জালের মতো চৌচির হয়ে ফেটে গেছে। ফলে বুলেটটা প্রতিহত হয়ে ঘরের ভিতরেই কোথাও আছে।

বেশি খুঁজতে হল না। সামনেই সেটা পড়েছিল মার্বেলের মেঝেতে। বাসু সেটা তুলে দেখলেন এবং ঠিক যেখান থেকে কুড়িয়েছিলেন সেখানে নামিয়ে রাখলেন। এবার উনি এগিয়ে গেলেন টেবিলটার দিকে। টেবিলের ওপর কিছু কাগজপত্র। ঝুঁকে পড়ে দেখলেন রায়বাহাদুর যে 'আত্মচরিত' লিখছিলেন তারই পাণ্ডুলিপি। যে পাতাটা লিখছিলেন সেটাই খোলাই রয়েছে। পৃষ্ঠার মাথায় পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৩১; একটি মাত্র অনুচ্ছেদ লেখা শেষ হয়েছে। তার নিচে কাঁপা-কাঁপা হস্তাক্ষরে বেশ বড় বড় হরফে ক্যাপিটাল লেটার্সে ইংরেজিতে লেখা : সরি!

কলমটাও খোলা অবস্থায় পড়ে আছে।

বাসু এবার মৃত বৃদ্ধের পকেট হাতড়াতে থাকেন।

সত্যপ্রসন্ন জিজ্ঞেস করেন, কী খুঁজছেন বলুন তো?

—ঘরের চাবিটা। ঘরটা ভিতর থেকে তালাবন্ধ করে উনি চাবিটা নিশ্চয় বার করে নিয়েছিলেন, না হলে ছিদ্রপথে আমি ঘরের ভিতরটা.......এই তো।

বাসু ওই মৃত বৃদ্ধের পাশপকেট থেকে একটি চাবি বার করে দেখলেন এবং রুমালে তাঁর নিজের ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে নিয়ে আবার পকেটে রেখে দিলেন।

সত্যপ্রসন্ন বললেন, সন্দেহের আর কোনও অবশেষ থাকল না। ভিতর থেকে ঘরটা বন্ধ করে, ওই 'সরি' কথাটা লিখে উনি নিজের রিভলভারে নিজেকেই হত্যা করেছেন। কিন্তু উনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন?

বাসু বললেন, তার চেয়েও বড় কথা, ডেকেই যখন পাঠালেন তখন আমার সঙ্গে কোনও কথাবার্তা না বলে এমন তাড়াহুড়ো করে আত্মহত্যা করে বসলেন কেন? আমি যে আসছি তা উনি আন্দাজ করেছিলেন। স্টেশনে লোক পাঠিয়েছেন, গাড়ি পাঠিয়েছেন, দশরথকেও বলে রেখেছেন। অথচ মিসেস শেঠ কিছু জানেন না, আপনি কিছু জানেন না। নাঃ! জিগস্-পাজল-এ অনেকগুলো টুকরো এখনো আমরা খুঁজে পাইনি। সে যাইহোক, আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন? কী এমন কাণ্ডটা ঘটল যাতে— কোনও একটা সমস্যা সমাধানের জন্য উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, অথচ আমার সঙ্গে কোনও কথা না বলে এভাবে—

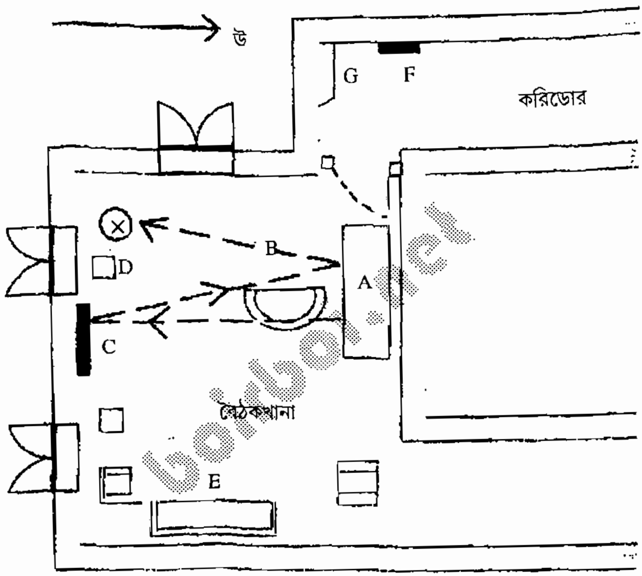

A - টেবিল
B - চেয়ার
C - ভাঙা আয়না
D - নটরাজ মূর্তি
বুলেটের গতিপথ — — — →

E - সোফাসেট
F - পিতলের ঘণ্টা
G - করিডোরের আয়না
× - যেখানে বুলেট পুলিশ খুঁজে পায়

—না, স্যার! আমি কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না।

—আপনি শেষ কখন ওঁকে দেখেন?

—আজই দুপুরে। আমরা একসঙ্গেই মধ্যাহ্নভোজন করেছি। তখনো উনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিলেন।

—আপনার মনে হয়নি উনি উত্তেজিত অথবা অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় আছেন?

—হ্যাঁ, একটু গম্ভীর ছিলেন। একটা পারিবারিক কারণে উনি কিছুদিন থেকেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু সেটা এমন কিছু নয়। মানে, উনি যে এভাবে আত্মহত্যা......

—বুঝেছি, বুঝেছি। আচ্ছা ওই মেয়েটি কে? বছর কুড়ি-বাইশ বয়েস। একটা মেরুন রঙের সালোয়ার কামিজ পরা? যে তখন বলল, 'শব্দটা তাহলে কোনও গাড়ির ব্যাকফায়ার নয়!'?

—ওর নাম ঝরনা মিত্র। ও আজ দিন-দশেক হল এ বাড়িতে আছে। মোহনপুরের মেয়ে নয়।

—হ্যাঁ, কিন্তু কোন সূত্রে? শশীকলার আমন্ত্রণে?

—আজ্ঞে না, ও ছিল আমার ছেলে সঞ্জয়ের সহপাঠিনী। সঞ্জয় লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বম্বে চলে গিয়েছিল। মেয়েটি এম. এ. পাশ করে একটা স্কুলে পড়ায়। গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে এসেছে।

—তা ওই মেয়েটি তখন 'ফায়ারিং'-এর কথা কী বলেছিল। সেটা কি আপনিও শুনেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা তখন অনেকেই বৈঠকখানায় এসে গেছি। হঠাৎ 'দুম' করে একটা শব্দ হল। সলিল বলল, 'কিসের শব্দ ওটা,' মিস্ স্মিথ বললেন, 'রাস্তায় কোন গাড়ি ব্যাকফায়ার করল বোধহয়।' তখন আমি বললাম, 'মোহনপুরে কটাই বা গাড়ি? আর রাস্তা তো অনেকদূরে। শব্দটা ডাইনিং হল থেকে এল মনে হচ্ছে।' অপরাজিতা বললে, 'না, আমার মনে হল স্টাডিরুমের দিক থেকে।'

—ওটা যে পিস্তলের ফায়ারিং হতে পারে, এটা আপনাদের কারও মনে হয়নি।

—তখন হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। এখন মনে হচ্ছে, ওটা রায়বাহাদুরের রিভলভারের শব্দই।

—সেটা আন্দাজ কয়টার সময় বলতে পারেন?

—পারি। 'আন্দাজ' নয়, ঠিক, আটটা পঁয়তাল্লিশ। কারণ শব্দটা শোনার পরেই আমার নজরে পড়েছিল বৈঠকখানার বড় দেওয়াল ঘড়িটায়। ওটা ঠিক তখনই শব্দ করে বেজে উঠল। প্রতি পনের মিনিট অন্তর ওই ঘড়িটা জলতরঙ্গের মতো শব্দ করে।

—বুঝলাম। এবার বলুন, তখন বৈঠকখানা ঘরে কে কে ছিল?

—আমরা সবাই ছিলাম।

—প্লিজ বি স্পেসিফিক। ঠিক কে কে?

—কেন বলুন তো? ও আয়াম সরি, বলছি বলছি। আমি ছিলাম, মোহান্তি ছিলেন, সঞ্জয়, সলিল. কামাল, জিতা সবাই ছিলাম।

—মিসেস শেঠ, ঝরনা, দশরথ, অথবা ডঃ মিস স্মিথ?

—না, শশী একটু পরে আসে। ঝরনা আর রমলাদেবী ছিলেন কি না মনে পড়ছে না। তবে দশরথ তখন ঘরে ছিল না।

—এই যে একটু আগে বললেন, "মিস স্মিথ বললেন 'রাস্তায় কোন গাড়ি ব্যাকফায়ার করল বোধহয়।'

—বলেছিলাম না কি? হ্যাঁ তাই! মিস স্মিথই ও কথাটা বলেন! এখন মনে পড়েছে।

বাসু পকেট থেকে নোটবই বার করে ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র ঘটনাস্থলের একটা স্কেচ করে নিলেন। স্টাডিরুমটা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। একটামাত্র দরজা পশ্চিমের দেওয়ালে, একেবারে উত্তরপ্রান্তে ঘেঁষে। দরজা খুলে সামনেই সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা, তার সামনে গদি-আঁটা

চেয়ার। সেটা পশ্চিমদিকে মুখ করে আছে। রায়বাহাদুর পশ্চিমদিকে মুখ করে বসে আছেন। টেবিলের দিকে ফিরে নয়। ঘরে তিনটি জানলা, সবগুলিই শার্সিপাল্লার এবং ভিতর থেকে ছিটকিনি-বন্ধ। চেয়ারের বিপরীতে দক্ষিণের দেওয়ালে ভাঙা আয়নাটা। তার পাশেই ছোট ছোট দুটি টেবিলে দুটি ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য। একটি মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিড, অপরটি নটরাজ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখছিলেন।

এই সময় দরজার বাইরে থেকে সঞ্জয় ঘোষণা করল, থানা থেকে ওঁরা এসে গেছেন। এখানে নিয়ে আসব কি?

প্রশ্নটি বাহুল্য। আত্মহত্যা কেসে তদন্তে এসে থানা অফিসার গৃহস্বামীর 'আসতে আজ্ঞা হোক' আমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা করে না। সঞ্জয়কে একপাশে সরিয়ে দিয়ে জনাতিনেক অফিসার আর দুজন পুলিশ ঘরে প্রবেশ করে। বড়-দারোগা দরজার কাছ থেকেই ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। চেয়ারে বসে থাকা মৃতদেহটাকে একনজর দেখে নিয়ে সত্যপ্রসন্নকে প্রশ্ন করেন: কখন ঘটল এটা?

ওপাশ থেকে বাসুসাহেব বলে ওঠেন, সম্ভবত আটটা পঁয়তাল্লিশে। কারণ ফায়ারিং-এর শব্দটা সেই সময় অনেকেই শুনেছেন।

এতক্ষণে এপাশ ফিরে বক্তাকে ভাল করে নজর করেন থানা অফিসার, হরেন দত্ত। অবাক হয়ে বলে ওঠেন, একী! স্যার, আপনি! এখানে?

বাসু বললেন, আমাকে চেনেন মনে হচ্ছে—

—বিলক্ষণ! আপনাকে চিনব না? থানার চার্জ পাওয়ার আগে পাঁচ-পাঁচটা বছর হোমিসাইডে ছিলাম যে। কতবার আদালতে আপনার ভেল্কি দেখেছি।

বাসু বললেন, সেসব কথা থাক। ভালই হল আপনি আমাকে চেনেন। নটা বেজে তিন কি চার মিনিটে ওই দরজা ভেঙে আমরা রায়বাহাদুরকে আবিষ্কার করি। অর্থাৎ ফায়ারিং-এর শব্দটা কয়েকজন শুনতে পাওয়ার প্রায় কুড়ি মিনিট পরে। আপনি কাজ শুরু করে দিন হরেনবাবু, রাত বাড়ছে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরের কথা। বাসুসাহেব ঘরের পূর্বপ্রান্তে একটা সোফায় বসে ধূমপান করছেন। ভাঙা দরজাটাকে আর স্বস্থানে বসানো যায়নি, তাই দ্বারপ্রান্তে পেতলের ঘণ্টার কাছে একজন পুলিশ প্রহরায় আছে। হরেনবাবুর সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন, ক্যামেরাম্যান আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট, তাঁরা কাজ শেষ করেছেন। হরেনবাবুর অনুমতি নিয়ে তাঁরা বিদায় হলেন। মৃতদেহটি মর্গের উদ্দেশে অ্যাম্বুলেন্সে চেপে রওনা হয়ে গেছে। হরেন্দ্রনাথ বাসুসাহেবের পাশে এসে বসলেন। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ক্লিয়ার কেস! রুদ্ধদ্বার কক্ষে, নিজের রিভলভারের গুলিতে রায়বাহাদুর আত্মহত্যা করেছেন। বেশ বোঝা যায়, উনি ডান হাতে ডান কানে গুলি করেন। সেটা মস্তিষ্ক ভেদ করে বাঁ কান দিয়ে বার হয়ে যায়। আয়নায় প্রতিহত হয়ে মেঝেতে পড়ে। সেটাও পাওয়া গেছে। ঘরের প্রতিটি শার্সিপাল্লা ভিতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ। জানলায় গরাদ বা গ্রিল না থাকলেও কোনও জানলা খোলা ছিল না। তাছাড়া দরজার চাবিটা রায়বাহাদুরের পকেট থেকেই পাওয়া গেছে। ক্লিয়ার কেস অব সুইসাইড।

—আপনার মনে তাহলে কোনও খটকা নেই?

—আজ্ঞে না। একটা সমস্যার সমাধান হয়নি অবশ্য।

—সেটা কী?

—আপনার উপস্থিতিটা। এই মর্মান্তিক সময়ে আপনি কলকাতা থেকে এখানে কেন?

বাসু নিঃশব্দে পকেট থেকে দুটি কাগজ বার করে দিলেন। প্রথমটা সাতদিন আগে পাওয়া চিঠিটা; দ্বিতীয়টা কালরাত্রে পাওয়া টেলিগ্রাম।

সে দুটি খুঁটিয়ে দেখে হরেনবাবু বললেন, যাচ্চলে! সব যে আবার গুলিয়ে দিলেন আপনি! কী ব্যাপার বলুন তো, স্যার?

—আমি জানি না। এটুকু জানি, কোন একটা প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা রায়বাহাদুরকে খোঁচাচ্ছিল। তিনি সেই সমস্যার সমাধানের জন্য আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। স্টেশনে লোক পাঠিয়েছিলেন। গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। আমাকে তিনি প্রত্যাশা করছিলেন। এক্ষেত্রে আমি এসে পৌঁছনোর ঠিক আগেই তিনি এভাবে...

—তা ঠিক। কিন্তু ঘরটা ভিতর থেকে তালাবন্ধ ছিল, স্যার! আর জানলাগুলো সব ছিটকিনি বন্ধ, চাবিটা রায়বাহাদুরের পকেটে...

—আমি তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমার প্রশ্নটার জবাব কই? কী মর্মান্তিক সমস্যায় বিচলিত হয়েছিলেন রায়বাহাদুর? যে জন্য সাতদিন আগে ওই চিঠি লেখেন? স্ত্রীকে জানাননি, কন্যা বা একান্তসচিবকে পর্যন্ত জানাননি, অথচ আমাকে টেলিগ্রাম করে আসতে বলেছেন! কী সেই মর্মান্তিক সমস্যাটা? আর আমি আসছি জেনেও এসময়ে...

—আমরা কি তাহলে একে একে সকলের জবানবন্দি নিতে থাকব? রাত পোয়াবার আগেই? যাতে কেউ ভেবেচিন্তে জবাব না বানাতে পারে?

—আমি একমত। তবে যাঁরা বাইরে থেকে এসেছেন তাঁদের তিনজনকে আগে ডাকা যাক। মোহান্তি, কামাল আর ডক্টর মিত্র। রাত এগারোটা প্রায় বাজে।

সেইমতোই ব্যবস্থা হল।

প্রথমে এলেন বলভদ্র মোহান্তি। রায়বাহাদুরের সাম্প্রতিক কোনও সমস্যার বিষয়ে তিনি কোনও আলোকপাত করতে পারলেন না। ইদানীং ওঁরা রবিবারের সন্ধ্যায় দাবা খেলতে বসেন না।

হরেনবাবু জানতে চান, আজ রাতে আপনার নিমন্ত্রণ ছিল, তাই না? কিন্তু উপলক্ষটা কী?

—হ্যাঁ, নিমন্ত্রণ ছিল; কিন্তু হেতুটা কী তা উনি পরিষ্কার করে বলেননি। শুধু বলেছিলেন, আজ কলকাতা থেকে ওঁর একজন মেহমান আসবেন। তাঁরই সম্মানে এই নৈশভোজ। দেখুন, এই আত্মহত্যার ব্যাপারে আমি কোনও কিছুই জানি না। এবার বলুন, স্যার, আমি কি নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারি?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি।

রায়বাহাদুরের গাড়িতে বলভদ্র মোহান্তিকে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। দশরথ খুব করিৎকর্মা। এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিতেও সে মোহনমঞ্জিলের আতিথেয়তার কথাটা ভুলে যায়নি। ড্রাইভারের হাতে একটা বড় খাবারের প্যাকেট ধরিয়ে দিল।

মোহান্তিমশাই-এর পরে জবানবন্দি দিতে এল যে ছেলেটি তার নাম কামালুদ্দীন রহমান। বছর ত্রিশের সুঠাম যুবক। স্থানীয় বিধায়ক জয়নাল রহমানের একমাত্র পুত্র। জয়নাল রহমান সাহেব এই এলাকা থেকে পরপর দুবার নির্বাচিত হয়েছেন, শাসকদলের পক্ষে। রাষ্ট্রমন্ত্রী হতে হতেও শেষ পর্যন্ত হতে পরেননি। এ-এলাকায় তাঁর দুর্দান্ত প্রভাব। অর্থনৈতিক বিচারে হয়তো

রায়বাহাদুরকে টপকে যেতে পারেননি এখনো, কিন্তু প্রতাপ-প্রতিপত্তি তাঁর অনেক বেশি। কামাল অপরাজিতার সহপাঠী। শুধু তাই নয়, মোহনপুরে একটি নাট্যদলের ওরা দুজন পাণ্ডা। মাঝে মাঝেই অভিনয় হয়। ওরা হিরো-হিরোইন সাজে। ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ নয় রায়বাহাদুরের; কিন্তু উপায় নেই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেমন হিন্দু কোড বিল, জমিদারী অ্যাবলিশন, অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজকে মেনে নিতে হয়েছে তেমনি এটাকেও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কামালের আজ নৈশভোজের নিমন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেও উপস্থিত ছিল।

হরেনবাবুর প্রশ্নের জবাবে কামাল জানালো, সে এসেছিল বিকালে। অপরাজিতার সঙ্গে ওদের মোহনপুর ড্রামাটিক ক্লাবের ব্যাপারে কথা বলতে। মিস্টার বাসু যখন আসেন তখনো সে চলে যায়নি। ডিনারের বেল বাজতে সে সতর্কিত হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে রাত করে ফেলেছে; কিন্তু তার প্রস্থানের আগেই বাসুসাহেব ঘরে প্রবেশ করেন।

হরেনবাবু বলেন, তার মানে আটটা পঁয়তাল্লিশে যখন পাশের ঘরে ফায়ারিং হয় তখন তুমি বৈঠকখানায়?

—ইয়েস স্যার।

—তখন ঘরে কে কে ছিল?

—আমার যতদূর মনে পড়ে মোহান্তিজেঠু ছিলেন, সঞ্জয়, ডাক্তার মিত্র, কাকু-আই মীন দুগার কাকু, অপরাজিতা ছিল।

—অপরাজিতার মা আর ডক্টর স্মিথ?

—না জ্যেঠিমা ছিলেন না। রমলা দেবী তার মিনিটখানেক আগেই ঘরে ঢুকেছেন। অথবা হয়তো দেড় মিনিট—

বাসু জানতে চান, এক-মিনিট না দেড় মিনিট! এভাবে বলার মানে?

কামাল হেসে বললে, কৌশিকবাবুর 'কাঁটা সিরিজে'র অনেক গল্পই আমার পড়া আছে, স্যার। আমি বলতে চাই : স্টাডিরুমে ফায়ার করে বৈঠকখানায় এসে পৌছতে যে সময় লাগে তার চেয়ে কম সময়। তাছাড়া ঘরটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, স্যার। এটা সিম্পল কেস অব সুইসাইড।

হরেনবাবু জানতে চান, আপনি স্যার এঁকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?

বাসু বললেন, না!

কামালুদ্দীন রহমানের পরে এল ডক্টর সলিল মিত্র। প্রতি সপ্তাহে সে একবার করে মোহনমঞ্জিলে আসে। বুড়ো-বুড়ির রক্তচাপ পরীক্ষা করতে। সলিল মোহনপুরেই প্র্যাকটিস করে। সবাইকে খুব ভালভাবে চেনে। গতকালই সে রায়বাহাদুরের রক্তচাপ পরীক্ষা করে দেখেছে। সেটা স্বাভাবিকই ছিল। ও যখন রুগী দেখতে আসে অপরাজিতা 'রক্তচাপ খাতা'-খানা হাতে হাজিরা দেয়। বুড়োকর্তার বি. পি. দেখা শেষ হলে ডাক্তার মিত্রকে পথ দেখিয়ে তিনতলায় নিয়ে যায়। শশীকলার প্রেশার দেখাতে। তারপরেও কিন্তু ডাক্তারবাবুর ছুটি হয় না। অপরাজিতার ঘরে তাকে গিয়ে বসতে হয়। দশরথদা নানানরকম খাবার বানিয়ে নিয়ে আসে, অপরাজিতার নির্দেশমতো—হিঙের কচুরি, মাছের চপ, ছানার জিলিপি, ক্যারামেল পুডিং—এক-একদিন এক-একরকম। ফলে সলিল প্রায় ঘরের মানুষ হয়ে গেছে। রক্তচাপ দেখে যাবার জন্য সে কিছুতেই কোনও 'ফি' নেয় না। হয়তো সেজন্যই অপরাজিতার ঘরে বসে তাকে আতিথেয়তার বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়। সলিলও জানালো, রায়বাহাদুরের শরীর

বা মনে ইদানীংকালে তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। প্রায় দিনদশেক হল তিনি একটু অতিরিক্ত মাত্রায় গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন শুধু। পরপর দু-সপ্তাহ দাবা খেলেননি। পুকুরে স্নান করতে যাওয়া ত্যাগ করেছিলেন। তবে আত্মহত্যা করার মতো মর্মান্তিক কোনও ঘটনার বিষয়ে কোনও কথা সে জানে না।

বাসু জানতে চান, আমাকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন, হেতুটা জানাননি। লিখেছিলেন, 'সাক্ষাতেই' কথা হবে। এক্ষেত্রে আমাদের সাক্ষাতের ঠিক পূর্বমুহূর্তে আত্মহত্যা করাটা কি অস্বাভাবিক নয়?

—কিন্তু আমরা তো জানি না, উনি কোন্ তাৎক্ষণিক আবেগে আত্মহত্যা করলেন। তাছাড়া ত্রিভুবনে ওঁর কোনও শত্রু ছিল বলে শুনিনি। তা থাকলেও রুদ্ধদ্বার-কক্ষে তাঁর নিজের রিভলভারে তাঁকে কে গুলি করতে পারে?

হরেনবাবু জানতে চান, রায়বাহাদুরের অবর্তমানে সম্পত্তিটা কে পাবে?

—আমি ঠিক জানি না। উইল না করে থাকলে স্ত্রী ও কন্যা।

বাসু জানতে চান, শুনেছি রায়বাহাদুর দুবার বিবাহ করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন : শশীকলা কি অপরাজিতার গর্ভধারিণী না বিমাতা?

ডক্টর মিত্র অসহিষ্ণুর মতো বলে ওঠে, এসব কথা কেন উঠছে?

—কী আশ্চর্য! সেকথাই তো এতক্ষণ বোঝালাম। আত্মহত্যা না হলে...

ডক্টর মিত্র দৃঢ়ভাবে দু-দিকে মাথা নেড়ে বললে, সরি স্যার, আপনার ও প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। আপনি 'মা' অথবা 'মেয়েকেই' প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন।

—কেন? তুমি কি এ-প্রশ্নের জবাবটা জান না?— বাসু জানতে চান।

—আমি সত্যবদ্ধ। আমি জানি, কিন্তু বলব না!

—অল রাইট! দেন য়ু আর এক্সকিউজ ডঃ মৈত্র। আপনি আসতে পারেন।

সলিল উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমার নাম ডক্টর 'মিত্র', 'মৈত্র' নয়।

বাসু শ্রাগ করে বলেন, রিয়্যালি? আপনি জানেন, কিন্তু বলবেন না শুনে আমি ভেবেছিলাম আপনার নাম ডঃ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র।

দারোগা বলে ওঠেন, আপনি সব গুলিয়ে ফেলছেন স্যার। 'হেরম্ব' নয় হরেন্দ্র! কিন্তু সেটা তো আমার নাম, তাও 'মৈত্র' নয়, 'দত্ত'!

বাসু আকাশপানে তাকিয়ে বললেন, আয়াম সো সরি।... 'শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ!'

এগারো

এরপর জবানবন্দি দিতে এলেন সত্যপ্রসন্ন দুগার। দীর্ঘদিন তিনি এ-বাড়িতে আছেন। রায়বাহাদুরের একান্তসচিবই শুধু নন, গৃহকর্ত্রী তাঁর বাল্যবান্ধবী। গূঢ় রহস্য কিছু থাকলে তাঁরই জানার কথা। কিন্তু তিনিও কোনও আলোকপাত করতে পারলেন না। হ্যাঁ, দিন-দশেক হল রায়বাহাদুর কিছু অস্থির, অন্যমনস্ক ছিলেন বটে, কিন্তু এমন কিছু মারাত্মকভাবে নয়। আত্মহত্যা করার মতো মানসিকতা তাঁর কোনদিনই ছিল না। ঘটনার দিন সকালেও তিনি সত্যপ্রসন্নের সঙ্গে বসে হিসাবের খাতা পরীক্ষা করেছেন। নানান বৈষয়িক নির্দেশ দিয়েছেন। রাত্রে একজন

অতিথি কলকাতা থেকে আসছেন একথা সত্যপ্রসন্নকে জানাননি। স্পষ্ট বোঝা যায়, সেক্ষেত্রে তিনিই দশরথকে সরাসরি নির্দেশটা দিয়েছিলেন। স্টেশনে গাড়ি পাঠানোই শুধু নয়, আউটহাউস সংলগ্ন গেস্ট-হাউসের একটি কামরা—রমলা স্মিথের ঠিক পাশের ঘরখানাই আগন্তুকদের জন্য প্রস্তুত রাখার নির্দেশও দশরথকে দিয়েছিলেন। সরাসরি। একান্তসচিব সত্যপ্রসন্নের মাধ্যমে নয়।

অপরাজিতা যে কার গর্ভজাত এ-প্রশ্নটা আদৌ উত্থাপন করলেন না বাসু। হরেন্দ্রনাথও এ বিষয়ে কৌতূহলী নয়। তবে হরেনবাবু হত্যার মোটিভটা খুঁজে বার করার চেষ্টায় তাঁর সেই চিরাচরিত প্রশ্নটা পেশ করলেন : রায়বাহাদুরের অবর্তমানে সম্পত্তিটা কে পাবে? তিনি কি উইল করে রেখেছেন?

দুগার বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। উইল তিনি করেছেন, প্রায় বছর চারেক আগে। আমি সেই উইল করার কথাটা জানি; কিন্তু তিনি কাকে কী দিয়ে গেছেন তা আমি জানি না।

হরেন্দ্র প্রশ্ন করেন, উইলে সাক্ষী হবার জন্য তিনি কি আপনাকে ডাকেননি? আপনি তো তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি?

সত্যপ্রসন্ন জবাব দেবার আগেই বাসু বলেন, প্রথমত, হয়তো মিস্টার দুগার একজন বেনিফিশিয়ারি। ফলে তাঁকে সই দিতে, ডাকা হয়নি। দ্বিতীয় কথা, উইলে যে সাক্ষী হিসাবে সই দেয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে জানতে পারে না উইলে কী লেখা আছে! সে শুধু স্বাক্ষর করে যে, উইলটা সে সই হতে দেখেছে। তার সামনেই সই হয়েছে। এইটুকুই।

হরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন, রায়বাহাদুরের অ্যাটর্নি কে? উইলটা কে ওঁর নির্দেশমতো তৈরি করেছিলেন, তা জানেন?

—জানি। মোহনপুরেরই একজন প্রৌঢ় অ্যাডভোকেট। কলকাতায় প্র্যাকটিস করেন। তাঁর নাম শ্রীলালমোহন বসু। ঘটনাচক্রে তিনি এখন মোহনপুরে। একটু আগেই তিনি ফোন করেছিলেন, জানতে চেয়েছিলেন গুজবটা সত্য কি না।

বাসু বলেন, তাঁকে কি একবার আনা যাবে? এত রাত্রে? টেলিফোন করে দেখুন না, তিনি শুয়ে পড়েছেন কি না।

সত্যপ্রসন্ন বলেন, আজকের রাতটা মোহনপুরে কেউ ঘুমাবে না। সবাই জেগে আছে—যে যার বাড়িতে। আমি ফোন করছি। উনি আধঘন্টার ভিতরেই এসে যাবেন।

লালমোহনের আসতে যেটুকু দেরি হল তার মধ্যে ওঁরা দুজনের জবানবন্দি একে একে নিয়ে নিলেন। প্রথমজন শশীকলা দেবী। তিনি ইতিমধ্যে কিছুটা সামলেছেন। সলিল মিত্রই সাজেশনটা দিল। ওঁকে যদি আদৌ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তাহলে এখুনি করে নিন। কারণ তারপর আমি ওঁকে হেভি সিডেটিভে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাই। অগত্যা শশীকলা দেবী এসে বসলেন স্টাডিতে।

বাসু আর হরেনবাবু বসেছিলেন দুটি চেয়ারে। অপরাজিতা তার মাকে নিয়ে এসে বসিয়ে দিল একটা সোফায়।

বাসু বললেন, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত মিসেস শেঠরায়। আমরা জানি, আপনি কী মর্মান্তিকভাবে আহত হয়েছেন। বেশিক্ষণ আপনাকে আটকাবো না। জরুরী দু-একটি কথা জেনে নিয়েই আপনাকে ছেড়ে দেব।

অপরাজিতা বলল, আমার বোধহয় এখন এখানে উপস্থিত থাকাটা ঠিক হবে না, তাই নয়?

বাসু বললেন, সচরাচর নয়, কারণ এরপর আমরা তোমাকেও পৃথকভাবে প্রশ্ন করব; তবে মিসেস শেঠরায় যদি চান ...

কথাটা উনি শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই শশীকলা তাঁর কন্যাকে বলে ওঠেন, তুই যা খুকু। আমি ঠিক আছি।

অপরাজিতা ধীরপদে নির্গত হতে —বাসুসাহেব কোনও প্রশ্ন উত্থানপতনের আগেই শশীকলা বলে ওঠেন, আপনারা যা যা জানতে চাইবেন আমি সব কথা জানাব; কিন্তু একটি শর্তসাপেক্ষে।

—শর্তসাপেক্ষে! কী শর্ত মিসেস শেঠরায়?

—কথা দিন। আপনারা ওই হতভাগ্য মানুষটার দেহ পোস্টমর্টেম......মানে, কাঁটা ছেঁড়া......

উদগত কান্নায় বাকি কথা কটা শেষ করতে পারলেন না।

হরেন্দ্র বিহ্বলভাবে বাসুসাহেবের দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, আপনি মনকে শক্ত করুন শশীকলা দেবী। যদি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, রায়বাহাদুর আত্মহত্যা করেছেন, তাহলে আমরা নিশচয় কোনও কাঁটা-ছেঁড়া করব না। রাত পোহালে কাল সকালে সারা মোহনপুরের মানুষ মরশবের অনুগমন করে তাঁকে শেষবিদায় জানাবে।

ওঁর মুখটা দুহাতে ঢাকা ছিল। ধীরে ধীরে হাত দুটি সরে গেল। বিহ্বলভাবে উনি জানতে চান, মানে? আত্মহত্যা ছাড়া আর কী হতে পারে?

—জানি না। আমরা সেটা জানি না। এখনো খুঁজছি। কেন তিনি আমাকে জরুরী টেলিগ্রাম করে...

— জরুরী টেলিগ্রাম...

বাসু পকেট থেকে চিঠি আর টেলিগ্রাম বার করে শশীকলার হাতে দিলেন। অনেকক্ষণ ধরে তিনি তা দেখলেন। নিঃশব্দে ফেরত দিয়ে বললেন, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানতাম না।

—তবেই দেখুন। কোনও একটা গভীর সমস্যা তাঁকে প্রচণ্ডভাবে খোঁচাচ্ছিল। তিনি সেকথা আপনাকে বা তাঁর একান্তসচিব ওই মিস্টার দুগারকে পর্যন্ত জানাননি। তথ্যটা এতই গোপন রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। অথচ আমি এসে পৌঁছানোর দশ-পনের মিনিট আগে তিনি এভাবে...

শশীকলা সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বেশ একটা পরিবর্তন হল তাঁর মুখমণ্ডলে। দৃঢ়স্বরে বললেন, সেক্ষেত্রে আমি আমার শর্তটা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন।

এবার হরেন্দ্রবাবুই সেই প্রশ্নটা উত্থাপন করেন, আমরা শুনেছি, রায়বাহাদুর দুবার বিবাহ করেন। তাই জানতে চাইছি, আপনি কি অপরাজিতার গর্ভধারিণী? না বিমাতা?

শশীকলা স্থিরভাবে বললেন, প্রশ্নটা বাসুসাহেবকে করবেন, উনি জানেন। এখানে এসে আমাদের দেখামাত্র যখন উনি আমাদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করেন তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, 'সুকৌশলী'কে আমরা যা জানিয়েছিলাম—তা ওঁর জানা।

বাসু বললেন, আই অ্যাডমীট! হ্যাঁ, অতীতের সেসব কথা এবং সাম্প্রতিক কিছু অতীত-কথা আমার জানা। তাই জানতে চাইছি, 'দর্পণে প্রতিবিম্বিত কাঁটাটা' কী এতই তীব্র ছিল যে উনি আত্মহত্যা করে বসবেন?

শশীকলা চোখ তুলে বাসুসাহেবকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, আমার তা মনে হয় না।

হ্যাঁ, আঘাত সে পেয়েছিল যখন আমি সন্ধান নিয়ে ওকে জানালাম যে, অতসী পুলিশ এনকাউন্টারে মারা গেছে...

বাধা দিয়ে হরেন্দ্রবাবু বলে ওঠে, কে? অতসী? সে কে? পুলিশ এনকাউন্টারে মানে?

বাসু এদিকে ফিরে বললেন, প্লিজ মিস্টার দত্ত! আপনাকে পরে আমি সব কথা জানাব। আপাতত...

—অলরাইট! অলরাইট, স্যার!! —দত্ত সামলে নিলেন নিজেকে।

বাসু শশীকলার দিকে ফিরে বলেন অতসীর মৃত্যুসংবাদে রায়বাহাদুর বিচলিত হয়েছিলেন? একথাই কি বলতে চান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ; পুরুষোত্তমদাস শেঠজীর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে ও একটা 'ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে' ভুগছিল। পুলিশের হাঙ্গামার ভয়ে ও সমুর বউকে স্বীকার করে নিতে পারেনি; কিন্তু দু'শ বছর আগে সহায়-সম্বলহীন পুরুষোত্তমদাসজী মীরজাফরের ভয়ে ও জাতীয় ব্যবহার করেননি। এটাকেই আমি 'দর্পণে প্রতিবিম্বিত কাঁটা' বলতে চেয়েছিলাম।

বাসু জানতে চান, অতসীর মৃত্যুর কথা উনি কতদিন আগে জেনেছেন?

— সে তো বহুদিন আগে। ধরুন দেড়-দুবছর। ...কেন?

—তাহলে এতদিন পরে সেটা ওঁর আত্মহত্যার কারণ হতে পারে না!

—নিশ্চয় নয়।

—তাহলে? অন্য কোনও হেতুর কথা আপনি আন্দাজ করতে পারেন না?

মহিলা নিঃশব্দে দুদিকে শিরশ্চালন করে অক্ষমতা জানালেন। বাসু বললেন, একটা কথা মিসেস শেঠরায়। অনেকেই বলেছেন, প্রায় মাসখানেক হল রায়বাহাদুরের চরিত্রে একটা পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি প্রায়ই চিন্তামগ্ন থাকতেন, গম্ভীর হয়ে গেছিলেন। দাবা খেলা বন্ধ করেছিলেন। এমনকি, পুকুরে স্নান করতেও যেতেন না। এই পরিবর্তনের কোনও সম্ভাব্য হেতুর দিকে আপনি আমাদের দৃষ্টি আর্কষণ করতে পারেন না? আপনি কি কিছুই টের পাননি?

শশীকলা ধীরে ধীরে বললেন, হেতুটা আমি জানি। কিন্তু তার সঙ্গে ওর এই দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু সম্পর্কবর্জিত।

— তা হোক। আপনি যেটুকু জানেন, তা বলুন।

— খুকুর ওই থিয়েটার করাটা ও পছন্দ করত না। কিন্তু খুকু তো দু-তিন বছর হল তা করছে। ইদানীং ওই ছেলেটি — কামাল রহমানের সঙ্গে খুকু একটু বাড়াবাড়িরকম মেলামেশা করছিল। ওরা দুজন স্টেজে হিরো-হিরোইন সাজে। তাই ও ভয় পেয়ে যায়।

বাসু বললেন, ধন্যবাদ! এতক্ষণে বোঝা গেল, রায়বাহাদুরকে কিসে খোঁচাচ্ছিল! জিতা হয়তো বেজাতে বিয়ে করে বসবে। তাই না?

— আমার তাই আন্দাজ।

বাসু বললেন, সেক্ষেত্রে আপনি বিশ্রাম নিতে যান। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে পোস্টমর্টেমটা এড়ানো যায়।

এরপর জবানবন্দি দিতে এলেন ডক্টর মিস রমলা স্মিথ। বাঙালি। রঙ খুব ফর্সা। নামেই বোঝা যায়, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। সোফায় বসতে বসতে বললেন, অহেতুক একটা বিশ্রী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম এখানে এসে।

হরেন্দ্রনাথ বলেন, জড়িয়ে কিছুই পড়েননি। পাশের ঘরে একটা লোক আত্মহত্যা করলে বিড়ম্বনা কিছুটা হয়ই। আপনি কতদিন এসেছেন এখানে?

— প্রায় তিন মাস আগে। বছর তিনেক আগে এসেও প্রায় মাসখানেক ছিলাম। এবার এসেছি মাস-তিনেক।

— রায়বাহাদুরকে আপনি শেষ কখন দেখেন?

ডক্টর স্মিথ ম্লান হেসে বললেন, আপনাদের পুলিশি এনকোয়্যারির ভাষায় আমিই সম্ভবত 'দ্য লাস্ট পার্সেন টু সি হিম অ্যালাইভ।'

— তার মানে?

— আমার সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাত ঠিক সাতটা ত্রিশে। ওঁর স্টাডিতে। তারপর বোধহয় ওঁকে জীবিত অবস্থায় আর কেউ দেখেনি। যদি না কোনও কাজে দশরথ ও-ঘরে গিয়ে থাকে সাড়ে সাতটার পরে।

— ঠিক সাতটা ত্রিশ কি করে বুঝলেন? ঘড়ি দেখেছিলেন?

— না। রাত নিস্তব্ধ ছিল। বৈঠকখানার বড় ঘড়িটায় জলতরঙ্গের শব্দ হতেই বুঝতে পারি, সাড়ে সাতটা বাজল। ইন ফ্যাক্ট—রোজই সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাড়ে সাতটা আমি ওঁর সঙ্গে স্টাডিতে কাজ করি। আজও করেছি।

— কী কাজ?

— উনি একটি আত্মজীবনী লিখছিলেন। তার প্রথম বিশ-বাইশ পাতা ওঁর নিজের হস্তাক্ষরে। তারপর আমার হাতের লেখা। উনি মুখে মুখে বলে যেতেন, আমি সেটা সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখে ওঁকে দেখাতাম। সারাজীবন লেখাপড়া বিশেষ করেননি। লংহ্যান্ডে 'আত্মজীবনী' লেখা তাঁর কর্ম নয়। অথচ ইচ্ছা আছে, অর্থ আছে। ফলে, পৃষ্ঠাপিছু উনি আমাকে পনের টাকা সম্মান দক্ষিণা দিতেন। আজও সন্ধ্যাবেলা এসে কাজ করে গেছি। সাড়ে সাতটার সময় যখন উঠে পড়ি তখন হঠাৎ উনি আমাকে রাত নয়টার সময় ডিনারে নিমন্ত্রণ করেন। আমি জানতে চেয়েছিলাম, হঠাৎ নৈশাহারের নিমন্ত্রণ? উনি জবাবে বলেছিলেন কলকাতা থেকে ওঁর একজন গেস্ট আসবেন। সেই জন্যই। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে চান। তাই বাসুসাহেবকে দেখে আমি খুব বেশি চমকে যাইনি।

হরেনবাবুর প্রশ্নের জবাবে ডক্টর স্মিথ জানালেন যে, প্রথমদিকে পূর্বপুরুষদের বিষয়ে রায়বাহাদুরের খুবই আগ্রহ ছিল, বিশেষ করে বংশের প্রথমপুরুষ মোহনলালের সম্পর্কে। কিন্তু ইদানীং সেই উৎসাহটা ওঁর স্তিমিত হয়ে যায়। হেতুটা কী, তা উনি আন্দাজ করতে পারেননি। ডক্টর স্মিথের মতে, রায়বাহাদুর ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। হামবড়াইভাবে টইটুম্বুর। মেগালোম্যানিয়াক। উনি যখন বিদায় নিয়ে চলে যান, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়, তখন তাঁকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। ওঁর মনে হয়েছিল, মাসখানেক রায়বাহাদুর বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। কোনও একটা সমস্যা তাঁকে খোঁচাচ্ছিল। কিন্তু উনি যে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন এমনটা মনে হয়নি।

হরেন্দ্র ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। আপনি স্যার, কিছু প্রশ্ন করবেন?

বাসু বলেন, হ্যাঁ। দেখুন ডক্টর স্মিথ, আমরা রাত নয়টা নাগাদ যখন সদলবলে বৈঠকখানা থেকে স্টাডিরুমে যাচ্ছিলাম, তখন সবার সামনে ছিল দশরথ। আমি তারপর। দলে সবার

পিছনে ছিলেন আপনি। ওই সময় প্যাসেজের আয়নার ভিতর দিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম, আপনি মেঝে থেকে কিছু কুড়িয়ে নিলেন। জিনিসটা কী?

রমলা বললেন, আমার ঘরের চাবির রিঙটা। ওটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল। কেন বলুন তো?

বারো

এরপর সঞ্জয় জানিয়ে গেল, অ্যাডভোকেট লালমোহন এসেছেন। রাত তখন সাড়ে এগারোটা। লালমোহন প্রৌঢ় মানুষ। কলকাতায় প্র্যাকটিস করেন। পারিবারিক প্রয়োজনে দিন-চারেক আগে মোহনপুরে দেশের বাড়িতে এসে আছেন। দুঃসংবাদটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল মোহনপুরে। লালমোহন তাই ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন, গুজবটা সত্য কি না।

হ্যাঁ, তিনিই ছিলেন রায়বাহাদুরের অ্যাটর্নি। আইনসংক্রান্ত পরামর্শদাতা। টেলিফোনে রায়বাহাদুরের সঙ্গে প্রায়ই কথাবার্তা হত। লিগ্যাল ড্রাফ্‌ট্ লালমোহন কলকাতায় বসে বানাতেন। সিনিয়র অথবা জুনিয়র দুগার কলকাতা-অফিস থেকে সিল করা কাগজপত্র নিয়ে আসতেন।

জিজ্ঞাসিত হয়ে লালমোহন স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, তিনি রায়বাহাদুরের নির্দেশমতো একটি উইল প্রণয়ন করেছিলেন। বছর-চারেক আগে। ওঁর দুজন ল-ক্লার্ক তার সাক্ষী। উইলের এক কপি আছে রায়বাহাদুরের কলকাতার ব্যাঙ্কের লকারে, এককপি লালমোহনের হেপাজতে।

উইল মোতাবেক শশীকলা যাবজ্জীবন মোহনমঞ্জিলে বসবাস করতে পারবেন, কিন্তু বন্ধক দিতে বা বিক্রি করতে পারবেন না। শশীকলার দেহান্তে মোহনমঞ্জিলের মালিক হবে অপরাজিতা। ওঁর অস্থাবর সম্পত্তি মোটামুটি দু-ভাগে বিভক্ত হবে; কিছু অবশ্য বন্টিত হবে গৃহভৃত্যদের মধ্যে এবং একটা বড় অংশ — সত্যপ্রসন্ন ও তাঁর পুত্রের।

হরেন্দ্র দত্ত জানতে চান, মোদ্দা ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়ালো এই যে, রায়বাহাদুরের মৃত্যুতে কেউই লাভবান হচ্ছে না। তাই তো?

লালমোহন একটু নড়েচড়ে বসে ওকালতি জবাব দিলেন, আপনার ওই অভিমতটা একটা 'কনক্লুশন'। আমি শুধু ফ্যাক্টস্-এর কথাই বলতে পারি।

বাসু মাঝপথে বলে ওঠেন, ঠিক কথা। তা উইলে অপরাজিতাকে কি 'কন্যারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে?

—আজ্ঞে না। 'দত্তক কন্যা!'

হরেন্দ্র বলেন, সে কী মশাই! অপরাজিতা দেবী রায়বাহাদুরের কন্যা নন?

— আমার জ্ঞানমতে: নয়। তাকে বহুদিন পূর্বে রায়বাহাদুর এবং শশীকলা দত্তক নিয়েছিলেন—বেনারসে!

—কী আশ্চর্য! গ্রামের কেউ তা জানে না?

— 'কেউ জানে না' বলাটা ঠিক হবে না। আমি জানি। ওঁর একান্তসচিব সত্যপ্রসন্ন জানেন,

কিন্তু গ্রামে সাধারণভাবে এ-কথা কেউ জানে না। নিঃসন্তান অবস্থায় ওঁরা তীর্থ করতে যান। প্রায় দেড়বছর বাদে সদ্যোজাত কন্যা সমেত ফিরে আসেন — এটাই মোহনপুরের লোক জানে।

— অপরাজিতা নিজে কি সেকথা জানে?

— আমি বলতে পারব না। তাকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন। আপনারা কি আমার কাছে আর কিছু জানতে চান?

হরেন্দ্র দত্ত বলেন, নো থ্যাংকস্। আপনি আসুন। গুড নাইট!

লালমোহন সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বাসু তাঁর পাইপে তামাক ঠেসতে ব্যস্ত ছিলেন। বললেন, আর-একটা শেষ প্রশ্ন, এই চার বছরের মধ্যে রায়বাহাদুর কি কখনো এমন কথা বলেননি যে, তিনি উইলটা বদলাতে চান?

লালমোহন আবার বসে পড়েন। বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। বলেছিলেন। গত সপ্তাহে। কিন্তু সেই মোতাবেক কোনও ড্রাফট্ই তৈরি করা হয়নি। উইল তো দূরের কথা। ওঁর নিজের হাতে লেখা একটা খসড়া অবশ্য ছিল।

এঁরা দুজনেই চমকে ওঠেন। হরেন্দ্রনাথ বলেন, কী আশ্চর্য! সেকথা তো আপনি এতক্ষণ বলেননি মশাই?

—না, বলিনি। আপনারা তো সেকথা জানতে চাননি। যা প্রশ্ন করেছেন আমি তারই জবাব দিয়ে যাচ্ছি।

বাসু বললেন, এবার তাহলে বলুন, উনি নতুন উইলে কী কী পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন এবং কেনই বা সেই মোতাবেক নতুন উইল বানানো যায়নি—

— উনি যা চাইছিলেন, আমি ওঁকে বলেছিলাম, সেটা আইনত হয়তো সিদ্ধ হবে না। ওইভাবে উইল তৈরি করলে ওয়ারিশদের মধ্যে কেউ হয়তো তাতে প্রতিবাদ জানাবে এবং আমার আন্দাজ আদালত প্রতিবাদটা মেনে নেবেন। তাই আমি রায়বাহাদুরকে বলেছিলাম, উইলটা ওইভাবে না বানাতে।

— তার জবাবে উনি কী বলেছিলেন?

একটু দেরি হল জবাবটা দাখিল করতে। তারপর লালমোহনবাবু বললেন, উনি বলেছিলেন, 'বুঝেছি! তোমার দ্বারা হবে না। যার হিম্মৎ আছে আমি তেমন লোকের ব্যবস্থা করছি।' তখন আমি বলেছিলাম, 'আজ্ঞে কোনও উকিলই এমন উইল তৈরি করার পরামর্শ দেবে না।' তার জবাবে উনি বলেছিলেন, 'জানি, সেজন্য উকিলের বদলে আমি ব্যারিস্টারের ব্যবস্থা করব।'

বাসু বললেন, নতুন উইলে উনি কী পরিবর্তন চাইছিলেন?

— শশীকলার অবর্তমানে অপরাজিতা সম্পত্তিটা পাবে একটি শর্ত মানলে। সে যদি সত্যপ্রসন্ন দুগারের পুত্র সঞ্জয়কে বিবাহ করে।

হরেন্দ্রনাথ বলেন, বুঝলাম। কোনও ছেলে বা মেয়েকে দত্তক নিয়ে তার 'ফান্ডামেন্টাল রাইট্স্'-এ হস্তক্ষেপ করে এভাবে সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করা আদালত হয় তো মেনে নেবে না।

বাসু জানতে চান, রায়বাহাদুর কী চাইছিলেন? ধরা যাক (ক) সঞ্জয় ওকে বিয়ে করতে রাজি হল না, সেক্ষেত্রে? ধরা যাক, (খ) রায়বাহাদুরের দেহান্তের পূর্বেই অর্থাৎ উইলটা সিল

ভেঙে দেখার পূর্বেই যদি অপরাজিতা বিবাহ করে বসে থাকে। সেক্ষেত্রে?

লালমোহন বললেন, দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথা রায়বাহাদুর ভেবে দেখেননি। তবে প্রথমটির বিষয়ে তাঁর মত, যদি সঞ্জয় রাজি থাকা সত্ত্বেও অপরাজিতা তাকে বিবাহ না করে অন্য কাউকে বিয়ে করে, তবে সম্পত্তিটা পাবে সঞ্জয় দুগার; আর যদি সঞ্জয় অস্বীকার করে জিতাকে বিবাহ করতে, তাহলে সম্পত্তি পাবে অপরাজিতাই। তখন সে অন্য কোনও হিন্দুকে বিয়ে করতে পারবে।

বাসু বলেন, কী আশ্চর্য! এর তো হাজারটা বিকল্প হতে পারে। এক নম্বর, সঞ্জয় রাজি আছে কি নেই তা সে জানাচ্ছে না। জানাতে সে তো বাধ্য নয়! দু-নম্বর, দুজনেই স্থির করল আজীবন অবিবাহিত থাকবে; তিন নম্বর, বিয়ে করে সম্পত্তিটা নিয়েই দুজন মিউচুয়াল ডিভোর্স করল। চার নম্বর ...

লালমোহন বলেন, জানি, স্যার। এ-জন্যই আমি ওই উইলটা বানাতে স্বীকৃত হইনি।

— অপরাজিতা বা সঞ্জয় কি একথা জানে?

— আমি কাউকে কিছু বলিনি। আমার বিশ্বাস যে, রায়বাহাদুরও কাউকে কিছু বলেননি।

বাসু বলেন, একটা কথা, কাউন্সেল। আপনি বললেন রায়বাহাদুর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, সঞ্জয় যদি অপরাজিতাকে বিবাহ করতে স্বীকৃত না হয় তা হলে সে অন্য কোনও 'হিন্দু' যুবককে বিবাহ করতে পারে। তাই নয়? কিন্তু বিশেষ করে, 'হিন্দু'-র কথাটা বলেছিলেন কেন? আপনার কি মনে হয়, রায়বাহাদুরের আশঙ্কা হয়েছিল অপরাজিতা কোনও অ-হিন্দুকে বিবাহ করতে পারে? মুসলমান, অথবা খ্রিস্টান?

লালমোহন বললেন, ওটা একটা কনক্লুশন...

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, কারেক্ট। কিন্তু আপনি তো কাঠগড়ায় উঠে সাক্ষী দিচ্ছেন না। আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন। যাতে আমরা বুঝতে পারি, কেন রায়বাহাদুর হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসলেন? তাই নয়?

— না। ও বিষয়ে আমার কিছু বলা ঠিক হবে না। ওটা একটা কনক্লুশন!

বাসু বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ, কাউন্সেল। আপনি আমাদের সামনে একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন। আচ্ছা, গুড নাইট।

তেরো

হরেন্দ্রনাথ বললেন, যাক বাবা! রাত পোহাবার আগেই আপনার সমস্যার সমাধানটা হয়ে গেল। অর্থাৎ কেন সাবেক উকিলকে ছেড়ে রায়বাহাদুর 'ব্যারিস্টারকে' তলব করেছিলেন। তাছাড়া আমরা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি মাসখানেক ধরে কোন্ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধকে খোঁচাচ্ছিল। ওই এম. এল. এ. সাহেবের ধনুর্ধর পুত্রটি।

বাসু জানতে চান, 'ধনুর্ধর পুত্র' বলছেন কেন?

— ছেলেটি কী করে জানেন?

— শুনলাম তো : থিয়েটার করে।

— হ্যাঁ, কিন্তু যখন থিয়েটার করে না, তখন?

— তখন?

— 'পাইয়ে দেবার দালালি' করে। এগ্নে-সাহেবের এজেন্ট-হিসাবে। বাসপারমিটই হোক, অথবা চাকরি । নায্য উপরওয়ালাকে সুপরাসিড করে প্রমোশনই হোক অথবা লোয়েস্ট টেন্ডারকে টপকে ঠিকাদারী। তবে আপনি যেন কাউকে বলে বসবেন না, আমি এসব কথা বলেছি। মোটকথা রায়বাহাদুরের আত্মহত্যা করার কারণটা এতক্ষণে পরিষ্কার বোঝা গেল। আশাকরি এখন আর আত্মহত্যার ব্যাপারে আপনার কোনও সন্দেহ নেই?

বাসু বিরক্ত হয়ে বলেন, কিসের আত্মহত্যা মশাই? অমন মানুষ কখনো আত্মহত্যা করতে পারে?

—পারে না? হাতের কাছে লোডেড রিভলভার থাকলেও?

— না, পারে না। সাইকোলজিক্যালি পারে না। আত্মহত্যা করে দু-জাতের মানুষ। এক, যাদের মনের জোর কম! বাইরের আঘাতে যারা সহজেই ভেঙে পড়ে। হার মেনে নেয়। নাইন্টি-নাইন পার্সেন্ট সুইসাইডাল কেসের সেটাই হচ্ছে মূল হেতু। বাকি এক পার্সেন্টের মনের জোর অসম্ভব দৃঢ়। তারা হার মেনে নিয়ে আত্মহত্যা করে না! ওই যে অলক্ষ্য নাট্যকার আমাদের সামনে সমাধানের অতীত সমস্যা ফেলে দিয়ে বলেন না, 'এবার?' তখন সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ মৃত্যুকে জয় করতেই আত্মহত্যা করে!

হরেন্দ্র দত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করল। চোখ পিটপিট করল, কান চুলকালো। তবু বুঝতে পারল না। বলল, দু একটা উদাহরণ যদি দিতেন, স্যার?

— যেমন প্রীতিলতা ওয়েদ্দদার, যেমন যতীন দাশ, যেমন মাতঙ্গিনী হাজরা!

— মাতঙ্গিনী হাজরা আত্মহত্যা করেছিলেন, স্যার?

— হ্যাঁ, যদিও আগ্নেয়াস্ত্রটা ছিল পুলিসের হাতে। রায়বাহাদুরের সামনে তেমন কোনও অবস্থার কথা আমরা জানি না। তাছাড়া ভেবে দেখ, হরেনবাবু— এর কি যৌক্তিকতা? ধর আমি রায়বাহাদুর — এই চেয়ারে বসে আছি।

বাসু রায়বাহাদুরের চেয়ারে বসলেন।

— যে কোনও কারণেই হোক, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম : আত্মহত্যা করব। আমি উঠে সব কটা জানলা ভেতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করলাম। দরজাটা বন্ধ করে, চাবিটা পকেটে রেখে টেবিলের সামনে চেয়ারে এসে বসলাম। 'আত্মজীবনীর' পাতায় লিখলাম 'সরি'। আমি নিশ্চয় তখন উত্তরমুখী। তারপর? ড্রয়ার থেকে রিভলভার বার করলাম। সেটা যদি লোডেড না থাকে তা লোড করলাম। তারপর? তারপর আমি কী করলাম?

— নিজের কানে রিভলভারটা লাগিয়ে ফায়ার করলেন।

— নো স্যার। অ্যান এম্‌ফ্যাটিক : নো! এরপর আমি চেয়ারটা ঘুরিয়ে পশ্চিমমুখী হলাম! কেন? কী কারণে আমি পশ্চিমমুখী হলাম? — বলো? ঘরের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে যদি কোনও প্রিয় মানুষের ফটো থাকত — শশীকলার, ওঁর বাবার, কোনও ইষ্টদেবতার, মায়ের — তাহলে এ-আচরণের একটা মানে থাকত। তা নেই! উনি মুসলমান নন, যে মক্কার দিকে মুখ করে আত্মহত্যা করবেন। তাহলে?

— সুতরাং?

— সুতরাং বাকি কয়জনের জবানবন্দি আমাদের নিতেই হবে। দশরথ, সঞ্জয়, ঝরনা, অপরাজিতা...

সঞ্জয় দুগার স্বীকার করল — রায়বাহাদুর তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। অনেক কাজ স্ত্রী বা একান্তসচিবকে না জানিয়ে তিনি সঞ্জয়ের মাধ্যমে করতেন। যেমন, কলকাতা থেকে স্কচ হুইস্কি কিনে আনা। ডাক্তার-নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে স্টাডিরুমে রুদ্ধদ্বার কক্ষে তিনি ওইভাবে মদ্যপান করতেন। সঞ্জয় যোগান দিত — স্ন্যাক্স্, বরফ। স্ত্রীকে তো বটেই, এমনকি দশরথকেও লুকিয়ে। তবে রায়বাহাদুর যে কেন আত্মহত্যা করলেন তা সে জানে না। কোনও আন্দাজ করতে পারে না। শশীকলা অপরাজিতার গর্ভধারিণী না বিমাতা এ- প্রশ্নের জবাবে সে সপ্রতিভভাবে জানালো, বড়জ্যেঠিমা মারা যাবার অনেক পরে খুকু জন্মায় — বেনারসে।

ঝরনার পরিচয় দিতে একটু লজ্জা পেল যেন। হ্যাঁ, ঝরনা ওর কলেজের বান্ধবী। সহপাঠিনী নয়, দু-ক্লাস নিচে পড়ত। ওরা পরস্পরকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। সত্যপ্রসন্নর আপত্তি নেই। তবে রায়বাহাদুরকে ব্যাপারটা জানানো হয়নি।

ঝরনাও স্বীকার করল তার জবানবন্দিতে যে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সে মোহনপুরে এসেছে। সঞ্জয়ের সঙ্গে বিবাহ হলে এই বিরাট বাড়ির কোনও একটা অংশই তার শ্বশুরবাড়ি হবে। রায়বাহাদুরের আত্মহত্যার হেতুর বিষয়ে তার কোনও আন্দাজ নেই।

দশরথ স্বীকার করল : বড়কর্তার আত্মহত্যার ব্যাপারটা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলে তার মনে হয়েছে। বড়কর্তাকে সে শেষবারের মতো দেখেছে সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টা-সাতটা নাগাদ। রমলা দেবীর সঙ্গে বসে তিনি কথাবার্তা বলছিলেন। সেই কী একটা বই লেখার ব্যাপারে। রমলা প্রতিদিনই এই সময় এসে দেড়-দুঘন্টা কাটিয়ে যান। দশরথ রোজই সেই সময় এক পেয়ালা চা আর বিস্কুট দিয়ে যায় রমলাকে। কাপ-ডিশ উঠিয়েও নিয়ে গিয়েছিল আন্দাজ সাতটা নাগাদ।

হরেন্দ্রনাথ জানতে চান, তখন তুমি কী দেখেছিলে মনে করতে পার? ঘরের তিনটে জানলাই কি বন্ধ ছিল?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। না হলে সন্ধ্যার ঝাঁকে বড় মশার উপদ্রব হয়।

বাসু জানতে চান, দেখ দশরথ আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি বুঝে নিতে যে, কেন রায়বাহাদুর এভাবে আত্মহত্যা করলেন। তাই তোমার সাহায্য চাইছি। তুমি যা জান তা আমাদের ঠিক ঠিক জানাও দেখি। প্রথম কথা, জিতাদিদি কি জানে তার গর্ভধারিণী মায়ের নাম? তুমি যে তা জান, তা আমি জানি।

দশরথ বুদ্ধিমান। সে নতনেত্রে বলে, দিদিমণিও তা জানে।

— তার গর্ভধারিণী মা কীভাবে মারা যান, সেটাও কি জিতা জানে?

দশরথ এবার চোখ তুলে তাকায়। বলে, আজ্ঞে সেটা আমি নিজেই জানি না, হুজুর। দিদিমণি জানে কি না তাও জানি না।

— তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারছ? কী কারণে রায়বাহাদুর এভাবে আত্মহত্যা করলেন?

আবার দশরথ নতনয়ন হল। দুদিকে মাথা নেড়ে জানালো সে কোনরকম আন্দাজ করতে পারে না।

হরেন্দ্র বললেন, তুমি তাহলে যেতে পার।

বাসু বললেন, দাঁড়াও, তুমি বহুদিনের মানুষ। কতদিন এ-বাড়িতে কাজ করছ, দশরথ?

— তা চল্লিশ বছর হবে, হুজুর। জিতাদিদিকে আমিই কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি।

— সেক্ষেত্রে তুমি নিজে থেকে কি কিছুই বলতে পার না?

দশরথ আবার বাসুসাহেবের চোখে-চোখে তাকালো। বলল, একটা কথা, ওই যে

মেমসাহেব বড়কর্তার জীবন-বেত্তান্ত লিখছেন, ওঁর ডান পায়ে বাত আছে। উনি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন।

হরেন্দ্রনাথ ধমকে ওঠেন, এটা কী এমন জরুরী কথা? তোমার মাথায় গোবর!

— আজ্ঞে হ্যাঁ, না, মানে এই কথার কথা বলছিলাম আর কি।

দশরথ পালাবার পথ পায় না।

শেষ জবানবন্দি দিতে এল জিতা। অপরাজিতা।

সকলের মতো সেও স্বীকার করল, কেন যে রায়বাহাদুর এভাবে আত্মহত্যা করলেন সেটা ওর আন্দাজের বাইরে। বাসু জানতে চান, তুমি কি জান, রায়বাহাদুরের উইলে কী প্রভিশন্স আছে?

— হ্যাঁ, জানি। বাপিই আমাকে নিজে থেকে বলেছিল.

— তুমি যে শশীকলা দেবীর কন্যা নও, দত্তক-কন্যা, একথা তুমি কত বয়সে জানতে পার? কে জানায়?

— বোঝবার মতো বয়স যখন হল তখন মা-ই আমাকে বলেছিল। আর কাউকে বলতে বারণ করেছিল। বলেছিল কথাটা মাত্র চারজন জানে। বাপি, মা, কাকামণি আর দশরথদা ছাড়া আর কেই জানে না। এমন কি সঞ্জয়দাও জানে না।

— তাহলে মায়ের বারণ না শুনে তুমি সেকথা ডাক্তার সলিল মিত্রকে বলে দিলে কেন?

— কে বলেছে? সলিল?

— কে বলেছে সেটা বড় কথা নয়। তুমি কি অস্বীকার করতে চাও?

— না, চাই না। আমি তাকে বলেছি। ডাক্তারের কাছে কিছু গোপন করতে নেই বলে।

— তুমি কি জান, রায়বাহাদুর একটা নতুন উইল করতে যাচ্ছিলেন?

— না, জানি না। বাপি বা মা আমাকে কিছু বলেনি।

— তোমার মা সেকথা জানেন না। সেই উইলটা সই হয়নি। হলে, তাতে প্রভিশন থাকত যে, তুমি সম্পত্তির অধিকারী হবে একটা বিশেষ শর্ত মানলে। যদি তুমি সঞ্জয় দুগারকে বিবাহ কর!

অপরাজিতা দশ সেকেন্ড নির্বাক তাকিয়ে থাকল। বলল, বাপি ছিল বদ্ধ পাগল। দিন পনের আগে মা আমাকে ওই কথা বলে। আমি মাকে বলেছিলাম যে, সঞ্জয়দা আর আমি খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোনের মতো মানুষ হয়েছি। ছেলেবেলা থেকে। আমরা দুজনেই দুজনকে ভালবাসি, কিন্তু ভাইবোনের মতো। তাছাড়া সঞ্জয়দা তো স্থির করে রেখেছে ঝরনাদিকে বিয়ে করবে বলে...

— সঞ্জয় কি রায়বাহাদুরকে জানিয়েছিল যে, সে ঝরনাকে বিয়ে করতে চায়?

— না জানায়নি। সাহস পাচ্ছিল না। আমাকে অন্তত ঝরনাদি তাই বলেছে।

বাসু জানতে চান একটা কথা জিজ্ঞেস করি জিতা— প্রশ্নটা একটু ডেলিকেট— তুমি কিছু মনে কর না —

অপরাজিতা বলে, আপনি খোলা মনে যা ইচ্ছে প্রশ্ন করতে পারেন, স্যার। আমি অফেন্স নেব না। অশোভন প্রশ্ন মনে করলে জবাব দেব না। কী জানতে চান?

— তোমার পক্ষে স্টেজে অভিনয় করাটায় কি রায়বাহাদুরের আপত্তি ছিল?

— ও এই কথা! হ্যাঁ ছিল। বাপির আশঙ্কা ছিল আমি ওই কামালদাকে বিয়ে করে বসব। বাপি গোঁড়া হিন্দু। অসবর্ণ বিয়ে কিছুতেই মেনে নিত না।

বাসু বললেন, তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে তোমার বাবা একটা উইল করে গেলেন যে, তুমি সঞ্জয় দুগারকে বিয়ে না করলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে সেক্ষেত্রে তুমি কী করতে? সঞ্জয়কে বিয়ে করতে? না, সম্পত্তিটা ত্যাগ করতে?

অপরাজিতা উঠে দাঁড়ালো। বলল, জাস্ট আ মিনিট, স্যার। আমি এখনি আসছি।

গটগট করে সে ঘরে ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দশ-পনের সেকেন্ড পরে ফিরে এল ডাক্তার সলিল মিত্রের হাত দৃঢ়ভাবে ধরে। বললে, এই নিন, স্যার, আমার জবাব। দিস্ ইজ মাই হাজব্যান্ড, ডক্টর এস. মিত্র। আমরা দিন পনের আগে কলকাতায় গিয়ে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেছি। খবরটা মোহনপুরের কেউ জানে না, এই যা।

ডক্টর মিত্র অবাক হয়ে বলে, কী ব্যাপার? এমন নাটকীয়ভাবে ...

বাসু বললেন, আই কংগ্র্যাচুলেট য়ু। ডক্টর মৈত্র, আই মীন মিত্র!

ডক্টর মিত্র বলেন, তা তো করছেন; কিন্তু হঠাৎ এমন নাটকীয়ভাবে কথাটা জিতা ঘোষণা করল কেন?

বাসু জবাব দেবার আগেই অপরাজিতা বলল, তোমাকে পরে আমি বুঝিয়ে বলব। এখন তুমি যাও। আমার জবানবন্দিটা এখনো শেষ হয়নি। তাই নয়, বাসুসাহেব? কিন্তু এত জবানবন্দি নেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে কেন বলুন তো?

বাসু বললেন, আমরা স্থির-নিশ্চয় হতে চাই এটা একটা আত্মহত্যার কেস!

— স্থির-নিশ্চয় হওয়ার কী আছে? ঘরটা ভিতর থেকে তালাবন্ধ। সমস্ত জানলা ভিতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ। রিভলভারটা বাপির। চাবিটা পাওয়া গেল তার পকেট থেকে। এ-ক্ষেত্রে এটা যে আত্মহত্যার কেস তাতে সন্দেহ থাকবে কেন?

বাসু বললেন, দুটো বিষয়ে আমরা স্থির-নিশ্চয় হতে চাই। প্রথম কথা, কেন তিনি আত্মহত্যা করলেন। দ্বিতীয় কথা কেন তিনি আমাকে টেলিগ্রাম করে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

একটু ইতস্তত করে অপরাজিতা বললে, হয়তো আমার বোকামিতে! কিন্তু আমি দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি যে, বাপি এমন একটা ড্রাস্টিক স্টেপ নিয়ে বসবে। আঘাত করলে সে চিরদিন প্রত্যাঘাতই করেছে তো। এভাবে সে যে হার মেনে নিতে পারে, তা ছিল আমার দুঃস্বপ্নের অগোচর!

— তোমার কী 'বোকামি'-র কথা বলছ, জিতা?

অপরাজিতা কিছুক্ষণ নতনেত্রে কী যেন চিন্তা করল। তারপর বলল, আগেই বলেছি, বাপির ইচ্ছে ছিল যে, সঞ্জয়দার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। কিন্তু আমাদের দুজনের কেউ তা চাইছিলাম না। সঞ্জয়দা ঝরনাদিকে পছন্দ করে রেখেছে; সাহস করে বাপিকে বলতে পারছে না। এদিকে আমি...

বাসু বলেন, এখন আর লজ্জা করার কী আছে, জিতা? এখন তো তোমরা স্বামী-স্ত্রী।

— আমি ইচ্ছে করেই কামালদার সঙ্গে বাড়াবাড়িরকম মেলামেশা করেছিলাম। আমি জানতাম, সলিলকেও বাপি মেনে নিতে চাইবে না; কিন্তু কামালদার বিকল্প হিসাবে বাপি সলিলকে মেনে নেবে—

হরেনবাবু বলে, তা ঠিক। রায়বাহাদুর ছিলেন কট্টর হিন্দু! তুমি কামালকে বিয়ে করতে

চাইছ বলেই তিনি ব্যারিস্টারসাহেবের সাহায্য চেয়েছিলেন। বাসুসাহেব যদি বলতেন 'কামাল নয়, সলিল' — তাহলে 'এনি পোর্ট ইন দ্য স্টর্ম' আইনে উনি এককথায় তা মেনে নিতেন।

বাসু বললেন, কিন্তু তা তো হল না, হরেনবাবু! তার আগেই কেন উনি এমন অবিমৃষ্যকারীর মতো...

অপরাজিতা বললে, নিয়তি। মৃত্যু বাপিকে টানছিল! তাই অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করে সে নিজের রিভলভারে নিজেকে ... স্যাড কেস ...

হরেন্দ্রনাথ বলে, ভেরি-ভেরি-স্যাড!

ঘর খালি হলে হরেন্দ্রনাথ বললেন, একটা কথা বলব, স্যার?

— বলো।

— আজ রাতের মতো 'ক্ষ্যামা' দেওয়া যায় না? আমরা তো অনেক অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছি। কেন রায়বাহাদুর আপনাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন। কেন অপরাজিতা কামালের সঙ্গে বিশ্রীভাবে 'লটঘট' করছিল। কেন সঞ্জয় সাহস করে বলতে পারেনি যে, সে ঝরনাকে বিয়ে করতে চায়। কেন অপরাজিতা গোপনে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে বসে আছে! তাই না? এখনো কি আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়নি? এখনো কি আপনি মেনে নিতে পারছেন না যে, রায়বাহাদুরকে কেউ খুন করেনি। ইটস্ জাস্ট এ কেস অব সুইসাইড!

বাসু ঘরময় পায়চারি করছিলেন। থমকে থেমে পড়ে বলেন, অলরাইট! আজ রাতের মতো এখানেই থামছি। কিন্তু কাল সকালে ঠিক এখান থেকেই যাত্রা শুরু করব। প্লিজ কাম ব্যাক অ্যাট টেন, টুমরো মর্নিং।

হরেনবাবু উঠে দাঁড়ায়। আড়মোড়া ভাঙে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, কী কী সমস্যার সমাধান এখনও বাকি রইল, স্যার?

— এক, কেন রায়বাহাদুর ঠিক ফায়ার করার আগে নব্বই ডিগ্রি ঘুরে পশ্চিমমুখো হয়ে বসেছিলেন। দুই, কেন রমলার হাত থেকে বেমক্কা চাবিটা মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল ...

— দ্বিতীয়টার জন্য যৌথভাবে দায়ী মাধ্যাকর্ষণ এবং রমলাদেবীর অন্যমনস্কতা।

— তিন, কেন হঠাৎ দশরথ জানার মনে হল রমলার ডান হাঁটুটে বাত আছে, সে একটু খুঁড়িয়ে চলে ...

— আপনি সেই পাগলের উক্তি নিয়েও চিন্তা করছেন, স্যার?

— চার, কেন বৈঠকখানার বাইরে বাগানে এই ছেঁড়া ঠোঙাটা পড়েছিল?

— ছেঁড়া ঠোঙা! মানে?

বাসু পকেট থেকে একটা ব্রাউন রঙের ঠোঙা বার করে বললেন, এলাকাটা স্পটলেসলি ক্লিন। তাহলে ঠোঙাটা এল কোত্থেকে? কেন? কখন?

হরেনবাবু বলেন, এটা তো, স্যার প্রায় সেই জাতের প্রশ্ন হল, 'কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসি?'

বাসু ওর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে বলে চলেন, পাঁচ, কি করে নটরাজ মূর্তির তলায় একটা কাচের টুকরো আটকে আছে ...

— নটরাজ মূর্তির তলায়? কী আছে?

বাসুসাহেব টুলের ওপর থেকে ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তিটা তুলে এনে দেখালেন। তার তলায় একটা ছোট্ট কাচের টুকরো আটকে আছে। প্রথমবার ঘরটা সার্চ করার সময়েই এটা তাঁর নজরে পড়েছিল।

চৌদ্দ

পরদিন সকাল নয়টায় ডাইনিং হলে প্রাতরাশে বসেছেন সবাই। ব্রেকফাস্ট টাইম সকাল সাতটায়। কিন্তু সে ছিল রায়বাহাদুরের জমানায়, গতকাল পর্যন্ত। তাছাড়া কাল শয্যাগ্রহণে সকলেরই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। গৃহকর্ত্রীর জ্বর হয়েছে, 'শক্'-এ। সলিল তাই সকাল-সকাল এসে তাঁকে পরীক্ষা করে ব্যবস্থা দিয়েছে। ব্রেকফাস্ট টেবিলে তিনি অনুপস্থিত। বাকি সবাই আছেন : সত্যপ্রসন্ন, সঞ্জয়, ঝরনা, অপরাজিতা, রমলা এবং সলিল। মোহান্তি আর কামালুদ্দীন শুধু অনুপস্থিত। দশরথ আর বামুনঠাকুর খাবার পরিবেশন করে চলেছে।

আহারান্তে বাসু সত্যপ্রসন্নের দিকে ফিরে বললেন, আজ বিকালের কোনও গাড়িতে আমি ফিরে যাব। আপনি কাইন্ডলি গাড়ির ব্যবস্থাটা করে দেবেন। মিসেস শেঠরায়কে আর বিরক্ত করব না। তাঁকে আমার সমবেদনা আর নমস্কার জানাবেন।

সত্যপ্রসন্ন বললেন, আপনি কি হরেনবাবুর সঙ্গে একবার —

— হ্যাঁ, হরেনবাবু ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আসবেন। তাকে আমার ওপিনিয়ন জানিয়ে যাব। আমার মতে, পোস্টমর্টেম হয়তো প্রয়োজন হবে না। আমি আজ খুব ভোরে উঠেছিলাম। তখনও আপনারা কেউ ওঠেননি। শুধু একজন মালি বাগানে কাজ করছিল। আমার মনে যে সংশয় ছিল তা মিটে গেছে।

ডক্টর মিত্র বলে ওঠে, অর্থাৎ আপনি বুঝতে পেরেছেন, রায়বাহাদুর কেন আত্মহত্যা করেছেন?

বাসুসাহেব তার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, তা আমি বলিনি, ডক্টর মিত্র। আমি বলিনি যে, আমি বুঝতে পেরেছি কেন রায়বাহাদুর আত্মহত্যা করেছেন।

— আমাদের তো মনে হয়েছে সেটাই একমাত্র সমস্যা। তা যদি না হয় তবে কী বলতে চাইছেন আপনি? কী সংশয় ছিল আপনার?

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমি বলতে চেয়েছি যে, আমি জানি, কীভাবে রায়বাহাদুরের মৃত্যু হয়েছে। এখন নয়টা কুড়ি। আমি ওই স্টাডিরুমে গিয়ে বসছি। ঠিক দশ মিনিট পরে আপনারা সবাই আসুন। আমি কী বুঝেছি তা বুঝিয়ে দিয়ে আমি কলকাতা ফিরে যাব। রায়বাহাদুর আমার ক্লায়েন্ট। কিন্তু তাঁকে এখন ... ওয়েল, প্লিজ মিট মি অ্যাট নাইন-থার্টি অ্যান্ড ওবে ফর দ্য লাস্ট-টাইম দ্য পাঙ্কচুয়ালিটি ইম্পোজড বাই দ্য লেট ল্যামেন্টেড আনফরচুনেট পার্সন!

•

দশ মিনিট পরে।

বাসু স্টাডিরুমের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। দশরথ খানকতক বাড়তি চেয়ার সাজিয়ে রেখেছে। সবাই উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে। সত্যপ্রসন্ন, সঞ্জয়, সলিল, ঝরনা, জিতা, রমলা— এমনকি দশরথও কপাটের ওপাশে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনুপস্থিত শুধুমাত্র অসুস্থা গৃহকর্ত্রী।

এবার অপরাজিতা বলে, আপনি শুরু করুন, মিস্টার বাসু। কী মর্মান্তিক কারণে বাপি আত্মহত্যা করলেন, তা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন?

বাসু বললেন, ও-ঘরে একবার বলেছি, আবার বলছি, না! রায়বাহাদুর আদৌ আত্মহত্যা করেননি। ইটস্ আ ডেলিবারেট ফার্স্ট ডিগ্রি কেস অব মার্ডার।

বাসুসাহেবের উচ্চারিত শেষ শব্দটা দু-তিনজনের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল! সত্যপ্রসন্ন সামলে নিয়ে বলেন, কী বলছেন, স্যার? 'মার্ডার' মানে? ঘর তালাবন্ধ, জানলাগুলো ভিতর থেকে বন্ধ। তাহলে হত্যাকারী ঘর ছেড়ে বার হয়ে গেল কি করে?

সঞ্জয় বলল, ভেন্টিলেটার দিয়ে নয় নিশ্চয়।

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, লক্ষ্য করে দেখুন, শার্সিপাল্লায় যে টাওয়ার-বোল্ট বা ছিটকিনি আছে তা সব নিচের দিকে। এই দেখুন, আমি দেখাচ্ছি কীভাবে বন্ধ জানলা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

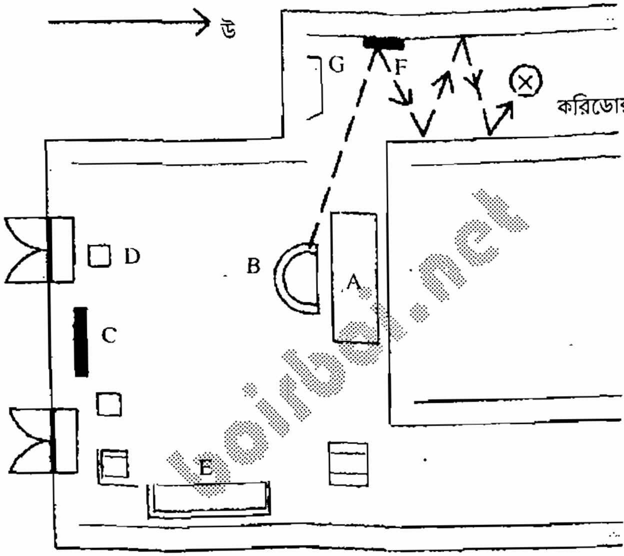

boirboi.net

A - টেবিল
B - চেয়ার
C - ভাঙা আয়না
D - নটরাজ মূর্তি
E - সোফাসেট
F - পিতলের ঘণ্টা
G - করিডোরের আয়না
× - যেখানে বুলেট রমলা কুড়িয়ে পায়

বুলেটের গতিপথ — — — →

তিনি কায়দাটা দেখালেন। শার্সিপাল্লার ছিটকিনিটা আলগাভাবে উঁচু করে রেখে দুটো পাল্লা টেনে বন্ধ করে একটু ঝাঁকালেই নিচেকার ফুটোয় ছিটকিনিটা পড়ে যায়।

বাসু বললেন, এই কায়দায় একজন মানুষ ঘর ছেড়ে জানলা দিয়ে বাইরে গিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে ছিটকিনিটা ফুটোর মধ্যে ফেলে দিতে পারে। তখন মনে হবে, ঘরের ভিতর যে আছে সেই লোকটাই প্রতিটি জানলা ও দরজা বন্ধ করেছে। এই কায়দায় ঘর ছেড়ে একজন বাইরে যেতে পারে; কিন্তু বাইরে থেকে ছিটকিনি-বন্ধ ঘরে সে ঢুকতে পারে না।

রমলা বলে ওঠে, কে, কেন, এ-কাজ করবে?

বাসু তার দিকে ফিরে বলেন, ওটা আমার অঙ্কের শেষ ধাপ ডক্টর স্মিথ। 'কেন' এবং 'কে'। তার আগে দেখতে হবে 'কী-ভাবে'! প্রথম কথা, হত্যা যে করেছে সে ঘরের লোক, বাইরের নয়। তাকে রায়বাহাদুর বিশ্বাস করেন, স্নেহ করেন। তাই সে নিকট সান্নিধ্য থেকে ওঁকে গুলি করার সুযোগ পায়। হয়তো রায়বাহাদুর তখন কিছু লিখছিলেন, হত্যাকারী তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিল। নিঃশব্দে টেবিলের ড্রয়ার খুলে রিভলভারটা সে বার করে নেয়। টেব্‌ল্-ল্যাম্পের জোরালো আলোয় বাইরের ব্যাপারটা নজর হয়নি রায়বাহাদুরের। হত্যাকারী ওঁর দক্ষিণ কর্ণমূলে গুলি করে। উনি তখন উত্তরমুখী হয়ে টেবিলে বসেছিলেন। গুলিটা ওঁর মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করে পশ্চিমদিকের খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চলে যায়। পিতলের ঘন্টায় প্রতিহত হয়ে করিডোরের দিকে চলে যায়। জানলা তিনটি বন্ধই ছিল। আততায়ী দরজাটা বন্ধ করে চাবিটা রায়বাহাদুরের পকেটে ফেলে দেয়। নিজের ফিঙ্গারপ্রিন্টটা মুছে নিয়ে রিভলভারটায় ওঁর ডান হাতের আঙুলের ছাপ তুলে দেয়। দ্রুত হাতে 'সরি' কথাটা ব্লক ক্যাপিটালে লিখে সে চেয়ারটা নব্বই উগ্রি ঘুরিয়ে দেয়। গুলিটা যে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়নি, অর্থাৎ গুলি করার আগেই যে দরজা বন্ধ করা হয়েছে, এটা প্রমাণ করতে হত্যাকারী এই কাণ্ডটা করে। নটরাজের মূর্তিটা তুলে নিয়ে আয়নাটায় আঘাত করে চুরমার করে দেয়। তারপর পশ্চিমদিকের জানলার ছিটকিনি খুলে — যে-কায়দা আমি দেখিয়েছি — সেই কায়দায় ঘর ছেড়ে বাইরে লাফিয়ে নামে।

ডক্টর মিত্র বাধা দিয়ে বলে, মাপ করবেন স্যার, আপনি আপ্তবাক্যের মতো ঘটনার বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। এর পিছনে কিছু যুক্তি আছে কি?

বাসু নটরাজ মূর্তিটা তুলে এনে দেখালেন তার নিচে একটা ছোট্ট কাচের টুকরো গেঁথে রয়েছে। কাচ নয়, আয়নার একটা ক্ষুদ্র অংশ। বাসু বললেন, বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়ে তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও, ডক্টর মিত্র — কীভাবে ওই আয়নার টুকরোটা ব্রোঞ্জমূর্তির তলায় —গায়ে নয়, তলায়, 'বেস'-এ —আটকে থাকতে পারে। বোঝাও, কী কারণে সুইসাইড করার আগে রায়বাহাদুর নব্বই ডিগ্রি ঘুরে বসেছিলেন।

কেউ কোনও জবাব দেয় না।

বাসু বলেন, আজ খুব ভোরে উঠে বাগানে তল্লাশি করতে গিয়ে আমি দেখেছি, স্টাডিরুমের পুবদিকের জানলার নিচে একজোড়া জুতোর ছাপ। বেশ বোঝা যায়, খোলা জানলা দিয়ে কেউ লাফ দিয়ে নেমেছিল। ওখানে ফুলের 'বেড' তাই মাটি ভিজে ছিল। ডানপায়ের জুতোর ছাপটা খুব স্পষ্ট। আমি তার নিখুঁত মাপ নিয়ে এসেছি।

বাসুসাহেব পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে টেবিলে রাখলেন। বললেন, নিঃসন্দেহে লেডিজ শু্য। পুরুষ মানুষের জুতোর 'হিল' এমন হয় না। ফলে সম্ভাব্য আততায়ীর জেন্ডার নির্ধারিত হল — আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটা অনেক সংকীর্ণ হয়ে গেল।

বাসুসাহেব থামলেন। সকলে এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। কেউ কোনও কথা বলে না। বাসুই পুনরায় বলেন, আপনারা জানেন, জুতোর মাপ থেকে পায়ের মাপ নির্ধারণ করা যায়। ক্রিমিনোলজি ও ফরেনসিক রিসার্চ বলে — আট-দশ মিলিমিটারের মধ্যে আন্দাজটা নিখুঁত হয়। আততায়ী যেহেতু বাইরের কেউ নয়, তাই আমাদের বাড়ির ভিতরেই সন্ধানটা করতে হবে। বাড়িতে চারজন মহিলা আছেন, তার ভিতর মিসেস শেঠরায়কে অনারেবল একসেপশন ধরে নিয়ে আমি বাকি তিনজনের পায়ের মাপ নিতে চাই। আপত্তি করার কিছু নেই। ইট্‌স্

অ্যান অ্যাকাডেমিক অ্যানালিসিস। পুলিস এসে খুঁজে দেখবে লেডিজ-শু্যটা কার। আশা করি আপনাদের কারও আপত্তি নেই?

অপরাজিতা রুখে ওঠে, এই অভদ্র অ্যাকাডেমিক এনকোয়্যারি থেকে আপনাকে নিবৃত্ত করা যাবে না, তা আমরা বুঝতে পারছি। তাছাড়া আপনি তো হুমকিও দিয়ে রাখলেন পুলিস এসে সেটা করবেই। সুতরাং আপনি, দেখুন —

বাসু নিঃশব্দে এগিয়ে এলেন। পকেট থেকে ছোট্ট একটা এক মিটারের মেটালিক রোলিং-টেপ বার করে এগিয়ে গেলেন ঝরনার দিকে। ঝরনা স্লিপার থেকে নিঃশব্দে তার ডান পা-টা বার করে দিল। জুতোর সেল্সম্যান যেভাবে মাপ নেয় সেই ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসে পায়ের মাপটা নিয়ে বাসু বললেন, না! ঝরনার পা অনেক বড়। ... নেক্সট ডক্টর স্মিথ।

রমলাও বিরক্ত মুখে তার ডান পা-টা বাথরুম স্লিপার থেকে বার করে বাড়িয়ে ধরল। বাসু মাপ দিয়ে বললেন, ডক্টর রমলা স্মিতের পা আবার বেশ কিছুটা ছোট। আউট বাই ফিফটিন এম. এম.। এবার অপরাজিতা এস।

অপরাজিতা উঠে পড়ে। স্যান্ডেল থেকে ডান-পা-টা বার করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বাসু মেটালিক টেপটা ওর পায়ের পাশে ধরে দেখলেন। উঠে দাঁড়ালেন। কোন কথা বললেন না। গুটিয়ে নিয়ে মেটালিক টেপটা পকেটে রাখলেন। নিঃশব্দে বসে পড়লেন নিজের চেয়ারে।

অপরাজিতার ভ্রূকুঞ্চন হল। বলে, কী হল? কিছু বলছেন না যে?

— আয়াম সরি, জিতা। মাপটা এবার হুবহু মিলে গেছে!

— সো হোয়াট ? — গর্জে ওঠে অপরাজিতা।

বাসু ধীরে ধীরে বললেন, রমলা বা ঝরনার ক্ষেত্রে মাপটা মিলে গেলেও আমাদের কিছুটা সন্দেহ থাকত। মোটিভের অভাবে। রায়বাহাদুরের জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে ডক্টর স্মিথ অথবা ঝরনার জীবন নিঃসম্পর্কিত! কিন্তু ...

বাক্যটা অসমাপ্ত রেখে বাসু থেমে গেলেন। হাসলেন।

ডক্টর সলিল মিত্র এবার গর্জে ওঠে, জিতার ক্ষেত্রেই বা কী মোটিভ দেখতে পেলেন আপনি?

— জিতা ওর বাবার ড্রয়ার ঘেঁটে একটা নতুন উইলের ড্রাফ্ট্ দেখতে পেয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল, ওই উইলটা সই হয়ে গেলে সে সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যাবে। রায়বাহাদুরের এস্টেটের মালিক হয়ে যাবে সঞ্জয় দুগার। এত বড় সম্পত্তির লোভটা সে ...

সত্যপ্রসন্ন বলে ওঠেন, মানে? এ কথার কী অর্থ? সঞ্জয় কীভাবে...

— অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করুন। সে জানে।

অপরাজিতা গর্জে ওঠে, ইটস্ আ লাই! এ ড্যামনেড লাই!

বাসু ম্লান হেসে বললেন, হত্যার পরিকল্পনাটা তুমি যেভাবে ছকেছিলে জিতা তা নিখুঁত। রায়বাহাদুর ঘটনাচক্রে আমাকে টেলিগ্রাম না করলে পুলিস মেনে নিত, এটা আত্মহত্যা! তোমাকে ধরতে পারত না।

অপরাজিতা আবার গর্জে ওঠে, আপনি... আপনি একটা বদ্ধ উন্মাদ!

বাসু বলেন, আজ এখানে নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় তুমি ও কথা বলতে পার। এটা আদালত নয়, তুমি আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু শেষের সেদিন ভয়ঙ্করের কথাটা ভেবে দেখ, জিতা। অনারেব্ল্ জাস্টিস যখন রায় দেবেন, 'শি শ্যাল বি হ্যাংগড বাই দ্য নেক, আনটিল...

— না!! থামুন আপনি!

বাসুসাহেব চমকে এ-পাশে ফিরলেন।

কথাটা বলেছেন ডক্টর মিস রমলা স্মিথ। সেই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলাটি! উত্তেজনায় তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে।

বাসু বললেন, জিতার ফাঁসি হবেই! ডেলিবারেট মার্ডার! সমস্ত এভিডেন্স তার বিরুদ্ধে। একমাত্র তারই 'মোটিভ' আছে। রায়বাহাদুরের মৃত্যুতে একমাত্র সেই লাভবান হচ্ছে। তাছাড়া জুতোর মাপ...

— হ্যাং ইয়োর জুতোর মাপ! ... আমি অকাট্য প্রমাণ দেব, খুকু এ-কাজ করেনি, করতে পারে না।

— কী প্রমাণ? জানতে চাইলেন বাসু।

— আই কনফেস! হ্যাঁ, স্বীকার করছি। আমি ... আমিই রায়বাহাদুরকে হত্যা করেছি। ঠিক যেভাবে আপনি বলেছেন সেইভাবে।

অপরাজিতা আবার গর্জে ওঠে, সে কী? কিন্তু কেন? কেন এই জঘন্য অপরাধটা করলেন, মাসিমা?

ডক্টর রমলা স্মিথ দুহাতে নিজের মুখটা ঢাকলেন।

বাসু এবার এগিয়ে এসে বললেন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন! প্লিজ লিভ আস অ্যালোন! ডক্টর মিস রমলা স্মিথের পাহারায় আমিই তো আছি। সঞ্জয়, তুমি থানায় একটা ফোন করে দাও। হরেন্দ্রবাবুকে এখনি চলে আসতে বল। ইম্মিডিয়েটলি!

একে একে সবাই ঘর ছেড়ে বার হয়ে গেলেন। নিঃশব্দে। মাথা নিচু করে। শুধু অপরাজিতা দরজার কাছে একবার ফিরে দাঁড়ালো। সেখান থেকে চাপা গলায় ভর্ৎসনা করে উঠল, ছিঃ! ছিঃ মাসিমা! আপনি ... আপনি কেন এ-জঘন্য কাজটা করলেন? বাপি আপনার কী ক্ষতি করেছিল?

বাসু এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরলেন। দরজার বাইরে পৌঁছে দিলেন। দেখলেন, সেখানে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরাতন ভৃত্য দশরথ জানা।

বাসু ফিরে এসে বললেন, বস রমলা! আয়াম সরি।

রমলা হাসলেন। হাত দুটি সরালেন মুখ থেকে। তাঁর চোখে জলের দুটি ধারা। বললেন, আপনি ....আপনি বোধহয় ইচ্ছে করেই ভুল করছিলেন। আমাকে উত্তেজিত করে নিজমুখে কনফেস করানোর জন্য ডেলিবারেটলি ওভাবে খুকুকে আক্রমণ করেছিলেন। তাই নয়?

বাসু নতনেত্রে বললেন, আয়াম সরি, রমলা!

— কিন্তু কী করে চিনলেন আমাকে?

— সন্দেহ আমার প্রথম থেকেই হয়েছিল, যখন তুমি জিতাকে 'খুকু' বলে ডাকতে শুরু করেছিলে। কিন্তু আমার আগেই তোমাকে চিনতে পেরেছিল আর একজন। ওই দরজার বাইরে যে পাহারায় আছে—দশরথ জানা! হয়তো বুঝতে পেরেও সে সাহস করে কাউকে কিছু বলতে পারেনি। শুধু আমাকে বলেছিল, তোমার ডান পায়ে বাত, তুমি একটু খুঁড়িয়ে চল! দশরথ!

দশরথ এগিয়ে এল ঘরের ভিতর।

বাসু রমলার দিকে ফিরে বললেন, তোমার এখন একটা স্টিমুলেন্ট দরকার। কী খাবে বল? জিন উইথ লাইম? না গরম দুধ?

ডক্টর স্মিথ দশরথের দিকে ফিরে বললেন, একগ্লাস ঠান্ডা জল, দশরথ!

— যে আজ্ঞে! —মাথা নেড়ে নিঃশব্দে চলে গেল দশরথ।

বাসু বললেন, সমস্ত সন্দেহের অবসান হল তোমার ডান পায়ের গোড়ালিটা দেখে। পায়ের মাপ নেবার অছিলায় আমি তোমায় ডান পায়ের গোড়ালিটা পরীক্ষা করলাম। বিশ-পঁচিশ বছরেও বুলেট-উন্ডের দাগটা মিলিয়ে যায়নি।

— ওঁর ড্রয়ার ঘেঁটে উইলটা দেখেই আমার মাথায় আগুন ধরে গেছিল। আপনি জানেন না, লোকটাকে আমি আজও চারুদার ডেফিনিশন অনুযায়ী শ্রেণীশত্রুরূপে দেখি। খুকুকে সে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু খুকুর মাকে অপমান করতে তার বাধেনি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম খুকু ডাক্তার মিত্রকে ভালবাসে। কামালকে সে যে প্রশ্রয় দেয় — সেটা লোকদেখানো। আমার আরও মনে হয়েছিল, খুকু ইচ্ছে করেই কামালের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করে, যাতে কামালের বদলে ডক্টর মিত্রকে বিয়ে করে বসলে ওর বাবার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়বে। কিন্তু ওই মেগালোম্যানিয়াক বুড়োটা তা হতে দেবে না। সে জোর করে খুকুর সঙ্গে সঞ্জয়ের বিয়ে দেবে। উইলটা সই হয়ে গেলে খুকুর আর বাঁচবার কোনও পথ থাকবে না।

— কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারনি এভাবে উইল করলে সেটা আদালতে টিকবে না। খুকুকে স্বেচ্ছায় দত্তক নিয়েছিলেন। তার ফান্ডামেন্টাল রাইটস্ কেড়ে নিয়ে তাকে ওভাবে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

— এখন সেকথা বুঝছি। তখন আমি বুঝিনি।

বাসু বললেন, বুলেটটাকে তুমি করিডোরে দেখতে পেয়েছিলে, তাই না? যখন আমরা স্টাডিরুমের দিকে যাচ্ছি, তখন?

— ইয়েস। চাবিটা ইচ্ছে করে হাত থেকে ফেলে দিয়ে চাবির সঙ্গে বুলেটটা কুড়িয়ে নিই। কপাটটা ভেঙে ফেলার পর সবাই যখন দু-পাঁচ সেকেন্ডের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়ে তখন সাবধানে সীসার গোলকটা স্টাডিরুমের মেঝেতে গড়িয়ে দিয়েছিলাম।

— আর সময়টা গুলিয়ে দেবার জন্য কাগজের ঠোঙাটা ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে ফাটিয়েছিলে?

— হ্যাঁ! গুলিটা করেছিলাম সাড়ে-সাতটায়। কিন্তু আমার শাড়িতে কিছু রক্তের দাগ লেগে যায়। তাই ঘরে গিয়ে শাড়িটা বদলে স্নান করে ফিরে আসি। ঠোঙাটা ফাটাই বৈঠকখানায় ঢোকবার মিনিটখানেক আগে। সবচেয়ে দুঃখের কথা, আমি বুঝতে পারছিলাম যে, জুতোর মাপের গল্পটা আপনার একেবারে আষাঢ়ে গল্প— কারণ তখন আমার পায়ে ছিল স্লিপার তার হিল নেই; আর আমি ওই জানলা দিয়ে আদৌ লাফ দিয়ে ফ্লাওয়ার বেডে নামিনি। আমি ঘর থেকে বার হয়েছিলাম দক্ষিণ দিকের একটা জানলা দিয়ে। সেদিকে ফ্লাওয়ার বেড নেই। কংক্রিটের পাথওয়ে। তাই বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, জুতোর মাপের আষাঢ়ে গল্পটা আপনি বানিয়ে বলছিলেন। আরও বুঝতে পারছিলাম, আপনি আমাকে কিছুতেই চিহ্নিত করতে পারবেন না। আমার কথা কেউ জানে না, কেউ আমাকে সন্দেহ করবে না। আমার কোনও মোটিভ কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু আপনি যেভাবে অজগরের মতো পাকে পাকে খুকুকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন, তাতে আমি প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। খুকুর মোটিভটা প্রতিষ্ঠা করা যাবে। আমার মনে হল, আপনারা পাকেচক্রে খুকুকেই ফাঁসির দড়ি থেকে ঝোলাবেন। 'তাই আমি ... মানে, নিরুপায় হয়ে ... মানে, আপনি যখন ড্রামাটিক্যালি বলতে শুরু করলেন, শি শ্যাল বি হ্যাংগড্ বাই দ্য নেক ...'

বাসু বললেন, নামটাকে ছেঁটে ফেলেছ, চুলগুলো ছেঁটে ফেলেছ, ধর্মটাকেও ছেঁটে ফেলে

ক্রিশ্চিয়ান হয়েছ, তবু আমার বিশ্বাস ছিল মাতৃস্নেহটাকে ওভাবে ছেঁটে ফেলা যায় না। তোমার স্বীকারোক্তি আদায় করতেই আমি অতি-নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়েছিলাম। আয়াম সরি —

— য়ু নিডন্ট বি, স্যার! একটা কথা শুনে রাখুন, পুলিস এনকাউন্টারে মরিনি, ফাঁসির দড়ি থেকেও এই বুর্জোয়া সরকার আমাকে ঝোলাতে পারবে না। আই থ্রো অ্যা চ্যালেঞ্জ টু য়ু অল—

বাসু শান্তকণ্ঠে বললেন, কিসের জোরে, এতবড় কথাটা আমাকে বলছ, অতসী? কে তোমাকে মুক্ত করে দেবে? ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাবে? কে? কোথায় তিনি?

সিলিং-এর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে অতসী বললেন, হি ইজ আপ দেয়ার, স্যার! আমি মুক্তি পাব করুণাময়ের অপার করুণায়। আমি লিউকেমিয়ার রুগী। আমার মেয়াদ আর চার-ছয় মাস। বিচারের প্রহসন শেষ হবার আগে আমি পৌঁছে যাব সমরের কাছে। জীবনের শেষ কয়েকটা সপ্তাহ মেয়ের কাছে কাছে কাটাব বলেই খুকুর কাছে চলে এসেছিলাম।

বাসু এগিয়ে এসে ডক্টর স্মিথের দুই বাহুমূল দুহাতে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে বললেন, গড ব্লেস য়ু, মাই চাইল্ড!

— একটা অনুরোধ করব, স্যার? রাখবেন?

— বলো, অতসী। আমি আজ দাতাকর্ণ!

— খুকু যেন কোনদিন জানতে না পারে — কেন তার মাসিমা ওই জঘন্য অপরাধটা করেছিল। না হলে বেচারি সারাটা জীবন অনুশোচনায় দগ্ধে দগ্ধে মরবে।

বাসু বলেন, আমেন!

সকল কাঁটা ধন্য করে

রচনাকাল :
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, 1999
প্রচ্ছদশিল্পী : বিজন কর্মকার
উৎসর্গ : শ্রীবীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

—বেশ তো খোশগল্প হচ্ছিল, এর মধ্যে তুমি আবার খুনের কথা ওঠাতে চাইছ কেন?

নিখিলের দিকে তাকিয়ে বেশ ধমকের সুরে কথাটা বলল কাকলি। নিখিল দাশ আর কাকলিকে আপনারা বোধহয় চিনতে পেরেছেন। এক সময় কাকলি হয়ে পড়েছিল একটি খুনের মামলার সম্ভাব্য আসামী, আর নিখিল সে সময়ে ছিল ঐ খুনের মামলার ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। 'প্যারাফিন টেস্টে'—না, ল্যাবরেটারিতে নয়, ইন্টারোগেশনের অবকাশে কাকলি ইন্সপেক্টর দাশের কাছে ধরা পড়ে যায় (পশ্য : *'যাদু-এ তো বড় রঙ্গ'-র কাঁটা*)। পরে নিখিল অনুভব করে, ধরতে গিয়ে সে নিজেও ধরা পড়ে গেছে। যে ছিল সম্ভাব্য আসামী, ও নিজে হয়ে পড়েছিল তার রূপে মোহিত, বন্দী। ক্রমে স্বামী। ফলে খুনের কথা বরদাস্ত হয় না কাকলির। তাছাড়া ওই বিশ্রি শব্দটা ওদের দাম্পত্যজীবনে নিত্য-বিভীষিকা। সিনেমা দেখার প্রোগ্রাম ভেস্তে গেছে। বান্ধবীর বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখতে যেতে পারেনি; মায় মশারি-ফেলা জনান্তিকের কোনো আনন্দঘন মুহূর্তকে খান্ খান্ করে খন্ খন্ করে বেজে উঠেছে টেলিফোন। বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে রিসিভারটা কানের কাছে চেপে ধরতে হয়েছে নিখিলকে। যথারীতি সেই ডায়াল 'এন' ফর মার্ডার। হেড-কোয়ার্টার্সে খুনের খবর পৌঁছালেই সেটা তৎক্ষণাৎ শান্ট করে দেওয়া হয় হোমিসাইডের ইন্সপেক্টরকে : নিখিল দাশকে—'এন'কে।

ফলে খুনের প্রসঙ্গে কাকলি ক্ষিপ্ত হবেই।

নিখিল বলে, আয়্যাম সরি!

কথা হচ্ছিল বাসু-সাহেবের বাড়ির সামনের বাগানে। নিখিল আর কাকলি এসেছে সৌজন্য

সাক্ষাতে। নিখিলের আজ খাতা-কলমে ছুটি—একে রবিবার, তায় কালীপূজা। খাতা-কলমে, অর্থাৎ এখানে আসার আগে হেড-কোয়ার্টার্সকে খবর দিয়ে আসতে হয়েছে—এমার্জেন্সি কেসে তাকে কত নম্বরে টেলিফোন করলে পাওয়া যাবে। 'পেজার নম্বর' বা 'মোবাইল ফোন' তখনো খুব ব্যাপক আকারে চালু হয়নি।

নিখিল সস্ত্রীক সৌজন্য-সাক্ষাতে এসেছে একটা বিশেষ হেতুতে। প্রায় বছর দুই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পোস্টেড থাকার পর নিখিল সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছে। শুধু বদলিই নয়, সেই সঙ্গে পদমর্যাদা তথা মাহিনাবৃদ্ধিও ঘটেছে। বর্তমানে সে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে মেজ-কর্তার পদটি অলঙ্কৃত করছে। অর্থাৎ আরক্ষা-বিভাগের পারিভাষিক সাদা বাঙলায় নিখিল দাশ বর্তমানে অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার, ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেন্ট। সংক্ষেপে এ. সি. ডি. ডি.।

কালীপূজার রাত। মহামান্য উচ্চ-ন্যায়ালয়ের সেই 'তিন-কুড়ি-পাঁচ' ডেসিব্ল-এর সীমারেখা তখনো জারি হয়নি। ফলে নিউ আলিপুরের ধনকুবের তনয়েরা দনাদ্দন কালী-পটকা, চকলেট-বম্ব, দোদোমা ফাটাচ্ছে, অতি উচ্চ নিনাদে। বিশে প্লেটে করে খাবার এবং বাসু-সাহেব বাদে আর সবাইকে কফি পরিবেশন করে গেছে। বাসু-সাহেব দু'পেগ শেষ করে একটা মিনি হাফ তাঁর গ্লাসে ঢালছিলেন এমন সময়—খুব কাছেই বিকট শব্দে রাস্তায় একটা বোমা ফাটলো। হাফ-আ-টেব্‌ল্‌স্পুনফুল শ্যিভাস্ রিগাল গ্লাসের বাইরে পড়ল। সে কয় ফোঁটা তরল পদার্থের আর্থিক মূল্য ঐ দোদোমার চেয়ে বেশি!

বোমার শব্দ এতক্ষণে সকলের প্রায় কান-সওয়া হয়ে এসেছে; কিন্তু এটা এত কাছে ফাটল যে, সুজাতা দু'হাতে কান চাপা দিয়ে বলে উঠে, ওফ্! আর পারা যায় না! আইন করে এ ধাষ্টামো থামানো যায় না?

বাসু তাঁর লীগ্যাল ওপিনিয়ান দেবার আগেই নিখিল বলল, আপনাদের অসুবিধা হয় ঠিকই, কিন্তু কালীপূজার এমন একটা রাত খুনীর কাছে আইডিয়াল। 'সাইলেন্সার'-এর দরকারই হবে না। ত্রিসীমানায় কেউ আদালতে উঠে হলপ নিয়ে পরে বলতে পারবে না কোনটা ছিল পট্‌কা-ফাটার শব্দ আর কোনটা ফায়ারিঙের। আজ রাতটায় খুনীর পক্ষে আদর্শ সুযোগ!

আর নিখিলের এই কথাতেই কাকলি আপত্তি জানিয়েছিল : বেশ তো খোশগল্প হচ্ছে, এর মধ্যে আবার খুনের কথা কেন?

বাসু বললেন, গল্পের সঙ্গে খুনের কিছু ভাশুর-ভাদ্দরবউ-এর সম্পর্ক নয়, কাকলি। গোয়েন্দা গল্পের বারো-আনাই তো 'খুন' নিয়ে। আজ তো তেরই নভেম্বর, রবিবার, আজ থেকে মাত্র আটদিন আগে, পাঁচই নভেম্বর, শনিবার, এবারও ওদের কালীপূজার রাত্রে লন্ডনে একটা খুন হয়েছে—পিকাডেলি সার্কাস অঞ্চলে—বাজি-পটকার শব্দে পাশের ঘরের মানুষজন পর্যন্ত বুঝতে পারেনি যে, পার্টিশন দেওয়ালের ওপাশে একজন পিস্তলের গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল।

কাকলি অবাক হয়ে বলে, লন্ডনের কালীপূজাতেও এত ধুমধাম হয়?

বাসু বলেন, লন্ডনেই। তবে কালীপূজা নয়। 'গাঈ ফ'ক্‌স্ ডে'-র সমাবর্তনে পাড়ায় পাড়ায় ছেলে-ছোকরার দল পটকা ফোটায়।

কৌশিক বলে, গাঈ ফক্স ব্যক্তিটি কে? কেওকেটা কেউ একজন নিশ্চয়। অহল্যা-দ্রৌপদী-কুন্তীর মতো একেবারে 'স্মরেন্নিত্যম্' না হলেও ইংরেজ তাকে বছরে একদিন যখন স্মরণ করে আজও।

বাসু বলেন, ঐ তো মুশকিল, ভাগ্নে। তোমাদের বি. ই. কলেজে আবার ইতিহাস পড়ানোর রেওয়াজ নেই। গাঈ ফ'ক্স্ একজন প্রফেশনাল কীলার। বিস্ফোরণে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে উড়িয়ে দিয়ে সপরিবারে ইংলন্ডেশ্বরকে হত্যা করতে চেয়েছিল। পারেনি। ধরা পড়ে যায়। লোকটার ফাঁসি হয়ে যায়।

কৌশিক বলে, বেচারি গাই ফক্স! তার আমলে বোধকরি ভাল ক্রিমিনাল-সাইড ব্যারিস্টার ছিল না, যাঁর আইন আর ইতিহাস বিষয়ে সমান পাণ্ডিত্য।

বাসু জবাবে কী-একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন—বাধা পড়ল। দ্রাম করে একটা পট্‌কা ফাটল। আর সেই সুযোগে সুজাতা কথাটার মোড় ঘোরায় : আপনি ওসব পাগল-ছাগলদের কমেন্ট্-এ কান দেবেন না, মামু। গাঈ ফ'ক্সের গল্পটা শেষ করুন।

বাসু বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের জানা থাকা ভাল। ভারতে তো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগেই আছে। দলীয় স্বার্থে দু'দল রাজনৈতিক ধর্মান্ধ খুনোখুনি করে ঈশ্বরসেবা করতে চায়। গাঈ ফ'ক্স্ ষোড়শ শতাব্দীর একজন প্রফেশনাল ক্রিমিনাল। জন্মেছিল প্রটেস্টান্ট হিসাবে—তার বাবা-মা দুজনেই প্রটেস্টান্ট; কিন্তু সে নিজে বড় হয়ে রোমান ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ করে। রবার্ট ক্যাটেস্‌বি নামের একজন ধনী লন্ডনেয়ার ওকে ভাড়া করে নিয়ে আসে নেদারল্যান্ডস্ থেকে। গাঈ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বেসমেন্টে প্রচুর বারুদ জমা করে রাখে। স্থির হয়, সে বছর পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনের দিনে যখন রাজারানী বাৎসরিক সভায় আসবেন তখন গাঈ ফ'ক্স্ দূর থেকে দড়িতে আগুন দেবে। ইতিহাসে এর নাম 'গানপাউড়ার প্লট'। রোমান ক্যাথলিক ধর্মান্ধদের পরিকল্পনা ছিল, পার্লামেন্টে ইংলন্ডের রাজারানী সহ যাবতীয় প্রটেস্টান্ট সেনেটাররা মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবেন। কিন্তু নিরাপত্তা-বিধায়ক পুলিশ আগে-ভাগেই টের পায়। দড়িতে আগুন দেওয়ার আগেই গাঈ ফ'ক্স্ ধরা পড়ে। পরে তার ফাঁসি হয়।

নিখিল জানতে চায়, আর যে ধর্মান্ধ রোমান ক্যাথলিক ঐ প্রফেশনাল কীলারটাকে নিয়োগ করেছিল? সেই রবার্ট ক্যাটেস্‌বির কী হলো?

—না, পুলিশ তাকে ছুঁতে পারেনি। তাকে গ্রেপ্তার করার আগেই ষড়যন্ত্রকারী দলের পাণ্ডারা তাকে গুলি করে মারে—নাহলে ষড়যন্ত্রকারীরা সবাই ধরা পড়ে যেত।

কাকলি বলে, কেনেডি হত্যাকারী অস্‌ওয়াল্ডকে যেমন পুলিশপ্রহরার ভিতরেই মেরে ফেলা হলো।

রানী বলেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু গাঈ ফক্সের সঙ্গে কালীপূজার কী সম্পর্ক?

বাসু বললেন, ঐ পাঁচই নভেম্বর গোটা ইংলন্ডে 'গান-পাউডার প্লট'-এর বার্ষিক সমাবর্তন হয়। রাস্তায় রাস্তায় চ্যাঙড়া ছেলেরা দনাদ্দন পটকা ফাটায়। ওরা একটা গানও গায় :

"Remember, remember/The fifth of November,
Gunpowder treason and plot.
We see no reason/Why gunpowder treason
Should ever be forgot !"

রানী বলেন, আশ্চর্য! ব্রিটেনের মতো রাজভক্ত দেশ ঐ লোকটাকে বছর-বছব স্মরণ করে?

বাসু বলেন, না রানু। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে না আদৌ। অনেক জায়গায় গাঈ ফ'ক্স্-এর কুশপুত্তলিকা দাহ করে নভেম্বরের শীতে ওরা আগুন পোহায়। আমরা যেমন দোলের সময় ম্যাড়া পোড়াই।

কৌশিক বলে, ম্যাড়া তো আসলে ভেড়া। আগুনে ঝল্‌সে গেলে সুখাদ্য হয়, কিন্তু ফক্স পোড়ালে কী লাভ? শেয়ালপোড়া তো খাওয়াও যাবে না।

বাসু তাঁর পানীয়টা গলাধঃকরণ করে বললেন, আয়াম সরি, এগেন মিস্টার কৌশিক মিত্র, বি. ই.! গাঈ ফ'ক্স্-এর উপাধি Fawkes অর্থাৎ Fox নয়। আপনার রসিকতাটা তাই অর্থহীন!

দুই

পরদিন। চোদ্দই নভেম্বর। সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা।

আজ কালীপূজার ভাসান। বাসু পরিবারের প্রাতরাশ অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে। তবু আসরটা ভাঙেনি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে সবাই দু'তিনখানি সংবাদপত্র ভাগাভাগি করে পড়ছেন। কৌশিক দ্বিতীয় কাপ চা/কফির অর্ডার দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে কিনা চিন্তা করছে, এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন। বিশে ছিল সবচেয়ে দূরে; কিন্তু আর কেউ স্টার্ট নেবার আগেই সে হুমড়ি খেয়ে পৌঁছে গেল টেলিফোন যন্ত্রটার কাছে।

বাসু বলেন, অমন হুড়মুড় করে দৌড়াস কেন? তোর গদি তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। টেলিফোন বাজলে তুইই প্রথম তুলবি।

বিশে ততক্ষণে ও-প্রান্তের কথা শুনে নিয়ে 'কথামুখে' হাত-চাপা দিয়ে বাসু-সাহেবকে বললে, 'আপনের।' —কথার সঙ্গে সঙ্গে কর্ডলেস ফোনের রিসিভারটা এগিয়ে দেয়।

বাসু বলেন, কে ফোন করছে?

—হুমোসাইড থেকে। নিখিল দাশ-সাহেব।

বাসু রানীর দিকে ফিরে বললেন, ছোকরা কেমন উন্নতি করছে, দেখেছ?

তারপর রিসিভারটা বিশের হাত থেকে গ্রহণ করতে করতে তাকে বলেন, ওটা 'হুমোপাখি' নয় রে বিশে : 'হোমিসাইড'। পুলিশদের যে অফিস শুধু খুনোখুনির কিনারা করে তাদের বলে—'হোমিসাইড'। বুঝলি?

বিশ্বনাথ ঘাড় নেড়ে স্বীকার করে। অর্থাৎ তার জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে।

টেলিফোনে বাসু বলেন, বলো নিখিল, এত সকালে কী বলতে চাও?

—কলকাতা ইজুক্যালটু লন্ডন! কাল রাত্রে বোমাবাজির সুযোগে—

বাসু ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, বুঝলাম। আর পিকাডেলি সার্কাস ইজ ইকোয়াল টু...?

—সল্ট লেক! আজ সকালে খবরটা এসেছে। মিনিট-পাঁচেক আগে। আমি যাচ্ছি। আসবেন নাকি? জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশনে রাজি আছেন?

বাসু বললেন, ডিপেন্ডস্! তুমি যদি আমার শর্ত দুটো মেনে নাও।

—শর্ত! কী শর্ত? দুটো শর্ত বললেন না?

—হ্যাঁ! প্রথমত, যে লোকটা সত্যিকারের খুনী তাকে বাদ দিয়ে তুমি একটা নিরীহ গোবেচারা লোককে অ্যারেস্ট করবে। দ্বিতীয়ত, গোবেচারা লোকটা যেন একেবারে 'অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ' না হয়!

নিখিল হাসতে হাসতে বলে, এটা কী বলছেন, স্যার? আমি আপনার সাহায্য চাইছি যাতে ভুল করে কোনও নিরীহ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার না করি...

—তাহলে আমার সংসার কেমন করে চলবে, নিখিল? তুমি তো জানই, যাকে দোষী বলে মনে করি, তার কেস আমি নিই না, তাকে 'গিল্‌টি প্লীড' করতে বলি...

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনার শর্ত দুটি মানলে আমার সংসার কেমন করে চলবে, স্যার? ক্রমাগত ভুল লোককে অ্যারেস্ট করলে আমার যে 'ডিমোশন' হয়ে যাবে! যাবে না?

—কারেক্ট! ঠিক আছে! শোধবোধ... আমি আছি তোমার সঙ্গে—'উই আর ইন দ্য সেম বোট, ব্রাদার!' রাস্তায় বসে যুগলবন্দিতে যদি হাপু গাইতে হয় তাও সই, তবু নিরপরাধীকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে আমাদের যৌথ প্রচেষ্টা করতে হবে।

নিখিল বলে, আসলে কী হয়েছে জানেন, স্যার? অনেকদিন ধরে তো হোমিসাইডের কাজ করছি না—ছিলাম, নর্থ বেঙ্গলে; স্মাগলার আর গোর্খাল্যান্ড সামলাতে সামলাতেই...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।

—আমি কি আপনাকে পিক-আপ্‌ করে নেব?

—না। তাহলে লালবাজার থেকে তোমাকে উল্টোমুখো অনেকটা আসতে হবে। তুমি সোজা অকুস্থলে চলে যাও। আমি কৌশিককে নিয়ে এখনি আসছি। তুমি অ্যাড্রেসটা বলো শুধু—

নিখিল ঠিকানাটা জানায়। লবণ হ্রদের করুণাময়ী এলাকায় আট নম্বর জলের ট্যাঙ্কের কাছে। বলে, ঐ ওভারহেড ইন্‌জে-ট্যাঙ্ক থেকে পুব দিকে একটা রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে গেলে একটা রিক্‌শ স্ট্যান্ড পাবেন। তার আগে একটা দোতলা বাড়ি দেখবেন। নম্বর খুঁজতে হবে না। কারণ আপনি ওখানে পৌঁছানোর আগেই পুলিশের গাড়ি পৌঁছে যাবে। কৌতূহলী জনতাই আপনাদের পথ বাৎলে দেবে। আমি এখনই রওনা হচ্ছি।

বাসু-সাহেব টেলিফোনটা ক্র্যাডেলে রেখে এদিকে ফিরলেন। কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, ধড়াচুড়ো পরে নাও। গাড়িটা গ্যারেজ থেকে বার কর।

কৌশিক বলে, কেন মামু? আপনারা দুজন রাস্তায় বসে যখন 'হাপু' গাইবেন তখন কি আমাকে তবলায় ঠেকা দিতে হবে?

বাসু ধমকে ওঠেন, জ্যাঠামো কর না।

রানী জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি দুপুরে বাড়িতে খাবে?

বাসু চলতে শুরু করেছিলেন। থমকে থেমে গিয়ে বলেন, কেমন করে বলব বল, রানু? কতক্ষণ লাগবে তা কি জানি? যেটুকু তথ্য জানা গেছে তা : কাল বোমা-পটকার আওয়াজের সুবাদে কেউ কাউকে গুলি করে মেরেছে। যে মারা গেছে সে জোয়ান না বুড়ো, পুরুষ কি স্ত্রীলোক তাও তো এখনো জানি না।

—তার মানে তোমরা দুজন বাইরে খাচ্ছ?

—তার মানে যদি তাই হয়, তো—তাই।

—অন্তত বিকাল পাঁচটার মধ্যে ফিরে এস। সন্ধ্যে সাড়ে-ছয়টায় ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কৌশিকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

—কেন? কৌশিকের আবার কী হয়েছে?

রানী দেবী জবাব দিলেন না। পূর্ণ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাসু-সাহেব তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হয়ে বলেন, ও আয়াম সরি! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ডাক্তারবাবু, মানে... ইয়ে... 'গাইনো'। আজ সুজাতার উইক্‌লি চেকিং-এর দিন।

বাসু-সাহেবের ভুল তো হতেই পারে। সাংসারিক বিষয়ে তিনি চিরদিনই এলোভুলো। কাহিনীকার হিসাবে আমারই তো একটা মারাত্মক ত্রুটি হয়ে গেছে। আপনাদের আগেভাগে

জানানো হয়নি। *'ড্রেস-রিহার্সালের কাঁটা'* সমূলে উৎপাটনের পর, সকল কাঁটা ধন্য করে এ পরিবারে একটি গোলাপকুঁড়ি ফুটবার উপক্রম করছে। গাইনো যে সম্ভাব্য তারিখ বাৎলেছেন সেই সুদিনের জন্য আর হপ্তা-খানেক মাত্র অপেক্ষা করতে হবে।

এইখানে কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। যাতে গল্পের ধরতাইটা আপনারা ধরতে পারেন। তাই বা কেন, এ ব্যাখ্যা তো এই গল্পের নামকরণের পক্ষে আবশ্যিক। যাঁরা *'ড্রেস-হিহার্সালের কাঁটা'* ইতিপূর্বে পাঠ করেননি তাঁদের জন্য পূর্ববর্তী কাহিনীর কিছু পূর্বকথন শোনানো গেল।

'ড্রেস-রিহার্সালের কাঁটা' কাহিনীতে বাসু-সাহেব একসময় বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। পুলিশ তখনো কাউকে অ্যারেস্ট করেনি, ফলে বাসু-সাহেবের কোনো ক্লায়েন্ট নেই। কিন্তু যে নির্বিরোধী পাদরী এবং বিশ্ববন্ধু ডাক্তারবাবু গল্পের প্রথম দিকে খুন হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের বন্ধুত্বের ঋণ শোধ করতেই যেন 'সু-মটো' তদন্ত শুধু করেছিলেন ব্যারিস্টার-সাহেব। সম্ভাব্য চার পাঁচজন অপরাধীর মধ্যে ইন্দ্রকুমার জানিয়েছিল মৃত্যুর সময় সে ছিল ঘটনাস্থল থেকে অনেকটা দূরে : গালুডিতে, মানে ঘাটশিলায়, 'সুবর্ণরেখা' হোটেলে। বাসু সেই 'অ্যালেবাই'টা যাচাই করতে সুজাতা আর কৌশিককে গালুডিতে পাঠিয়ে দিলেন, দু'দিনের জন্য। কৌশিক বলেছিল, 'আপনিও চলনু না, মামু।' বাসু রাজি হননি। রানুকে নিউ আলিপুরে একা রেখে তিনজনের ঘাটশিলা যাওয়া সম্ভবপর নয়। সে-কথা অবশ্য মুখে বললেন না। বললেন, তোমরা প্রাথমিক তদন্তটা সেরে এস তো। তারপর দরকার হলে আমি না হয় আবার একাই যাব।

কৌশিক ও সুজাতা যুগলে ঘাটশিলা রওনা হয়ে যাবার পরদিন সকালে প্রাতরাশে বসেছেন বুড়োবুড়ি। পট থেকে কফি ঢালতে ঢালতে রানু বললেন, একদিক থেকে ওদের দুজনকে গালুডি পাঠানোটা ভালোই হয়েছে।

বাসু নির্মাখন টোস্টে কামড় দিতে দিতে বললেন, কোন দিক থেকে?

—তোমার পাল্লায় পড়ে ওরা দুটি তো গোল্লায় গেছে। দিবারাত্র শুধু খুনজখম, তদন্ত-মদন্ত নিয়ে মেতে আছে। রাতদিন কর্তাগিন্নি শুধু চোর-পুলিশ খেলছে। ওরা দুজন বোধহয় এতদিনে ভুলেই গেছে যে, ওদের সম্পর্কটা শুধু 'সুকৌশলী'-র পার্টনার হিসাবেই শেষ হয়ে যায় না : ওরা দুজন স্বামী-স্ত্রী। যাক্ দুদিন ঘাটশিলায় ফুর্তি করে আসুক।

বাসু হাসলেন। বলেন : তা ঠিক!

—না, শুধু হাসলে হবে না। তুমি একটা জিনিস হিসাব করে দেখেছ? ওদের এত বছর বিয়ে হয়েছে, অথচ আজও বাচ্চা-টাচ্চা হয়নি! কেন? বাচ্চা হয় না কেন? আপত্তিটা কার? কিসের?

বাসু আমতা-আমতা করে বলেন কী আশ্চর্য! তা, আমি কেমন করে জানব?

রানী চটে ওঠেন, বটেই তো! তুমি কেমন করে জানবে? সন্তান না হবার অপরাধে ওদের যখন পুলিশে ধরছে না, তখন তুমি তো নির্লিপ্ত! তুমি জান না, আমি জানি!

—কী জান?

—ওদের দুজনের মধ্যে কারও কোনও শারীরিক ত্রুটি নেই। সুজাতা আমার কাছে স্বীকার করেছে। ওদের সন্তান হচ্ছে না—কারণ ওরা সেটা চাইছে না। তাহলে ওদের 'সুকৌশলী'-র কাজে ক্ষতি হবে।

র-কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বাসু সংক্ষেপে বলেন : আই সী!

রানী খেঁকিয়ে ওঠেন, য়ু সী নাথিং! কিছুই দেখতে পাও না তুমি। কারণ, তুমি ছুঁচোর মতো

অন্ধ! কী দেখবে তুমি? দেখবার চোখ তোমার আছে? চোর-পুলিশ খেলার বাইরে যে দুনিয়াটা আছে তা কখনো চোখ তুলে দেখেছ? সুজাতার বয়স কত হলো বল তো? এর পর 'ফার্স্ট কনসাইনমেন্ট' যে বিপদজনক তা কি তুমি জান না? ওদের এখনি একটা সন্তান হওয়া উচিত। ছেলে অথবা মেয়ে। এ সংসারে একটা চুন্নিমুন্নি বাচ্চা এলে সকলের জীবন—বিশেষ করে আমার এই বন্ধ্যা-জীবন—কেমন আনন্দঘন হয়ে উঠবে তা তুমি কোনোদিন ভেবে দেখেছ?

বাসু রীতিমতো বিব্রত হয়ে বলেছিলেন, কী আশ্চর্য! তা এ বিষয়ে আমি কী করতে পারি, বল?

—তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া! ওদের ফুলশয্যার রাত ভোর হলো-কি-হলো না তুমি ওদের কাঁটা দিয়ে খোঁচাতে শুরু করলে! তারপর থেকে ক্রমাগত কাঁটার পাহাড় বানিয়ে চলেছ। কাঁটার পরে কাঁটা! একটা কাঁটা শেষ হতে-না-হতেই : আবার কাঁটা! কোনো বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই—শুধু কাঁটা আর কাঁটা! ডাইনে কাঁটা, বাঁয়ে কাঁটা, হেঁটোয় কাঁটা, মুড়োয় কাঁটা! বলি, সকল কাঁটা ধন্য করে গোলাপ-ফুলটা কি ফুটবার সুয়োগ পাচ্ছে?

বাসু তাঁর ফাঁকা-হয়ে-আসা পাকাচুলে আঙুল বুলিয়ে কী একটা কথা জবাবে বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বেজে উঠল টেলিফোনটা।

রানু বললেন, ঐ শুরু হয়ে গেল! স্বামী-স্ত্রীতে মন খুলে দুটো সংসারের কথা বলার সুযোগ নেই। তার মাঝখানে শুরু হয়ে গেল খোঁচানি : 'টেলিফোনের কাঁটা'!

দিন-তিনেক পরে ঘাটশিলা থেকে ওরা যুগলে ফিরে এল। সুজাতা আর কৌশিক। হাওড়া থেকে ট্যাক্সি নিয়ে যখন নিউ আলিপুরের বাড়িতে এসে পৌঁছালো তখন পাড়া সুনসান। রাত সাড়ে দশ। কলবেল বাজাতে, ম্যাজিক-আই দিয়ে ভালো করে দেখে নিয়ে বিশে সদর দরজা খুলে দিল।

কৌশিক জানতে চায়, কি রে বিশে? মামা-মামী শুয়ে পড়েছেন?

—না তো। ঘরে বসে গপ্পোসপ্পো করছেন। সাহেব আজ সেইটা বার করেছেন!

হাতের মুদ্রায় শ্যিভাস-রিগ্যালের বোতলটা দেখায়।

সুজাতা জানতে চায়, তুই খেয়ে নিয়েছিস?

—না। এবার খাব। আপনেরা?

—আমরা রাতে খাবো না। ট্রেনেই খেয়ে নিয়েছি। মামিমা জিজ্ঞেস করলে বলে দিস্।

ঠিক তখনই করিডোরের ও-প্রান্তে একটা সুইচ কেউ জ্বালল। হুইল-চেয়ারে পাক মেরে রানু এগিয়ে আসেন। বলেন, এই তো! এসে গেছ তোমরা। রাতের খাবার ফ্রিজে রাখা আছে। বিশে শুধু গরম করে দেবে।

কৌশিক বলে, না, মামিমা, হোটেল থেকে প্যাকেট নিয়েছিলাম। আমরা ট্রেনেই রাতের খাবার সেরে নিয়েছি। ফ্রিজে যা রাখা আছে তা কাল সকালে সদ্ব্যবহার করা যাবে। মামু কি শুয়ে পড়েছেন?

রানু বললেন, না! তাঁর এখন থার্ড পেগ চলছে। একটু আগে উনি আমাকে বলছিলেন—খুনীটা কে তা উনি জানেন কিন্তু পুলিশকে জানাতে পারছেন না।

সুজাতা জানতে চায় : কেন?

—কারণ ওঁর বিশ্বাস : গিল্টি-ভার্ডিক্ট হবার মতো এভিডেন্স উনি এখনো যোগাড় করতে পারেননি। উনি পুলিশকে জানালেই লোকটা 'অ্যারেস্টেড' হবে। সে সজাগ হয়ে যাবে!

কৌশিক বলে, লোকটা কে তা বলেছেন? আই মীন, উনি কাকে সন্দেহ করছেন?

—সন্দেহ নয়, কৌশিক, উনি বলছেন যে, লোকটাকে নির্ভুল ভাবে সনাক্ত করেছেন। যাহোক তোমরা গিয়ে ঘাটশিলা-তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টটা দাখিল কর; দেখি, সেই মওকায় হাতসাফাই করে বোতলটা সরিয়ে ফেলতে পারি কি না।

তিনজনে এগিয়ে আসেন বাসু-সাহেবের ঘরে। সে-ঘরে স্তিমিত একটা সবুজ আলো জ্বলছে। উনি একটা ইজিচেয়ারে লম্ববান। পাশে টি-পয়তে গ্লাস-বোতল-স্ন্যাক্‌স্-জল, আইস কিউব।

সুজাতা-কৌশিক এদিক থেকে প্রাচীন ভারতীয় শালীনতা মেনে চলে। মাত্র দু'দিনের ভ্রমণান্তে ফিরে এসে দুজনেই বাসু-সাহেবকে প্রণাম করল। মামীকেও।

বাসু সোজা হয়ে সোৎসাহে উঠে বললেন : অ্যাই যে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ সুকৌশলী! গুড-ঈভনিং! আপনারা দুজন যে নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছেন এতেই আমরা কৃতার্থ।

বোঝা গেল, সাড়ে তিন পেগেই বাসু-মামুর নেশাটা জমজমাট!

রানু ইতিমধ্যে কায়দা করে হুইল-চেয়ারটা টি-পয়ের ওপাশে নিয়ে গেছেন। বোতলটাও দখল করেছেন। বলেন, ওদের কাছ থেকে প্রাথমিক রিপোর্টটা এবার শুনে নাও। বিস্তারিত কাল সকালে শুনো বরং!

বাসু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তা না হয় শুনব। কিন্তু...তুমি...মানে, ইয়ে...ওটা নিয়ে যাচ্ছে কেন?

রানু বোতলটা সুজাতাকে হস্তান্তরিত করে বলেন, তোমার বরাদ্দ মতো দু'পেগ খতম করে একটা এক্সট্রা পেগও ঢালা হয়ে গেছে। আর নয়।

প্রসঙ্গটা চাপা দিতে কৌশিক বলে ওঠে, আমাদের মিশন সাকসেস্‌ফুল! বুঝলেন মামু?

বাসু ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়ে বলেন, রীয়েলি? কী মিশন নিয়ে তোমরা ঘাটশিলা গেস্‌লে, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ সুকৌশলী?

—বাঃ! আপনার মনে নেই? ঘোষাল-হত্যা মামলায় চার-চারজন সম্ভাব্য অপরাধীর কথা আপনি ভাবছিলেন—ব্রজবাবু, ইন্দ্রকুমার, অ্যাগি আর ডক্টর দাশ। তাই আপনি আমাদের দুজনকে ঘাটশিলায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ইন্দ্রকুমারের 'অ্যালেবাই'টা যাচাই করে দেখতে। দ্যাট চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজড। ইন্দ্রকুমার ইজ অ্যাকুইটেড। মানে, ঐ চারটি সম্ভাব্য কাঁটার ভিতর থেকে তাকে সমূলে উৎপাটিত...

—কী? কী? কী বললে? কিসের থেকে?

—সম্ভাব্য কন্টক! কাঁটা—

কোথাও কিছু নেই, ব্যারিস্টার-সাহেব একেবারে দুর্বাসা মুনি : তোমরা কি আমাকে একটুও শান্তিতে থাকতে দেবে না, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ সুকৌশলী? মধ্যরাত্রে একা বসে মৌজ করছি, সেখানেও তোমরা হাঁউ মাঁউ খাঁউ রাক্ষসের মতো তাড়া করে এসেছ 'কাঁটা-কাঁটা' করতে করতে? কী পেয়েছ তোমরা? শুধু কাঁটা আর কাঁটা? একটা শেষ হতে না হতেই আর একটা কাঁটা! হেঁটোয় কাঁটা—মুড়োয় কাঁটা! তাহলে সকল কাঁটা ধন্য করে জোলাপটা কখন ফুটবে? অ্যাঁ? আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ সুকৌশলী?

রানু কৌশিকের আস্তিন ধরে টানলেন। ওদের ইঙ্গিত করলেন কেটে পড়তে। তাই পড়ল ওরা। নিঃশব্দে। পা টিপে টিপে। বাসু ক্লান্ত হয়ে আবার ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েছেন। তাঁর চোখ দুটি বোঁজা। অস্ফুটে শুধু বলে চলেছেন : দিস্ ইজ ডিজ্‌গাস্টিং! হেঁটোয় কাঁটা, মুড়োয় কাঁটা, সামনে কাঁটা, পিছনে...

সুজাতা ফিস্ ফিস্ করে রানুর কাছে জানতে চায়, মামা কি আজ একেবারে আউট? জোলাপের কথা কী যেন বললেন?

রানু হাসলেন। বলেন : উনি না হয় তিন পেগের পর মুখ ফস্‌কে কথাটা বলে ফেলেছেন। কিন্তু তোমরা দুজন তো মদ্যপান করনি। বুঝতে পার না—উনি 'জোলাপে'র কথা বলছেন না আদৌ। বলছেন : গোলাপের কথা।

সুজাতা অবাক হয়ে বলে : গোলাপ! মানে?

রানু বলেছিলেন, গোলাপ একটা ফুলের নাম, সুজাতা। তুমি সে-কথা অনভ্যাসে বেমালুম ভুলে গেছ! একটু চেষ্টা করে দেখ, মনে পড়ে যাবে! এখন যাও, শুয়ে পড়।

—কিন্তু মামু যে...

—ভবের ভ্রূকুটির ভাবনাটা ভবানীকেই ভাবতে দাও, সুজাতা। তোমরা দুজন বরং ভেবে দেখ হঠাৎ গোলাপের কথাটা উনি তোমাদের শুনিয়ে দিলেন কেন? 'কাঁটা' নয়, 'গোলাপ'!

এ ঘটনা প্রায় বছর-খানেক আগেকার। ইতিমধ্যে ঘোষাল-হত্যা মামলার জট খুলেছে। সেসব কথা বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে *ড্রেস-রিহার্সালের কাঁটায়*। তারপর আরও এটা কণ্টক উৎপাটন করতে হয়েছে বাসু-সাহেবকে। একেবারে একা হাতে। না সুজাতা, না কৌশিক কেউই ওঁকে সেবার সাহায্য করতে পারেনি। সে ঘটনা বেলডাঙার কাছাকাছি মোহনপুর গ্রামে, মুর্শিদাবাদ জেলায় : *দর্পণে প্রতিবিম্বিত কাঁটা*।

এবারও বাসু-সাহেবকে একা-একাই লড়তে হচ্ছে। সুজাতা যেকোনো দিন নার্সিংহোমে ভর্তি হতে পারে। আর রানু দেবীর কড়া নির্দেশ কৌশিককে কলকাতার বাইরে পাঠানো চলবে না। কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যে কৌশিকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। আর সুজাতা শুধু সামনের লন-এ পায়চারি করতে পারে। রানুর নজরবন্দি অবস্থায়।

ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস ধরে ড্রাইভ করতে করতে কৌশিক পার হলো সায়েন্স সিটি, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। ক্রমে লবণহ্রদ নবনগরীতে প্রবেশ করে ওঁরা সোজা চলে এলেন আট নম্বর জলের ওভারহেড ট্যাঙ্কে। সেখানে থেকে ডান দিকে মোড় নিয়ে কিছুটা অগ্রসর হতেই অকুস্থলে পৌঁছে গেল কৌশিক। একটা দোতলা বাড়ির সামনে কৌতূহলী মানুষের জটলা। রাস্তার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ-ভ্যান। এদিকটা খুব ঘনবসতি নয়। ফাঁকা প্লটে একটা বস্তি মতো গড়ে উঠেছে। তা থেকে বহু মানুষ এসে ভিড় করেছে দোতলা বাড়ির সামনে। তবে পুলিশ তাদের বেশ কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছে। বাড়ির খুব কাছাকাছি ঘেঁষতে দেয়নি।

পুলিশ-ভ্যানের পশ্চাৎভাগে পার্কিঙের সৌভাগ্য লাভ করায় কৌশিক তার গাড়িটা 'লক্' করার কোনও প্রয়োজন বোধ করল না। শুধু ইগ্‌নিশন থেকে চাবিটা খুলে নিয়ে হিপ-পকেটে রাখল। দুজনে বাড়ির দিকে অগ্রসর হতেই নিখিল বিপরীত দিকে থেকে এগিয়ে এল। রাস্তায় কেউ কোনো কথা বললেন না। নিখিলের নেতৃত্বে বাসু-সাহেব আর কৌশিক সদর দরজা অতিক্রম করলেন। নিখিল দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল। সদর দরজায় ইয়েল-লক।

বাড়িতে ঢুকতেই একটা বড় হল-কামরা। সামনের দিকে বৈঠকখানা বা ড্রইং-রুমের আকারে সোফা-সেট দিয়ে সাজানো। একটা সেন্টার-টেবিল। এক দিকে স্ট্যান্ডের উপর টি.ভি.। পাশে একটা লোহার আলমারি। বিপরীত দিকে কাচের আলমারিতে বই ও শৌখিন

'কিউরিও' সাজানো। ওদিকে কাশ্মীরি জাফ্‌রিকাটা কাঠের পার্টিশন দেওয়াল। তার ও-পাশে চারজনের উপযুক্ত ছোট ডাইনিং টেবিল ও চেয়ার। হল-কামরার ডান দিক দিয়ে কাঠের রেলিং সমন্বিত সিঁড়ি দ্বিতলে উঠে গেছে। সিঁড়ির তলাটাও সুদৃশ্য কাঠের প্যানেলিং করা। তাতে একটা ছোট্ট একপাল্লার দরজা। কাচের শার্শি পাল্লা। কিন্তু কাচের উপর কালো কাগজ আঠা দিয়ে সাঁটা। মনে হয় গুদাম ঘরটা নীরন্ধ্র অন্ধকার। মোজেইক মেঝে, 'সেম'-পেন্টিং করা দেওয়াল।

ওঁরা ভিতরে আসতে ড্রইংরুমের গদি-ঠাশা সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো বছর পঁয়ত্রিশের একজন সুপুরুষ পুলিশ সাব্‌-ইন্সপেক্টার। লোকাল থানার।

নিখিল বলে, বল, অনিমেষ, এ পর্যন্ত যেটুকু জেনেছ—

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, রসো! তার আগে আমরা গুছিয়ে বসি। তুমিও বস, অনিমেষ। আমাকে চেন তো?

অনিমেষ বললে, পুলিশে চাকরি করছি আজ সাত বছর। ফলে শুধু আপনাকে নয় স্যার, কৌশিকবাবুকেও বিলক্ষণ চিনি।

—ঠিক আছে। এবার শুরু কর।

সবাই বসলেন। অনিমেষ সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দিল :

প্রয়াতার নাম রীতা বিদ্যার্থী। অবাঙালী। বয়স আন্দাজ ছাব্বিশ-সাতাশ। এই বাড়িরই বাসিন্দা। বাড়ির মালকিন শকুন্তলা রায়ের বান্ধবী। এ বাড়ির নির্মাতা শকুন্তলার পিতৃদেব। তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর প্রয়াণের পর বর্তমানে গোটা বাড়িটাই শকুন্তলা ভোগ করে, যদিও অর্ধেক মালিকানা তার দাদার। সে আছে মার্কিন মুলুকে, সপরিবারে। রীতা ভাড়াটে হিসাবে থাকত অথবা বন্ধবী হিসাবে, কিংবা পেইং গেস্ট হিসাবে, সেই স্থূল প্রশ্নটা এখানো জানা হয়নি অনিমেষের। তবে এটুকু জেনেছে যে, ওরা দুজনে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল। দুজনের একই বয়স। শকুন্তলা গত পর্শুদিন তাঁর মাসিমার বাড়ি গিয়েছিলেন সপ্তাহান্তে। ভদ্রেশ্বরে। কালবাতি লেন-এ! সে বাড়িতে কালীপূজা হয়। আজ সকালে—মূর্তি বিসর্জন না হওয়া সত্ত্বেও তিনি ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। রীতা সপ্তাহান্তটা একাই ছিলেন এ বাড়িতে। শকুন্তলা ফিরে আসেন আজ সকালে। সদর দরজায় ইয়েল-লক লাগানো। তার দুটো চাবি। এক-একটা এক-একজনের কাছে থাকত। ফলে মিস্‌ শকুন্তলা কল-বেল বাজাননি। চাবি খুলে ভিতরে আসেন। একতলায় তিনি কাউকে দেখতে পাননি। একজন কাজের লোক সচরাচর বেলা নয়টা নাগদ আসে। সে-ই রান্না করে, বাসন ধোয়, ঘর মোছে। শকুন্তলা তাকে একতলায় দেখতে পাননি, যদিও তখন বেলা দশটার কাছাকাছি। নিচে কাউকে দেখতে না পেয়ে শকুন্তলা সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে উঠে যান। দেখেন, রীতার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বেশ কয়েকবার জোরে জোরে ধাক্কা দিয়েও শকুন্তলা তাঁর বান্ধবীর সাড়া পাননি। এত বেলা পর্যন্ত সচরাচর সে ঘুমায় না। তাছাড়া ওঁদের দু'জনের মধ্যে একটা অলিখিত বোঝা-পড়া আছে—কেউ যদি বাড়ি তালাবন্ধ করে বার হয়ে যায় তাহলে সিঁড়ির লাগোয়া স্টিল আলমারির পাল্লায় 'ম্যাগনেট-নব'-এ চাপা দিয়ে একটা চিরকুট রেখে যায়—কখন ফিরবে, বা কোথায় যাচ্ছে জানিয়ে। শকুন্তল দেখলেন আলমারির গায়ে কোনও চিঠি চুম্বকী-বেতামে আটকানো নেই। উনি অত্যন্ত ভয় পেয়ে যান। ওঁদের বাড়িতে একটাই ফোন—একতলার ড্রইংরুমে। উনি নেমে এসে স্থানীয় থানায় টেলিফোন করে সাহায্য প্রার্থনা করেন। লোকাল থানা ফোনটা পায় দশটা বেয়াল্লিশে। থানা কাছেই। মিনিট পনেরর মধ্যে থানা থেকে পুলিশ এসে যায়। দরজাটা তারাই ভাঙে। বস্তুত অনিমেষ নিজেই তা ভাঙে দুজন কন্সটেবল-এর সাহায্যে।

রীতা বিদ্যার্থী পড়েছিল মেঝেতে। জমাট-বাঁধা রক্তের গালিচায়। মাথায় গান-শট উন্ড। তার হাতে ধরা আছে পয়েন্ট টু-টু বোরের একটা অটোমেটিক পিস্তল। জানলার পাল্লা ভিতর থেকে ছিট্‌কিনি বন্ধ ছিল। দরজাটা তালাবন্ধ ছিল। ফলে আপাতদৃষ্টিতে কেসটা আত্মহত্যা মনে হলেও অনিমেষ মৃতদেহকে কোনো রকম নড়াচাড়া না করে সোজা হোমিসাইডকে খবর দিয়েছিল।

নিখিল জানতে চায়, প্রথমত বল, তুমি এটাকে হোমিসাইড কেস বলে ভাবলে কেন? দরজা-জানলা ভিতর থেকে বন্ধ। এক্ষেত্রে আত্মহত্যা নয় কেন?

—কোনও 'সুইসাইডাল নোট' আমরা খুঁজে পাইনি।

—বুঝলাম। আর কিছু?

—লক্ষ্য করে দেখুন, স্যার, দরজায় যে গা-তালা তা 'ইয়েল-লক' নয়। অর্থাৎ ঠেলে বন্ধ করলেই লক করা যায় না। চাবি ঘুরিয়ে তালাবন্ধ করতে হয়। রীতা দেবী যদি তাই করে থাকেন, তাহলে চাবিটা গেল কোথায়?

—তোমরা খুঁজে পাওনি?

—না, স্যার। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও চাবিটা ঘরের ভিতর পাইনি।

নিখিল মাথা নিচু করে কী যেন ভেবে নিল। তারপর জানতে চাইল, শখুন্তলা দেবী কোথায়?

—নিচে যে ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুম আছে তার পাশেই ওঁর শয়নকক্ষ। উনি সেই ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। খুবই ভেঙে পড়েছেন তিনি। তাঁকে খবর দেব?

নিখিল বাসু-সাহেবের দিকে তাকায়। তিনি বলেন, চল, আগে হতভাগিনীটাকে স্বচক্ষে দেখি। তারপর শকুন্তলার সঙ্গে কথা হবে। তাকে বরং একটু সামলে নেবার সময় দাও।

ওঁরা চারজনে সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে উঠে এলেন। সিঁড়ির চাতাল অতিক্রম করে একটা বড় বেডরুম। দরজাটা খোলাই আছে। এটা রীতা বিদ্যার্থীর শয়নকক্ষ। সেটার দিকে এগিয়ে যেতে ঘরে উপস্থিত একজন সৌম্যদর্শন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক আহ্বান জানালেন, আসুন, দাশসাহেব।

তারপর বাসু-সাহেবকে দেখে বলে ওঠেন, আরে! ব্যারিস্টার-সাহেব যে! আপনি এত সকাল-সকাল? 'হোমিসাইড' কেসটা নিতে না-নিতেই আপনার মক্কেল জুটে গেল?

বাসু বললেন, না হে, না। কোনো মক্কেলের তরফে আসিনি। এটা হোমিসাইড কেস না আত্মহত্যা তাই তো এখনো স্থির হয়নি। আমাকে নিখিল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। এ কেসে আমি এখানে নিখিলের অ্যাসিস্টেন্ট—

নিখিল বাধা দিয়ে বললে, ওকথা বলবেন না, স্যার! আপনি আমার গার্জেন হিসেবে এসেছেন। ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড!

বাস্তবে ঘরের ভিতর যিনি বসেছিলেন তিনি পুলিশ বিভাগের অটোপ্সি সার্জেন, ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ সান্যাল। তাঁর এখানে আসার কথা নয়। মৃতদেহ তিনি সচরাচর দেখতে পান শবব্যবচ্ছেদাগারে। তবে ডক্টর সান্যালের বাড়ি সল্ট লেকে, কাছেই। অনিমেষ তাঁকে ফোনে খবর দেয়। তাই উনি এত সকালে এসেছেন।

আগন্তুক চারজনেরই দৃষ্টি পড়ল ভূলুণ্ঠিতার উপর। হ্যাঁ, অনিমেষের আন্দাজ ঠিকই। মেয়েটি ত্রিশের নিচে। অত্যন্ত সুন্দরী। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মাথায় সোনালী চুল, পরনে সালোয়ার-কামিজ। হঠাৎ দেখলে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলে মনে হয়। মৃতদেহের ডানহাতে ধরা আছে ছোট্ট পিস্তলটা। বেশ বোঝা যায়, গুলিবিদ্ধ হবার সময় সে বসেছিল একটা সোফায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। তার দোপাট্টার অনেকটা এখনো সোফার উপর

নেতিয়ে আছে। মেয়েটির বাঁ-কানের উপর একটা গভীর ক্ষত। নিঃসন্দেহে বুলেট-উন্ড। তা থেকে একটা রক্তের ধারা ওর গাল বেয়ে কামিজে নেমে এসেছে।

নিখিল ডক্টর সান্যালের দিকে ফিরে বললে, সুইসাইড?

ডক্টর সান্যালের ভ্রূকুঞ্চন হলো। বললেন, আইনত কাটাছেঁড়ার আগে আমার কথা বলা মানা। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি অটোপ্সি সার্জেন হিসাবে আসিনি। এসেছি প্রতিবেশী হিসাবে। অনিমেষ ঘোষ ডেকে পাঠিয়েছিল বলে। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি : 'ডালমে কুছ্ কালা হ্যায়!'

নিখিল প্রশ্ন করে, কী জাতের গোলমাল?

ডঃ সান্যাল বললেন, পোজিশন ঠিকই আছে। ওই সোফাটায় বসে মাথার বাঁ-দিকে গুলি লাগলে এভাবেই মেজেতে পড়ে যাবার কথা। দরজা ভিতর থেকে 'লক্' করা ছিল। সব কটা জানলাও বন্ধ ছিল, ছিটকানি লাগানো, এখন যেমন আছে।

—তাহলে ডালমে 'কালা'টা কোথায় দেখলেন?

দুদিকে মাথা নেড়ে সান্যাল বলেন, পিস্তলের গ্রিপ্‌টা ভালো করে দেখুন। আমি ডেডবডিকে স্পর্শ করিনি। সুধাকর যতক্ষণ না আসছে, যতক্ষণ ফটো তোলা না হচ্ছে ততক্ষণ ছোঁয়াছুঁয়ি করা ঠিক নয়। তাছাড়া নন্দী এসে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিক্...

মৃতদেহের পাশে উবু হয়ে বসে নিখিল বলল, কারেক্ট। দেখে মনে হচ্ছে পিস্তলটা ওর হাতে রাখা আছে। যেন ধরা ছিল ওর মৃত্যু মুহূর্তে; কিন্তু আসলে তা নয়। পিস্তলটা কেউ ওর মুঠিতে গুঁজে দিয়েছে...

ডাক্তার সান্যাল বলেন, কারেক্ট! পিস্তলটা ওর হাতে আছে, 'গ্রিপ্'-এ নেই!

নিখিল হঠাৎ বলে ওঠে, আরও একটা অসঙ্গতি : দক্ষিণ হস্ত এবং বাম কর্ণ!

বাসু-সাহেব ইতিমধ্যে গোটা ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করেছেন। ঘরে আসবাব বেশি নেই। একটা সেন্টার-টেবিল, খান তিনেক চেয়ার। পিছনে একটা স্টিল-আলমারি। এ ছাড়া যেটা নজরে পড়ে তা হলো একটা লেখার টেবিল। ঝকঝকে পালিশ-করা মেহগনি কাঠের। এমন জিনিস আজকাল শুধু অক্শান মার্কেটে পাওয়া যায়। টেবিলের উপরটা মোটা প্লেট-গ্লাসে চাপা দেওয়া। কাচের নিচে অনেক সুন্দর-সুন্দর ফটোগ্রাফ। অধিকাংশই প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিছু আছে মানুষের। দু'একটি ঐ মৃতা মেয়েটির। প্রতিটি ফটোই অতি নিখুঁত। ভাল ক্যামেরা-পার্সেন-এর হাতের কাজ। দেওয়ালেও অনেকগুলি এনলার্জড ফটোগ্রাফ। ফ্রেমে বাঁধানো। অথবা লামিনেট করা। গৃহস্বামিনীর রুচি অনুসারে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। মান্ধাতা আমলের মেহগনি কাঠের টেবিল, তার গামছা-মোড় পায়া, টেবিলের উপর প্লেট-গ্লাসের আচ্ছাদন। আবার তার উপর একটা প্রাচীন যুগের ব্লটিং-পেপার হোল্ডার। সবুজ রঙের রেক্সিনের পাড় দিয়ে বাঁধান। ব্লটিং-পেপারটা ধপধপে সাদা, নিদাগ! তার ডানদিকে সেকালের মানানসই কাট্‌গ্লাসের দোয়াত ও খাগের কলম। এ দুটি ব্যবহারের জন্য নয়। শোভাবর্ধনকারী। শৌখিন বস্তু। টেবিলের বাঁদিকে আধুনিক পেন-হোল্ডারে একটি পাইলট কলম। তার পাশে একটি স্ট্যান্ডিং ক্যালেন্ডার। দৈনিক তারিখ বদলাতে হয় তাতে। তারিখটা গতকালকার। বাসু সব কিছু খুঁটিয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ নিচু হয়ে তিনি কী একটা জিনিস কুড়িয়ে নিলেন। পকেটে রাখলেন।

নিখিল নজর করেছিল, এগিয়ে এসে বললে, কী ওটা?

বাসু পকেট থেকে বার করে দেখালেন। ঝিনুকের কাফ-লিংক-এর একটা ভাঙা টুকরো!

নিখিল বলে, এ তো পুরুষ মানুষের কাফ-লিংক। এ ঘরে?

—রীতার বন্ধুরা হয়তো এঘরে আসে। দেখ না, সেন্টার টেবিলে অ্যাশট্রেতে একটা চুরুটের স্টাম্প। রীতা সিগ্রেট হয়তো খেত। কিন্তু চুরুট খেত না নিশ্চয়?

নিখিল এগিয়ে এসে চুরুটটা তুলে নিয়ে কাগজে মুড়ে পকেটে রাখল। কাফ-লিংটাও। বাসু-সাহেব ততক্ষণে টেবিলের তলায়-রাখা ওয়েস্ট-পেপার ড্রামটাকে দেখছিলেন। বেতের বোনা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট নয়। নক্শা-কাটা টিনের ব্যারেল। 'দেখছিলেন' মানে কব্জি ডুবিয়ে হাতড়াচ্ছিলেন।

অনিমেষ দূর থেকে বললে, বৃথাই খুঁজছেন, স্যার, কোনও সুইসাইডাল নোট ওটাতে নেই। আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি।

বাসু বললেন, তা নেই, কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা নিত্যি সাফা করা হয় না। কাজের মহিলাটি বেশ ফাঁকিবাজ।

নিখিল বলে, কিন্তু ওয়েস্ট-পেপার ড্রামের অর্ধেকও তো ভরে যায়নি।

—তা যায়নি; কিন্তু ওটা মাসখানেক সাফা করাও হয়নি। ছেঁড়া ভাউচার কিছু দেখলাম সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের। আরও একটা কথা : ড্রামটায় ছোঁড়া চিঠি বা লেফাফা একটাও নেই। মনে হয়, রীতা মেয়েটির বন্ধুবান্ধব বিশেষ ছিল না, থাকলেও তাদের চিঠিপত্র লেখার বাতিক ছিল না। সে যা হোক, এবার কি আমরা রীতার বান্ধবী, গৃহস্বামিনীর কাছে যাব?

নিখিল জবাব দেবার আগেই উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শুনল। হ্যাঁ, একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। ওঁরা নিচে নেচে এলেন। ঠিকই অনুমান করা গেছে। ক্যামেরা নিয়ে সুধাকর আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ওঠানোর সরঞ্জাম নিয়ে নন্দী এসে গেল।

নিখিল ওদের দুজনের জিম্মায় মৃতদেহ ও ঘরখানি রেখে দিয়ে নিচে নেমে আসবার উদ্যোগ করল। বাসু প্রশ্ন করেন, ডক্টর সান্যাল, মৃতদেহের বাঁ ভ্রূর উপর একটা প্রমিনেন্ট কাটা দাগ দেখেছেন নিশ্চয়? ওটার বয়স কত হতে পারে?

ডাক্তার সান্যাল বললেন, সেটা বলা অসম্ভব। তবে বছর খানেকের মধ্যে সে দুর্ঘটনা ঘটেনি বলে মনে হয়। আমার আন্দাজ কিশোরী বয়সে ও কোথাও পড়ে গিয়ে কপালের বাঁদিকে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল। দু-একটি স্টিচ করতেও হয়েছিল। সাম্প্রতিক এই মৃত্যুর সঙ্গে ওই কাটা দাগের কোনও সম্পর্ক নেই। চলুন।

ওঁরা নিচে নেমে এলেন। ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ বললেন, আপনারা অনুমতি দিলে আমি এবার রওনা দিতে পারি।

নিখিল বললে, বিলক্ষণ! আপনি তো এসেছেন প্রতিবেশী হিসাবে। আপনার যাওয়া-আসার জন্য কারও অনুমতি লাগবে কেন?

সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে ছিল মধ্যবয়সী একজন বিধবা স্ত্রীলোক। দেখেই বোঝা যায়, এই মহিলাটি অনিমেষ-বর্ণিত সেই কম্বাইন্ডহ্যান্ড। ওঁদের দেখে মাথায় ঘোমটা তুলে দিল, হাত তুলে সকলকে যৌথ নমস্কারও করল।

নিখিল বলে, মিস রায়কে একটু খবর দাও। আমরা এবার তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

মহিলাটি বলল, আপনেরা বৈঠকখানায় বসেন। বড়দিমনিরে খপর দিই।

ড্রইংরুমে এঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলেন। একটু পরে একতলার শয়নকক্ষ থেকে বার হয়ে এল মিস্ শকুন্তলা রায়। রীতা বিদ্যার্থীর প্রায় সমবয়সী। কিন্তু চেহারায় ও পোশাকে যেন তার বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। রীতা দীর্ঘাঙ্গী, মেদবর্জিত, অত্যন্ত ফর্সা। এ মেয়েটি পাঁচ ফুটের

সামান্য উপরে, শ্যামাঙ্গিনী, কিছুটা পৃথুলা। তবে আদৌ কুৎসিতদর্শনা নয়। রীতার সঙ্গে তুলনা না করে বলা যায়, এই বাংলাদেশের একটি শ্যামাঙ্গী সাধারণ মেয়ে। কিন্তু তার দুটি চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। যদিও এখন চোখ দুটো রক্তবর্ণের। নিঃসন্দেহে অশ্রুপাতজনিত কারণে। রীতার পরনে ছিল সালোয়ার-কামিজ, এ পরেছে ফল্‌সা-রঙের শান্তিপুরী ঘরোয়া তাঁতের শাড়ি, নীল পাড়। ওই পাড়ের রঙের ম্যাচিং ব্লাউজ। চোখে মোটা কাচের চশমা।

নিখিল নমস্কার করে অত্মপরিচয় দিল। অন্য সবাইয়ের পরিচয় উহ্য রেখে বলে ওঠে, বুঝতে পারি, বান্ধবীর এমন অকস্মাৎ মৃত্যুতে আপনি কতটা মর্মাহত। তবু আমাদের কর্তব্য তো করে যেতে হবে। আপনার কাছে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

—নিশ্চয়ই। বলুন, কী জানতে চাইছেন?

—আপনি প্রথমে বসুন, মিস্ রায়।—নিখিল নিজেও বসে। আর সকলে ইতিপূর্বেই সোফা অথবা ডিভানে বসে পড়েছেন।

নিখিল বলে, শুনলাম কাল রাত্রে আপনি ভদ্রেশ্বরে ছিলেন। আজ সকাল কটার সময় আপনি বাড়ি ফিরে আসেন?

—ঘড়ি দেখিনি। দশটা বোধহয় তখনও বাজেনি। কেষ্টার-মা তখনো আসেনি—

কাজের মহিলাটি কথার মাঝখানে বলে ওঠে, আমি তো এনু অনেক পরে গো। তখন তো দোতলার দরজা ভাঙা হয়ে গেছে...

নিখিল এপাশ ফিরে বলল, ও! তুমিই বুঝি কেষ্টার-মা? তা তুমি তোমার এজাহারটা দিয়েছ?

—এজাহার! মানে? সেডা কি?

—ঐ পুলিশ সাহেবের সঙ্গে ও ঘরে যাও। উনি যা যা জানতে চাইবেন তা জানাও। অনিমেষ...

বাকিটা বলতে হলো না। অনিমেষ বাধাদানকারী মহিলাটিকে নিয়ে দ্বিতলে উঠে গেল।

নিখিল আবার শুরু করে, মিস্ রীতা বিদ্যার্থী কত দিন ধরে আছেন এ বাড়িতে?

—প্রায় দেড় বছর। না, না,...গত পূজা থেকে—ধরুন চৌদ্দ মাস।

—ভাড়াটে? না পেয়িং গেস্ট? অথবা বান্ধবী হিসাবে?

—না, ভাড়াটে নয়। বান্ধবী হিসাবেই। একেবারে একা-একা থাকতাম তো। তবে সংসারখরচ আমরা দুজনে সমান ভাগে ভাগ করে নিতাম। বাজার, কাজের লোকের মাহিনা, ইলেকট্রিক অথবা টেলিফোনের বিল ইত্যাদি সব কিছুই। বাড়ির ট্যাক্স অবশ্য আমার।

—ওঁকে আপনি কতদিন ধরে চিনতেন?

এ প্রশ্নটার জবাব দিতে—কি জানি কেন—একটু দেরি হলো। ভেবে নিয়ে শকুন্তলা বললে, আমরা দুজনে একই স্কুলে, একই ক্লাসে পড়তাম। পাস করার পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তারপর দীর্ঘদিন পরে গতবছর সেপ্টেম্বরে একটি পূজামণ্ডপে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। রীতা সেসময় একটা মাথা গোঁজার আস্তানা খুঁজছিল। ও কিছুদিন আগে কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে। অসুবিধা সত্ত্বেও একটা ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলে থেকে চাকরি করছিল। আমিই ওকে ডেকে নিয়ে এলাম।

নিখিল কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাসু জানতে চান, কোন স্কুলে তোমরা পড়তে, মা? কলকাতায়?

শকুন্তলার স্পষ্টই ভ্রূকুঞ্চন হলো। এ-কথার জবাব না দিয়ে নিখিলকে প্রশ্ন করে, উনি কি একজন প্লেন-ড্রেস পুলিশ অফিসার?

নিখিল বলে, না। উনি মিস্টার পি. কে. বাসু, ব্যারিস্টার। আমাকে সাহায্য করতে এসেছেন।

শকুন্তলা নিখিলের দিকে ফিরেই জানতে চায়, আমরা কোন স্কুলে পড়তাম, কে কোন ডিভিশনে পাশ করেছিলাম, এসব প্রশ্ন কি রীতার এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় প্রাসঙ্গিক?

এবারও নিখিল জবাব দেবার আগে বাসু-সাহেব বলে ওঠেন, সেটা প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক এ প্রশ্ন তো পরের কথা, মা; কিন্তু পুলিশ অফিসার এখনো তোমাকে একথা জানায়নি যে, সে তোমাকেই এ খুনের মামলায় আসামী করবে না। ফলে, তুমি ওর কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নও। অর্থাৎ যতক্ষণ তোমার স্বার্থ দেখতে কোনো সলিসিটার এখানে এসে উপস্থিত না হন। ইটস্ য়োর কন্সটিট্যুশনাল রাইট!

শকুন্তলা অস্ফুটে শুধু বললে, খুন! মানে? রীতা তো সুইসাইড করেছে...

নিখিল সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, তাই আপনার ধারণা?

—তা ছাড়া কী? দরজা-জানলা ভিতর থেকে বন্ধ। ওর হাতের মুঠিতে নিজের পিস্তল...

—নিজের পিস্তল? ওর যে একটা পিস্তল ছিল, তা আপনি জানতেন?

—কেন জানব না?

—যা হোক, আপনি আজ সকালের কথা বলুন?

শকুন্তলা ধীরে ধীরে সব কথা গুছিয়ে বলল।

আজ যদিও ওর স্কুলের ছুটি তবু বাড়িতে বসে ও কিছু পরীক্ষার খাতা দেখবে বলে খুব ভোর-ভোর ট্রেন ধরে ভদ্রেশ্বর থেকে কলকাতায় চলে আসে। হাওড়া থেকে ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ও এসে সদর দরজার ইয়েল-লক্ খুলে বাড়িতে ঢোকে। একতলায় কাউকে দেখতে পায় না—না কাজের লোক, না রীতা। ও তখন সুটকেসটা সিঁড়ির নিচে রেখে দ্বিতলে উঠে যায়। রীতার ঘর ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। বহু ধাক্কাধাক্কি করেও রীতাকে জাগাতে পারেনি। ও ভয় পেয়ে যায়। নিচে নেমে এসে আলমারির গায়ে কোনও 'নোট'ও দেখতে পায় না। তখন ও পুলিশে ফোন করে।

বাসু প্রশ্ন করেন, রীতার ঘরে তো গা-তালা লাগানো দেখলাম। তোমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি ছিল না?

আবার ভ্রূকুঞ্চন হলো শকুন্তলার। বললে, ছিল। এ বাড়ির সব গা-তালার ডুপ্লিকেট চাবি আছে—কিন্তু তা রাখা আছে আমার ব্যাঙ্ক ভল্টে। আজ দেওয়ালীর ছুটি।

বাসু আবার বলেন, তা পুলিশ ডাকার আগে পাড়ার লোকজন ডেকে দরজাটা ভাঙার কথা তোমার মনে হলো না? অথবা বাইরে মই লাগিয়ে উঠে কাচের ভিতর দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখার চেষ্টা?

আবার যেন বিরক্ত হলো মেয়েটি। বললে, না। পাড়ার লোকজনের সঙ্গে আমার তেমন আন্তরিকতা নেই। আর তাছাড়া অঘটন কিছু ঘটলে প্রথমে পুলিশে খবর দেওয়াই তো উচিত।

—তার মানে তুমি তখনই বুঝতে পেরেছিলে—রীতার ঘরের ভিতর 'অঘটন' কিছু ঘটেছে?

—ন্যাচারালি। না হলে সে সাড়া দিচ্ছে না কেন?

—বেশি ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে সে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকতে পারে। সে তো জানতো না যে, তুমি আজ সকালে ফিরে আসবে দশটা নাগাদ! কী? জানত?

শকুন্তলা জবাব দিল না। চুপ করে বসেই রইল। বাসু আবার বলেন, অথবা সে হয়তো

বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে বাড়ির বাইরে কোথাও গেছে—আলমারির ম্যাগ্নেটিক নবে চিঠি লিখে যায়নি।

—সেটা আমরা কখনও করি না। বাইরে গেলেই...

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, কারেক্ট! কিন্তু, রীতা তো জানে যে, তুমি ভদ্রেশ্বরে। কালীঠাকুরের বিসর্জন দিয়ে রাত্রে ফিরবে। ও হয়তো ঘণ্টা-খানেকের জন্য বাইরে গেছে। সে ক্ষেত্রে ওর পক্ষে কোনও নোট রাখা তো অর্থহীন। এসব সম্ভাবনার কথা তোমার মনে হলো না? তুমি প্রতিবেশীদের কাউকে কিছু না জানিয়ে সোজা থানায় ফোন করে দিলে?

শকুন্তলা একবার বাসু-সাহেব একবার নিখিলেশের দিকে পর্যায়ক্রমে দেখে নিয়ে বললে, এটা কি আমার কিছু অন্যায় কাজ হয়েছে?

নিখিল তৎক্ষণাৎ বললে, নিশ্চয় নয়। আপনি একা বাড়িতে থাকেন। বিপদের সম্ভাবনা বুঝলে প্রথমেই তো পুলিশে ফোন করবেন। আপনি ঠিকই করেছেন, মিস্ রায়। সে যা হোক, রীতা দেবী কী কারণে আত্মহত্যা করতে পারেন তা আন্দাজ করতে পারেন?

—না। পারি না। আর সেটাই আমাকে খোঁচাচ্ছে। কেন, কেন, ও এভাবে...নিজের হাতে...

বাক্যটা অসমাপ্ত রেখে মেয়েটি মুখে আঁচল-চাপা দিল।

ওকে সামলে নেবার জন্য মিনিটখানেক সময় দিয়ে নিখিল প্রশ্ন করল, রীতা সম্বন্ধে আপনি কতটুকু জানেন, বলুন। ওর আত্মীয়স্বজন, বাবা-মা...

দুদিকে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে শকুন্তলা বললে, আয়াম্ এক্সট্রীমলি সরি, অফিসার! আমি সে-সব কথা কিছুই জানি না।

নিখিল বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখে তিনি পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বার করতে ব্যস্ত। নিখিল বলে, এটা কেমন করে সম্ভব, শকুন্তলা দেবী? আপনারা দুজন ক্লাস-ফ্রেন্ড, বান্ধবী..

শকুন্তলা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। বলে, লুক হিয়ার, অফিসার! আমরা দুজনে একই ক্লাসে পড়তাম বটে, কিন্তু একই সেকশানে নয়। ওর সঙ্গে আলাপ ছিল, কিন্তু ও কখনও আমাদের বাড়ি আসেনি। আমিও ওর বাড়িতে যাইনি। স্কুলজীবনে আমাদের এমনকিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়নি। গত বছর পূজামণ্ডপে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ও একটা আশ্রয় খুঁজছে, আর আমি এই নির্বান্ধব পুরীতে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমাদের দুজনেরই মনে হলো 'উই আর মেড ফর ইচ আদার'। তবে এটুকু জানি, ওর তিন কুলে কেউ নেই। এতদিনেও ও কখনো কারও কাছ থেকে চিঠিপত্র পায়নি। আইনের কথা যদি বলেন, তবে আমিই ওর নিকটতম বন্ধু হিসাবে মৃতদেহ গ্রহণ করব সৎকারের জন্য।

বাসু পাইপটা ধরিয়েছেন। সেটা মুখ থেকে সরিয়ে বলেন, সৎকার? সেটা কী জাতের, মিস্ রায়? দাহ, না কবর?

শকুন্তলা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল কিছুক্ষণ বাসু-সাহেবের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, রীতা হিন্দু। হিন্দুমতেই দাহ করব ওকে।

নিখিল প্রসঙ্গটা বদল করতে চায় : রীতা দেবীর কোনও আত্মীয়-স্বজনের কথা তো আপনি জানেন না বলছেন, ওঁর কোনও বন্ধু-বান্ধবও দেখা করতে আসত না?

—খুব কম। ওর অফিসের দু'একজন কখনো-সখনো আসতেন।

—কোন অফিস? কী কাজ করতেন উনি?

শকুন্তলা জানালো—রীতা একটি নামকরা প্রাইভেট অফিসে রিসেপশনিস্ট ছিল। সে ইংরেজি-অনার্স গ্র্যাজুয়েট। স্টেনোগ্রাফি টাইপিংও জানত।

—উনি তো আধুনিকা ছিলেন। স্যুটার বা বয়-ফ্রেন্ড জাতীয় কেউ আসত না?

এবার জবাব দিতে বেশ কিছু দেরি হলো। ভেবেচিন্তে নিয়ে শকুন্তলা বলল, আসত। ইন ফ্যাক্ট একজনের সঙ্গে ইদানীং ওর স্টেডি ডেটিং চলছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি—এই খুনের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই।

বাসু ঝপ করে বললেন, খুন? আত্মহত্যা নয়, তাহলে?

—আমি...আমি কেমন করে জানব? সে তো আপনারা বলবেন!

বাসু ঠোঁট থেকে পাইপটা সরিয়ে বললেন, ঠিক কথা মা, কিন্তু তোমার যেটুকু বলার কথা সেটুকু তো তুমি বলবে? আমাদের সাহায্য করতে? কী? যে তথ্যগুলো তুমি জান, আমরা জানি না। ওর বয়-ফ্রেন্ডের নাম-ঠিকানা। ও তোমার সঙ্গে কোন স্কুলে, কোন ক্লাসে পড়ত। ওর অর্থনৈতিক অভাব ছিল কিনা। এমন কোনো গোপন কথ্য থাকতে পারে কি না, যার জন্য ক্ষণিক উত্তেজনায় ও আত্মহত্যা করতে পারে? কিছু মনে কর না, মা, আমার মনে হচ্ছে, তুমি সব কথা খুলে বলছ না। তোমার তরফে কোনো লীগ্যাল অ্যাডভাইসার ছাড়া...

মেয়েটি নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসে। বলে, না, না! আমার কোনো লীগ্যাল অ্যাডভাইসারের প্রয়োজন নেই। আমি ওর সম্বন্ধে যেটুকু জানি তা অকপটে জানাব। আপনারা বিবেচনা করে দেখুন : এটা আত্মহত্যা না মার্ডার।

নিখিল তার পকেট থেকে নোটবইটা বার করল :

রীতা আর শকুন্তলা সহপাঠিনী ছিল সেন্ট থেরেসা স্কুলে। ব্যাঙ্গালোরে। শকুন্তলার বাবা ছিলেন ইনকামট্যাক্স কমিশনার। তখন কর্ণাটকে পোস্টেড। ওরা দুজনে ভিন্ন-ভিন্ন সেকশনে পড়ত বটে কিন্তু থাকত কাছাকাছি পাড়ায়। দুজনেই লেডিজ সাইকেলে চেপে স্কুল করতে যেত। মস্তানদের ঈভটীজিং রুখতে ওরা তিনচার জনে স্কুলছুটির পরে একসঙ্গে সাইকেলে চেপে বাড়ি আসত। রীতা থাকত মিশনারীদের ব্যবস্থা করা একটা লেডিজ হস্টেলে। স্কুল থেকে পাস করার বছরেই শকুন্তলার বাবা বদলি হলেন কলকাতায়। তারপর রীতা বিদ্যার্থী ওর জীবন থেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। দুজনের সাক্ষাৎ হলো প্রায় দশ-বারো বছর বাদে কলকাতার একটি পূজামণ্ডপে। রীতা কখনো একসাথে দুজন বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে কোর্টশিপ করত না। প্রায় মাসতিনেক ধরে সে যাঁর সঙ্গে স্টেডি চলছিল তিনি একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। বড়লোকের ছেলে, সুদর্শন, অ্যাডভোকেট এবং একটি রাজনৈতিক দলের এম. এল. এ.। রবিন মাইতি। বর্ধমানে বাড়ি। সচ্চরিত্র। হ্যাঁ, শকুন্তলা তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে চেনে। কারণ সে যে স্কুলে পড়ায় সেই হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের উনি গভর্নিং বড়ির প্রেসিডেন্ট। তিনি আগেও এ বাড়িতে বহুবার এসেছেন নানান কাজে। ইদানীং আসেন না।

নিখিল জানতে চায়, গত সাত-দশ দিনের মধ্যে তিনি কি এসেছিলেন এ বাড়িতে?

—অন্তত আমার জ্ঞাতসারে নয়।

—এ ছাড়া ওর অফিসের বন্ধু-বান্ধবীরা কেউ কি আসত না?

—কখনো-সখনো।

—তাদের মধ্যে কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তির কথা কি আপনার মনে পড়ে?

শকুন্তলা নীরবে চিন্তা করতে থাকে।

—পড়ে?

—দেখুন, আমার একথাটা বলা শোভন হবে কিনা জানি না, কিন্তু একজন লোক মাঝে মাঝে—ইন ফ্যাক্ট প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে—রীতার সঙ্গে দেখা করতে আসত। লোকটা কে, আমি জানি না। রীতা তার কথা আমাকে কিছু বলেনি। কিন্তু বেশ বোঝা যেত যে, সে

অবাঞ্ছিত অতিথি। আসত একটা কালো ফিয়াট গাড়িতে। তার নম্বরটা আমার ডায়েরিতে লেখা আছে। দিতে পারব। কিন্তু সে কেন আসত, তা জানি না।

নিখিল বলে, প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে যদি একটা লোক বারে বারে আস তখন স্বতই মনে হয়—সে পাওনাদার...

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, অথবা 'ব্ল্যাকমেলার'। মাসের প্রথম সপ্তাহে তারাও হাজিরা দিয়ে থাকে ভিক্‌টিমের কাছে। তেমন কিছু কি আশঙ্কা করেছিলে তুমি?

শকুন্তলা জানলা দিয়ে আমগাছটার মগডালের দিকে অনেকক্ষণ নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানি না।

—কিন্তু তোমার মনে নিশ্চয় কিছু সন্দেহ জেগেছিল, নাহলে তার গাড়ির নম্বর ডায়েরিতে লিখে রাখবে কেন?

—তা বলতে পারেন। লোকটাকে আমার আদৌ ভাল লাগেনি। রীতার কাছে ওর বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম, সে কিছু বলেনি। কিন্তু বাড়িটা যেহেতু আমার, তাই সন্দেহজনক লোকটার গাড়ির নম্বরটা লিখে রেখেছিলাম।

অনিমেষ বলে ওঠে, তার একটা বর্ণনা দিন কাইন্ডলি...

মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে শকুন্তলা ধীরে ধীরে বললে, বয়স বছর পঞ্চাশ। বেঁটে। পাঁচ-তিনের উপরে নিশ্চয় নয়। বেশ মোটা। খুব কালো। অবাঙালী—

নিখিল জানতে চায়, অবাঙালী তা কেমন করে বুঝলেন?

—টেলিফোনে তার কণ্ঠস্বর শুনে। সে কখনো আন-অ্যাপয়েন্টেড আসত না। কোনোদিন তার নাম বা রিটার্ন-নম্বর জানায়নি। রীতাকে ডেকে দিতে বলত। ওর কণ্ঠস্বরে বা বাচনভঙ্গিতে মনে হয়েছিল ও দাক্ষিণাত্যের লোক। রীতাকে বহুবার প্রশ্ন করেছি—লোকটা কে, কেন আসে; ও বলেনি।

—শেষ কবে সে এসেছিল?

—গতপর্শুই বিকালে। আমি ভদ্রেশ্বর বেরিয়ে যাবার পর। আমাকে এইমাত্র কেষ্টার-মা জানালো, পর্শু সন্ধ্যায় সেই মদ্র-সাহেব এসেছিল।

—কেষ্টার-মা কেমন করে জানল? ও কি দু'বেলাই আসে?

—হ্যাঁ। বিকালে এসে বাসন ধুয়ে দেয়। অ্যাকোয়া-গার্ড থেকে জল ভরে রাখে। ঘণ্টাখানেক লেগে যায় সব কাজ সারতে।

এরপর নিখিল কী প্রশ্ন করবে ভেবে পায় না। এদিকে ফিরে বাসু-সাহেবকে বলে, আপনি কি আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন, স্যার?

বাসু মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, ফটো তোলার 'হবি'টা কার? তোমার না রীতার?

শকুন্তলা অবাক হয়ে প্রতিপ্রশ্ন করে, মানে? দুজনের মধ্যে অন্তত একজনের ফটো তোলার বাতিক থাকতেই হবে, এ-কথা মনে হলো কেন, আপনার?

—বাঃ! 'পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ'! সারা বাড়িতে চমৎকার সব ফটো বাঁধানো। এঘরেও রয়েছে। রীতা বিদ্যার্থীর গ্লাস-টব টেবিলের তলাতেও দেখলাম দারুণ কিছু ফটো। দেওয়ালেও টাঙানো আছে...

শকুন্তলা বলল, তাই বলুন। হ্যাঁ, ছবি তোলার হবিটা আমারই।

—নিজেই ডেভেলপ আর প্রিন্ট কর, তাই না?

—কী আশ্চর্য! আপনি তা কেমন করে জানলেন?

—বাঃ! সিঁড়ির নিচে যে ঘুপ্‌চি ঘরটা আছে তার দরজার কাচের প্যানেলে কালো কাগজ সাঁটা দেখেই তো বোঝা যায় : ওটা তোমার ডার্করুম। না হলে অমন অন্ধকূপের ভিতর আলো ঢোকার শেষ ছিদ্রটিও কেন ওভাবে বন্ধ করা হবে? ওইটাই ডার্করুম? তাই না?

শকুন্তলা হেসে বলে, আপনার তো দারুণ নজর! হ্যাঁ তাই। বাসু হেসে বললেন, তা আমার নজরের কথাই যখন তুললে মা, তখন আরও একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি : রীতার টেবিলের ওপরে দেওয়ালে যে ফটোখানা ছিল—পনের ইঞ্চি খাড়াই, দশ ইঞ্চি চওড়া—সে ছবিটার কী হলো?

শকুন্তলা দুরন্ত বিস্ময়ে শুধু আঙ্কিক মাপটার পুনরুক্তি করল, পনেরো ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চি...?

—না, না, ফটোর মাপটা আরও ছোট। আমি ফ্রেমসমেত মাপটা বলছি। দেওয়ালের দিকে তাকালেই মনে হয় না যে, ওখানে 'ফিফ্‌টিন বাই টেন' একটা বিবর্ণ আয়তক্ষেত্র দেওয়ালে বন্দী হয়েছে? মাথায় একটা হুক, নিচে দু'দুটি ভারবাহী পেরেক মাথা কুটছে হারানো ছবিটার জন্য!

শকুন্তলা এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়েছে। মৃদু হেসে বলে, আপনার ডিটেক্‌টিভ হওয়া উচিত ছিল, ব্যারিস্টারের বদলে। হ্যাঁ ছিল, দিন চার-পাঁচ আগে ঝড়ে ছবিটা খুলে পড়ে। কাচটা ভেঙে যায়। ওটা ফ্রেমিং করতে দিয়েছি।

নিখিল আর অনিমেষ বুঝল 'পি. কে. বাসু' নামটা শকুন্তলার কাছে অপরিচিত। কৌশিক অবশ্য মর্মাহত হলো। এ ব্যর্থতা তারই। তার কাঁটা-সিরিজ 'গেলেও বিচিত্র পথে' হয়নি সে সর্বত্রগামী!

বাসু জানতে চান, রীতারই পোর্ট্রেট ছিল, নিশ্চয়। তাই না?

—হ্যাঁ, এবারও ঠিক আন্দাজ করেছেন। অবশ্য এবার আপনার কৃতিত্ব ততটা নয়। টমের ঘরে ডিক্‌-এর ফটো থাকবে না, ডিক্‌-এর ঘরে হ্যারির।

কৌশিক এতক্ষণে কথা বলে, কিন্তু ওটা যীজাস বা মা-মেরীর ছবিও তো হতে পারত। আমি তো ভেবেছিলাম মিকেলাঞ্জেলোর 'পীতা'-র একটা এন্‌লার্জড কপি : যীশুক্রোড়ে মা মেরী!

নিখিল প্রসঙ্গটা বদলে বললে, আপনি ওই এম. এল. এ. ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর একটা কাগজে লিখে দিন। আর ঐ অবাঞ্ছিত আগন্তুকের গাড়ির নম্বর। আমরা এবার উপরের ঘরে যাব। ফিংগারপ্রিন্ট এক্সপার্ট-এর সঙ্গে কথা বলতে।

শকুন্তলা তার শয়ন কক্ষে উঠে গেল। তার অ্যাড্রেস-বই বোধকরি ওই ঘরে রাখা আছে। কাগজ-কলমও। শকুন্তলা উঠে যেতেই কৌশিক বাসু-সাহেবের কাছে ঘনিয়ে এসে বললে, ফটোখানার বিষয়ে এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন, মামু?

বাসু অস্ফুটে বললেন, মেয়েটি 'নার্থিং বাট দ্য ট্রুথ' বলছে না বলে। দিন তিন-চার আগে ফটোর কাচখানা ভাঙলে আমরা ওই ব্যারেল-শেপ্‌ড ময়লা ফেলার টিনের পাত্রে কিছু কাচের টুকরো পেতাম। সেটা দেড়-দু'মাস সাফা করা হয়নি। আর অমন সহজ-লভ্য সংগ্রহপাত্র থাকা সত্ত্বেও ভাঙা কাচগুলো ফেলতে অন্যঘর থেকে...

কথাটা তাঁর শেষ হলো না। শকুন্তলা ফিরে এল। রবিন মাইতি, অ্যাডভোকেটের নাম-ধাম, টেলিফোন নম্বর পরিষ্কার করে লেখা একটা কাগজ বাড়িয়ে ধরল। অবাঞ্ছনীয় আগন্তুকের গাড়ির নম্বরটাও। নিখিল সেটা পকেটে রেখে বলল, আচ্ছা, নমস্কার। আপনি এবার বিশ্রাম নিয়ে যেতে পারেন।

শকুন্তলা প্রতিনমস্কার করে বললে, একটা কথা, অফিসার! এ পর্যন্ত যেটুকু দেখেছেন, যেটুকু বুঝেছেন, তাতে আপনাদের কী মনে হচ্ছে? রীতা কি আত্মহত্যা করেছে? নাকি...

নিখিল নীরবে নতনয়নে দাঁড়িয়েই থাকল। জবাব দিল না।

শকুন্তলা আবার বলে, দেখুন! অন্য কিছু হলে আমাকে আরও সাবধান হতে হবে। আমি এ বাড়িতে আবার একা থাকতে বাধ্য হয়ে গেলাম তো!

নিখিল মনস্থির করে বলল, ঠিকই বলেছেন, মিস্ রায়। হ্যাঁ, আমরা এটাকে 'আত্মহত্যা' বলে ধরে নিচ্ছি না। না, হোমিসাইডও নয়—ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার। কেন সেকথা মনে করছি তা আপনাকে এখনি জানাতে পারব না। তবে লোকাল থানাকে নির্দেশ দেব—আপনার বাড়িটা তারা গোপনে নজর রাখবে।

—থ্যাঙ্কু, অফিসার।

—আরও একটু সাহায্য চাইব আমরা। 'ডেডবডি' রিমুভ হয়ে গেলে আপনাকে নিয়ে আমি দোতলায় যাব। মিস্ রীতার ভ্যানিটি ব্যাগে একটা চাবির গোছা দেখেছি। মনে হয়, ওঁর ঘরে যে আলমারিটা আছে তার চাবি...

শকুন্তলা বাধা দিয়ে বলে, হ্যাঁ, আলমারিটা আমারই। ওকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলাম...

—আমরা আলমারিটা সার্চ করব। হয়তো কিছু 'সীজ' করব—পিস্তলটা তো বটেই। 'সীজার লিস্ট' আপনাকে এক কপি দিয়ে যাব। আপনি আমাদের সাহায্য করবেন তল্লাশিতে। আর রীতার দু'তিনটি ছবি আমাদের দেবেন। ফ্রন্ট ফেস্ এবং প্রোফাইল।

—শ্যিওর!

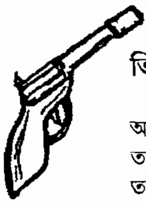

তিন

আরও ঘণ্টাখানেক পরের কথা। ডক্টর সান্যাল বিদায় হয়েছেন। মৃতদেহ অপসারিত হয়েছে। ফটো আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ার কাজও সারা। শকুন্তলার তরফে কেষ্টা-মায়ের উপস্থিতিতে রীতার স্টিল-আলমারি খুলে নিখিল চিরুনি তল্লাশি করেছে। আশ্চর্য! রীতা বিদ্যার্থীর ফেলে-আসা জীবন সম্বন্ধে কোনও তথ্যই পাওয়া যায়নি। কোনও পুরানো দিনপঞ্জিকা, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ—কিছু না। কিছু বই অবশ্য পাওয়া গেছে। তাতে রীতা বিদ্যার্থীর নাম লেখা। ঠিকানা এই বাড়ির। কিছু শাড়ি-ব্লাউজ, সালওয়ার-কামিজ, রাতের পোশাক, আন্ডার গার্মেন্টস্, প্রসাধন দ্রব্য, তোয়ালে, রুমাল এবং একটি ছোট বাঁধানো পার্সোনাল টেলিফোন-বই। নিখিল সেটা উল্টে-পাল্টে দেখল। কৌশিকও দেখল। বাসুও দেখলেন। সবই অচেনা নাম, অজানা ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর। সবই কলকাতা শহরের। ইনসাইড লকারে কিছু স্বর্ণালঙ্কার—কানের দুল, আংটি, একপাটি বালা, একটা জরোয়া হার। একটা টফির কৌটায় পঞ্চাশ টাকার নম্বরি বান্ডিলে খান আষ্টেক নোট। সল্ট লেকে অবস্থিত একটি বিদেশী ব্যাঙ্কের সেভিংস অ্যাকাউন্ট চেকবই। তাতে দেখা যাচ্ছে এগারোই নভেম্বর, শুক্রবার, রীতা ছয় হাজার টাকা তুলেছে। সে টাকার কোনো চিহ্ন নেই।

বাসু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আদালতে উঠে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে পারব না—কিন্তু নাইন্টি-নাইন পার্সেন্ট চান্স ওই বেঁটে কালো লোকটা রবিবার সন্ধ্যাবেলা রীতার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ব্ল্যাকমেলিং-এর ইনস্টলমেন্ট আদায় করেছে।

অনিমেষ বলে, পাঁচ হাজার তা কেমন করে বুঝলেন, স্যার?

—পঞ্চশ টাকার নম্বরী নোটে আলমারিতে আছে চারশ, ওর ভ্যানিটি ব্যাগে সাড়ে চারশ, আন্দাজ করছি ও খরচ করেছিল প্রায় দেড়শ টাকা—একুনে হাজার টাকা। দেয়ারফোর, ছয় হাজার মাইনাস হাজার ইজুক্যালটু পাঁচ হাজার হচ্ছে ব্ল্যাকমেলারের প্রাপ্য।

নিখিল বলে, কেষ্টার-মায়ের জবানবন্দি অনুসারে মিস্ রায় ভদ্রেশ্বরে চলে যাবার পরে রীতা জীবিত ছিল। কিন্তু পরদিন রবিবার সন্ধ্যায় সে কাজ সেরে যখন চলে যায় তখন কি ঐ মদ্রদেশীয় লোকটা এসেছিল।

বাসু বলেন, অ্যাশুমিং এসেছিল। তাতে কী প্রমাণ হয়?

অনিমেষ বলে, লোকটা অ্যান্টিসোশাল। রীতা দেবীকে জীবিতাবস্থায় সেই শেষ দেখেছে, এক্ষেত্রে সন্দেহটা তার উপরেই পড়ে না কি, স্যার?

—না, পড়ে না। যে হাঁস মাস-মাস সোনার ডিম পাড়ে তাকে কেন মারতে চাইবে ব্ল্যাকমেলার? তার উপর পিস্তলটা রীতার জিম্মাদারীতেই ছিল! ব্ল্যাকমেলারের নাগালের মধ্যে নয়।

—তাহলে আপনি কী বলতে চান?

—আমি বলতে চাই, আমাদের হাতে যা তথ্য আছে তা অপ্রতুল। ওই কেষ্টার-মা তার জবানবন্দিতে কী বলল?

অনিমেষ বলে, সে তো আজ সকালের কথা বলেছে। গতকাল সন্ধ্যার প্রসঙ্গ আমি তুলিইনি। তখনও আমি জানতাম না যে, ঐ মদ্রদেশীয় লোকটা কাল সন্ধ্যায় এসেছিল।

বাসু জানতে চান, কী যেন নাম? হ্যাঁ, কেষ্টার-মা। সে আছে, না চলে গেছে?

—না, স্যার। তাকে ছুটি দিইনি। সে নিচে বসে আছে।

—তাকে ডাক দিকিন একবার।

একটু পরেই কেষ্টার-মা এসে দাঁড়ালো। বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, দেখুন সাহেবরা! আমি ন্যায্য কথা কইব! আমি গতর খাটিয়ে খাই। পাঁচ-বাড়ি কাজকাম করে আমার সংসার চলে। তা আপনেরা আমারে এ কী আতান্তরিতে ফেললেন, ছার! হকাল থিকে বসি আছি তো বসিই আছি! আমার সময়ের কি দাম নাই?

বাসু নিরুত্থায় তাঁর হিপ-পকেট থেকে ওয়ালেটটা বার করলেন। তা থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে বললেন, তুমি হক্কথা বলিছ, কেষ্টার-মা। পাঁচ কতার অ্যাক্কথা! লাও! এইডা ধর দিনি। এইডা হলো গে তোমার একবেলার মজুরি! বুঝলা? অখন বহ দেহি, এইহানে। যা জিগাই তার নিয্যস জবাব দাও!

কেষ্টার-মা অবাক হয়ে গেল। বললে, কী কন? হেইডা কি আমারে বস্‌কিশ দিতেছেন, সাহেব?

বাসু জবাবে বলেন, না! বস্‌কিশ লয়। ন্যায্য মজুরি। বহ দেহি ওইখানে! যা জিগাই তার জবাব দাও!

বাসু-সাহেব যদিও তাকে একটি চেয়ার দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কেষ্টার-মা তাতে বসল না। থাপন-জুড়ে মাটিতেই বসে পড়ল। এরপর ওঁদের দুজনের ওই বিচিত্র গ্রাম্য ভাষায় দীর্ঘ আলাপচারী হলো। সওয়াল ও জবাব। যার সংক্ষিপ্তসার এইরকম :

আজ সকালে তার কাজে আসতে অনেক বেলা হয়ে গেছিল। দোষ কেষ্টার—ওর পুত্রের। সারারাত জেগে সে যাত্রা দেখেছে পূর্বরাত্রে। সকালে তার জ্বর আসে। ফলে কেষ্টার-মার দেরি হয়ে যায়। ও যখন এ বাড়িতে এসে পৌছায় ততক্ষণে রীতার ঘরের দরজা ভাঙা হয়ে গেছে। তাই আজ সকালের কথা সে কিছুই জানে না। পুলিশের গাড়ি আসার পরে সে এসে পৌছায়।

তবে হ্যাঁ, গত কালকার কথ সে কিছু বলতে পারে। বড়দিদিমনি শনিবার ভদ্রেশ্বরে চলে গেছে কালীপূজার নিমন্ত্রণে। ছোড়দিমনি খায়নি। তার কালীপূজার 'উপুস'। রাতে খাবে। তার রাতের খাবার মিটসেফে রাখা আছে। সেটা কালীপূজার দিন। বোমা-পটকা লেগেই আছে। কেষ্টার-মা পড়ন্ত বেলায় এসেছিল এ বাড়িতে—এঁটো বাসন ধুতে, জলের বোতল ভরে দিতে, আর ছাদ থেকে শোকানো কাপড়গুলো পেড়ে নামাতে। তখনো সন্ধ্যা হয়নি। সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু রাস্তায় বাতি জ্বলেনি। কেমন একটা আলো-আঁধারি ভাব। কেষ্টার-মার নজর হলো : গেটের পাশে সেই কালো ছোট্ট গাড়িটা 'ডেঁড়িয়ে' আছে। অর্থাৎ সেই মুখপোড়া বেঁটে মদ্রসাহেবটা আজ আবার 'এয়েচেন'। কেষ্টার-মা 'তাঁরে' চেনে। বহুবার দেখেছে ঐ 'খ্যালনা গাড়ি' চেপে আসতে। ছোড়দিমনির চেনা মনিষ্যি। 'পেরাইই' আসে। কী সব গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর চলে। আজ্ঞে না, 'আপনেরা' যা 'ভাবতিছেন তা লয়'। মিনষেডা ছোড়দিমনির বাপ লয়,—জ্যাঠার বয়সী। তা সে যাগ্গে মরুগ্গে। কেষ্টার-মা হাতের কাজসেরে যখন বাড়িফানে যাবার 'উয্যোগ' করছে 'ত্যাখনো মিন্‌ষেডা বিদেয় হয়নি।' কেষ্টার-মা দোরের বাইরে থেকে 'জাস্তে চেইছিল : ছোড়দিমনি আমি তাইলে যাই?'

এই পর্যায়ে বাসু-সাহেব ওকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, ওরা দুজন কোথায় বসে কথাবার্তা বলছিল? উপরের ঘরে না নিচের?

—ওমা আমি কনে যাব? ছোড়দিমনি কি অই হাড়হাবাতেরে নিজের শোবার ঘরে নে যাবে? বাইরের ঘরেই। কিন্তু কী বলব সাহেবরা! চুরুটের গন্ধে বমি আসে—ওয়াক্ থুঃ।

বাসু বলেন, তা বাড়ি যাবার কথায় তোমার ছোড়দিমনি কী বললেন?

—বুললে, যাও কেনে। তবে সদরদোরটা টানি দে যেও।

—ছোড়দিমনি তাহলে বাঙলা বলতে পারতেন?

—ওমা আমি কনে যাব? ছোড়দিমনি একবন্নও বাংলা জানত না। হিন্দি!

—বুঝলাম। তারপর?

কেষ্টার-মা নির্দেশমতো সদর দরজাটা টেনে দিয়ে চলে যায়। 'ইয়েল-লক' কপাট। তালাবন্ধ হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। তবে কেষ্টার-মার মনটা খচ্‌খচ্ করতে থাকে। বদ্ধঘরের ভিতর দুজনকে রেখে বাড়ি যেতে তার মন সরছিল না। ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বাড়ি বাড়ি রেলিঙে, ছাদের পাঁচিলে দীপাবলী জ্বলতে শুরু করেছে। মিত্তিরবাড়ির ছেলেরা রাস্তায় 'বস্যান তুবড়িতে' রোশানাই দিতে আরম্ভ করছে। কেষ্টার-মা ওই মিত্তিরবাড়ির রোয়াকে 'টুক' বসি গেল। খানিকপরে মিত্তিরবাড়ির মেজ-বৌ বাইরে বেরিয়ে আসে। বাজি ফোটানো দেখতে। তার দু'চার মিনিট বাদে শকুন্তলার বাড়ি থেকে ওই মদ্র-সাহেব বেরিয়ে আসে। দরজার বাইরে এসে ভিতর-বাগে তাকিয়ে হিন্দিতে বললে, 'তোমার ভালর জন্যই বলছিলাম। মাস-মাস এ বখেড়া ভাল লাগে না। তোমারও না, আমারও না।'

তখন ছোড়দিমনি ঘরের ভিতর থেকে 'অরে কী-যান বুইললে'। তার জবাবে মদ্রসাহেব 'বুইললে'—'বেশ তো। তাড়াহুড়ার কী আছে? পরে ভেবে-চিন্তে আমারে জানিও।' এই কথা বলে দরজাটা টেনে দিয়ে মদ্রসাহেব গাড়িতে উঠে বসে। তখন মিত্তিরবাড়ির মেজবৌ হঠাৎ জানতে চায়, 'ওই লোকটা কে বল তো কেষ্টার-মা? প্রায়ই আসে দেখি শকুন্তলার কাছে?' কেষ্টার-মা বলেছিল, 'না, উনি ছোড়দিমনির কাছে আসে। কে, তা জানি না!'

বাসু-সাহেব জানতে চান, মদ্র-সাহেব যখন তোমার ছোড়দিমনির সঙ্গে কথা বলছিল তখন সে ছিল দরজার বাইরে, রাস্তায়; আর রীতা ছিল দরজার ওদিকে, বাড়ির ভিতরে। তাই তো?

—তাই তো বলনু আমি।

—তুমি তখন তোমার ছোড়দিমনিকে দেখতে পাচ্ছিলে?

—হ্যাঁ, তা পাব না কেনে? ছোড়দিমনি তো জবাবে বইল্‌ল...

—কী বলল?

—ঠিক মনে নাই। কী যেন এট্টা কথা বইলল, তখন মদ্রসাহেব বইল্‌ল, 'ঠিগাছে, ঠিগাছে। তাড়াহুড়া করনের কোনো দরকার নেই। পরে আমারে বুইললেই হবে নে।'

বাসু বললেন, সে-কথা তুমি আগে বলেছ। তার মানে, ছোড়দিমনি কী বলেছে তা তুমি শোননি। তাকে দেখতে পেয়েছিলে কী?

কেষ্টার-মা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা করল। তারপর বলল, নিশ্চয় দেখতে পেইছিলাম বোধহয়। নইলে মদ্রসাহেব ওকথাডা বুলবে কেন, কন?

বাসু-সাহেব সায় দিলেন, তা তো বটেই। এবার আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। বল তো : ঐখানে যে ছবিটা ছিল সেটা কতদিন আগে সরানো হয়েছে?

বাসু-সাহেবের অঙ্গুলি নির্দেশে কেষ্টার-মা ঊর্ধ্বমুখ হলো। অবাকও হলো। বলল, অ-মা! ফটোকটা কই গেল?

—ছবিটা ভেঙে পড়েছিল না?

—কবে?

—কবে ভেঙে পড়েছিল, সেটা তো তোমার জানার কথা, কেষ্টার-মা। তুমি কাচগুলো ঝেঁটিয়ে ফেলে দিলে। মনে পড়ছে না?

— আপনে যে কী কন! ফটোকটা যে বেপাত্তা হই গেছে, তা অ্যাইমাত্তর আমার নজরে পড়ল।

—কার ফটোক ছিল গো?

—ছোড়দিমনির। অ্যাই খাটে শুয়ি শুয়ি ছোড়দিমনি কারে যান চিঠি লিখ্‌তিছেল। ভারী সোন্দর ফটোকটা গো! কই গেল সেটা?

বাসু বললেন, আমিও তো তোমারে হেই কথাডাই জিগাই!

চার

আরও আধঘণ্টা বাদে। বেলা একটা বাজে। অনিমেষও ইতিমধ্যে নিজের থানায় চলে গেছে। কেষ্টার-মা যাব যাব করছে। নিখিল বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে গৃহস্বামিনীর কাছে বিদায় নিতে চেয়েছিল; কিন্তু কেষ্টার-মা নিচের তলায় শকুন্তলার শয়নকক্ষ ঘুরে এসে জানালো : বড়দিমনি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অগত্যা ওঁরা তিনজনে নিঃশব্দেই নিষ্ক্রান্ত হলেন সে বাড়ি থেকে। কেষ্টার-মা তার ঘরপানে রওনা হলো। বাসু-সাহেব বললেন, অতঃ কিম্‌?

নিখিল বললে, চলুন, প্রথমে কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। বেলা একটা বেজে গেছে।

বাসু রাজি হলেন না। বললেন, তার চেয়ে তোমার অফিসে চল। সেখানে তোমার ঘরে বসে কিছু খাবার আনিয়ে খেয়ে নিতে পারব। কাজও করা যাবে ঐ সঙ্গে।

—এত তাড়াতাড়ি করছেন কেন, স্যার?

—দুজনের সঙ্গে আমাদের এক্ষুনি যোগাযোগ করতে হবে। এক নম্বর : মদ্র-সাহেব, দু-নম্বর এম. এল. এ.-সাহেব। আমি জানতে চাই এদের মধ্যে কেউ জানে কি না যে, সল্ট লেক অঞ্চলে রীতা, বিদ্যার্থী নামে একটি সোনালী চুলের মেয়ে এখন শবব্যবচ্ছেদের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কামরায় শায়িতা। কালকের কাগজে খবরটা ছাপা হবার পরে ওদের অ্যাটিচুড বদলে যাবে।

—তাহলে এক কাজ করি, স্যার। আমার বাড়ি চলুন। অফিসে গেলেই পাঁচজন সাক্ষাৎপ্রার্থী, পাঁচটা ফাইল, আর কিছু না হয় তো অন্য একটা মার্ডার কেস ঘাড়ে চাপবে। আমার বাড়িতে গিয়ে টেলিফোন করতে পারব। কাকলি ইতিমধ্যে কিছু খাবার বানিয়ে অথবা আনিয়ে নিতে পারবে।

অগত্যা তাই।

মিনিট-পনেরোর মধ্যে ওঁরা পৌঁছে গেলেন নিখিলের বাড়িতে। কাকলি খুবই খুশি। বললে, ও-বেলার জন্য চিকেন দো-পেঁয়াজা করাই আছে। দুজনের মতো ভাত তো আছেই। আমি বরং খান-কয় পরোটা ভেজে দিই।

বাসু বলেন, তোমাদের তিনজনের জন্য পরোটা বানাও। আমাকে স্রেফ শশা বা টমেটোর ভেজিটেব্‌ল স্যান্ডুইচ বানিয়ে দাও। পরোটা খাব না। আর তোমার মাসিমা কিংবা সুজাতাকে টেলিফোন করে জানিয়ে দাও আমরা দুজনে এখানে খাচ্ছি।

ওঁরা তিনজনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ড্রইংরুমে বসলেন। নিখিল জানতে চায়, ওই ফটোটাকে আপনি অতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন, স্যার?

বাসু পকেট থেকে পাইপ বার করে টেবিলের উপর রাখলেন। বললেন, প্রসঙ্গটা শুরু করেছিলাম নিতান্ত 'ওয়াইল্ড গুজ চেজ' হিসাবে। রীতার টেবিলের উপর একটা বড় ফটো টাঙানো ছিল, সেটা সম্প্রতি সরিয়ে ফেলা হয়েছে—এটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র নয়। কিন্তু গোয়েন্দাগিরির ধর্মই হচ্ছে : 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই...'! ছবিটার অনুপস্থিতি থেকেই আমার মনে প্রশ্ন জাগল, এটা কোন কারণে খুলে রাখা হয়েছে? অ্যাক্সিডেন্টালি দড়ি ছিঁড়ে পড়েনি।

নিখিল জানতে চায়, কেন? সেটা নয় কেন?

—কারণ কাছেই রয়েছে ওই ব্যারেল-শেপড্‌ টিনের ওয়েস্ট-পেপার ড্রামটা। যেটাতে দু-তিন মাস আগেকার ছেঁড়া ভাউচার রয়েছে, অথচ একটাও ভাঙা কাচের টুকরো নেই। কিন্তু মেয়েটি বললে, মাত্র তিন-চার দিন আগে ফটোটা পড়ে ভেঙেছে। আমার সন্দেহ হলো—এর মধ্যে হয়তো কিছু একটা কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। তাই আরও একটু খোঁজখবর নিলাম। মজার কথা : কেষ্টার-মা জানেই না যে, ছবিটা পড়ে গিয়ে কাচ ভেঙেছে—

নিখিল আবার বলে, কিন্তু ওটা আমাদের তদন্তে কীভাবে সাহায্য করতে পারে?

—জানি না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ছবিটা থাকলে আমরা একটা বিষয় নিশ্চিন্ত হতে পারতাম : রীতা বিদ্যার্থী গারফিল্ড সোবার্স থেকে ডেভিড গাওয়ারের দলে কিনা। আই মীন, লেফ্‌ট্‌-হ্যান্ডার কি না। কারণ কেষ্টার-মা ইতিমধ্যে জানিয়েছে ছবিতে দেখা যাচ্ছিল রীতা খাটে শুয়ে শুয়ে চিঠি লিখছিল। আমি জানতে চাই : ডান হাতে, না বাঁ-হাতে? সেটা কেষ্টার-মা বলতে পারত না। তার অতটা বুদ্ধি নেই।

কৌশিক বলল, ধরুন যদি ছবিতে দেখতাম কলমটা ওর বাঁ-হাতে? তাহলে কী ইনফারেন্স হতো?

—আমরা সিদ্ধান্তে আসতাম : এটা আত্মহত্যার কেস। মেয়েটি ছিল বেঁয়ো। বাঁ-হাতে

পিস্তল ধরে নিজের বাঁ-কানের উপর ফায়ার করে আত্মহত্যা করেছে। পরে কেউ পিস্তলটা ওর ডান হাতে গুঁজে দিয়েছে!

—কে দিতে পারে? কেন দিতে যাবে?

বাসু বলেন, আমরা এখনও তা জানি না। দু'দুটো 'ভাইটাল ক্লু' এখনও আমাদের হাতে আসেনি। এলে, তখন হয়তো ও প্রশ্নের জবাবটা বোঝা যাবে। নাম্বার ওয়ান : ফিঙ্গার প্রিন্ট রিপোর্ট। পিস্তলে আর কারও আঙুলের ছাপ আছে কি না।

নিখিল বলে, কেউ যদি পরে মেয়েটির মুঠিতে পিস্তলটা গুঁজে দিয়ে থাকে তাহলে মিলিয়ান টু ওয়ান চান্সেও তেমন কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে না। পিস্তলটা মৃত মেয়েটির মুঠিতে গুঁজে দেবার আগে অপরাধী সযত্নে রুমাল দিয়ে সেটা মুছে নেবে—

বাসু বলেন, অথবা আঁচল দিয়ে!

কৌশিক এদিকে ফিরে বলে, আপনি কি শকুন্তলাকে সন্দেহ করছেন?

—না! তবে শকুন্তলাকে বর্তমানে সন্দেহের বাইরে রাখতে পারছি না।

—কিন্তু শকুন্তলার কী স্বার্থ?

—শকুন্তলাই যদি হয়, তবে মোটিভও পাব। জোরালো মোটিভ—আদিম রিপু। সেই শাশ্বত ত্রিকোণ! একজন সুদর্শন, সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষ আর দুটি নারী। যে মারা গেছে সেই বেশি সুন্দরী! দ্বিতীয়ত শকুন্তলার জবানবন্দি অনুসারে ঐ ভদ্রলোক এবাড়িতে ইতিপূর্বে ঘন ঘন আসত। ইদানীং আসে না। রীতার সঙ্গে তার অন্যত্র দেখা হয় নিশ্চয়। তৃতীয়ত শকুন্তলার পক্ষে ওই পিস্তলটা সংগ্রহ করা খুব সহজ।

নিখিল বলে, কিন্তু সে তো ভদ্রেশ্বরে ছিল—

—তার জবানবন্দি অনুসারে। অ্যালেবাইটা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাছাড়া সকালে এসে সে যে রুদ্ধদ্বার দেখেছিল—এটাও তো তারই জবানবন্দি অনুসারে। হত্যার পর দরজা-জানলা বন্ধ করে সে পুলিশে ফোন করে থাকতে পারে।

নিখিল বলে, সেক্ষেত্রে পিস্তলটা কি রীতার বাঁ-হাতে থাকত না?

—হ্যাঁ, তাই থাকার কথা। কেন নেই, তা আমরা এখনো জানি না। মেয়েটি যে ঐ পিস্তলের গুলিতেই মারা গেছে সেটাও তো এখনো জানা যায়নি।

কৌশিক বলে, আর ধরুন যদি ফটোতে আমরা দেখতে পেতাম কলমটা ডান হাতে ধরে রীতা লিখছে?

—সেক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত হতো—এটা আত্মহত্যার কেস আদৌ নয়! মার্ডার! পিস্তলটা ডান হাতে ধরে কেউ বাঁ-কানের উপর ফায়ার করতে পারে না। সেটা ফিজিক্যালি অ্যাবসার্ড। তার মানে ওর পিস্তলটা হাতিয়ে কেউ ওকে ফায়ার করে এবং রিভলভারটা ওর মুঠিতে গুঁজে দেয়। সেক্ষেত্রে আমরা পিস্তলে আদৌ কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাব না। রুমালেই হোক বা আঁচলেই হোক, মুছবার সময় সব ফিঙ্গারপ্রিন্টই মুছে যাবে। রীতারটাও!

কৌশিক বলে, এখনো অবশ্য আমরা জানিই না যে, ওই পিস্তলটা বাস্তবে মার্ডার ওয়েপন কিনা। সীসার বলটা সম্ভবত খুলিতেই আটকে আছে। ব্যালাস্টিক্ এক্সপার্ট কম্পারেটিভ মাইক্রোস্কোপে যাচাই করে প্রথমে বলুন যে, মৃত্যু হয়েছে ওই পিস্তলের গুলিতেই—তারপর আবার আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। তবে হ্যাঁ, ফটো থেকে যদি বোঝা যেত রীতা কোন হাতে লেখে, তাহলে আমাদের বিশ্লেষণের সুবিধা হতো।

নিখিল ইতিমধ্যে উঠে গিয়ে একটা ফোন করল। বাসু জানতে চাইলেন, তোমার অফিসে ফোন করলে না কি?

—না স্যার। মোটর ভেহিক্লস্-এ আমার এক সহকারী বসে। তাকে ওই কালো ফিয়াট গাড়ির নম্বরটা দিলাম। রেকর্ড ঘেঁটে দেখতে, গাড়ির মালিকের নাম। ঘটনাচক্রে লাইসেন্স নম্বর থেকেই বোঝা যাচ্ছে—গাড়িটার লাইসেন্স এখানকার।

বাসু বললেন, তুমি আর একটা কাজ কর তো হে। এম. এল. এ.-সাহেবকে একটা ফোন করে দেখ তিনি বাড়িতে আছেন কি না। এখন অ্যাসেম্‌ব্লি চলছে না। তবে বেলা দেড়টার সময় তিনি বাড়িতে নাও থাকতে পারেন। কায়দা করে সমঝে নাও, মাইতি-সাহেব ইতিমধ্যে খবর পেয়েছেন কি না।

নিখিল পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা আবার বার করে। টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলল, এই ফোনের একটা এক্সটেনশান আছে পাশের ঘরে, আমার বেড়রুমে। আমি সেখান থেকে ফোন করছি। আপনি এটায় শুনুন। তাহলে দু'পক্ষের কথাই শুনতে পাবেন।

বাসু ওর হাত থেকে ফোনটা তুলে নিলেন।

নিখিল পাশের ঘরে উঠে গেল। কর্ডলেস্ ফোনটা নিয়ে ডায়াল করতে করতে এ-ঘরে ফিরে এল। বার দুই রিঙিং টোন হতেই ও প্রান্তে কেউ সাড়া দিল : রবিন মাইতি বলছি। বলুন?

নিখিল বললে, গুড আফটারনুন, স্যার। আমি অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, নিখিল দাশ বলছি...

—বলুন? রীতা বিদ্যার্থীর বিষয়ে কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি তাহলে খবরটা পেয়েছেন?

—পেয়েছি। আপনারা ঘুরে এসেছেন তাও শুনেছি।

—মিস্ শকুন্তলা রায় বুঝি টেলিফোনে খবরটা দিলেন?

—এ প্রশ্ন অবান্তর। সল্ট লেক আমার কন্সটিটুয়েন্সিতে। এলাকার যাবতীয় খবর আমাকে রাখতে হয়। সবই জেনেছি—

নিখিলের পিত্তি জ্বলে গেল এম. এল. এ.-সাহেবের হামবড়াই ভঙ্গিতে। বললে, তাহলে তো ল্যাটা চুকেই গেল। কাইন্ডলি বলবেন স্যার, এটা কেস অফ সুইসাইড না মার্ডার?

মাইতি-সাহেব ধমকে ওঠেন, মানে? সেটা আমি বলব, না আপনি বলবেন? মার্ডার হতে যাবে কেন? বন্ধঘরের ভিতর...

—না, আপনি এখনি বললেন না : 'সবই জেনেছি'...

—ডোন্ট বি ফ্রিভলাস মিস্টার দাশ! ইটস্ এ ভেরি ভেরি সিরিয়াস কেস। আমি জানতে চাই : আপনারা কতটুকু কী জানতে পেরেছেন। কে মিস্ বিদ্যার্থীকে সুইসাইডে প্ররোচিত করেছে?

—সেজন্যেই তো আপনাকে টেলিফোন করছি। কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে।

—করুন। কী জানতে চান, বলুন?

—টেলিফোনে হবে না, মিস্টার মাইতি। সামনা-সামনি বসে কথা বলতে হবে...

—তাহলে আপনি আমার চেম্বারে চলে আসুন। ওল্ড-কোর্ট হাউস স্ট্রিটে। পাঁচটার সময়। নাম্বারটা জানেন তো?

—জানি। কিন্তু আলোচনাটা লালবাজারে হলে ভাল হতো না কি? কন্‌ফিডেন্সিয়েলি কথা বলা যেত।

—এখানে আমার চেম্বারটাও সাউন্ড-প্রুফ। সে বিষয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।

তবে ঠিক পাঁচটায় আসবেন। ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়বেন না। সাড়ে পাঁচটায় আমার অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

নিখিল বললে, অলরাইট স্যার! তাই হবে।

লাইন কেটে দিয়ে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে নিখিল বললে, তেজ দেখেছেন এম. এল. এ.-সাহেবের? এখন সিংহবিক্রম! আর মেয়াদ ফুরোলেই যুক্তকরে পথে-পথে ভিক্ষে করে বেড়াবেন : আমাকে আপনার ভোটটা কাইন্ডলি দেবেন স্যার?

কৌশিক এতক্ষণে বসে বসে টেলিফোন ডাইরেক্টারিতে কী যেন খুঁজছিল। তার দিকে ফিরে নিখিল বলে, আপনি কার নম্বর খুঁজছেন বলুন তো?

কৌশিক বইটা বন্ধ করে মুখ তুলে তাকায়। এক গাল হেসে বলে, না মিস্টার দাশ, আমি কারও নম্বার খুঁজছিলাম না। আমি ডাইরেক্টরি হাৎড়ে দেখছিলাম SATAKIA আর SATAPATI-র মাঝখানে কোনও এন্ট্রি আছে কি না। না, নেই!

—তার মানে?

—মানেটা খুব ইন্টারেস্টিং! আমার আস্তিনের তলায় বহুক্ষণ ধরে একটা তাস লুকানো আছে। সেটা তুরুপের তাস কিনা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এখন মনে হচ্ছে বোধহয় আমার আন্দাজটা ঠিকই। দেখা যাক চেষ্টা করে। যদি ঠিক হয়, মামু, তাহলে আপনার কাছে আমার খাওয়া পাওনা থাকল। কারণ জিনিসটা আপনারা দুজনেই খুঁটিয়ে দেখেছেন। নজর করেননি।

বাসু টেবিলের উপর থেকে পাইপটা তুলে নিয়ে তাতে তামাক ঠেশতে ঠেশতে বলেন : ফায়ার!

—মিস্ বিদ্যার্থীর সেই ছোট্ট নোটবইটার কথা বলছি। যাতে অনেকগুলি নাম আর টেলিফোন নম্বার লেখা। আপনারা দুজনেও তা দেখেছেন, আমিও খুঁটিয়ে দেখেছি। একটা এন্ট্রিতে আমার কেমন যেন খট্‌কা লাগল। 'S'-এর ঘরে অনেকগুলি এন্ট্রি। সাহা, সরকার, সেনগুপ্ত, সৎপতি ইত্যাদি বারো-তেরটা নাম। তার মধ্যে একটি উপাধি SATAN—ওটা তার নাম, না উপাধি সেটার উল্লেখ নেই। এখন ডাইরেক্টরি ঘেঁটে দেখছি 'সতকিয়া' অর 'সতপতির' মাঝখানে SATAN উপাধিওয়ালা কোনও লোকের টেলিফোন নেই। আমার আন্দাজ : এটা নাম নয়, 'কোড-নাম'—ওই মদ্র ভদ্রলোকের টেলিফোন নম্বারটা মিস্ বিদ্যার্থী এভাবে খাতায় লিখে রেখেছে।

বাসু বললেন, গুড-ওয়ার্ক! হতে পারে। রীতার জীবনে লোকটা শয়তান; সে এমন কোনও তথ্য জানে যেটা রীতা গোপন রাখতে চায়—তাই ছদ্মনামে টেলিফোন নম্বরটা লিখে রেখেছে। নিখিল, তুমি এক কাজ কর। পরোটা ভাজা থাক। তুমি কাকলিকে একটু ডাক।

উপায় নেই, কম্বাইন্ড-হ্যান্ডকে গ্যাস-স্টোভের দায়িত্ব দিয়ে কাকলিকে এঘরে আসতে হলো।

বাসু তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। কাকলিকে কী করতে হবে তাও বললেন, লোকটার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট কর রাত আটটায়। তুমি রীতা বিদ্যার্থী হিসাবে কথা বলবে। হিন্দিতে নয়, ইংরেজিতে। তোমার হিন্দি চোস্ত্ নয়; ধরা পড়ে যাবার চান্স। বেশি কথা বল না। লোকটা তোমার কণ্ঠস্বরে যেন সন্দেহ না করে। অবশ্য এটাই যে সেই লোকটা তা আমরা নিশ্চিত জানি না। উই আর জাস্ট টেকিং আ ওয়াইল্ড চান্স। নাও। তুলে নাও টেলিফোনটা; দেখি তুমি কেমন অভিনয় করতে পার।

কাকলি টেলিফোনটা ক্র্যাডল থেকে তুলে নিল। এক্সটেনশন লাইনে বাসু কান পাতলেন।

'SATAN'--এর নম্বারে কাকলি ডায়াল করল। বার তিন-চার রিঙিং টোন—তারপরই কে যেন বলল, হ্যালো?

কাকলি ইংরেজিতে বললে, আমি রীতা বলছি, রীতা বিদ্যার্থী...

ও-প্রান্তবাসী হিন্দিতে প্রশ্ন করল, ইয়েস! কাকে খুঁজছেন?

কাকলি একটু ইতস্তত করে বলল, নামটা টেলিফোনে বলায় অসুবিধা আছে। বুঝেছি, আপনি নন। আয়াম সরি...

ও-প্রান্ত থেকে লোকটা বলল, না, না, আমিই! তোমার গলার আওয়াজটা প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি।

কাকলি জোর দিয়ে বললে, না! আপনি নন! আপনার গলার আওয়াজ শুনে আমিও বুঝতে পেরেছি—আপনি সে লোক নন।

লোকটা এবার ইংরেজিতে বললে, প্লিজ ডোন্ট কাট্ অফ্। মিস্ রীতা,... মিস্ রীতা...

কাকলি বিনাবাক্যব্যয়ে ক্র্যাডাল-এ টেলিফোনটা রেখে দিল। বাসু বললেন, এক্সেলেন্ট!

লাইনটা কেটে দিয়েই তিনি আবার কী একটা নম্বরে ডায়াল করতে থাকেন। ও-প্রান্তে বার দুই-তিন রিঙিং টোনের পর কে যেন রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলল, দিস্ ইজ শকুন্তলা রয়...

বাসু বললেন, লুক হিয়ার শকুন্তলা! আমি পি. কে. বাসু বলছি। ইন্সপেক্টার দাশের সঙ্গে সকালবেলা তোমার বাড়ি গেছিলাম। তুমি চিনতে পারছ আমাকে?

—ইয়েস। বলুন, স্যার!

—ঐ মদ্র ব্ল্যাকমেলারটার সন্ধান বোধহয় আমরা পেয়েছি। তার সঙ্গে এই মাত্র আমার এক মহিলা-সহকর্মী রীতা বিদ্যার্থী সেজে টেলিফোনে কথা বলে হঠাৎ লাইন কেটে দিয়েছে। সম্ভবত পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে তোমাকে ফোন করবে। হয় সে এখনো জানে না, অথবা বোঝাতে চাইছে যে, সে জানে না—বিদ্যার্থী আজ সকালে মারা গেছে। লোকটা যদি এখনি ফোন করে তুমি তার নাম জানতে চাইবে। ও তোমাকে কোনোদিনই নিজের নাম জানায়নি এ-কথা বলেছিলে তুমি। আজও জানাবে না নিশ্চয়। সেক্ষেত্রে তুমি রূঢ় ভাষায় বলবে, 'নাম-না-জানলে রীতাকে ডেকে দিতে পারব না। সরি! প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব মি এগেন' বলে লাইন কেটে দেবে। এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে এই নম্বারে ফোন করবে। নম্বরটা লিখে নাও—

নিখিলের নম্বরটা জানিয়ে বাসু-সাহেব লাইন কেটে দিলেন। কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, ইয়েস্ মিস্টার গুরু-মারা-চেলা! তোমার একটা ফাইভ-কোর্স ডিনার পাওনা হয়েছে। নাইন্টি-সেভেন পার্সেন্ট চান্স তুমি বুল্স্-আই হিট করেছ। লোকটার উচ্চারণ বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণাঞ্চলের। কাকলিও দুর্দান্ত অ্যাকটিং করেছে। 'অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স'! লোকটা যেই বলেছে, তোমার কণ্ঠস্বর ঠিক চিনতে পারিনি, অমনি কাকলিও একই ভাষায় রুখে উটেছে. আমার বিশ্বাস, নাইন্টি-ফাইভ পার্সেন্ট চান্স লোকটা রিং-ব্যাক করবে!

কৌশিক গোবেচারির মতো জানতে চায়, বেমক্কা দু'পার্সেন্ট কমে গেল কেন, মামু?

নিখিল তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলে নিতে বললে, আমি আপনার সঙ্গে একমত! দুটো সম্ভাবনা। আইদার ওই লোকটাই খুন করেছে; সেক্ষেত্রে সে রীতার বাড়িতে রিং-ব্যাক করবে একথা প্রমাণ করতে যে, সে জানে না, রীতা মারা গেছে। অথবা লোকটা খুন করেনি; সেক্ষেত্রেও সে যাচাই করতে চাইবে রীতা বিদ্যার্থী কী বলতে চায়। কেষ্টার-মায়ের জবানবন্দি থেকে মনে হয়েছিল, লোকটা মাস-মাস টাকা আদায়ের বদলে একটা থওকা-টাকায় ফয়শালা করতে চেয়েছিল। সেটা পেতে হয়তো ব্ল্যাকমেলার এখনি রিং-ব্যাক করবে।

কাকলি জানতে চায়, আমার কাজ হয়ে গেছে তো? ছুটি?

বাসু বলেন, ও মা! ছুটি কি গো? পেটে ইঁদুরে ডন মারছে, আর তুমি ছুটি চাইছ?

কাকলি ধম্‌কে ওঠে, বেশ লোক বাপু আপনারা! রান্না ফেলে ছুটে এলাম, এখন আমাকেই দোষ দিচ্ছেন!

কাকলি ফিরে গেল তার রান্নাঘরে।

বাসু-সাহেব টেলিফোনটা তুলে নিয়ে কী একটা নম্বর ডায়াল করতে থাকেন। দু'একবার রিঙিং টোনের পরেই মেয়েলি কণ্ঠে কে যেন বললে, হ্যালো?

বাসু জানতে চান, অশোক আছে? অশোক মুখুজ্জে?

মেয়েটি বলে, না, ও তো বাড়িতে নেই!

বাসু ধম্‌কে ওঠেন, কেন নেই? কাজের সময় সে বাড়িতে থাকে না কেন?

ও-প্রান্তবাসিনী বলে, সহজ কারণে বাসু-মামু। হেতুটা এই : ও এখনো রিটায়ার করেনি। আজ সোমবার। উইক ডে'জ-এ দুপুরবেলা...

ওকে মাঝপথে থামিয়ে বাসু বলেন, বুঝেছি, বুঝেছি! ভারতী বলছ তো? তা তোমার কর্তাটিকে কি অফিসে পাব, না ট্যুরে গেছে?

—না, কলকাতাতেই আছে। একটু আগে আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছে। অফিসের নম্বারটা জানেন তো?

—জানি! ধন্যবাদ।

লাইন কেটে দিয়ে নতুন করে ডায়াল করতে করতে নিখিলকে বলেন, অশোক হচ্ছে পূর্বাঞ্চলের চীফ এঞ্জিনিয়ার—টেলিকম ডিপার্টমেন্টের। ভারী ভাল ছেলে। নানা ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করে।

অশোক মুখার্জি, অর্থাৎ টেলিকম ডিপার্টমেন্টেই পূর্বভারতের চীফ এঞ্জিনিয়ারকে অফিসেই পাওয়া গেল। বাসু-সাহেব তাকে একটি টেলিফোন নম্বর দিয়ে বললেন, এই নম্বরটা কার এবং কোন ঠিকানায় তা একটু দেখে দিতে হবে। জানি, তুমি ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু তোমার ডিপার্টমেন্টে সবাই নিশ্চয় ব্যস্ত নয়। সেই মেয়েটি কোথায়? কী যেন নাম, হ্যাঁ মনে পড়েছে, অপর্ণা দেব। ভারী কাজের মেয়ে। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' টাইপ। তাকে বল, এটা খুঁজে বার করে আমার এই নাম্বারে রিং-ব্যাক করতে—

অশোক বলে, অপর্ণা দেব-এর নাম আপনার মনে আছে, মামু?

—থাকবে না? কী দক্ষতার সঙ্গে সেবার (পশ্য : *ন্যায়নিষ্ঠ ন্যাসনাশীর কাঁটা*) খুঁজে দিয়েছিল সেই ক্রিমিনালটার নাম-ঠিকানা, যার টেলিফোনের শেষ চারটে সংখ্যা ছিল 1836!

—আশ্চর্য! নম্বরটাও মুখস্ত আছে?

—তুমি ভুলে গেছ, অশোক। নম্বরটা কষ্ট করে মনে রাখতে হয় না। ওটা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মবৎসর!

—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঠিক আছে, আধঘণ্টার মধ্যেই আপনাকে রিং-ব্যাক করছি। আপনি ওই নম্বরে আধঘণ্টা আছেন তো?

—আছি।

—তাহলে আধঘণ্টার মধ্যেই ক্রিমিনালটার নাম-ঠিকানা পেয়ে যাবেন।

বাসু বলেন, ক্রিমিনাল? লোকটা যে ক্রিমিনাল তা কেমন করে বুঝলে?

—সহজেই! আমার স্বনামধন্য পূজ্যপাদ বাসু-মামু শুধু ক্রিমিনালদেরই তত্ত্ব-তালাশ নিয়ে থাকেন! এই কারণে!

—অ! তাই বুঝি? সেক্ষেত্রে আজ বাড়ি ফিরে গিন্নিকে বল, 'আজ দুপুরে হঠাৎ বাসু-মামু

ফোন করেছিলেন।' ভারতী ন্যাচারালি জানতে চাইবে, 'কেন?' তখন তোমার ওই সহজ সমাধানটা তাকে শুনিয়ে দিও—'আমার স্বনামধন্য পূজ্যপাদ বাসু-মামু শুধু ক্রিমিনালদের তত্ত্ব-তালাশই নিয়ে থাকেন যে!'

অশোক হো-হো করে হেসে ওঠে। বলে, আপনার সঙ্গে তর্ক-করা বৃথা—

—তাহলে অহেতুক বৃথা তর্ক কর কেন?—বলে লাইনটা কেটে দেন।

ক্র্যাডেলে টেলিফোনটা রাখা মাত্র সেটা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। আবার যন্ত্রটা তুলে নিখিলের নম্বরটা ঘোষণা করলেন। ওপক্ষের বক্তা বললে, স্যার দাশকে একটু ডেকে দেবেন? বলুন, মটোর ভেহিক্লস্ থেকে সেনগুপ্ত ফোন করছে।

বাসু নিখিলের দিকে তাকাতেই সে কর্ডলেস ফোনটা তুলে নিয়ে সুইচ টিপে দিল। ও-প্রান্ত থেকে সেনগুপ্ত বললে, আপনি যে গাড়ির নম্বরটা দিয়েছেন সেটা একটা অ্যাম্বাসাডারের। সাদা রঙ। এইট্টি ফাইভ মডেলের ইঞ্জিন। মালিকের নাম যশোবন্ত সিং। সম্ভবত পাঞ্জাবী শিখ। তার বাড়ির নম্বর বলব?

নিখিল টেলিফোনে বললে, একটু ধরতো, সেনগুপ্ত। আর একটা টেলিফোন বাজতে শুরু করেছে। সেটাকে থামাই...

বলে টেলিফোনের মাউথ-পিসে হাত-চাপা দিয়ে বাসু-সাহেবকে জিজ্ঞেস করে, যশোবন্ত সিং-এর নাম-ঠিকানা—

কথাটা ওকে শেষ করতে দিলেন না বাসু। বললেন, পণ্ডশ্রম! গাড়িটা ফিয়াট। কালো রঙ। বেটা ব্ল্যাকমেলিং করতে যাবার সময় নম্বরপ্লেটটা বদলে নিয়ে অপারেশনে যায়। প্রফেশনাল ব্লাকমেলার! ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে থাকতে চায়!

নিখিল এবার সেনগুপ্তকে জানিয়ে দেয়—যশোবন্ত সিং-রে নাম-ঠিকানায় তার প্রয়োজন নেই।

কাকলি এসে বলে, খানা তৈয়ার। খানা-কামরামে পাধারিয়ে।

ওঁরা চারজনে চলে আসেন সংগপ্ন খানা-কামরায়। নিখিল তার কর্ডলেস ফোনটা রেখে দিল পাশেই। শুধু দো-পেঁয়াজি নয়, একটা নিরামিষ তরকারি আর নারকোল দেওয়া ছোলার ডালও দিল ওই সঙ্গে। তাছাড়া রায়তা এবং দোকান-থেকে-আনা মিষ্টি দই। মধ্যাহ্ন আহার যখন মধ্যগগন অতিক্রম করছে, তখন আবার বেজে উঠল টেলিফোন। এবার হতাশাব্যঞ্জক কিছু নয়। সল্ট লেক থেকে শকুন্তলা রায় টেলিফোন করে জানালো—মদ্রসাহেব ফোন করে রীতার সন্ধান করেছে। শকুন্তলা ওঁর নির্দেশমতো লোকটার নাম জানতে চায়। লোকটা বলে, 'এক্সকিউজ মি ম্যাডাম! প্রয়োজনটা আমার নয়, রীতা দেবীর। একটু আগেই তিনি কী একটা দরকারে আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। কথাবার্তা বলতে বলতে যান্ত্রিক গোলযোগে লাইনটা কেটে যায়। কাইন্ডলি মিস বিদ্যার্থীকে একবার ডেকে দিন। আপনি তো মিস্ শকুন্তলা দেবী? তাই না?' জবাবে শকুন্তলা কড়া ধমক দেয়। আবার বিরক্ত করতে নিষেধ করে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে। লোকটা আর ফোন করেনি। বাসু ধন্যবাদ জানিয়ে লাইনটা কেটে দিলেন।

কৌশিক বললে, ওয়ান উইকেট ডাউন! মদ্র লোকটা কট-বিহাইন্ড হয়েছে। তার টেলিফোন নম্বরটা অন্তত জানতে পেরেছি আমরা।

বাসু বললেন, না। কট-বিহাইন্ড নয়। কট অ্যান্ড বোল্ড বাই সুকৌশলী! চিন্তা কর না, নাইন্টি-টু পার্সেন্ট চান্স লাঞ্চ শেষ হওয়ার আগেই দ্বিতীয় উইকেট পড়বে। এবার ক্লিন বোল্ড। অপর্ণার গুগলিতে!

বাসুর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। লাঞ্চ শেষ হবার আগেই অশোক মুখার্জি ফোন করে জানালো, সন্ত-মহারাজের নাম এস. স্বামীনাথন! বাগবাজার স্ট্রিটের ঠিকানাটাও দিতে পারল। বাসু ধন্যবাদ দিয়ে জানতে চাইলেন, 'সন্ত-মহারাজ' বলছ কেন?

অশোক জবাবে বললে, আমার স্বনামধন্য পূজ্যপাদ বাসু-মামু যে শুধু সাধুসন্তদের তত্ত্বতালাশ নিয়ে থাকেন তা আপনি জানেন না?

বাসু বললেন, দ্যাট্‌সে আ গুড পিস অব রেইলারি (raillery)।

পাঁচ

মধ্যাহ্ন আহারের পর বাসু-সাহেব কৌশিককে বললেন, তুমি এবার বাড়ি ফিরে যাও। আমি একটু বিশ্রাম নেব। তারপর নিখিল আমাকে ওল্ড-কোর্ট হাইস স্ট্রিটে নিয়ে যাবে।

নিখিল জানতে চায়, আপনি যাবেন, স্যার, ওই এম.এল.এ. অ্যাডভোকেটের চেম্বারে?

বাসু বললেন, না, নিখিল। সেটা সৌজন্যে মানা। ওই হাঁটুর বয়সী অ্যাডভোকেটের চেম্বারে আমি কেন আনইনভাইটেড যাব? তুমি আমাকে আমার চেম্বারেই নামিয়ে দিও। ওখানে আমার একটি সাবেকি ইজিচেয়ার আছে। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। রে-সাহেবের জুনিয়ার হিসাবে যখন কাজ করতাম তখন রে-সাহেব ওই ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান অবস্থায় ডিক্‌টেশন দিতেন।

নিখিল বলে, আমি জানি, স্যার।

—ওই ইজিচেয়ারে আমাকে বিশ্রাম করতে দিয়ে তুমি ঠিক পাঁচটায় অ্যাডভোকেট মাইতির চেম্বারে যেও। তার ইন্টারভিয়্যু নিয়ে আমার চেম্বারে ফির এস, আমাকে পিক্‌-আপ করতে।

কৌশিক বলে, তার মানে আপনি আজই শুনতে চান মিস্টার মাইতির বক্তব্যটা?

—না হে! অন্য কারণ আছে! তারপর আমরা দুজন—আমি আর নিখিল—যাব বাগবাজারে। সন্ধ্যার ঝোঁকে কিছু সাধু-সন্তের সন্ধানে। কীর্তিটা যদি তারই হয় তবে হয়তো সে ফেরার হয়ে যেতে পারে। অবশ্য সে এখনো জানে না যে, পুলিস তার ঠিকানা জেনে গেছে। তুমি তোমার মামিমাকে বলে দিও, আন্দাজ রাত নয়টার মধ্যে আমি ফিরব।

কৌশিক জানতে চায়, তার মানে, রাত্রে বাড়িতেই খাচ্ছেন তো?

—যদি না তোমার মামিমা মুখের সামনে নৈশাহার হিসাবে এক বাড়ি সাবুর পায়েস ধরে দেন।

কৌশিক নিউ আলিপুরের দিকে রওনা হয়ে গেল। নিখিল বাসু-সাহেবকে তাঁর চেম্বারে পৌঁছে দিল। তাঁর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে জুনিয়াররা খুশি হয় ওঠে। বাসু তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ-করা ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে সকলের তত্ত্ব-তালাশ নিতে থাকেন।

নিখিল যখন ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে মাইতি-সাহেবের চেম্বারে গিয়ে পৌঁছালো তখনো পাঁচটা বাজতে আট-দশ মিনিট বাকি। এটি একটি ত্রিতল মোকাম। শতখানেক বছর বয়স হবে হয়তো। দু'তিনটি অথবা দু'একটি ঘর দখল করে এক-একজন আইনজীবীর চেম্বার। কারও বা এককামরার আস্তানা। এমন কি কিছু লোকের খুপরি এত ছোট যে, একসঙ্গে তিনজন লোক

বসার জায়গা হয় না! ওই খুপরি ঘরের দখল পেতে হলে অন্তত লাখ-টাকা সেলামী দিতে হবে!

মাইতি-সাহেবের দখলে তিনটি কামরা। রবিন মাইতির পিতৃদেবও ছিলেন নামকরা অ্যাডভোকেট—ইনকাম ট্যাক্স আর সেলট্যাক্সের কেসই বেশি করতেন তিনি। তাঁর পরলোকগমনের পর রবিন মাইতি উত্তরাধিকারসূত্রে ঘর তিনখানির দখল পেয়েছে. রবিনের স্পেশালিটি বাড়িভাড়া সংক্রান্ত মামলা,—মালিক বনাম ভাড়াটে। অর্থাৎ ভাড়াটে উচ্ছেদের মামলা। অথবা বাড়িওয়ালাকে নাস্তানাবুদ করার।.

আদালতের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পাড়াটা ক্রমে ক্রমে ফাঁকা হতে শুরু করেছে। নিখিল নিজেই ড্রাইভ করে এসেছে। গাড়িটা পার্ক করে সে এগিয়ে গেল ত্রিতল বাড়িটার দিকে। মাইতি-সাহেবের চেম্বারের সামনে একজন চাপরাশি-জাতীয় লোক হঠাৎ এগিয়ে এসে বলল, সাহেবের শরীর খারাপ। আজ আর কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।

—'সাহেব' মানে মিস্টার রবিন মাইতি, অ্যাডভোকেটের কথা বলছ তো? তিনি কি চেম্বারে আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। আছেন। তবে শরীর খারাপ, তাই...

হঠাৎ তাকে সরিয়ে একজন বৃদ্ধ ল-ক্লার্ক এগিয়ে এসে নিখিলকে বিনম্র নমস্কার করেন। জোড়হস্তেই বলেন, আসুন। আসুন স্যার, বসুন এই চেয়ারটায়।

তারপর চাপরাশিটার দিকে ফিরে ধমক দেন, কাকে কী বল্‌ছিস্‌, কানাই? তোর কি কোনোদিন কাণ্ডজ্ঞান হবে না?

আবার নিখিলের দিকে ফিরে বলেন, আমার নাম মহেন্দ্রলাল জানা, স্যার। আমি ছোট-সাহেবের ল-ক্লার্ক। আমি জানি, আপনার আসার কথা আছে। পাঁচটার সময়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্যাডে আমিই লিখে রেখেছি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি, ছোট-সাহেবের শরীরটা একেবারে হঠাৎ...

বাধা দিয়ে নিখিল বলে, 'ছোট-সাহেব' মানে রবিনবাবু তো? তাহলে বড়-সাহেবটি কে?

—আমি স্যার, দু'পুরুষের গোলামী করছি। রবিনবাবুর বাবার আমল থেকে। তাই ওঁকে...

—বুঝেছি। তা আপনার ছোট-সাহেবের হয়েছেটা কী? ডাক্তার ডেকেছেন?

মহেন্দ্রবাবু রীতিমতো কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, কী ভাষায় আপনার কাছে মার্জনা চাইব জানি না—আমার বেয়াল্লিশ বছরের চাকরি, স্যার। এই একই চেম্বারে—দু' পুরুষের গোলামী আমার! কিন্তু আজ যে কাণ্ডটা হয়েছে তা আমার জীবনে ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। নেভার!

—কিন্তু হয়েছেটা কী?

—আপনি স্যার, এই ঘরে এসে বসুন। কথাটা একটু ইয়ে জাতীয়। গোপন...

জনান্তিকে সরিয়ে এনে মহেন্দ্রবাবু বললেন, ছোট-সাহেব একেরে বে-এক্তিয়ার। ইতিপূর্বে চেম্বারে তিনি কোনোদিন ড্রিংক করেননি, কিন্তু আজ...কি জানি কেন...সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে দেবার ফর্মান জারি করে দিয়েছেন!

—ও! বুঝলাম! চেম্বারে বসে মদ্যপান করছেন। একা? না কি বান্ধবী-টান্ধবীও আছে?

মহেন্দ্রবাবু দু'হাতে নিজের কান চাপা দিলেন।

নিখিল বললে, ঠিক আছে। আমি ফিরে যাচ্ছি। শুনুন : ওঁর খোঁয়াড় ভাঙলে ওঁকে বলবেন—হ্যাঁ, আমি বলে গেছি বলে আপনি তাঁকে জানাতে বাধ্য হচ্ছেন : নেশা ভাঙলে মিস্টার মাইতি যেন তাঁর ডায়েরিতে লিখে রাখেন—এক : বিধানকক্ষের বাইরে তিনি ভারতীয় নাগরিক মাত্র! প্রয়োজনে আমি তাঁর মাজায় দড়ি পরাতে পারি। দুই : আদালত থেকে যেদিন

সাক্ষী দেবার সমন পাবেন সেদিন মদ্যপান করলে তাঁর 'বার' লাইসেন্স বাতিল হয়ে যেতে পরে। তিন :...

মহেন্দ্রবাবু বললেন, ব্যস! ব্যস! আর দরকার নেই স্যার! আপনি বসুন! আমি আমার ডিউটিটা করি। আপনি এসেছেন—সময় মতোই এসেছেন—এ খবরটা তাঁকে দিয়ে আসি। তারপর তিনি যা করবেন তার জিম্মাদারী আমার নয়।

নিখিল বলল, ঠিক কথা! যান! ওঁকে বলুন আমি এসেছি! মাথায় ঢোকে ভাল, না ঢোকে তাও ভাল। তারপর নেশার ঝোঁকে তিনি যা করবেন, তার জিম্মাদারী আপনার নয়!

মহেন্দ্রবাবু ঊনবিংশতি শতাব্দীর বাবু-কালচারের ভঙ্গিতে 'যে-আজ্ঞে' বলে নব ঘুরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

নিখিলেশের হাতঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটাটা পুরো একটা পাক মারার সময় পেল না। তার আগেই দ্রাম করে খুলে গেল দরজাটা। বার হয়ে এলেন রবিন মাইতি। বছর চল্লিশ বয়স। সুন্দর সুঠাম চেহারা। গলার টাইটা শুধু আলগা করা—পা কিন্তু টলছে না। চুলও সুবিন্যস্ত। দুটি হাত জোড় করে বলেন, ছি, ছি, ছি! আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে এরা? আয়াম সো সরি। এদের হয়ে মার্জনা চাইছি আমি। আপনি ভিতরে আসুন, মিস্টার দাশ।

রবিন মাইতি তার স্টাফ্‌ড রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসল। তার টেবিলের উপর হোয়াইট হর্স হুইস্কির বড় বোতল, গ্লাস ও বরফ। নিখিলও বসল টেবিলের এপাশে ভিজিটার্স চেয়ারে। নিখিল বললে, মহেন্দ্রবাবু বলছিলেন, আপনি অসুস্থ। অসুস্থতা তো যে কোনো লোকের যে কোনও সময়েই হতে পারে। সুতরাং মার্জনা চাওয়ার কিছু নেই, মিস্টার মাইতি। আমি না হয় পরে আর একদিন আসব, ধরুন কাল।

মাইতি দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, আমি যে অসুস্থ নই, তা তো স্বচক্ষেই দেখছেন। সকালে খবরটা শুনেই আমি প্রচণ্ড শক্‌ড হই। ঠিক মনে নেই, কী কী কথোপকথন হয়েছিল, আপনাতে-আমাতে—কিন্তু আমি বোধহয় ঠিক ভদ্রজনোচিত কথাবার্তা বলিনি। ওই একই কারণে। আমার মাথার ঠিক ছিল না খবরটা শুনে। রীতা কেন..কেন হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসল?

নিখিল বলে, সেই রহস্যের সমাধান প্রচেষ্টাতেই তো আমার এই অভিযান। কিন্তু আপনি যখন...

—না, না, না, মিস্টার দাশ! আমি প্রস্তুত। আপনি যা জানতে চান তা অকপটে জানতে চাইতে পারেন। আই ওয়ান্ট টু নো, রীতাকে কেন...

নিখিল পকেট থেকে ছোট্ট একটি টেপ-রেকর্ডার বার করে টেবিলে রেখে বলল, সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু আমাদের কথাবার্তা টেপ করে রাখব।

—য়ু থিংক আয়াম টিপ্‌সি?

নিখিল জবাব দিল না। সুইচ টিপে জাপানি টেপ-রেকর্ডারটা চালু করে দেয়। স্পষ্ট উচ্চারণে বলে, মিস্টার মাইতি, আজ চোদ্দই নভেম্বর, সোমবার, আপনি বিকাল পাঁচটায় আপনার চেম্বারে আমার সঙ্গে রীতা বিদ্যার্থীর মৃত্যু-বিষয়ে আলোচনা করতে রাজি হয়েছিলেন; কিন্তু শুনলাম আপনার শরীর ভাল নয়। তা সত্ত্বেও আপনি কি আলোচনাটা চালিয়ে যেতে চান?

মাইতি হাসলেন, বললেন, বি ইট রেকর্ডেড, আমি সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায়, স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করছি। অথবা বলতে পারেন, আমার জবানবন্দি দিচ্ছি!

নিখিল জানতে চায়, আপনি এইমাত্র বলছিলেন, আপনি প্রচণ্ড শক্‌ড হয়েছেন, মিস্ বিদ্যার্থীর মৃত্যুতে। কিন্তু কেন? তিনি আপনার আত্মীয় নন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কি?

মাইতি টেপ-রেকর্ডার যন্ত্রটা দেখিয়ে বললেন, ওটা চালু থাকলে আমি যে জবাবটা দেব তা 'নাথিং বাট দ্য ট্রুথ' হবে না, মিস্টার দাশ! সেটা রাখা-ঢাকা 'ডাইলিউটেড ট্রুথ' হবে।

নিখিল তৎক্ষণাৎ যন্ত্রটা সুইচ-অফ করে পকেটে পুরল। বলল, না। আমি খোলামেলা আলোচনা করতেই এসেছি। আপনাকে জড়াতে নয়। শুধু জানতে এসেছি। বলুন, আপনি এতটা শক্‌ড হলেন কেন?

—বিকজ আই লাভড্ হার। নিজের হাতে নিজেকে হত্যা না করলে আমি তাকে জীবনসঙ্গিনী করতাম!

নিখিল অবাক হয়ে গেল মদ্যপটার দৃঢ়তায়। জানতে চায়, কতদিন ধরে তাকে চিনতেন?

—ধরুন তিন মাস!

—এ তিন মাসে কতবার আপনাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে?

—তিন মাসে বারো-তেরোটা সপ্তাহ। আন্দাজ সপ্তাহে দু'বার ধরে বার পঁচিশ।

—তাকে প্রথম কোথায় দেখেন?

—তার কর্মস্থলে। আমি ওদের কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। রিসেপ্‌শানিস্ট হিসাবে সেখানে ওকে প্রথম দেখি। এম. ডি. একটা মিটিঙে ছিলেন। ফলে আমাকে রিসেপ্‌শনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। প্রায় পনের মিনিট। তখন ওর সঙ্গে আলাপ হয়। ওর রূপে, ওর ব্যবহারে, ওর মোহিনী চৌম্বকবৃত্তিতে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই! ওই পনের মিনিটের মধ্যেই আমি ওর প্রেমে পড়ে যাই, মিস্টার দাশ! ও তখনও আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল কিনা, জানি না।

নিখিল বলে, কীভাবে আলাপটা শুরু হয়, মনে আছে আপনার?

ম্লান হাসল মাইতি। বলল, আর একটা গ্লাস আনতে বলব? কম্পানি দেবেন আমাকে?

নিখিল সংক্ষেপে বলল, নো থ্যাংক্‌স্!

—আপনি ড্রিঙ্ক করেন না আদৌ?

—করি। য়ুনিফর্ম পরে নয়। ডিউটি আওয়ার্সে নয়!

—ও আয়াম সরি।

টঙে করে একটা আইস-কিউব তুলে নিয়ে গ্লাসে দিলেন। এক সিপ্ পানীয় মুখে টেনে নিয়ে বললেন, কী যেন প্রশ্ন করলেন? হ্যাঁ, হাউ আই স্টার্টেড টু ফল সো ডীপ ইন ল্যাভ্!

এবার সে ড্রয়ার থেকে বার করল ইন্ডিয়া কিঙের ডবল্ প্যাকেট, আর লাইটার। একটা স্টিক্ বার করে ঠোঁটে চেপে লাইটার দিয়ে ধরালো। তারপর বললে, ডিউটি আওয়ার্সে স্মোকও করেন না, না কি?

নিখিল জবাব দিল না। একটা সিগ্রেট নিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরতেই রবিন মাইতি লাইটার বাড়িয়ে সেটা জ্বালিয়ে দিল।

তারপর বন্ধ ঘরের ভিতর সিগারেটের রিঙ পাকাতে পাকাতে সে ফিরে গেল তার প্রথম সাক্ষাতের দিনটাতে। স্মৃতির সরণী বেয়ে সেই শীতাতপ-তথা-ধূম্র-নিয়ন্ত্রিত রিসেপ্‌শান কাউন্টারে।

ঘরে আর কেউ ছিল না। টীক-প্যানেলিং-করা ঘেরাটোপ কাউন্টারে বন্দিনী নারীর মতো বসে ছিল রীতা বিদ্যার্থী। তার পরনে ময়ূরকণ্ঠী রঙের একটা কাঞ্জিভরম শাড়ি। লাল চওড়া পাড়। ওই রানী-কালার রঙেরই আঁটো জ্যাকেট। পিছনে বোতাম। নীবিবন্ধের অনেকটাই

অনাবৃত। হাতির দাঁতের মতো দুটি শুভ্র বাহু। বব্‌কাট চুল। কপালে ছোট্ট একটা রানী-কালার টিপ্। অদূরে বসে আছে রবিন মাইতি। থ্রি-পিস্ স্যুট। হাতে সিগ্রেট।

মেয়েটি বললে, আয়াম সরি, স্যার। মনে হয় মিনিট পনের অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।

মাইতি বলেছিল, আই ডোন্ট মাইন্ড। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, ড্যাম্প ওয়েদার। এখানে তো ভালই বসে আছি আমি। আমার হাতে সময়ও আছে।

মেয়েটি বললে, ও-পাশের টেবিলে কিছু ম্যাগাজিন আছে। উল্টোপাল্টে দেখতে দেখতে সময় কাটাতে পারেন।

মাইতি বলেছিল, ও তো দেখছি ফিলম্-ফেয়ার, ডেবনেয়ার, আর স্টারডাস্ট! শুধু সুন্দরী মেয়েদের ছবি!

মেয়েটি চোখ বড় বড় করে বললে, কী আশ্চর্য! সুন্দরী মেয়ের ছবি দেখতে আপনার ভাল লাগে না? দেখেন না?

—ভাল লাগে। দেখিও। যখন ত্রিসীমানায় সুদৃশ্য নয়নাভিরাম কিছু থাকে না।

মেয়েটি হাসল। মাইতির নজর হলো হাসলে ওর গালে সুন্দর টোল পড়ে। কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজিতে। মাইতি বলে, আমার নাম তুমি জান, আমি কিন্তু তোমার নামটা...

—রীতা বিদ্যার্থী।

—তুমি কেরালার মানুষ, তাই না?

—না, স্যার, আমি কর্ণাটকের মেয়ে।

—ক্রিশ্চিয়ান?

—বাই নো মীনস্। আমি হিন্দু।

—আমি তোমাকে কী বলে ডাকব? মিস্ বিদ্যার্থী, না মিসেস্ বিদ্যার্থী?

—ডাকাডাকির কি সুযোগ কিছু পাবেন? এখনি তো আপনার নিজের ডাক আসবে বড়-সাহেবের ঘর থেকে।

—তবু?

—আপনি আমাকে 'রীতা' বলেই ডাকতে পারেন। বয়সে যখন আপনি বড়!

মাইতি বুঝতে পারে, রীতা বিদ্যার্থী কৌশলে এড়িয়ে গেল প্রশ্নটা। জানতে চায়, কলকাতার কোন্ অঞ্চলে থাক তুমি?

—লবণ হ্রদ এলাকায়।

—তবে তো তুমি আমার এলাকার লোক?

—আপনিও সল্ট লেখে থাকেন বুঝি?

—না! তবে সল্ট লেক আমার কন্সটিটুয়েন্সিতে পড়ে।

—কন্সটিটুয়েন্সি?

—আমি অ্যাসেম্লিতে আছি। বাই প্রফেশন অ্যাডভোকেট। সল্ট লেকের কোন দিকটায় থাক তুমি?

—আট নম্বর ওভারহেড ট্যাঙ্কের কাছাকাছি।

—তাই নাকি! করুণাময়ীতে? ওখানে আমার এক বান্ধবীও থাকে। তাকে চেন? শকুন্তলা রায়? তোমাদের পাড়ারই মেয়ে।

boiboi.net

রীতা বিদ্যার্থী খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে বলেছিল, শকুন্তলা আপনার বান্ধবী? কেমনতর বান্ধবী? গত এক বছরের ভিতর তো সেই বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যাননি আপনি একবারও!

—তুমি কেমন করে জানলে?

—যেহেতু ওই একই বাড়িতে আমি থাকি। কুন্তলা আমারও বান্ধবী। আমার ক্লাস-মেট! বর্তমানে আমার রুমমেট!

মাইতি আরও ঘনিষ্ঠ আলাপ জমাবার অবকাশ পায়নি। কারণ তখনই ভিতরের মিটিঙটা শেষ হলো। ভিতর থেকে একজন উর্দিধারী পিওন এসে ওকে বললে, আপনাকে বড়-সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

মাইতি উঠে দাঁড়ায়। জানতে চায়, আমি মিটিঙ সেরে ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি কি ডিউটিতে থাকবে, রীতা?

—ডিপেন্ডস্! আপনার মিটিং কতক্ষণ ধরে চলবে তা তো আমি জানি না।

সেই ওদের প্রথম আলাপ।

মাইতি তার প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা শেষ করে গ্লাসে আবার একটা চুমুক দিল। নিখিল বলে, বুঝলাম। তারপর নিশ্চয় সল্ট লেকের দিক থেকে একটা চৌম্বক আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন। সপ্তাহে গড়ে দু'বার সেই আট নম্বর ট্যাঙ্কের...

বাধা দিয়ে মাইতি বলে, নো, স্যার! য়ু আর রং দেয়ার! বিদ্যার্থীর বাড়িতে যাওয়ায় বাধা ছিল। টেলিফোন করারও। আমি সময় পেলে অফিস ছুটির পর ওর সঙ্গে অফিসেই দেখা করতাম। অফিসেই ফোনে কথাবার্তা হতো। ফেরার পথে কখনো আমরা সিনেমা দেখেছি, কখনো রেস্তোরাঁয় নৈশ আহারও সেরেছি।

—ওর বাড়িতে যাওয়ার বাধাটা কী ছিল?

মাইতি একদৃষ্টে তার গ্লাসের দিকে তাকিয়ে থাকল। জবাব দিল না।

নিখিল জানতে চায়, আর মিস্ শকুন্তলা রায়ের সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ? কীভাবে আলাপটা হয়েছিল?

মাইতি আবার একটা সিপ্ দিয়ে বললে, য়ু আর ভেরি শার্প, মিস্টার দাশ। ঠিকই বুঝেছেন। রীতার বাড়িতে যাওয়ার সেটাই ছিল বাধা।

—এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব নয়!

—না। আপনার পূর্ববর্তী অজবাবিত প্রশ্নের জবাব। কুন্তলার সঙ্গে আমার আলাপ সাত-আট বছর ধরে। আমি ওর অসীম উপকার করেছি। ও-ও আমার জানকবুল উপকার করেছে। আমরা দুজনেই দুজনের কাছে ওব্লাইজড—কৃতজ্ঞ। মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমি কৃতজ্ঞতাপাশটাই বন্ধনের সীমান্ত বলে মেনে নিতে চাইছিলাম; কিন্তু...

নিখিল বললে, এখনও কিন্তু আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেননি। শকুন্তলার সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপ হলো কীভাবে? এখন অবশ্য আরও দুটি প্রশ্ন যোগ করব—কোন সূত্রে আপনারা দুজনে দুজনের প্রতি কৃতজ্ঞ?

—রীতা বিদ্যার্থীর আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানে সেসব তথ্যের কোনও প্রয়োজন আছে কি, মিস্টার দাশ?

—আছে। প্রচণ্ডভাবে আছে। হেতুটা আমি যাবার আগে জানিয়ে যাব। তার আগে—যদি এটাকে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে আমার অহৈতুকী নাক-গলানো বলে মনে না করেন—শকুন্তলার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা আমি সমঝে নিতে চাই। বলবেন?

—বলব। আশা করি এটা প্রকাশ হবে না।

—না। নিশ্চয় নয়।

—অল রাইট। শুনুন তাহলে—

প্রায় সাত বছর আগেকার কথা। রবিন তখনো সিনিয়ার অ্যাডভোকেট হয়নি। এম. এ. আর ল পাস করে এক পিতৃবন্ধুর কাছে অ্যাপ্রেনটিস্ হিসাবে কোর্টে যাচ্ছে। আর সেই বছরই গ্র্যাজুয়েট হলো শকুন্তলা রায়। বাঙলা অনার্স। ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড। শকুন্তলার বাবা তার আগেই মারা গেছেন। মা তখনো জীবিতা। দাদা মার্কিন মুলুকে। বাবার রেখে যাওয়া টাকার সুদে কোনোরকমে সংসার চলে। দাদাও সাহায্য পাঠায়, তবে নিয়মিত নয়। বৌদি বিদেশিনী। শকুন্তলার ইচ্ছে নয়, দাদার অর্থনৈতিক সাহায্য হাত পেতে নেবার। মায়েরও সেটা পছন্দ নয়। বি. এ. পাস করে সে মরিয়া হয়ে একটা চাকরি খুঁজতে থাকে। একটার পর একটা দরখাস্ত।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিল বিভাবতী মাইতি সেকেন্ডারি স্কুলে। ওঁরা বাঙলার জন্য একজন শিক্ষিকা নেবেন। ন্যূনতম যোগ্যতা : বাঙলা ভাষায় অনার্স গ্র্যাজুয়েট। কপাল ঠুকে দরখাস্ত ছেড়ে দিল শকুন্তলা।

বিভাবতী হচ্ছেন রবিন মাইতির পিতামহী। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ওর পিতৃদেব, সিনিয়ার মাইতি-সাহেব। তিনি গভর্নিং-বড়ির প্রেসিডেন্ট। রবিন তাঁর একমাত্র পুত্র। সেও ছিল গভর্নিং-বড়ির জনৈক সদস্য। ঘটনাচক্রে রবিন বাঙলায় এম. এ.। তাই ইন্টারভিয়ু বোর্ডে তার প্রাধান্যটাই অন্য সবাই মেনে নিয়েছিলেন। যারা ইন্টারভিয়ু দিতে এসেছে তাদের প্রশ্ন করেছিল রবিনই।

কতজন প্রতিযোগিনী ছিল তা আজ আর মনে পড়ে না। তবে দুজন এম. এ. বি. টি ছিলেন। একজন পি. এইচ. ডি. করছিলেন। রবিন খুব জোর দিয়ে শকুন্তলার রায়কে সমর্থন করেছিল। তার যুক্তিটা ওঁরা মেনে নিয়েছিলেন। বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা। রবিনের মতে—অন্য সবাই এ চাকরিটাকে 'জাম্পিং-বোর্ড' হিসাবে গ্রহণ করবে। চাকরিতে যোগদান করেই মেয়েদের কলেজে অধ্যাপনার জন্য দরখাস্ত করতে থাকবে। পরিবর্তে যদি এই মধ্যবিত্ত ঘরের অভিভাবকহীন মেধাবী মেয়েটিকে নেওয়া হয় এবং স্কুলে শিক্ষকতা করতে করতেই যদি তাকে এম. এ. পাস করানো যায়, তাহলে মেয়েটি কৃতজ্ঞতাবশত এখানেই টিকে যেতে পারে। স্কুলের প্রতি একটা মায়াও পড়ে যাবে তার।

তিন-তিনটি এম. এ. পাস প্রতিযোগিনীকে টপ্‌কে শকুন্তলা চাকরিটা পেয়ে যায়। পরে হেডমিস্ট্রেস-এর কাছ থেকে—তিনিও ছিলেন সিলেকশন বোর্ডে—জানতে পারে, কার জন্য তার চাকরিটা হলো!

রবিন মাইতির স্পষ্ট মনে আছে সেই ইন্টারভিয়ু নেবার দিনটার কথা। একটা পাটভাঙা সাদা-খোল, নীলপাড় তাঁতের শাড়ি পরে ইন্টারভিয়ু দিতে এসেছিল শ্যামলা মেয়েটি। তখন সে আদৌ পৃথুলা ছিল না। যৌবন তার কানায় কানায়—মধ্যক্ষাম দেহাবয়ব। নমস্কার করে সামনের চেয়ারে বসতেই রবিন মাইতি মেয়েটিকে প্রশ্ন করেছিল, আপনি ফার্স্টক্লাস সেকেন্ড হয়েছেন দেখছি। ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হতে পারলেন না কেন?

ভেবেছিল, মেয়েটি কৈফিয়ৎ দিতে আমতা-আমতা করবে। বাড়িতে কারও অসুখ করেছিল, নিজের শরীর খারাপ হয়েছিল ইত্যাদি কোনো একটা অজুহাত খাড়া করবে। শকুন্ততলা সে দিক দিয়েই গেল না। তার আয়ত হরিণ নয়ন মেলে বললে, এর তো সহজ জবাব। যে ছেলেটি ফার্স্ট হয়েছে সে আমার চেয়ে ভাল আনসার করেছিল বলে।

এরপর রবিনের বাবা মেয়েটির পারিবারিক তথ্য, বাল্য-কৈশোরের সংবাদ

করলেন। শকুন্তলার বাবা কেন্দ্রীয় সরকারে ভাল চাকরি করতেন। তিনি যখন বাঙ্গালোরে পোস্টেড তখন ও স্কুল-ফাইনাল পাস করে। পরে চলে আসে কলকাতায়। বেথুন থেকে বি. এ. করেছে। বাঙ্গালোরে সে বাংলা পড়েনি। এখানে একটি বছর তাই নষ্ট হয়েছে তার।

অন্যান্য সবাই নানান রকম প্রশ্ন করার পর আবার রবিনকেই তুলে নিতে হলো 'বাঙলা' বিষয়ে প্রশ্ন করার দায়িত্বটা। ও জিজ্ঞেস করেছিল, রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থের কোন পংক্তিটা আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে এবং কেন ভাল লাগে?

ইন্টারভিয়ু দিতে আসা প্রার্থীর কাছে এমন একটা বেমক্কা প্রশ্ন রীতিমত কঠিন। শকুন্তলা কিন্তু ঘাবড়াল না। জবাবে তৎক্ষণাৎ বলেছিল, "মনে রে আজ কহ যে/ভালমন্দ যাহাই আসুক সত্যরে লও সহজে।" গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দশ-বিশটা শ্লোকে যে কথা বলেছেন, এখানে মাত্র দুটি পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ তা বলতে পেরেছেন—সহজবোধ্য সরল ভাষায়। এ দুটি পংক্তি ভারতীয় দর্শনের নিষ্কামকর্মের সরলীকৃত চুম্বকসার।

মুগ্ধ হয়েছিল সবাই।

রবিন শেষ প্রশ্ন পেশ করেছিল শেষের কবিতা থেকে। জানতে চেয়েছিল, শেষের কবিতার শেষ কবিতার মোদ্দা কথাটা কী?

শকুন্তলা জবাবে বলেছিল, সেটা নির্ভর করে পাঠকের মানসিকতার উপর। *'ঝরাফুল'* কাব্যগ্রন্থের লেখক পেসিমিস্টিক কবি করুণানিধানের মতে হয়তো মোদ্দা কথাটা "হে বন্ধু বিদায়"; আবার পরশুরামের *'রাতারাতি'* কাহিনীর অপ্‌টিমিস্ট নায়িকার মতে, "উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে/ সেই ধন্য করিবে আমাকে!"

এককথায় চাকরি হয়ে গেল শকুন্তলার।

• বেশ কিছুদিন চাকরি করার পর একদিন স্কুলের নির্জন করিডোরে শকুন্তলার সঙ্গে ঘটনাচক্রে রবিনের দেখা হয়ে গেল। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শকুন্তলা টিচার্সরুমে বসে মেয়েদের খাতা দেখছিল এতক্ষণ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। স্কুলবাড়ির পাশেই রাধাশ্যামের মন্দিরে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। শকুন্তলা খাতাপত্র গুছিয়ে বারান্দা দিয়ে গেটের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ লক্ষ্য হলো, বিপরীত দিক থেকে রবিন মাইতি এগিয়ে আসছেন। শকুন্তলা পাশ দিল। হাত তুলে নমস্কারও করল। রবিন ওর সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রতিনমস্কার করে বলল, কেমন আছেন মিস্ রায়? চাকরিটা ভাল লাগছে?

শকুন্তলা গ্রীবা সঞ্চালনে জানাল, তার ভাল লাগছে, অথবা সে ভাল আছে। রবিন চলতে শুরু করতেই ও পিছন থেকে হঠাৎ ডেকে উঠল, শুনুন?

রবিন দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়। কৃতজ্ঞতার আবেগে শকুন্তলা বলে বসে, হেডমিস্ট্রেস আমাকে সব কথা বলেছেন।

—'সব কথা'? মানে?

—আপনি আমাকে সাপোর্ট না করলে আমার চাকরিটা হতো না।

—তাই বলেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। আমি কৃতজ্ঞ। অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বলুন, কীভাবে আমি আপনাকে...

কথাটা বেচারি শেষ করতে পারেনি। ওর হঠাৎ মনে হলো, এই নির্জন করিডোরে ওর অন্তরের আকুতিটার একটা কদর্য ইন্টারপ্রিটেশান হতে পারে। একটি কুড়ি বছরের অনূঢ়া যুবতী মেয়ে যদি একজন সুদর্শন অবিবাহিত যুবককে নির্জনে এমন কথা বলে...

রবিন সহাস্যে বলেছিল, বলুন? বাক্যটা আপনি শেষ করেননি—

দুরন্ত লজ্জায় শকুন্তলা বলেছিল, না করিনি! আমার হঠাৎ মনে হলো এ-কথায় আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না তো?

—কী কথায়? কী ভুল বুঝব?

মর্মান্তিক আহত হরিণীর মতো শকুন্তলা তার উপকারকারীর দিকে তাকিয়েছিল। তার মুখে কথা সরেনি। রবিন আবার হেসে বলেছিল, না, শকুন্তলা। তোমার 'প্রত্যুপচিকীর্ষার' ভুল ইন্টারপ্রিটেশন আমি করব না। কিন্তু এই নির্জন করিডোরে দাঁড়িয়ে সে-বিষয়ে আলোচনা করলে দূর থেকে তৃতীয় ব্যক্তি ভুল বুঝতে পারে। কাল তো ছুটির দিন। কাল সকালে আমাদের বাড়িতে এস। কথা হবে।

রবিন মাইতি কদিন আগে পার্টি নমিনেশন পেয়েছে। সে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচনপ্রার্থী। তার নিষ্ঠাবান কর্মীর খুব দরকার।

রবিন মাইতির ইলেকশনের সময় জান-কবুল লড়ে গিয়েছিল মেয়েটি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটার লিস্ট যাচাই করা, আর সারা দিন ধরে শহরের দেওয়াল দখল। রবিন মাইতি বাইশ হাজার ভোটে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে যে পরাজিত করতে পেরেছিল তার জন্য শকুন্তলার বিরাট অবদান অনস্বীকার্য!

শকুন্তলা সে সময় দিবারাত্র ওদের বাড়িতে পড়ে থাকত। ইলেকশনের কাজে। মেয়েটিকে মাইতি-জননীর নজরে ধরে। একমাত্র পুত্রের বিবাহের জন্য তিনি অনেকদিনই উদ্‌গ্রীব। পুত্রকে প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন। রবিন মাইতি বলেছিল, কী যে বল মা! সব সময়েই তোমার ওই এক বায়নাক্কা!

কেন যে শকুন্তলাকে বিবাহ করতে সে রাজি নয়, তা মাকে জানায়নি। বোধকরি নিজের চেতন মনকেও সে কোনে কৈফিয়ত দেয়নি। কিন্তু শকুন্তলার এই সাহায্যের প্রতিদান সে দিয়েছিল—আর্থিক সাহায্য নয়, অন্যভাবে। ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, শিক্ষিকা হিসাবে নৈশ-ক্লাস করে সে যাতে এম. এ. পরীক্ষাটা দিতে পারে। মাইতি ওর প্রতি মুগ্ধ হয়েছিল আরও একটা কারণে : শকুন্তলার বাঙলাপ্রীতিতে। মাইতি নিজেও বাঙলা ভাষার একান্ত সেবক। কবিতা-টবিতা লেখে! নিজের খরচে কবিতার বইও ছাপিয়েছে। সে মুগ্ধ হয়েচিল, এই কারণে যে, শকুন্তলা স্কুল-জীবনে আদৌ বাঙলা পড়েনি, বাঙ্গালোরে থাকার সময়। অথচ বাঙলা বই পড়েছে, বাঙলা-ভাষাকে ভালবেসেছে। ওর বাবা কলকাতায় বদলি হবার পর 'স্পেশাল পেপার' পাশ করে, একটি বছর নষ্ট করে, সে বি. এ. তে বাঙলা অনার্স নেবার অনুমতি পায়। মাইতির নিজস্ব সংগ্রহে প্রচুর বাঙলা বই। গল্প-উপন্যাস, ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য, ভাষাতত্ত্বের উপর গ্রন্থ। শকুন্তলাকে সে লাইব্রেরির কপাট উজাড় করে খুলে দিয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। লাইব্রেরি মালিকের হৃদয়-দুয়ার শকুন্তলা খুলতে পারেনি।

রবিন মাইতি যে ঠিক এই ভাষায় স্বীকার করেছিল তা নয়, তবে 'হোয়াইট হর্স' হুইস্কির মাদকতায় মেশানো তার স্বীকৃতি থেকে নিখিল এভাবেই ব্যাপারটার ধারণা করেছিল। মাইতি থামলে নিখিল জানতে চায় : ঠিক আছে, 'ইটার্নাল ট্রায়াঙ্গেল'-এর প্রসঙ্গে এখানেই ছেদ টানা যাক। আমি একটি প্রশ্ন করি : মিস্ বিদ্যার্থী কি বেঁয়ো ছিলেন?

—মানে? 'লেফ্‌ট্-হ্যান্ডার' ছিলেন কি না?

—ইয়েস। তিনি কি বাঁ-হাতে লিখতেন?

—কী আশ্চর্য! সে প্রশ্ন উঠছে কেন?

—মিস্টার মাইতি! আমি যা জানতে চাই তা প্রথমে আমাকে জানান। তারপর যাবার

আগে—কথা দিচ্ছি—আপনার সব কৌতূহল আমি মিটিয়ে দিয়ে যাব। মিস্ বিদ্যার্থীর মৃত্যু সংক্রান্ত যেটুকু তথ্য আমরা জেনেছি। আপাতত বলুন, বিগত তিন মাসের মধ্যে আপনি কি মিস্ বিদ্যার্থীকে কিছু লিখতে দেখেছেন—চিঠি, চিরকুট, চেক? কোন হাতে?

রবিন মাইতি দীর্ঘক্ষণ তার পানপাত্রের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললে, সরি! মনে পড়ছে না। সে লেফ্‌ট্‌-হ্যান্ডার ছিল কি না আমি জানি না।

—আপনারা তো রেস্তোরাঁয় বসে একসঙ্গে খেয়েছেন। মনে পড়ছে না মিস্ বিদ্যার্থী ডান হাতে কোনটা ধরতেন? ছুরি না ফর্ক?

—তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। অনেক লেফট্-হ্যান্ডেড ব্যাটস্‌ম্যান আছে যারা ডান হাতে বল করে। রিচার্ড হ্যাডলি যেমন একজন।

—সেটা তো এক্‌সেপশন—ব্যতিক্রম!

—তা যদি বলেন, তাহলে আমি বলব 'লেফট্ হ্যান্ডেডনেস্' টেন্ডেন্সিটাই তো একটা ব্যতিক্রম।

—ট্রু। তবু আপনার মনে পড়ে না?

একটু চিন্তা করে রবিন মাইতি বলে, হ্যাঁ মনে পড়ে। রীতা ডান হাতে ছুরি আর বাঁ হাতে কাঁটা নিয়ে খেত। আমার-আপনার মতোই। কিন্তু এ-প্রশ্নটা কেন জানতে চাইছেন?

নিখিল দুদিকে মাথা নেড়ে বলল, আপনার সঙ্গে মিস্ বিদ্যার্থীর শেষ যোগাযোগ কবে হয়েছিল? কোথায়?

—এগরোই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার। ওকে অফিসে ফোন করে জানতে চেয়েছিলাম কালীপূজার সন্ধ্যাটা ফ্রি রাখতে পারবে কি না। ও বলেছিল, না! ওইদিন শকুন্তলা কোথায় বুঝি যাবে আর সন্ধ্যেবেলায় ওর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি ঠাট্টা করে জানতে চেয়েছিলাম, 'এনি আদার স্যুটার?' ও বলেছিল, 'তোমার হিংসে হচ্ছে? ভয় নেই। যাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট তাঁর বয়স তিন কুড়ির ওপরে।'

নিখিল বলে, থ্যাংস-আ-লট! আমার আপাতত আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

উঠবার উপক্রম করতেই রবিন মাইতি নিখিলের হাত চেপে ধরে। বলে, সে কি মশাই! আপনি না কথা দিয়েছিলেন...

ওকে মাঝপথে থামিয়ে নিখিল বলে, আজ থাক প্লিজ। আপনি এমনিতেই অত্যন্ত কঠিন আঘাত পেয়েছেন একটা।

—নো, নো, নো! বলুন? আপনারা কতটুকু কী জানতে পেরেছেন। রীতা 'লেফট্-হ্যান্ডার' কি না এ প্রশ্নটা উঠছে কেন?

—যেহেতু মৃত্যুর পরে তাঁর ডান হাতে ধরা ছিল পিস্তলটা!

—তাই তো থাকবে! যদি সে লেফট্-হ্যান্ডার না হয়।

—আই এগ্রি। কিন্তু বুলেট-উন্ডটা তার বাঁ কানের উপর ঠিক এইখানে—

নিজের বাম কর্ণের উপর কপালের শেষ প্রান্তটা দেখায়।

রবিন মাইতি অনেকটা অ্যালকোহল নিয়েছে তার পাকস্থলীতে। মস্তিষ্কে তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ব্যাপারটা সমঝে নিতে সে তার নিজের মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটা বাম-কর্ণমূলে নিয়ে গিয়ে কল্পিত পিস্তলের ট্রিগার টানার চেষ্টা করে। শেষে বলেই বসে, বাট্ দ্যাটস্ অ্যাবসার্ড!

—ইয়েস, আমাদের তাই আশঙ্কা : হয়তো এটা 'কেস অব সুইসাইড' আদৌ নয়! মার্ডার!

শেষ শব্দটার প্রতিক্রিয়া হতে একটু সময় লাগল। তারপর ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠে

দাঁড়াল রবিন মাইতি। মনে হচ্ছে অক্ষিগোলক থেকে ওর চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়।

নিখিল বলে, আমরা নিশ্চিত নই এখনো। আপনি শান্ত হোন, মিস্টার মাইতি! আমরা তো ইন্‌ভেস্টিগেট করছিই।

মাইতি তার বাম করতলে দক্ষিণ হস্তে মুষ্ট্যাঘাত করে চিৎকার করে ওঠে : ড্যাম ইট! মার্ডার!!

তৎক্ষণাৎ দরজাটা খুলে যায়। কানাই আর মহেন্দ্রবাবু যুগলে প্রবেশ করেন ঘরে। রবিন ততক্ষণে বসে পড়েছে চেয়ারে। বস্তুত এলিয়ে পড়েছে। মহেন্দ্রবাবু আর কানাই দুদিক থেকে সেদিকে এগিয়ে এসে ছোট-সাহেবকে সাঁড়াশি আক্রমণে চেপে ধরেন।

নিখিল নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হয় ঘর থেকে।

ছয়

সন্ধ্যা ছয়টা-সাড়ে ছয়টার সময় বি.বা.দী বাগ থেকে বাগবাজার পর্যন্ত ড্রাইভ করা নিতান্ত বখেড়ার কথা। ছুটির দিন ছাড়া এই দুঃসাহসিক অভিযান যিনি না করেছেন তাঁকে সেকথা বোঝানোর ক্ষমতা আমার নেই, আর যাঁরা সে নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছেন তাঁদের তা বোঝাতে যাবার প্রচেষ্টা বাহুল্য। কিন্তু গাড়ির মাথায় ঘূর্ণ্যমান লাল-বাতির ক্রমাগত 'অ্যাঁ-ওঁ'-র ব্যবস্থা যার আছে, তার কাছে কুড়ি মিনিটে এ-পথ পাড়ি দেওয়া অসম্ভব নয়। নিখিল বাসু-সাহেবকে এই মটোরাকীর্ণ যানপথের ভিতর দিয়ে নিয়ে আসতে পারল ওই কুড়ি মিনিটেই। একবারেও পিছনের গাড়ির হর্নের তাগাদা অথবা সামনের গাড়ির একজস্ট পাইপের কার্বন-ডায়োক্সাইডে আপ্যায়িত হতে হলো না ওঁদের।

গাড়িতে যেতে যেতে বাসু-সাহেব জানতে চাইলেন, কী বুঝলে? মাইতি-সাহেব কোনও 'ক্লু' সরবরাহ করতে পারল?

—তা পারল। আপনার অনুমানই ঠিক। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যোগ থাক বা না থাক—এ মৃত্যু ঘিরে একটা অদৃশ্য শাশ্বত ত্রিকোণ বর্তমান। বেস-এ দুটি নারী—একজন দীর্ঘদিনের বান্ধবী, যাঁকে পছন্দ করেছেন শীর্ষবিন্দুর জননী এবং যিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন পর পর দুবার মাইতির নির্বাচনের সময়। অপরপ্রান্তে একজন অত্যন্ত সুন্দরী যৌবনবতী, যে উড়ে এসে জুড়ে বসে প্রথমজনের অধিকার জবর-দখল করতে চাইছে। ফলে ত্রিকোণের শীর্ষবিন্দু একেবারে ভেঙে পড়েছেন! 750 মিলিলিটার একসিটিং-এ কর্পূর!

বাসু বললেন, তা তো বুঝলাম। কালীপূজার রাতে সে কোথায় ছিল? তার নিজের অ্যালেবাইটা কী?

নিখিল একটু অবাক হয়ে বলে, কী বলছেন স্যার! সে সম্ভাবনা আমার মনে আদৌ জাগেনি। লোকটা রীতার মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েছে, অফিসে বসে মদ্যপান করছে—সে কেন নিজে হাতে...

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, ওই তোমাদের দোষ নিখিল! তোমরা নিরাসক্ত থাকতে পার না, টি. টি. আই.দের মতো..

—টি. টি. আই? মানে?

—রেলের টিকেট চেকারদের দেখনি? এ. সি. কোচে যদি জজ-সাহেবকে চিনতে পারে তখন সে হাত তুলে নমস্কার করে বলে, 'ভাল আছেন, স্যার? আপনার টিকিটটা কাইন্ডলি...'। কারণ টিকেট চেকারের ধর্মই হচ্ছে টিকেট দেখে তা পাঞ্চ করবে, অথবা সই করবে। ডিস্ট্রিক্ট জাজ বিনা টিকিটের যাত্রী হতে পারেন কি না,—এসব বাহুল্য প্রশ্ন তার মনে মনেও করার অধিকার নেই। যা হোক, নতুন কথা কী বলল মাইতি?

—শকুন্তলাকে সে পাঁচ-সাত বছর ধরে চেনে। তার জন্যেই শকুন্তলা রায় স্কুলে শিক্ষকতার চাকরিটা পায়। পড়াতে পড়াতে এবং পড়তে-পড়তে এম. এ.-টা পাস করে, ওই মাইতি সাহেবের বদান্যতাতেই। এজন্য মেয়েটি রবিনবাবুর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। পরিবর্তে রবিনবাবুও মেয়েটির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ—পর পর দুটি ইলেকশানে সে ওঁর পার্টিকর্মী হিসাবে জানকবুল পরিশ্রম করেছে।

—আর রীতা বিদ্যার্থী? তাকে সে কতদিন ধরে চেনে?

—মাস তিনেক। দু'জনেই দু'জনের প্রেমে আকণ্ঠ মগ্ন ছিল। কথাবার্তা শুনে আমার মনে হলো, মাইতি-সাহেবের তরফে দু-দুটো বাধা ছিল। না হলে ওই সোনালীচুলের সুন্দরী মেয়েটিকে উনি ইতিমধ্যেই বিবাহ করে ফেলতেন। প্রথম বাধা : ওঁর মা। তিনি ইংরেজি অথবা হিন্দি জানেন না। দীর্ঘদিন পুত্রকে বিয়ের জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। ঘরোয়া মেয়ে হিসাবে শকুন্তলাকে তাঁর পছন্দ। রীতা বিদ্যার্থীকে সম্ভবত তিনি চোখের দেখাও দেখেননি। চেনেনই না। দেখলে, রূপে মুগ্ধ হলেও তিনি হয়তো রাজি হতেন না—বধূমাতার সঙ্গে বাক্যালাপেরই তো সুযোগ হতো না তাঁর! দ্বিতীয় বাধা : স্বয়ং শকুন্তলা রায়! মাইতি জানে, ওই মেয়েটির চোখে রবিন মাইতি স্বপ্নলোকের রাজপুত্র। তার চোখের সামনে, তারই বাড়ি থেকে রীতাকে ছোঁ-মেরে কেড়ে নিয়ে গিয়ে...

—বুঝলাম! আর কোনও ক্লু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! অনিমেষকে সল্ট লেক থানায় ফোন করেছিলাম, লেটেস্ট খবর জানতে। ও খবর দিল : এক—ডক্টর সান্যাল শবব্যবচ্ছেদ শুরু করে দিয়েছেন। মৃতার করোটির ভিতর সীসার গোলকটাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। সেটা ঐ পিস্তল থেকেই ছোঁড়া হয়েছিল কি না সেটা এখনি বলা যাচ্ছে না। ডক্টর সান্যাল সীসার বলটা ব্যালাসটিক এক্সপার্টকে হস্তান্তরিত করেছেন। তিনি বর্তমানে কম্পারেটিভ মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা চালাচ্ছেন। রেজাল্ট পাওয়া যায়নি। কাল সকালে রিপোর্ট পাওয়া যাবে। দু'নম্বর : মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করা যাচ্ছে না। মেয়েটি উপবাসে ছিল—তার পাকস্থলী বা খাদ্যনালীতে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায়নি; যার খাদ্যজীর্ণতার পরিমাণ থেকে মৃত্যু-সময়ের আন্দাজ করা যাবে। তাছাড়া যা সামান্য কিছু ওর পাকস্থলীতে পাওয়া গেছে তা মেয়েটি কখন আহার করেছে তার কোনও হদিস নেই।

বাসু বললেন, গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত রীতা যে জীবিতা ছিল তার সাক্ষী আছে। কেষ্টার-মা। সে রীতার কাছে অনুমতি নিয়ে বাড়ি গেছে।

—না, স্যার, আমি শুধু মেডিক্যাল এভিডেন্স থেকে বলছি। শবব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে মৃত্যু-সময়ের কোনো সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে না।

—আর কোনও সূত্র?

—হ্যাঁ। আরও দুটো তথ্য সরবরাহ করেছে অনিমেষ। প্রথম কথা : দ্বিতলের ঘরে সেন্টার-টেবিলে যে দগ্ধশেষ চুরুটের স্টাম্প্টা পাওয়া গেছে, ওটা মাদ্রাজী-চুরুট। চুরুটটার ব্র্যান্ড নেম 'জয়রঙ্গম'; তৈরি হয় চিদাম্বরমের একটা ফ্যাক্টারিতে। দ্বিতীয়ত অনিমেষ সামনের ওই মিত্তিরবাড়ির মেজবৌটির জবানবন্দি ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছে। সে ভদ্রমহিলা বলেছেন, মদ্র-

সাহেবকে তিনি অনেকবার দেখেছেন, আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডে নিশ্চয় শনাক্ত করতে পারবেন যদি না আমরা তাঁর যমজ ভাইকে দলে মিশিয়ে দিই। তিনি আরও বলেছেন, পূর্বদিন সন্ধ্যায় ওই দাক্ষিণাত্যের বেঁটে মোটা মানুষটি তাঁর কালো রঙের ফিয়াট গাড়ি চেপে এসেছিলেন। কখন আসেন তা উনি জানেন না, কিন্তু ফিরে যান সন্ধ্যা ছয়টা-সাড়ে ছয়টা নাগাদ। তখন উনি বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে কালীপূজার বাজি পোড়ানো দেখছিলেন। কেষ্টার মাও ছিল সেখানে। ওই ভদ্রমহিলার জবানবন্দিতে : মাদ্রাজী লোকটির পরনে ছিল কালো রঙের প্যান্ট, পায়ে চপ্পল, ঊর্ধ্বঙ্গে ফুল শার্টের উপর গ্রে-রঙের সোয়েটার। সামনে-বাড়ির অর্থাৎ শকুন্তলার দ্বিতল বাড়ির সদর দরজা খুলে ঐ মদ্র-সাহেব বার হয়ে আসেন। দুই ধাপ নেমে রাস্তার সমতলে দাঁড়িয়ে হিন্দিতে বলেন, কোট 'মাস-মাস এ ঝামেলা আমার ভাল লাগে না, তোমারও নিশ্চয় নয়। তাই ও-কথা বলেছিলাম,' আনকোট। তখন দরজার ওপাশ থেকে কে যেন কী একটা কথা বলে। মদ্র-সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে মুখ করে তখন বলে, 'বেশ তো! তাড়াতাড়ি করার কী আছে? কথাটা ভেবে দেখ, সুবিধা মতো জবাব দিও।'

বাসু বললেন, কেষ্টার-মা যা বলেছিল প্র্যাকটিকালি তাই। ভার্বাটিম এক হতে পারে না। কারণ কেউই কথাটা মুখস্থ করে রাখেনি এবং দুজনেই হিন্দি থেকে নিজ নিজ ভাষাজ্ঞান অনুযায়ী কথাগুলো বাংলায় অনুবাদ করেছে। সে যা হোক, কিন্তু মিত্তিরবাড়ির সেই মেজবৌমা কি রীতাকে দেখতে পেয়েছিল?

—না স্যার। রীতা নাকি দরজার আড়ালে ছিল। তার পরিধানে শাড়ি ছিল না সালোয়ার কামিজ, বা অন্য কোনও পোশাক, তাও বলতে পারেনি। এমন কি দরজার আড়াল থেকে রীতা কী বলেছিল, তা শুনতেও পায়নি।

—সে কি অন্তত এটুকু বলেছে, ''কপাটের ওপাশ থেকে মেয়েলী গলায় কে যেন কী একটা কথা বলল?'' অর্থাৎ দেখতে না পেলেও, এবং অর্থ না বুঝলেও সে কি স্ত্রীলোককণ্ঠে কিছু বাক্য উচ্চারিত হতে শুনেছে?

—উনি দাবি করছেন, উনি তা শুনেছেন। খুব সম্ভবত রীতার কণ্ঠস্বর, শকুন্তলার নয়। উনি দুজনকেই চেনেন। কিন্তু কথাটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। কারণ এটা অপরাধজীবীদের একটা বহুল প্রচলিত কায়দা। সর্বসমক্ষে ঐভাবে পিছন ফিরে অনুপস্থিত কারও সঙ্গে কথা বলা—যাতে পরে প্রমাণ করা যায় যে, কোনো বিশেষ লোক অন্তরালে দাঁড়িয়ে ছিল! তাছাড়া হয়তো কেষ্টার-মায়ের কাছ থেকে উনি শুনেছিলেন, শকুন্তলা ভদ্রেশ্বরে গেছে। ফলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন দরজার কপাটের ওপ্রান্তে রীতাই আছে। তৃতীয়ত ঐ মদ্র-সাহেব 'ভেন্ট্রিলোকুইজম্' বিদ্যায় পারদর্শী কি না, তাও আমরা জানি না।

—ইয়েস। অসম্ভব নয়। লোকটা পাকা ক্রিমিনাল। অপারেশনে যখন যায় তখন সুবিধামতো নির্জন স্থানে জ্যাক দিয়ে গাড়িটাকে তুলে গাড়ির নম্বর-প্লেট বদলায়—যাতে দূর থেকে যারা দেখে, অথবা চলতি গাড়ি থেকে দেখে মনে হয় ও গাড়ির পাঞ্চার-হয়ে-যাওয়া চাকা পালটাচ্ছে। তাই পাড়ার লোক আর বেপাড়ার লোক ওর গাড়ির নম্বরটা দু'রকম জানে। তাছাড়া দেখ এক বছরে সে দশ-বারোবার ব্ল্যাকমেইল-এর টাকা আদায় করে গেছে তবু শকুন্তলা জানতে পারেনি : লোকটার কী নাম, কী ঠিকানা, কেন আসে। 'স্বরক্ষেপণ'-এর ম্যাজিক হয়তো তার এক্তিয়ারে।

নির্দিষ্ট ঠিকানায় ওঁরা এসে পৌছালেন। রাত তখন সাতটা। টি.ভি.তে বাঙলায় খবর হচ্ছে। বাড়িটা নতুন। বহুতল বিশিষ্ট। নিচে সার সারি লেটারবক্স। তার ভিতর এস. স্বামীনাথনের নামে কোনও লেটারবক্স নেই। ইতিমধ্যে লিফ্‌টটা বার-দুই উপর-নিচ করেছে।

তৃতীয়বার লিফট্‌টা ভূতলে নেমে আসার পর লিফ্‌ট্‌ম্যান এগিয়ে এল। জানতে চাইল : কী নাম খুঁজছেন, স্যার?

—এস. স্বামীনাথন।—নিখিল বললে।

—স্বামীনাথন? ঠিকানা এ বাড়ির?

নিখিল বললে, হ্যাঁ এই মাল্টিস্টোরিড বাড়িরই বাসিন্দা। মাদ্রাজী। বয়স পঞ্চাশ। হাইট পাঁচ তিনের বেশি নয়। মোটা একটা কালো রঙের ফিয়াট গাড়ি আছে...

লিফ্‌ট্‌ম্যান বাধা দিয়ে বলল, আর বলতে হবে না, স্যার। ঠিকানা ঠিকই আছে, নামটা ভুল হয়েছে। ওঁর নাম স্বামীনাথন নয়—পাণ্ডুরঙ্গ-সাহেব। আসুন, ফিফ্‌থ-ফ্লোর।

বাসু মাথা নাড়েন, না হে! তোমার কোথাও কিছু ভুল হয়েছে—লোকটা আদৌ পাণ্ডুরঙ নয়! কালোজামরঙ!

লিফ্‌ট্‌ম্যান প্রতিবাদ করতে গিয়ে বেমক্কা হেসে ওঠে। বলে, ঠিকই বলেছেন, স্যার। 'পাণ্ডুরঙ' নাম হলেও সাহেব কালোজামের মতোই কালো—আসুন। ওঁর অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর হচ্ছে পাঁচের তিন।

ওঁরা লিফটের গর্ভে প্রবেশ করেন। ফিফ্‌থ্‌ ফ্লোরে সেটাকে রুখে দিয়ে লিফট্‌ম্যান দরজাটা দেখিয়ে দেয়। দরজার পাশে একটা প্লাস্টিকের নেম-প্লেট। নীল জমিতে সাদা হরফ : এল. পাণ্ডুরঙ। পাশে 'ইন-আউট' ব্যবস্থা আছে। তাতে নির্দেশ : পাণ্ডুরঙ সাহেব বর্তানে বাড়িতেই আছেন। নিখিল কলবেল বাজাল। সদর দোরের পাল্লাটা দেড়-ইঞ্চি মতো ফাঁক হলো। একজোড়া কৌতূহলী চোখ ও-প্রান্তে দেখা গেল। দরজায় চেন আটকানো। ভিতর থেকে ইংরেজিতে প্রশ্ন হলো : কাকে চাই?

নিখিল ওই দেড় ইঞ্চি ফাঁকের ভিতর দিয়ে বললে, মিস্টার এল, পাণ্ডুরঙ।

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—আমার পোশাক দেখে কী মনে হয়? চার্চ থেকে? নাকি মস্‌জিদ থেকে?

লোকটা তবু দরজাটা খুলে দিতে আগ্রহ দেখাল না। আবার জানতে চায়, না, মানে হঠাৎ পুলিশ কেন?

নিখিল বলে, আপনি যদি চান তাহলে এই করিডোরে দাঁড়িয়েই আমি চিৎকার করে সেটা ঘোষণা করতে পারি—তাতে আপনার লাভ কিছু হবে না। অহেতুক পাশের ফ্ল্যাট থেকে কিছু কৌতূহলী মানুষ...

কথাটা নিখিলের শেষ হলো না। দরজাটা খুলে গেল। পাণ্ডুরঙ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, বুঝেছি, স্যার! বিশ্বাস করুন, আমি লক্ষ্য করে দেখিনি ট্রাফিক সিগন্যালটা বদলে গেছে। পুলিশের হুইসেলও আমি শুনেছিলাম, কিন্তু তখন ব্রেক কষলে পিছনের গাড়ি এসে ধাক্কা মারত। কারণ বাই দ্যাট টাইম আলো সবুজ হয়ে গেছে—

নিখিল বললে, আলোচনাটা আপনার বৈঠকখানা ঘরে বসে করলে ভাল হতো না?

—সরি, স্যার। নিশ্চয়! নিশ্চয়! আসুন, বসুন।

ওঁরা দুজনে ভিতরে গিয়ে বসলেন। ছোট ঘর। আট বাই দশ। মাঝে একটা সেন্টার-টেবিল। একপাশে সেটী, অপরপাশে দুটি সোফা। একান্তে একটি টেবিল। তাতে টেলিফোন। কিছু বই ও টি.ভি.।

নিখিল বললে, মানলাম, কিন্তু আপনি তো একটু দূরে গিয়েও গাড়ি থামাতে পারতেন। আপনি ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে গেলেন কেন?

—না স্যার, পালাইনি! পালাব কেন? আর পালানোর কোনও উপায় আছে? পুলিশ তো গাড়ির নম্বর টুকেই নিয়েছে। এই তো আপনি সেই সূত্র ধরে এসে হাজির হয়েছেন।

নিখিল বললে, লেট আস প্রসিড সিস্টেমেটিক্যালি। আপনার গাড়ির নম্বরটা কত? ঐ কালো ফিয়াট গাড়িটার?

পাণ্ডুরঙ নম্বরটা বলল। নিখিল পকেট থেকে নোটবইটা বার করে লিখল। বলাবাহুল্য, শকুন্তলা রায় প্রদত্ত সাদা অ্যাম্বাসাডার গাড়ির নম্বরের সঙ্গে এটা মিলে গেল না।

নিখিল প্রশ্ন করে : আপনার টেলিফোন নম্বরটা কত?

পাণ্ডুরঙ সাতটা সংখ্যা উচ্চারণ করল।

নিখিল তার নোটবই দেখে নিয়ে বললে, সে কি মশাই? টেলিফোন ডাইরেক্টরি অনুসারে এ নম্বরটা তো মিস্টার এস. স্বামীনাথনের?

মদ্রলোকটা একগাল হাসল। বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। স্বামীনাথন আমার সম্বন্ধী। মানে আমার ওয়াইফের বড় ভাই। সে-ই এতদিন এই ফ্ল্যাটে থাকত। বছর খানেক আগে বদলি হয়ে যায়। তার ফ্ল্যাটেই আমি আছি; তার টেলিফোনটা ব্যবহারও করছি।

—আই সি!

পাণ্ডুরঙ জানতে চায়, চা বা কফি জাতীয় কিছু খাবেন, স্যার? অথবা কোল্ড ড্রিঙ্কস্?

বাসু-সাহেব প্রতিপ্রশ্ন করেন, বাড়িতে আর কেউ কি আছেন? যিনি চা-কফি বানিয়ে দেবেন? না কি অপনাকেই উঠে গিয়ে বানাতে হবে?

পাণ্ডুরঙ বললে, না স্যার। এ ফ্ল্যাটে আমি একাই থাকি। একজন পার্টটাইম কম্বাইন্ড-হ্যান্ড আছে। তবে চা-কফি আমাকে বানাতে হবে না। লিফট্‌ম্যানকে ফ্লাস্কটা ধরিয়ে দিলে সে-ই নিচে থেকে আনিয়ে দেবে। বলব? তিন কাপ কফি?

বাসু বললেন, নো থ্যাংকস্।

নিখিল তৈরি হয়েই এসেছিল। পকেট থেকে সিগ্রেট-কেস আর লাইটার বার করে টেবিলে রাখল। তারপর সিগ্রেটের কেসটা খুলেই আপনমনে বললে, এই য্যাঃ। সব শেষ হয়ে গেছে। শূন্যগর্ভ সিগ্রেট-কেসটা সে বাসু-সাহেবকে দেখিয়ে বলে, আপনার কাছে আছে, স্যার?

বাসু বললেন, আমি কি সিগারেট খাই?

পাণ্ডুরঙ অযাচিত বললে, সিগ্রেট নেই। চুরুট চলবে?

নিখিল বললে, খুব কড়া না হলে চলবে। কী ব্র্যান্ড?

পাণ্ডুরঙ টেবিলের কাছ থেকে দুটি মাদ্রাজী চুরুট নিয়ে এল—'জয়রঙ্গ' ব্র্যান্ড। মেড ইন চিদাম্বরম্।

নিখিল প্রত্যাখ্যান করল, না! এটা খুব কড়া।

—লিফট্‌ম্যানকে দিয়ে সিগারেট আনিয়ে দিই? কী ব্র্যান্ড চলবে, বলুন?

—না, থাক! আপনি বরং আমার প্রশ্নের জবাবগুলো দিন। সল্ট লেকের মিস্ রীতা বিদ্যার্থীর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?

পাণ্ডুরঙের মুখের রঙ বদলালে তা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেলে তা বোঝা যায়। টেবিল থেকে সে একটা চুরুট তুলে নিয়ে ধরায়। বলে, ও! তাই বলুন! ট্রাফিক-রুল ভায়োলেশনের কেস নয় তাহলে? রীতা বিদ্যার্থীর আত্মহত্যার ব্যাপারে তদন্ত। খুবই দুঃখের ব্যাপারটা! কতই বা বয়স মেয়েটির!

—তাহলে ওকে চিনতেন। ও যে মারা গেছে তা-ও জেনেছেন?

—হ্যাঁ চিনতাম। আজ সন্ধ্যার কাগজে ও আত্মহত্যা করেছে জেনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজে থেকেই পুলিশে খবর দেব কি না তাই এতক্ষণ ভাবছিলাম।

—কেন?

—কাগজে লিখেছে, আজ ভোরবেলা তার মৃতদেহ সল্ট লেকে করুণাময়ীর কাছে একটা বাড়িতে পাওয়া গেছে। অথচ আজ দুপুরবেলা রীতার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। অবশ্য গলার স্বরটা কেমন যেন সন্দেহজনক। কিন্তু সেটা রীতারই ফোন। কারণ...

—কারণ?

—কারণ যান্ত্রিক গোলযোগে লাইনটা কেটে যায়। আমি রিং-ব্যাক করি। রীতা যে বাড়িতে থাকে সেখানে। ঐ বাড়িতে থাকে—ও আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয় সেসব কথা জানেন—পুলিশ-তদন্ত তো হয়েই গেছে—মিস্ শকুন্তলা রায় টেলিফোনটা তোলেন। আমি তাঁকে বলি, রীতা বিদ্যার্থীকে ডেকে দিতে। তিনি অস্বীকার করেন। বলেন, রীতাকে ডেকে দেওয়া যাবে না। দ্যাটস্ মিস্টিরিয়াস্! তাই না? শকুন্তলা দেবী আমাকে একবারও বলেননি যে, রীতা জীবিতা নেই।

—তা বলেননি, কিন্তু শকুন্তলা দেবী আপনার নাম জানতে চেয়েছিলেন, তাও আপনি বলেননি! তাই নয়?

পাণ্ডুরঙ রুখে ওঠে, এটা কি একটা কথা হলো, স্যার? আমি তাঁকে একথাও বলেছিলাম যে, এইমাত্র রীতা দেবী আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, হঠাৎ যান্ত্রিক গোলযোগে ডিস্কানেক্ট হয়ে যায়। উনি তো সে কথার প্রতিবাদ করবেন। বলবেন না যে, "রীতা পাঁচ মিনিট আগে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারে না? যেহেতু সে মারা গেছে?"

নিখিল জানতে চায়, রীতা বিদ্যার্থীকে আপনি কতদিন ধরে চেনেন? সে যখন ব্যাঙ্গালোরে স্কুলে পড়ত, তখন থেকে। তাই নয়?

পাণ্ডুরঙ একটু চিন্তা করে বলল, হ্যাঁ, পাঁচ-ছয় বছর ধরে চিনি।

—তার মানে, ও যখন ব্যাঙ্গালোরে সেন্ট থেরেসা স্কুলে পড়ত তখন থেকে, তাই নয় কি?

—হ্যাঁ প্রায় তখন থেকেই।

—আবার 'প্রায়' কেন মিস্টার পাণ্ডুরঙ? ও যখন ব্যাঙ্গালোরে স্কুলে পড়ত তখন আপনিও ব্যাঙ্গালোরে থাকতেন। ওকে চিনতেন। রীতা যখন ফ্রক পরে সাইকেল চেপে স্কুলে যেত, তখন আপনি তাকে দেখেছেন। তাই তো?

পাণ্ডুরঙ রুখে ওঠে, সাইকেলে চেপে একটি কিশোরী মেয়ে স্কুলে পড়তে যাচ্ছে এটা চোখ মেলে দেখাতে ফৌজদারির কোনও ধারায় কি কিছু আপত্তি আছে?

—না নেই; কিন্তু সে কথাটা স্বীকার করিয়ে নিতে যদি তিনবার প্রশ্ন করতে হয়, তখন মনে সন্দেহ জাগে না কি : কোথাও-না-কোথাও একটা ফৌজদারি ধারা লঙ্ঘিত হচ্ছে? পাঁচ-ছয় নয়, আপনি ওকে দশ বছর ধরে চেনেন তাই নয়?

পাণ্ডুরঙ জবাব দিল না।

—ওর বাবা-মা, পরিবার-পরিজনদের কাউকে কি চিনতেন?

—না! তবে একথা জানতাম, মেয়েটি ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি ছাত্রাবাসে থাকত।

—সে কী! শকুন্তলা তো বললেন, রীতা হিন্দু!

পাণ্ডুরঙ তার চুরুটে একটি টান দিয়ে বললে, শকুন্তলা দেবী ঠিকই বলেছেন। প্রাপ্তবয়স্কা

হবার পর আর্যসমাজীদের প্রভাবে সে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ঠিক জানি না, শুনেছিলাম, ওর মা ছিলেন হিন্দু, কিন্তু বাবা ছিলেন সাহেব! সেজন্য জন্মসূত্রে ও খ্রিস্টান। পরে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়ে : হিন্দু।

—আপনি মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন?

—তা যেতাম। ও আমার মাধ্যমে কিছু ইনভেস্টমেন্ট করেছিল। সেই সূত্রে এজেন্ট হিসাবে যেতে হতো। প্রতি মাসেই।

—কালীপূজার রাত্রে, রবিবার, সন্ধ্যা নাগাদ আপনি ওর কাছে গিয়েছিলেন, তাই না?

পাণ্ডুরঙ চুরুটে একটি টান দিয়ে একমুখ ধোঁওয়া ছেড়ে বলল, হ্যাঁ, রীতা বিদ্যার্থীর আহ্বানে আমি ওই দিন ওই সময় ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ইয়েস! দ্যাটস্ এ ফ্যাক্ট! কী বলব মশাই, তখন ওর কথাবার্তা শুনে আদৌ বুঝতে পারিনি যে, রাত না পোহাতে মেয়েটা আত্মহত্যা করবে!

—ওকে কি খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিল, নার্ভাস লাগছিল?

—তখন অতটা মনে হয়নি, এখন যতই ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে। ওর কথাবার্তা, ব্যবহার কেমন যেন স্বাভাবিক ছিল না।

বাসু জানতে চাইলেন, রবিবার সন্ধ্যায় মেয়েটি আপনাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছিল? কী আলোচনা করলেন আপনারা?

পাণ্ডুরঙ নিখিলের দিকে ফিরে বললে, আপনার পরিচয় তো আপনার পোশাকেই বোঝা যায়। ইনি? প্লেন-ড্রেস কোনও পুলিশ-অফিসার?

নিখিল বললে, না। উনি একজন কোর্ট-অফিসার। মিস্টার পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল।

পাণ্ডুরঙ বললে, চেন্নাইতে দেখেছি ক্লায়েন্টরা ব্যারিস্টারের পিছন পিছন ঘোরে। তাঁর চেম্বারে যায়। কলকাতার ব্যারিস্টারেরা ক্লায়েন্টদের চেম্বারে শুভাগমন করে থাকেন বুঝি? এটাই এখানকার রীতি?

নিখিল বলল, না। আপনি আদৌ ওঁর ক্লায়েন্ট নন। ফলে সে প্রশ্ন ওঠে না। উনি এসেছেন আমাকে সাহায্য করতে। কিন্তু ওঁর প্রশ্নটার জবাব আপনি এখনো দেননি।

—তার কারণ, ওঁর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ইচ্ছা আমার নেই; তবে পুলিশের সঙ্গে সর্বদাই আমি সহযোগিতা করে থাকি। এখনও করব। আপনি জানতে চাইছেন, তাই জানাচ্ছি : মিস্ বিদ্যার্থীর কালীপূজার ছুটি ছিল। উনি আমাকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, বিশেষ একটি 'চিট্ ফান্ডে' মান্থলি ইন্সটলমেন্ট দেবার জন্য।

—তিনি ইনভেস্ট করেছেন? কোন 'চিট ফান্ডে'?

—লুক হিয়ার, স্যার! রীতা বিদ্যার্থী আমার ক্লায়েন্ট ছিল। সে কোথায় টাকা খাটাতো আমি তা জানতে বাধ্য নই সিভিল পুলিশকে। আপনি এনফোর্সমেন্ট বিভাগের পুলিশ অফিসার নন, ইনকাম ট্যাক্স অফিস থেকেও আসেননি। রীতা বিদ্যার্থীর ওয়ারিশদের স্বার্থে .আমি বর্তমান ক্ষেত্রে আপনার প্রশ্নের জবাব দেব না।

—কোন 'চিট ফান্ডে' টাকা খাটাতো সেটা না জানালেও আপনি কি এটুকু জানাবেন : মিস্ রীতা বিদ্যার্থী কি গতকাল আপনাকে কিছু পেমেন্ট করেছিলেন?

—ইয়েস, করেছিলেন। 'ফাইফ গ্র্যান্ডস্'!

—মানে পাঁচ হাজার টাকা? চেক-এ?

—হ্যাঁ, পাঁচ হাজার টাকাই। না 'চেক'-এ নয়। নগদে। আপনি চাইলে আমি প্রমাণ দিতে পারব। আনকোরা পঞ্চাশ টাকার নম্বরী নোট। তার দু'একটা আপনাকে এখনি দিতে পারি।

মিস্ বিদ্যার্থীর বাড়িতে ওই নম্বরী নোটের পরবর্তী নম্বরের নোট হয়তো আপনারা খুঁজে পাবেন।

নিখিল বলে, তার মানে কাল সন্ধ্যায় আপনি রীতা বিদ্যার্থীর বাড়ি গিয়েছিলেন—তারই ইচ্ছানুসারে। কী একটা 'চিট ফান্ডের' ইনভেস্টমেন্ট ব্যাপারে। সেসময় মিস্ শকুন্তলা রায় বাড়ি ছিলেন না। আপনি ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা বলে চলে আসেন। এই তো?

—হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেক অথবা সওয়া ঘণ্টা।

—কটার সময় আপনি ও-বাড়ি ছেড়ে আসেন?

—আমি ঠিক ঘড়ি দেখিনি। আন্দাজ সাড়ে ছয়টায়।

—কোথায় বসে কথা বলছিলেন আপনারা দুজন?

—ন্যাচারালি নিচের বৈঠকখানা ঘরে। একটি অবিবাহিতা মেয়ের শয়নকক্ষে যাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমি যাইনিও।

নিখিল জানতে চায়, আপনি হাড্রেড পার্সেন্ট শ্যিওর?

—বুঝলাম না! কী বিষয়ে?

—আপনি দ্বিতলে রীতা বিদ্যার্থীর শয়নকক্ষে আদৌ যাননি?

—কী আশ্চর্য! এক কথা কতবার বলব? না, যাইনি। সত্যি কথা বলতে কি, মিস্ শকুন্তলার এবং মিস্ রীতার, কার কোনটা শয়নকক্ষ তা আমি জানিই না।

নিখিল ধমকে ওঠে, কথা সেটা নয়। আমি জানতে চাইছি, গতকাল সন্ধ্যাবেলায় আপনি একটু সময়ের জন্যও দ্বিতলে মিস্ বিদ্যার্থীর ঘরে প্রবেশ করেননি। ইজ দ্যাট কারেক্ট?

—দ্যাটস্ কারেক্ট! হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট।

—অলরাইট। এবার বলুন, কাল বিকালে আপনি কোন শার্টটা পরে রীতার সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন?

—সে প্রশ্ন কেন উঠছে?

—আপনি জবাবটা দিন, হেতুটা তখন জানাব।

—একটা স্ট্রাইপড্ লিবার্টি ফুলস্লিভ শার্ট।

—সেটা কি আপনার ওয়ারড্রোবে আছে? না কাচতে দিয়েছেন?

—না, কাচতে দিইনি। দেখতে চান?

—যদি না আপনার আপত্তি থাকে?

—আপত্তি কিসের?—পাণ্ডুরঙ এগিয়ে যায় তার শয়নকক্ষে। হ্যাঙারে ঝোলানো তার ফুলস্লিভ শার্টটা নিয়ে ফিরে এসে বলে, এইটা। কিন্তু এসব কী শুরু করলেন আপনি? কোন জামা? কোন প্যান্ট? কোন জুতো? আপনি কি শার্লক হোমস্? না এয়ার্কুল প্যারো?

নিখিল জবাব দিল না। শার্টটা গ্রহণ করে তার হাতের আস্তিনে কাফ-লিংক দুটো পরীক্ষা করল। যা আশঙ্কা করা গেছে! কাফ-লিংক-দুটি ঝিনুক বোতামের, রূপা দিয়ে বাঁধানো; কিন্তু বাঁ হাতের কাফ-লিংকের ঝিনুক বোতামের অনেকটা ভাঙা।

নিখিল জানতে চায়— এই কাফ-লিংকটা ড্যামেজড্। এর একটা টুকরো ভেঙে গেছে দেখছি। কবে ভেঙেছে?

পাণ্ডুরঙ জামাটা হাতে নিয়ে লক্ষ্য করল। বলল, এতক্ষণ এটা আমার নজরে পড়েনি। আপনি বলতে নজর হলো। কিন্তু...

—আমি যদি বলি, এটা খুলে পড়েছে ওই মিস্ বিদ্যার্থীর বাড়িতেই?

—হতে পারে। কারণ ওটা যে ভেঙে খুলে পড়েছে তা আমার নজরে পড়ল এইমাত্র।

—কিন্তু আমি যদি বলি, এটা আমরা খুঁজে পেয়েছি, মিস্ রীতা বিদ্যার্থীর শয়নকক্ষে? যেখানে তার মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হয়েছিল?

পাণ্ডুরঙ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। বলে, দ্যাটস্ আ ড্যাম্‌ড লাই! আমি দোতলাতে আদৌ যাইনি। সামবডি ইজ ট্রাইং টু ফ্রেম মি! হয়তো ও বাড়িতেই আমার কাফ-লিংকটা খোয়া গেছে। তা গেলে সেটা বৈঠকখানায় অথবা বাইরের সিঁড়িতে কিংবা সামনের রাস্তায় পাওয়া যেতে পারে। দোতলায় ওর শয়নকক্ষে নিশ্চয় নয়। কে বলেছে?

নিখিল কাগজের মোড়ক খুলে দেখাল ঝিনুকের টুকরোটা।

পাণ্ডুরঙ থমকে গেল। জানতে চায়, সত্যি? এটা ওই মেয়েটির শয়নকক্ষে— যেখানে সে আত্মহত্যা করেছিল—সেই ঘরে আপনারা খুঁজে পেয়েছেন?

—শুধু তাই নয়, মিস্টার পাণ্ডুরঙ; দোতলার ঘরে একটা অ্যাশ্‌ট্রেতে পাওয়া গেছে একটা সিগারের দগ্ধাবশেষ স্টাম্প্! আর সেটা চিদাম্বরমে তৈরি একটা স্পেশাল ব্র্যান্ড চুরুট : 'জয়রঙ্গ'। এ বিষয়ে আপনি কী বলবেন? সে চুরুট থেকে কে ধূমপান করেছে? রীতা বিদ্যার্থী? না শকুন্তলা রায়?

পাণ্ডুরঙ কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, দিস্ ইজ প্রিপস্ট্রাস, অফিসার। আমি স্বীকার করছি, কাল সন্ধ্যাবেলায় রীতার বাড়িতে গেছিলাম। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। চুরুট খেয়েছি—কিন্তু একতলার ঘরে। দোতলায় আমি আদৌ যাইনি। ইন ফ্যাক্ট, আমি আজও জানি না—কোন ঘরটায় ওদের মধ্যে কে শোয়। আই মীন দোতলার ওই ঘরটায় দুই বান্ধবীর মধ্যে কে শয়ন করে। বিশ্বাস করুন! হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি রীতা বিদ্যার্থী গতকাল সন্ধ্যায় আমাকে নগদে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল—কিন্তু সে তো 'চিট্ ফান্ড'-এর মাস্থলি ইন্সটলমেন্ট! ওর দেওয়া নোট আমার আলমারি সার্চ করলে এখনো পাবেন—সব পঞ্চাশ টাকার! বাট্-বাট্...ওর মৃত্যুর কথা আমি প্রথম জেনেছি আজ সান্ধ্য এডিশন খবরের কাগজ পড়ে।

নিখিল বললে, সেটা আদালতে প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন। পাবলিক প্রসিকিউটারের ওইসব প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য জবাব দেবার চেষ্টা করবেন—কীভাবে আপনার জামার কাফ-লিংক একতলা থেকে দোতলায় চলে গেল, কীভাবে চুরুটের স্টাম্পটা রীতার শয়নকক্ষে আবিষ্কৃত হলো, কীভাবে আপনার গাড়ির নম্বারটা—আমি ওই কালো ফিয়াট গাড়িটার কথা বলছি—বহুরূপীর মতো রঙ বদলাতে পারে...

—গাড়ি রঙ বদলাতে পারে! এ কথার মানে?

—গোটা গাড়িটা নয়। নম্বারপ্লেটটা। সল্ট লেকের করুণাময়ী অঞ্চলে, মানে ওই আট নম্বর ট্যাঙ্কের কাছাকাছি লোকেরা গাড়িটার যে নম্বর বলেছে সে নম্বরপ্লেট এখন কেন আপনার গাড়িতে লাগানো নেই—এইসব প্রশ্নের!

—বিলীভ মি, স্যার! কেউ আমাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করতে এসব এভিডেন্স সাজিয়ে বলেছে! গাড়ির নম্বর আমি পালটাতে যাব কেন? আমি অনেস্ট-ব্রোকার—

—তাই 'অ্যাকাউন্ট-পেয়ী চেক'-এর বদলে ক্লায়েন্ট-এর কাছ থেকে মাস-মাস নগদ টাকা আদায় করেন, তাই নয়?

—স্যার! পোস্টমার্টাম-এ নিশ্চয় জানা যাবে—রীতা মারা গেছে মধ্যরাত্রে, বা পরদিন ভোরবেলায়! অথচ আমি ওর সঙ্গে যখন দেখা করি তখন সন্ধ্যা ছয়টা, সাড়ে-ছয়টা। আমি যখন ও-বাড়ি ছেড়ে চলে আসি তখন সে সুস্থ-সবল ছিল। সে আমাকে সদর-দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। দরজা খুলে আমি বাইরে বেরিয়ে আসি। তখনো সামনের বাড়ির রোয়াকে দু'তিনজন বসেছিল। তাদের ভিতর একজনকে আমি চিনি—সে রীতার মেইড-সার্ভেন্ট। সে

নিশ্চয় সাক্ষ্য দেবে যে, আমাকে চলে যেতে দেখেছে এবং তখনো রীতা বিদ্যার্থী জীবিতা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের কী কথা হয়—হয়তো তাও সে বলতে পারবে—

বাধা দিয়ে নিখিল বলে, কী কথা হয়েছিল আপনাদের?

—আমার যদ্দূর মনে পড়ে আমি হিন্দিতে বলেছিলাম "প্রতিমাসে এভাবে তোমার কাছে চিট ফান্ডের টাকা কালেক্ট করতে আসা আমার পোষাবে না—তুমি আমার কথাটা ভেবে দেখ।" জবাবে ও বলল, "তাতে আমার অসুবিধা আছে।" তখন আমি বললাম, 'বেশ তো, পরে ভেবে-চিন্তে স্থির করে আমাকে জানিও।"

—রীতার কাছে আপনার প্রস্তাবটা কী ছিল?

—মাস-মাস ইন্সটলমেন্ট দেবার বদলে ত্রৈমাসিক পেমেন্ট করা। ও তাতে রাজি হচ্ছিল না। বলছিল টাকা ওর খরচ হয়ে যায়। এজন্য মাসের প্রথম সপ্তাহেই...

নিখিল বাধা দিয়ে—আপনি চিট ফান্ডের কাগজপত্র বার করুন তো। অরিজিনাল সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য কাগজপত্র।

লোকটা তৎক্ষণাৎ বললে, অরিজিনাল সার্টিফিকেট কি এজেন্টের হেপাজতে থাকে? সে তো পার্টির কাছে। মানে রীতার কাছে—

—কিন্তু তার স্টিল-আলমারিতে তন্ন তন্ন করে দেখেও আমরা তো তা খুঁজে পাইনি?

—সেটাও কি আমার অপরাধ? হয়তো ওর ব্যাঙ্ক-ভল্টে আছে, অথবা অফিসের আলমারিতে—

—কিন্তু ওর অ্যাপ্লিকেশন, ওর কোনো চিঠি বা ফাইল?

—সরি স্যার! সে-সব রাখা আছে চেন্নাইয়ের হেড-অফিসে। আমি তো এজেন্ট মাত্র।

—বুঝলাম। কিন্তু রাত্রে যে আপনি দ্বিতীয়বার ফিরে আসেননি তার কী প্রমাণ?

—কালীপূজোর রাত্রে আমরা সাত-আটজন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তাস খেলেছিলাম—

—অর্থাৎ জুয়া?

—কেন এসব কথা আমাকে দিয়ে কবুল করাচ্ছেন?

—এবং মদ্যপান?

—যদি করেই থাকি তাহলে 'মার্ডার-চার্জ' কি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, স্যার?

নিখিল বলে, শুনুন মশাই! আপনার ওই সাত-আটজন অনারেব্‌ল সাক্ষীর মাধ্যমে অ্যালেবাঈ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে না। তাতে কোনো লাভ নেই। আমাদের বক্তব্য ঃ আপনি সন্ধ্যাবেলায় যখন ও বাড়ি ছেড়ে যান, তখন রীতা বিদ্যার্থী তার শয়নকক্ষে মরে পড়ে আছে। মৃত্যুর আগে সে 'রেপর্ড' হয়েছিল কিনা তা এখনি বলতে পারছি না—পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা হাতে পাইনি। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, সে আপনাকে দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়নি। কেউ তাকে দেখেনি—

—কেউ দেখেনি? কেউ শোনেনি? ঐ মেডসার্ভেন্টটি এবং তার পাশে যে ম্যারেড ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা আমাদের কথা বলতে দেখেননি, শোনেননি?

—না! তাঁরা শুধু একতরফা আপনাকেই দেখেছেন, আপনার কথাই শুনেছেন। এমনকি কায়দা করে আপনি পিছন ফিরে এমনভাবে কথা বলেছেন যে, স্বতই মনে হয় কপাটের আড়ালে কেউ একজন শ্রোতা আছে। কিন্তু রাস্তার ও পাশ থেকে ওঁদের দুজনের কেউই রীতাকে দেখতে পাননি বা কথা শুনতে পাননি।

—মাই গড! এরা সবাই মিলে আমাকে ফাঁসাতে...

বাধা দিয়ে নিখিল বলে, আপনি তৈরি হয়ে নিন মিস্টার পাণ্ডুরঙ। আমার সঙ্গে আপনাকে একবার লালবাজারে আসতে হবে।

—আপনি...আপনি...আমাকে অ্যারেস্ট করছেন?

—না! আপাতত ভদ্রভাষায় এটাকে বলা যায়—'বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধানের জন্য আটকে রাখা।'

—মাই গড!

বাসু-সাহেব অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেননি। এবার বললেন—লুক হিয়ার মিস্টার পাণ্ডুরঙ। কলকাতা শহরে আপনার পরিচিত কোনও ক্রিমিনাল ল-ইয়ারের বাড়ির টেলিফোন নম্বর জানা আছে কি? থাকলে এই মওকায় তাঁকে একটা ফোন করে রাখতে পারেন। আমার মনে হয়, আপনার বিরুদ্ধে পুলিশ 'মার্ডার-চার্জ' আনতে পারে। সলিসিটারের অনুপস্থিতিতে কোনো কথা না বলার সাংবিধানিক অধিকার আপনার আছে।

পাণ্ডুরঙ বিহ্বলের মতো বললে, থ্যাঙ্কু, স্যার!

সাত

ষোলই নভেম্বর, বুধবার, সকাল।

প্রাতরাশে বসেছেন ওঁরা তিনজন। হ্যাঁ, তিনজনই। সুজাতা বাদে। কারণ কাল সন্ধ্যাবেলায় সুজাতাকে পরীক্ষা করে 'গাইনো' পরামর্শ দিয়েছেন তাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিতে। বেশি বয়সে প্রথম সন্তান হচ্ছে তো। তাই এই বিশেষ সাবধানতা। হয়তো শেষ পর্যন্ত সিজারিয়ানই করতে হবে।

বাসু বিনা-মাখন টোস্টে অভ্যাসবশে ছুরিটা বোলাতে-বোলাতে বললেন, সিজারিয়ান আজকাল জলভাত। এ তো আর সীজার অথবা ম্যাকডাফের আমল নয়!

কৌশিকের মাখন-আহারে ডাক্তারের বারণ নেই। সে যেন বাসু-সাহেবকে দেখিয়ে দেখিয়ে টোস্টে মাখনের মোলায়েম প্রলেপ লাগাচ্ছিল। জানতে চায়, জুলিয়াস সীজারকে চিনি, কিন্তু ম্যাকডাফটি কে?

বাসু ওর ওই দেখিয়ে-দেখিয়ে মাখন মাখানোর কায়দায় বোধহয় চটে ছিলেন। বললেন. সেটা জুলিয়াস সীজারের সৌভাগ্য আর সেক্ষপীয়রের দুর্ভাগ্য।

ঠিক তখনই বেজে উঠল টেলিফোনটা। যথারীতি বিশে সেটা তুলে নিয়ে শুনল। বাসু-সাহেবের দিকে যন্ত্রটা বাড়িয়ে ধরে বললে, আপনের। হোমিসাইড অফিস থেকে দাশ-সাহেব বলতেছেন।

বাসু বলেন, হোমিসাইড? সেটা আবার কী?

এক গাল হেসে বিশে বলে, আমি জানি। যে অফিসে সবাই শুধু খুনোখুনি করে।

এঁরা তিনজনেই হেসে ওঠেন।

নিখিল টেলিফোনে জানায় সাম্প্রতিকতম সংবাদ। অনেকটা অগ্রসর হওয়া গেছে। যদিও সমাধানের কোনও ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রথম কথা : ব্যালাস্টিক এক্সপার্ট ইতিমধ্যে কম্পারেটিভ মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছেন মৃত্যুবাহী বুলেটটি রীতার নিজস্ব পিস্তল থেকেই নিক্ষিপ্ত। দ্বিতীয়ত,

ব্যাঙ্গালোরে ফ্যাক্স করে জানা গেছে : রীতা বিদ্যার্থীর পিতৃপরিচয় নেই। বস্তুত ফুটপাতের একান্তে সদ্যোজাত অবস্থায় ফুটফুটে মেয়েটিকে আবিষ্কার করে শহরের কোনো এক মানুষ তাকে পুলিশের হেপাজতে জমা দেয়। পরে একটি মিশনারী প্রতিষ্ঠানে রীতা অনাথা হিসাবে মানুষ হয়। তারাই ওকে স্কুলে পড়ায়। স্কুল ফাইনাল পাস করে রীতা কর্ণাটকের বাইরে চলে আসে। তখনও সে মিশনারী সোসাইটি থেকে আর্থিক সাহায্য পেত। পরে গ্র্যাজুয়েট হয়ে একটি বড় কোম্পানিতে রিসেপ্‌শনিস্টের চাকরি পায়। ব্যাঙ্গালোরের গোয়েন্দা দপ্তর তার বর্তমান ঠিকানা জানে না। নিখিল জানালো, সে আর একবার ওই করুণাময়ী অঞ্চলের বাড়িটায় যাচ্ছে। বাসু-সাহেব কি ওকে সঙ্গ দেবেন?

বাসু জানতে চান, আজ তুমি আবার কেন যাচ্ছ, বল তো?

নিখিল টেলিফোনে বলে, কাল যে প্রশ্নটা মিস্ রায়কে করিনি, আজ সেটাই করে দেখতে চাই, সে কী বলে!

—কালই বা সেটা জানতে চাওনি কেন?

—যে কারণে আপনিও তাকে প্রশ্নটা করেননি, সেই একই কারণে। শকুন্তলা রায়কে সন্দেহ তালিকার বাইরে রাখা যাচ্ছিল না। তাই আপনিও তার কাছে জানতে চাননি, রীতা লেফ্‌ট্-হ্যান্ডার ছিল কি না। তাই না?

বাসু বললেন, তুমি আমাকে পিক্-আপ করে নিয়ে যেও। বিশেষ কারণে কৌশিককে আজ নিয়ে যাওয়া যাবে না। গাড়িটাও তার হেপাজতে থাকবে।

—বিশেষ কারণে?

—হ্যাঁ। কাল গাইনো সুজাতাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করে নিয়েছেন। হয়তো অ্যাডভান্স ডেলিভারি হবে।

—আই সী। ঠিক আছে, স্যার, আমি আধঘন্টার মধ্যেই আসছি।

বাসু-সাহেব তৈরি হয়ে নিলেন। নিখিল আধঘন্টার মধ্যেই এসে পৌঁছাল। রানী দেবী ওর কাছে জানতে চাইলেন, ব্রেকফাস্ট করে এসেছ তো, নিখিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু তাহলেও আমি আর এক কাপ কফি খাব। কিছুটা আলোচনা করার আছে—সল্ট লেকে যাত্রা করার আগে।

অগত্যা বিশে আবার গেল কফি বানাতে।

নিখিল বলে, আপনি কি এখনো কোনো সমাধানের ইঙ্গিত পাচ্ছেন না স্যার?

বাসু বললেন, তুমি তো জানই, আমি নিজের মতো চিন্তা করে চলি। সম্পূর্ণ সমাধানের নাগাল পাওয়ার আগে মুখ খুলি না। আমার মনে একটা সমাধান এসেছে, কিন্তু জিগ্‌স-পাজ্‌ল্-এ এখনো আছে দু'একটা মিসিং-পিস্। তুমি বরং গুছিয়ে বল—তোমার কী কী সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছে।

নিখিল বলে, তিনটি বিকল্প সমাধান। কিন্তু প্রত্যেকটিতেই কিছু-না-কিছু প্রশ্নের জবাব নেই। অর্থাৎ একটাও সবসমস্যার সমাধানসম্পন্ন নয়।

—একে একে বলে যাও।

—প্রথম সমাধান : আত্মহত্যা। তাহলে তার আগে প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার যে, রীতা বিদ্যার্থী 'লেফট্-হ্যান্ডার' ছিল। সে যদি বাঁ-হাতে লিখত, বাঁ-হাতে তালার চাবি খুলত, আক্রান্ত হলে প্রতিবর্তী-প্রেরণায় বাঁ-হাতটাই বাড়িয়ে দিত আত্মরক্ষার জন্য—তাহলে ধরে নিতে হবে যে সে বাঁ-হাতে নিজের প্রাণ নিয়েছে। মোটিভটা তো এতক্ষণে খুঁজে পেয়েছি আমরা : রীতা বাস্টার্ড! খানদানি ঘরের সুপাত্র রবিন মাইতির জীবনসঙ্গিনী সে কোনোদিনই হতে পারবে

না। হলে ওই ব্ল্যাকমেলার তাকে সারা জীবন শোষণ করে যাবে! সে এক নরকযন্ত্রণা! তাই উত্তেজনার মুহূর্তে নির্জন বাড়িতে সে আত্মহত্যা করে বসেছে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে পিস্তলটা ওর ডান হাতে চলে এল কী করে? তাছাড়া ঐ কাফ-লিংকটা আর চুরুটের স্ট্যাম্প-এর অস্তিত্বটাও ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। ফলে এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। দ্বিতীয় সম্ভাবনা : পান্ডুরঙ মিছে কথা বলেছে। সে দ্বিতলে উঠে এসেছিল। বৈঠকখানায় নয়, দ্বিতলেই ওরা কথাবার্তা বলেছিল, কেষ্টার-মা চলে যাবার পরে—

কৌশিক বাধা দিয়ে বলে, সেটা একটু কষ্টকল্পনা হয়ে যাচ্ছে না? কেষ্টার মায়ের উপস্থিতিতে দুজনে বাইরের ঘরে বসে কথা বলল, আর তারপর রীতা ওই ব্ল্যাকমেলারটাকে তার শয়নকক্ষে দ্বিতলে নিয়ে যাবে?

নিখিল বলে, ঘটনাটা যদি এই রকম হয় : কেষ্টার-মা চলে যাবার পর পান্ডুরঙ তাগাদা দেয়—'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, টাকাটা দাও।' হয়তো তখন রীতা দ্বিতলে তার শয়নকক্ষে উঠে যায়—আলমারির থেকে টাকাটা বার করে আনতে। পান্ডুরঙ গোপনে তাকে অনুসরণ করে। তারপর ধরা যাক, মেয়েটি যখন স্টিল-আলমারিটা খুলছে তখন পান্ডুরঙ ঠিক ওর পিছনে চুপিসাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। হয়তো রীতা বলেছিল, এ কী? আপনি উপরের ঘরে এসেছেন কেন? আর তখনই পান্ডুরঙ ওকে জড়িয়ে ধরে। এমনটা কি হতে পারে না?

কৌশিক জানতে চায়, অটোপ্সি-সার্জেন কি এ বিষয়ে...

—না, বলেননি। শী ওয়াজ নট রেপড বিফোর হার ডেথ।

বাসু বলেন, ঠিক আছে। তুমি তোমার গল্পটা শেষ কর। এ পর্যন্ত তুমি যা বলেছ তার মধ্যে 'ফ্যালাসি' কিছু নেই। এমনটা বাস্তবে ঘটে থাকতে পারে।

নিখিল উৎসাহিত হয়ে বলে, ধরুন সে সময় ওর মুখে ছিল জ্বলন্ত চুরুট। রীতাকে আক্রমণ করা মাত্র একটা ধস্তাধস্তি হবেই। তাতে ওর হাতের কাফ-লিংকটা ভেঙে ঝিনুকের টুকরোটা মাটিতে পড়ে যেতে পারে। চুরুটটাও মুখ থেকে মেজেতে ছিটকে পড়বে, তাই না?

—ন্যাচরাল কনক্লুশান। বলে যাও?

—ধরা যাক, রীতার পিস্তলটা ছিল আলমারির ভিতর। সম্ভাব্যস্থান! মেয়েটি হাত বাড়িয়ে পিস্তলটার নাগাল পেয়ে যায়। পান্ডুরঙের অবস্থা তখন কাহিল। কামাবেগ চরিতার্থ করা অথবা ব্ল্যাকমেলিং-এর টার্গেটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদটা অনেক বড় হয়ে ওঠে। হাত কাড়াকাড়ি এবং ধস্তাধস্তির সময় পিস্তলটা ফায়ার হয়ে যায়! কালীপূজার রাত বলে রাস্তার ওপাশে কেষ্টার-মা বা মেজবৌ তা শুনতে পায় না। অর্থাৎ পটকার শব্দ বলে মেনে নেয়। এমনটা কি হতে পারে না?

কৌশিক বলে, আপনি বলতে চান, তারপর পান্ডুরঙ পিস্তলটাকে রুমাল দিয়ে মুছে রীতার মুঠিতে ধরিয়ে দেয়। সিগারটা অ্যাশট্রেতে ফেলে সব কটা দরজা-জানলা বন্ধ করে?

নিখিল বলে, হয়তো রীতা ঘবটার তালা চুকে ছিল এবং চাবিটা 'কী-হোলে' লাগানোই ছিল। সুতরাং বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে পান্ডুরঙ নেমে আসে একতলায়। সদর দরজা খুলেই দেখতে পায় সামনের বাড়ির রোয়াকে বসে আছে দুজন। একজন ওর পরিচিত— কেষ্টার-মা! পান্ডুরঙ লোকটা প্রফেশনাল ক্রিমিনাল। তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে এমনভাবে কথা বলে, যাতে দূর থেকে মনে হয় যে, কপাটের আড়ালে রীতা দাঁড়িয়ে আছে। বলুন স্যার? কোথাও কোনও 'ফ্যালাসি' আছে? যা ব্যাখ্যা করা যায় না এমন কিছু তথ্য?

কৌশিক বলে, আছে নিখিলবাবু। তিন-তিনটে অসঙ্গতি। প্রথম কথা, আপনার হাইপথেসিস্ অনুসারে পান্ডুরঙ একজন পাকা ক্রিমিনাল। সে জানলায় ছিটকিনি দিল,

পিস্তলটা রুমালে মুছে নিয়ে রীতার মুঠিতে গুঁজে দিল। আলমারি বন্ধ করে চাবিটা রীতার ব্যাগে ফেলে দিল। এমনকি দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে নেমে এল চাবিটা পকেটে নিয়ে। হঠাৎ দুজন সাক্ষীকে দেখে এমন অভিনয় করল যাতে মনে হয়, রীতা দরজার কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে। এমন একজন পাকা ক্রিমিনাল অ্যাশট্রেতে চুরুটটা রেখে আসবে?

নিখিল বলে, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে ক্রিমিনালজিতে একটা কথা চালু আছে : 'দেয়ার্স নেভার সামথিং অ্যাজ আ পার্ফেক্ট মার্ডার!' কোথাও না কোথাও একটা ভুল হয়ে যায়ই। এছাড়া ও বাপারটার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না। যাহোক, আর দুটো অসঙ্গতি কী কী?

কৌশিক বলে, পান্ডুরঙের মতো পাকা ক্রিমিনালের পক্ষে স্বাভাবিক হতো—পিস্তলটা ভাল করে মুছে নিয়ে সেটাকে রুমালে জড়িয়ে রীতার আঙুলের ছাপ তুলে নিয়ে গুঁজে দেওয়া। নয় কি?

—তা ঠিক! আর তৃতীয় অসঙ্গতি?

—পান্ডুরঙ রীতাকে দীর্ঘদিন ধরে চেনে। সে নিশ্চয় জানে রীতা বেঁয়ো কি না। যদি প্রমাণিত হয় যে, মেয়েটি লেফ্‌ট্‌-হ্যান্ডার ছিল, তাহলে সে কিছুতেই ওর ডান হাতে পিস্তলটা গুঁজে দেবে না। এমনকি যদি সে রাইট-হ্যান্ডার হয়, তাহলেও সে পিস্তলটা বাঁ-হাতেই গুঁজে দিত। কারণ অমন একজন দাগী আসামী নিশ্চয় খেয়াল করত যে, ডান হাতে পিস্তল ধরে ওইভাবে বাঁ-কানের উপর ফায়ার করা ফিজিক্যালি অসম্ভব।

বাসু বলেন, আর কোনও অলটারনেটিভ সল্যুশান?

নিখিল একটু দম ধরে চিন্তা করে। তারপর বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই যাকে আপনি বলেছিলেন 'ইটার্নাল ট্রায়াঙ্গেল'—শাশ্বত ত্রিকোণ। দুটি নারী এবং একটি পুরুষ। এ সাবধানটা মেনে নিলে কেসটা আর 'হোমিসাইড' পর্যায়ে থাকবে না, স্যার—হয়ে যাবে ফার্স্ট ডিগ্রি ডেলিবারেট মার্ডার! যার শাস্তি : ফাঁসি।

কৌশিক বলে, বাই শকুন্তলা রায়?

—অব্‌ভিয়াসলি। ভদ্রেশ্বরে আমি লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছি। কালীপূজাটা ছিল মিস্ শকুন্তলার নিজের মাসির বাড়ি। সেবাড়ির অনেকেই স্বীকার করেছে যে, শনিবার সন্ধ্যাবেলা সে এসেছিল। পরদিন সন্ধ্যারাত্রে শকুন্তলা ওই বাড়িতে ছিল। প্রদীপ জ্বেলেছে, বাড়ি পোড়ানো দেখেছে। তারপর কালীপূজা শুরু হয়ে যাবার পর আর তাকে কেউ দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না। এক-একজন এক-এক রকম বলছে। ভদ্রেশ্বর থেকে হাওড়াগামী শেষ লোকালটা ছাড়ার পর কেউ তাকে দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না। একমাত্র ব্যতিক্রম ওর নিজের মাসিমা। তিনি বলেছেন, ভোরবেলা শকুন্তলা তাঁকে প্রণাম করে ট্রেন ধরতে যায়। বাড়ির অন্য সবাই তখন সারারাত জেগে ঘুমে অচেতন। কিন্তু আমার ধারণা—মাসিমা তাঁর বোনঝিকে বাঁচাবার জন্য সজ্ঞানে ডেলিবারেট মিছে কথা বলছেন।...অর্থাৎ শকুন্তলা কখন ফিরে এসেছিল তার প্রমাণ নেই।

কৌশিক বলে, মোটিভটা ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। আপনি বলেছেন, আপনার ধারণায় শকুন্তলার চোখে অ্যাডভোকেট মাইতি ছিল স্বপ্নলোকের রাজপুত্র। মাইতি—যদিও মদ্যপ অবস্থায়—স্বীকার করেছিল, এককালে সে ঘন ঘন ওই করুণাময়ী অঞ্চলে যেত, ইলেকশানের সময় রাতের পর রাত শকুন্তলা মাইতির বাড়িতে কাজ করে গেছে। তার মায়ের স্নেহধন্যা হয়েছে। আর তারপর ঐ সোনালীচুলের দুধে-আলতা মেয়েটি ওর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। খুন যদি শকুন্তলাই করে থাকে তাহলে উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। আর মার্ডার ওয়েপনটার নাগাল

পাওয়াও শক্ত নয় শকুন্তলার পক্ষে। স্টিল আলমারিটা তারই, ডুপ্লিকেট চাবি তার কাছে থাকার সম্ভাবনাটা প্রবল...

নিখিল বলে, এক্ষেত্রে কিন্তু কাফ-লিংক আর চুরুটের স্টাম্প দোতলায় চলে আসার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে—

কৌশিক বলে, শকুন্তলার কীর্তি?

—অবভিয়াসলি! হয়তো শকুন্তলা দেবী জানতেন যে ওই মদ্রসাহেব বিকেলবেলা আসবে। হয়তো টেলিফোনে রীতার সঙ্গে পান্ডুরঙের যখন কথা হয় তখন মিস্ রায় তা শুনেছেন। সেক্ষেত্রে এমনটাও হতে পারে যে, মিস্ রায় রাত সাড়ে দশটা-এগারোটার সময় অথবা সকালবেলাতেই ফিরে এসে বান্ধবীর কাছে শোনেন পান্ডুরঙ এসেছিল—

কৌশিক বলে, কিন্তু রীতা কি নিজে থেকে সে কথা স্বীকার করবে?

—হয়তো নিচের ঘরে অ্যাশট্রেতে পোড়া চুরুটটা দেখে, আর কাফ-লিংকের ঝিনুকের টুকরোটা ঘটনাচক্রে কুড়িয়ে পেয়ে শকুন্তলা আন্দাজ করেছিল ঠিকই। রীতাকে হত্যা করার পর খুব তাড়াতাড়ি সে কিছু এভিডেন্স সাজিয়ে দেয়। একতলা থেকে চুরুটের স্টাম্প আর কাফ-লিংকের টুকরোটা দোতলার ঘরে নিয়ে যায়। জানলাগুলো ভিতর থেকে ছিটকানি বন্ধ করে দেয়। দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে পুলিশে ফোন করে।

কৌশিক বলে, সেক্ষেত্রে পিস্তলটা সে রীতার ডান হাতে গুঁজে দেবে কেন?

নিখিল বলে, একটাই সম্ভাব্য সল্যুশন : রীতা 'লেফ্‌ট-হ্যান্ডার' ছিল না। ফলে তার বাঁ-হাতে পিস্তলটা গুঁজে দিলে স্বতই মনে প্রশ্ন জাগবে, কেন সে বাঁ-হাতে পিস্তলটা নিয়ে বাঁ-কানে গুলি করে আত্মহত্যা করবে? তাই শকুন্তলা এটাকে 'আত্মহত্যা' বলে প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি। অপরাধটা পান্ডুরঙের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। সেই জন্যেই চুরুটের স্টাম্প আর ঝিনুকের টুকরোটা সযত্নে নিয়ে এসেছে দোতলায়।

কৌশিক বলে, আর যদি প্রমাণিত হয় রীতা 'লেফ্‌ট্-হ্যান্ডার' ছিল?

—তাহলে আবার সব গুলিয়ে যাবে। আমাদের মেনে নিতে হবে 'আত্মহত্যা'ই সম্ভাব্য সমাধান। আর সেক্ষেত্রে ওই চুরুটের টুকরো আর ঝিনুকের টুকরোটা কী করে দোতলায় উঠে এল এ প্রশ্নটা অমীমাংসিত থেকে যাবে!

কৌশিক তার মামুর দিকে ফিরে বলল, আপনি কী বলেন?

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমার মতামত তো আগেই জানিয়েছি। আমাদের হাতে এভিডেন্স যা আছে তা অপ্রতুল। এখন কোনও সিদ্ধান্তেই আসা যাবে না। ইনসাফিশিয়েন্ট ডাটা।

নিখিল বলে, আর নতুন কোনও সূত্র পাওয়া যাবে না, স্যার। যা হাতে এসেছে তাই দিয়েই...

—না হে, আমি ওইভাবে জোড়া-তালি দেওয়া সমাধান মেনে নিতে রাজি নই। চল, সন্ট লেকে আবার যাওয়া যাক। দেখা যাক—শকুন্তলা কী বলে। রীতা কি লেফ্‌ট্-হ্যান্ডার ছিল?

রানী ধমকে ওঠেন, অত তাড়াহুড়ো করার কী আছে? নিখিল 'কফি' খেতে চাইল না?

—ও, আয়াম সরি।

বিশে কফির ট্রে নিয়ে ঠিক তখনই ঢুকল ঘরে।

আট

কলবেল-এর আওয়াজ শুনে কেষ্টার-মা দরজা খুলে দিল। বলল, অ! আপনেরা! আমি বলি অ্যাত্তসকালে কে এল জ্বালাতে...

নিখিল জানতে চায়, তোমার বড়দিমণি আছেন?

—আছেন। এখন তো ইস্কুলের ছুটি গো। আসেন, বসেন। আমি খপর দিই।

বাসু আর নিখিল গিয়ে বসলেন বৈঠকখানায়। একটু পরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল শকুন্তলা। হাতে তার সেদিনের সংবাদপত্র। বোধকরি শয়নকক্ষে সেটাই পড়েছিল এতক্ষণ। ভাঁজ করে সেন্টার-টেবিলের নিচের তাকে সেটাকে রেখে দিয়ে বসে। হাত তুলে নমস্কার করে বলে, কোনও হদিস হলো? কেন রীতা এভাবে আত্মহত্যা করল?

নিখিল বলে, বলছি। সব কথাই আজ খুলে বলব। তার আগে দু'একটা তথ্য জানাই, এবং জেনে নিই। যে মদ্রদেশীয় লোকটির গাড়ির নম্বর আপনি লিখে রেখেছিলেন তার সন্ধান পাওয়া গেছে। অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, লোকটা মাস-মাস রীতা দেবীর কাছ থেকে 'ব্ল্যাকমেল'-এর টাকা আদায় করতে আসত।

শকুন্তলার ভ্রূকুঞ্চন হলো। বললে, ব্ল্যাকমেইল! কী ব্যাপারে? রীতার মতো শান্ত স্বভাবের মেয়ে কোনো অপরাধ করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এটা বিশ্বাসই হয় না।

নিখিল বলে, সেইটাই আমার প্রথম প্রশ্ন, মিস্ রায়। আপনি রীতা দেবীকে কিশোরী বয়স থেকে চেনেন। পারলে, আপনিই পারবেন ওর অতীত জীবনের কিছু সন্ধান দিতে। রীতা বিদ্যার্থীর জীবনে এমন কিছু অতীত ঘটনা থাকতে পারে কি—যার জন্য ওকে ব্ল্যাকমেইল করা যায়?

শকুন্তলা তার ম্যানিকিওর-করা নখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, আমি নিশ্চিতভাবে জানি না, রীতার সঙ্গে এ বিষয়ে কখনো আমার কোনো কথাবার্তা হয়নি—কিন্তু স্কুলে একটা গুজব শুনেছিলাম—সত্যমিথ্যা জানি না...

—থেমে গেলেন কেন? বলুন?

—দু'একজন বলেছিল, রীতা...মানে...বাস্টার্ড!

—বাস্টার্ড? মানে ওর জন্মের আগে ওর বাবা-মায়ের বিবাহ হয়নি?

—না, স্যার। সে অর্থে নয়। ওর মা ছিলেন সম্ভবত কর্ণাটকী মহিলা। সম্ভবত তাঁকে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান 'রেপ' করে। লোকটা পালিয়ে যায়। সন্তান জন্মের পর ওর মা ওকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেয়। পথচলতি মানুষ ওকে কুড়িয়ে পায়—থানায় জমা দেয়, হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে একটি মিশনারী প্রতিষ্ঠান ওর দায়িত্ব নেয়।...আই রিপীট, স্যার, এটা একেবারে শোনা কথা—গুজব মাত্র। এ নিয়ে রীতার সঙ্গে আমার কোনোদিন কথা হয়নি, অর্থাৎ রীতা আমার কাছে কোনোদিন সেকথা স্বীকার করেনি।

নিখিল বলে, 'যা রটে তার কিছুটা বটে।' এটা সত্য হলে বাকি ঘটনা পরম্পরার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

—কী ঘটনা পরম্পরা?

—ঐ মাদ্রাজী লোকটি এই তথ্য জানত। রীতার ওই বংশ-পরিচয়টা জানাজানি হলে সমাজে তার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। অ্যাডভোকেট মাইতির মতো খানদানি ঘরে তার স্থান হতে পারে না। ফলে, পাণ্ডুরঙ তথ্যটা গোপন রাখার শর্তে ওর কাছে মাসে-মাসে...

শকুন্তলা বাধা দিয়ে বলে, লোকটার নাম পান্ডুরঙ? তার সন্ধান পেয়েছেন?

—পেয়েছি। লোকটা সম্ভবত স্বভাবক্রিমিনাল। সে যে ব্র্যান্ডের চুরুট খায় সেই ব্র্যান্ডের চুরুট আমরা পেয়েছি রীতার ঘরে। তাছাড়া এই জিনিসটা দেখুন। এটা কী বলে মনে হয়?

শকুন্তলা ঝিনুকের টুকরোটা নেড়ে-চেড়ে দেখল। বলল, মনে হয় ঝিনুকের কানের দুলের অংশ। এমন দুল অবশ্য আমারও নেই, রীতারও ছিল না। কোথায় পেলেন ওটা?

নিখিল বললে, না, মিস্ রায়, এটা মেয়েদের দুল থেকে খসে পড়েনি। পড়েছে পুরুষমানুষের ফুলস্লিভ শার্টের কাফ-লিংক থেকে। ঐ পান্ডুরঙেরই আস্তিন থেকে খসে পড়া। আর এটা আবিষ্কৃত হয়েছে রীতা দেবীর শোবার ঘর থেকে...

—তার মানে কি...তার মানে কি...

—হ্যাঁ, তাই। রীতা বিদ্যার্থী আত্মহত্যা করেনি। দিস্ ইজ এ কেস অব মার্ডার!

শকুন্তলা বজ্রাহতা হয়ে নিস্পন্দ তাকিয়ে থাকে। তারপর সম্বিত পেয়ে আঁচলটা তুলে মুখটা ঢাকে।

বাসু এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। এবার বললেন, তুমি শান্ত হও মা! বুঝতে পারছি, তুমি এ সংবাদে কতটা শক্ড। কিন্তু তোমার বান্ধবীর হত্যাকারীকে তার প্রাপ্য শাস্তিটা দিতে তুমি নিশ্চয় পুলিসকে সাহায্য করবে?

শকুন্তলা মুখ মুছে জানতে চাইল, সেই মাদ্রাজী শয়তানটা এখন কোথায়?

—হাজতে। তাকে মার্ডার-চার্জে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শকুন্তলা কোনও জবাব দিল না।

নিখিল বলে, লোকটা স্বীকার করেছে যে, কালীপূজার দিন সন্ধ্যায় সে রীতার কাছ থেকে নগদে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছে। কিন্তু তার বক্তব্য হচ্ছে, সে টাকা ও নিয়েছে 'চিট ফ্যান্ডের' ইন্সটলমেন্ট হিসাবে। ব্ল্যাকমেলিং বাবদ নয়।

শকুন্তলা অবাক হলো। বলল, চিট ফান্ড? রীতা তো কখনো আমাকে তা বলেনি। ওর হাতে প্রায়ই টাকা থাকত না। মাঝে মাঝে আমার কাছে ধার নিত, আবার পরের মাসে মাইনে পেলে শোধ করেও দিত। সে কোনও 'চিট ফান্ডে' মাসে মাসে ডিপজিট করত এটা আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। আর যদি তাই করতে চায় তাহলে 'অ্যাকাউন্ট-পেয়ী' চেকে কেন নয়? লোকটা নিঃসন্দেহে ব্ল্যাকমেলার। পাক্কা শয়তান!

—আমারও তাই বিশ্বাস। তবু আপনার উপস্থিতিতে আমি ঐ আলমারিটা আর একবার খুলব। খুঁজে দেখব, ওই চেন্নাইয়ের কোনও চিট ফান্ডের সার্টিফিকেট বা রসিদ পাওয়া যায় কি না। গতবার সে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা তো আলমারিটা সার্চ করিনি।

শকুন্তলা বললে, চাবি দিচ্ছি। আপনারা খুঁজে দেখুন। তবে, প্লিজ আমাকে রেহাই দিন। ওই ঘরে আমি এখনো যাইনি। যেতে পারছি না। আরও দু চারদিন না গেলে...

—কিন্তু আপনার অসাক্ষাতে কেমন করে আমরা আলমারি খুলে...

বাধা দিয়ে শকুন্তলা বলল, অলরাইট। আমি কেষ্টার-মাকে আবার আপনাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে আমার প্রতিনিধি। এভাবেই আইনটাকে বাঁচিয়ে আমাকে রেহাই দিন, প্লিজ।

নিখিল রাজি হলো। উঠে দাঁড়াল। চলতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে এসে বলল, আর একটা প্রশ্ন মিস্ রায় : রীতা কি 'লেফ্‌ট্‌-হ্যান্ডার' ছিল?

—লেফ্‌ট্‌-হ্যান্ডার'? মানে—ওই যারা বাঁ-হাতে লেখে?

—হ্যাঁ, তাই। আপনি তাকে স্কুলজীবন থেকে দেখেছেন, আপনি নিশ্চয়ই তা জানেন...

—কেন জানব না? না, রীতা আপনার-আমার মতো ডান হাতেই লিখত। কিন্তু হঠাৎ এ-কথা কেন?

—পিস্তলটা রীতার কোন হাতে ছিল, তা মনে নেই?

শকুন্তলা মুখ নিচু করে চিন্তা করল। তারপর মুখ তুলে স্বীকার করল, সরি। তা আমার মনে নেই।

—মনে নেই? মাত্র দুদিন আগেকার ঘটনাটা...

—আয়াম এক্সট্রিমলি সরি, অফিসার। এই দুটো দিন ধরে আমি ক্রমাগত চেষ্টা করে গেছি, সেই ক্ষণিক-দেখা দৃশ্যটা ভুলে যেতে! আমার এটুকু মনে আছে : অনিমেষবাবু আর তাঁর কন্সটেবল্‌রা মিলে দরজাটা ভেঙে ফেললেন। তিনজনেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন। আমিও তাঁদের পিছু পিছু...কিন্তু অনিমেষবাবু হঠাৎ আমাকে রুখে দিলেন। বললেন, ঘরের ভিতরে এলে কোনো কিছু স্পর্শ করবেন না। দূর থেকে...তা, হ্যাঁ, আমি দূর থেকেই দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। ঘরে আদৌ ঢুকিনি...রক্তের মধ্যে পড়ে আছে রীতা। ইনফ্যাক্ট, তার কোথায় গুলিটা লেগেছে, তার হাতে কোনো কিছু ছিল কি না, আমি কিছুই দেখিনি। আমার প্রচণ্ডভাবে গা গুলিয়ে উঠল। আগের রাত্রে ভদ্রেশ্বরে অনেক রাত করে খাওয়া-দাওয়া করেছিলাম...তারপর ঘুম হয়নি...ট্রেন জার্নি...আমার সব কিছু বমি হয়ে গেল। এরপর আমি আর দোতলায় যাইনি!

নিখিল বলল, কেষ্টার-মাকে পাঠিয়ে দিন দোতলায়। আর আলমারির চাবিটা দিন। আসুন, স্যার—

বাসু কিন্তু গাত্রোত্থান করলেন না। বসে বসেই বললেন, এর মধ্যে অ্যাডভোকেট মিস্টার মাইতির সঙ্গে তোমার কোনোও কথা হয়েছে? টেলিফোনে?

শকুন্তলা তার আয়ত চোখজোড়া তুলে বললে, এসকিউজ মি স্যার, তার সঙ্গে কি রীতার মৃত্যুরহস্যের কোনও সম্পর্ক আছে?

বাসু হেসে বললেন, সেইটাই তো জানতে চাইছিলাম!

ওঁরা দুজনে সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে উঠে এলেন। পিছন-পিছন কেষ্টার মা। নিখিল এগিয়ে গিয়ে আলমারিটা খুলল। বাসু-সাহেব হঠাৎ রুখে গেলেন। কেষ্টার-মাকে বললেন, টুলের উপর উঠে ঐ ছবিটা টাঙালো কে গো? তুমি?

বাসু-সাহেবের অঙ্গুলি নির্দেশে কেষ্টার-মা ঊর্ধ্বমুখ হলো। অবাকও হলো। বলল, অ-মা! ফটোকটা বড়দিমণি আবার টাইঙ্গে দেছে দেখছি...

বাসু বলেন, না! তোমার ভুল হচ্ছে। বড়দিমণি তো ওই ঘটনার পর এঘরে আর আসেইনি বলল। তুমিই নিশ্চয় টাঙ্গিয়েছ!

কেষ্টার-মা রুখে ওঠে, না! আমি টাংগাই নাই...

বাসু আপসের চেষ্টা করেন, বেশ তো, বেশ তো! তা রাগ করছ কেন? এই ছবিটাই তো আগে ছিল ওখানে? তোমার ছোড়দিমণির ছবিটা?

কেষ্টার মার কেমন যেন ধন্ধ লেগে গেল। বললে, ওই ফটোকটাই কি ছেল ওখানে? ওইডা ছোড়দিমণি?

বাসু বলেন, সেটা তো তুমি বলবে কেষ্টার-মা! আমি কি আগের ছবিখানা দেকিচি? তা কী বলছ তুমি? এইটাই সেই ছবি তো?

কেষ্টার-মা একগাল হেসে বললে, এজ্ঞে! পেরথমটায় কেমন যান ধন্দ ধরি গেস্‌ল! মনে হতি ছিল, এডা ছোড়দিমণি লয়। তার যমজ বোনের ফটোক!

—এখনো তাই মনে হচ্ছে?

দুদিকে মাথা নেড়ে কেষ্টার-মা বললে, না! এডাই সেডা!

নিখিল ও-পাশ থেকে প্রশ্ন করে, কী কথা হচ্ছে আপনাদের?

বাসু বললেন, ওই দেখ! রীতা বিদ্যার্থীর সেই ছবিখানা ফ্রেমিং হয়ে ফিরে এসেছে।

নিখিল ঊর্ধ্বমুখে ছবিটা দেখে! তারপর আলমারির চাবি বন্ধ করে এদিকে এগিয়ে আসে। বলে, শী ওয়াজ নট দেন আ লেফ্‌ট্‌-হ্যান্ডেড লেডি?

এনলার্জড ফটোতে দেখা যাচ্ছে, বাসন্তী রঙের একটা চকড়া-বকড়া সালোয়ার কামিজ পরে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে রীতা একটা প্যাডে কাকে যেন চিঠি লিখছে। তার ডান হাতে কলম।

নিখিল আবার আপন মনে বললে, সো দ্যাটস্‌ দ্যাট! মেয়েটি লেফ্‌ট্‌-হ্যান্ডার নয় তাহলে?

বাসু বললেন, তাই তো দেখছি। কিন্তু একটা কথা, নিখিল। কেষ্টার-মা প্রথম-দর্শনে বলেছিল এটা তার ছোড়দিমণির ফটোক নয়।

—সে কি! কেন? এটা তো রীতা বিদ্যার্থীর ফটোই!

—হ্যাঁ। তোমার-আমার তাই মনে হচ্ছে বটে, তবে কেষ্টার-মায়ের মনে হয়েছিল : এটা ছোড়দিমণির যমজ বোনের ফটোক।

নিখিল অবাক হয়। বলে, যমজ বোন! রীতার কি কোনও যমজ বোন ছিল না কি? কি গো কেষ্টার-মা? ও রীতার যমজ বোন?

কেষ্টার-মা সলজ্জে বলে, পেরথমটায় আমার 'ভেরম্‌' হই গেল, পুলিশ-সাহেব। না গো, এইডা ছোড়দিমণির সেই ফটোকটাই।

নিখিল একদৃষ্টে ছবিটার দিকে তাকিয়ে ছিল। বললে, ডেট-কার্ডটা পড়া যাচ্ছে—লক্ষ্য করেছেন?

বাসু বললেন, হ্যাঁ। মাস বা বার কী ছিল পড়া যাচ্ছে না; কিন্তু তারিখটা ছিল কোনো একটা মাসের এগারো তারিখ।

নিখিল হঠাৎ বলে বসে, হোল্ড এভরিথিং! ব্যাপারটা কী?

একটা চেয়ার টেনে এনে ফ্রেমে বাঁধানো ফটোটা নামাল সে। উল্টো-পাল্টে দেখল। তারপর হিপপকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে খুব গভীরভাবে ছবিটা দেখল। অবশেষে সে বলল, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখুন!

বাসু ফটো আর আতস কাচটা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। নিখিল বললে, অ্যানোম্যালিটা নজরে পড়েছে?

বাসু বললেন, 'অ্যানোম্যালি'? মানে অসংগতি? কই না। আমি তো যা প্রত্যাশা করেছিলাম, তাই দেখতে পাচ্ছি।

—রীতার বাম ভ্রূর উপর কাটা দাগটা...

—হ্যাঁ, এবার ডান ভ্রূতে চলে গেছে এবং এগারো অক্ষরের ইলেকদুটো উল্টো দি... গেছে...

—'ইলেকদুটো উল্টো দিকে চলে গেছে' মানে?

—ও! সেটা তোমার নজরে পড়েনি বুঝি? শোন, কলমটা যদি রীতার বাঁ-হাতে থাকত আর কাটা দাগটাও বাম-ভ্রূর উপরে দেখতে পেতাম তাহলে, দাও দেখি তোমার নোটবইটা...

নিখিল পকেট থেকে তার নোটবইটা বার করে দিল। বাসু-সাহেব পাশাপাশি দুটি স্কেচ এঁকে বললেন, এই দেখ, ফটোতে যদি কলমটা ওর বাঁ-হাতে থাকত তাহলে এগারো হরফটা ফটোতে 'ক'-চিহ্নের মতো হতো। কিন্তু তা হয়নি। একের-পিঠে-এক-এর ইলেকদুটো উল্টো দিকে হয়ে গেছে—কারণ কলমটা এসে গেছে ওর ডান হাতে। তাই এগারোটা দেখতে হয়েছে 'খ'-চিহ্নের ছবির মতো!

নিখিল বলল, এনাফ!

—না, নিখিল, এখনো 'এনাফ' হয়নি। ফটোটা উল্টে পিছন দিকটা দেখ। বালি-কাগজে আঠা দিয়ে পাশটা এবং পিছনটা মোড়ানো হয়নি। খবরের কাগজ কেটে আঠা দিয়ে সেঁটে তড়িঘড়ি ফটোটা বাঁধানো হয়েছে। একেবারে অ্যামেচারিশ কাজ!

নিখিল বললে, এই এভিডেন্সটা কনক্লুসিভ! মার্ডারার পুলিশের চোখে ধোঁকা দিতে নিজের ডার্করুমে নিজে হাতে 'রিভার্স প্রিন্ট' এনলার্জ করেছে! প্রমাণ করতে চেয়েছে রীতা ছিল রাইট-হান্ডার।

—কিন্তু কেন? কী তার উদ্দেশ্য?

—হত্যাপরাধটা পান্ডুরঙের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, স্যার। গাড়িতে আমার রেডিও-সেটটা আছে। আমি হোমিসাইডে একটা ফোন করি।

বাসু ওর হাত চেপে ধরেন। বলেন, না, নিখিল, না। আগে সবটা বুঝে নাও! এখনও তুমি সবটা জান না!

নিখিল দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, সরি স্যার! এত বড় একটা ক্লু আমি আস্তিনের তলায় লুকিয়ে রাখতে পারব না। আমার 'বস'-কে এক্ষণি ওটা জানাতে হবে। আর তিনি যদি মিস্ রায়কে অ্যারেস্ট করতে বলেন, তাহলে সেটাও আমাকে করতে হবে। আমি পুলিশে চাকরি করি, স্যার। কৌশিকবাবুর মতো শখের গোয়েন্দা নই।

বাসু শ্রাগ করলেন। কেষ্টার-মা বলল, হৈছেডা কী?

নিখিল জবাব দিল না। ফটোটা বগলে নিয়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল বাইরে।

বাসু ধীর পায়ে নেমে এলেন নিচে। দেখলেন, শকুন্তলা নিশ্চুপ বসে আছে তার বৈঠকখানা ঘরে। বাসু ধীরে ধীরে এসে বসলেন তাঁর পাশটিতে। কেষ্টার-মা কলঘরের দিকে চলে গেল কাপড় কাচতে।

বাসু পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বার করে তামাক ঠেশতে ঠেশতে বললেন, এটা তুমি কী করলে, কুন্তলা মা! এত বুদ্ধি তোমার, আর এটুকু বুঝলে না যে, তোমার ফটোগ্রাফিক ট্রিকস্টা পুলিশে সহজেই বুঝে ফেলবে? লেফট্-হ্যান্ডারকে ওভাবে রাইট-হ্যান্ডার করা যায় না—তার জন্য 'মোবিয়াস্ প্লেন'-এ স্পেসকে পাক খাওয়াতে হয়। সে বড় কঠিন অঙ্ক, মা...*

* *নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা দ্রষ্টব্য*

শকুন্তলা কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে এতক্ষণ শুনে যাচ্ছিল। এবার বলে, সম্ভবত আপনি বাংলা ভাষাতে কথা বলছেন। ওইটাই আমি স্কুলে পড়াই; কিন্তু আপনার কথা আমি বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছি না।

বাসু ঝুঁকে পড়ে বললেন, সাদা-বাংলায় বলি, বুঝবে! রীতা বিদ্যার্থীকে কে গুলিবিদ্ধ করেছে, এ দুনিয়ায় তা তিনজন জানে। এক : রীতা নিজে জানত। সে চিরনির্বাক হয়ে গেছে। দুই : আমি জানি, যেহেতু ঘটনার পারম্পর্য বিশ্লেষণ করে সেটা বোঝার মতো বিশেষ শিক্ষা আমার আছে। তিন : তুমি নিজে। যেহেতু— কিন্তু হেতুটা তোমাকে বোঝানো বৃথা। তুমি জান কীভাবে তুমি নিজেই অপরাধী...

শকুন্তলা বাধা দিয়ে বললে, আপনার কথা এখন সহজবোধ্য। কিন্তু আপ্তবাক্যধর্মী। এসব আবোল-তাবোল কথা আমাকে কেন বলছেন?

—বলছি, এজন্য যে, পনেরো মিনিটের ভিতর তুমি রীতা বিদ্যার্থীর হত্যাপরাধে গ্রেপ্তার হবে। ঐ পুলিস অফিসারটি ফিরে এলেই। তোমাকে আমার অনুরোধ—আমাকে দশটা টাকা এনে দাও। আমি তোমার নামে একটা রসিদ কাটি! আইনত তোমাকে মক্কেল বলে স্বীকার করতে হলে সেটা প্রয়োজন। কুইক!

শকুন্তলা বললে, সরি স্যার! আমি বুঝতে পেরেছি, মিস্টার দাশ রেডিও মেসেজে আমাকে গ্রেপ্তার করার অনুমতি আনতে গেলেন। এখনি এসে আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবেন। এই তো? আই নো! আমি সেজন্য প্রস্তুত হয়েই বসে আছি। কিন্তু আপনাকে আমি আমার কাউন্সেলার হিসাবে এনগেজ করতে পারব না! সরি স্যার!

—কিন্তু কেন? তুমি কি গিল্‌টি প্লীড করবে?

—আইনভঙ্গ করেছি, তাই গিল্‌টি তো আমি বটেই। কিন্তু রীতাকে আমি হত্যা করিনি! সুতরাং গিল্‌টি প্লীড করব কোন দুঃখে?

—তাহলে তুমি আমাকে...

কথাটা তাঁর শেষ হলো না। সদর দরজাটা খুলে গেল। নিখিল ফিরে এসে বলল, মিস্ শকুন্তলা দেবী, আয়াম এক্সট্রিমলি সরি টু অ্যানাউন্স...

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে শকুন্তলা বললে, আপনার দুঃখিত হবার কী আছে মিস্টার দাশ? আপনি তো উপরওয়ালার নির্দেশে আমাকে অ্যারেস্ট করছেন। আমি তৈরিই। শুধু একটা অনুরোধ—

—বলুন?

—আমার শোবার ঘরে একটা মিনি-অ্যাকোয়ারিয়াম আছে। তাতে আট-দশটা বিদেশী মাছ আছে। ও বেচারারা তো কোনো অপরাধ করেনি। ওগুলোকে আপনার লোক দিয়ে কোনও অ্যাকোয়ারিয়াম মালিককে পৌঁছে দেবেন। দাম চাই না আমি। জাস্ট এ গিফ্‌ট্! মাছগুলো না হলে মরে যাবে!

বাসু-সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মেয়েটির মনের জোর দেখে।

শকুন্তলা ঘরের ভিতর গেল। একটু পরেই একটা ওভারনাইট ব্যাগ নিয়ে সে ফিরে এল। বোঝা গেল, এ ঘটনা তার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নয়। সে মনে মনে তৈরি হয়েই ছিল। শকুন্তলা কেষ্টার-মাকে ডাকল। তার হাতে একটা খাম দিয়ে বলল, এতে তোমার তিন মাসের মাইনে আছে। তুমি অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নিও।

কেষ্টার-মার অর্থগ্রহণ হলো না। বললে, আমার হাতের-কাজ এখনো সারা হয়নি। তুমি কি বেরুচ্ছ বড়দিমনি?

—হ্যাঁ, নাও এই খামটা ধর। কাপড় কাচার দরকার নেই। এস। আমি দরজা বন্ধ করব।

তারপর বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললে, থ্যাঙ্কু অল দ্য সেম, স্যার, ফর য়োর কাইন্ড অফার।

বাসু-সাহেব কথা খুঁজে পেলেন না।

শকুন্তলা এবার দাশের দিকে ফিরে বললে, চলুন?

নয়

বাসু-সাহেব নিউ আলিপুরে ফিরে এসে দেখলেন রানী দেবী একা বসে টি. ভি. দেখছেন। সুজাতা নার্সিংহোমে; কৌশিক তার সঙ্গে দেখা করতে গেছে, এখনো ফেরেনি। বিশে তার ঘরে একটা অসময়ের 'বেড়াল ঘুম' দিচ্ছে।

বাসু বললেন, তুমি আবার বড় একা হয়ে পড়েছ, তাই নয়?

রানী বললেন, এ তো 'টেম্পরারি ফেজ'। কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায়?

—কেষ্ট?

—হ্যাঁ, কেষ্টঠাকুরই তো! ননীচোরা! দুদিন পরেই এসে যাবে!

বাসু বললেন, ভুল ধারণা তোমার। কৌশিকের মেয়ে হবে।

রানী বললেন, আমি কৌশিকের বাচ্চার কথা বলছি থোড়াই!

—তবে কার কথা বলছ?

—সুজাতা যে চুনুমুনু বাচ্চাটাকে নিয়ে আসবে তার কথা!

আহারাদি সেরে বিশ্রাম নিতে যাবার আগে বাসু-সাহেব মিস্টার রবিন মাইতির চেম্বারে একটা ফোন করলেন। শুনলেন, সাহেব আজ আদালতে আসেননি। তাঁর শরীর খারাপ। অগত্যা অ্যাডভোকেট সাহেবের বাড়িতে ফোন করলেন। সেখানে খবর পাওয়া গেল, মাইতি-সাহেব বাড়ি নেই—কোথায় গেছেন বাড়ির লোক জানে না।

সন্ধ্যা-নাগাদ দু'দুটো ফোন এল। একটা কৌশিকের। জানাল, পরদিন সকালে সিজারিয়ান করার আয়োজন হচ্ছে। কৌশিকের ফিরতে দেরি হতে পারে। দ্বিতীয় টেলিফোনটা এল নিখিল দাশের। জানতে চাইল, সে দেখা করতে চায়। আসতে পারে কিনা?

বাসু বললেন, বাট উই আর নট নাউ ইন দ্য সেম বোট, ব্রাদার!

—না, স্যার! আপনার ওই ধারণাটা ভুল। আপনি অনুমতি করলে আমরা দুজন এসে দেখা করতে চাই।

—দুজন? কাকলিও আসছে? এস, এস! রানু খুব একা হয়ে পড়েছে। কাকলি এলে একটু গল্পগুজব করতে পারবে।

নিখিল বুঝতে পারে—তার বাজারদর একেবারে পড়ে গেছে। সে কিছু উচ্চবাচ্য করে না।

সন্ধ্যার পর এল ওরা দুজন। বাসু-সাহেব ততক্ষণে তাঁর শিভ্যাস-রিগাল-এর বোতলটা বার করে নিজের ঘরে জমিয়ে বসেছেন—সোডা, বরফ কিউব, আর স্ন্যাক্স্ নিয়ে। নিখিল কফির কাপ হাতে এসে বসল সেখানে। কাকলি রানী দেবীর কাছে।

নিখিল আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশে বললে, আমার আর কোনো উপায় ছিল না, স্যার। অতবড় খবরটা আমাকে জানাতেই হলো; আর আমার 'বস' যা অর্ডার করবেন তা তো আমাকে মানতে হবে?

—বাই অল মীন্স্! সেজন্য আমি তো তোমার দোষ ধরছি না। আমি শুধু বলছিলাম, আমরা এখন টেনিস-কোর্টের দু'প্রান্তে। মাঝখানে টাঙানো আছে অলক্ষ্য একটা নেট। এতদিন ছিলাম পার্টনার!

নিখিল সসঙ্কোচে বললে, এখন কিন্তু শকুন্তলা দেবীকে ছাড়া আর কাউকে চিন্তা করা যাচ্ছে না।

—তুমি তাই মনে কর?

—নয় কি? আমরা যখন টেনিস কোর্টের একই প্রান্তে পার্টনার হিসাবে খেলছিলাম, স্যার, তখন আমরা তিনটি বিকল্প সমাধানের কথা ভেবেছিলাম। আত্মহত্যা, পাণ্ডুরঙ আর মিস্ রায়। আত্মহত্যার থিয়োরি ধোপে টিকল না। শুধু সুইসাইডাল নোট নেই, বা ঘরের চাবিটা আমরা খুঁজে পাইনি বলে নয়—সে ক্ষেত্রে পিস্তলটা ডান হাতে চলে আসার কোনো ব্যাখ্যা নেই। পাণ্ডুরঙকে আমরা মার্ডারার বলতে পারছি না তিন-তিনটি কারণে। প্রথম কথা : সে আট-দশ বছর ধরে রীতা বিদ্যার্থীকে চেনে—ফলে নিশ্চয় জানে, সে লেফট্-হ্যান্ডেড। কেসটাকে সে আত্মহত্যা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে কিছুতেই পিস্তলটা ডান হাতে গুঁজে দিত না—বিশেষত গুলিটা যখন ঘটনাচক্রে কপালের বাঁদিকে লেগেছে। তাছাড়া দগ্ধাবশেষ সিগারটা ওর মতো পাকা অপরাধজীবী ওখানে ফেলে রেখে যেত না। বাকি থাকল শকুন্তলা। তার মোটিভটা আমরা জানি। সে বুঝে নিয়েছিল—'আত্মহত্যা' হিসাবে কেসটাকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। কারণ কোনো 'সুইসাইডাল-নোট' নেই। তাই হত্যাপরাধটা কায়দা করে পাণ্ডুরঙের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। নিচের ঘর থেকে সিগারের স্টাম্পটা উপরের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। ঘটনাচক্রে নজরে-পড়া তার জামার কাফ-লিংকের ঝিনুকের টুকরোটাও দ্বিতলে নিয়ে যায়।

বাসু বলেন, কিন্তু শকুন্তলাও তো আট-দশ বছর ধরে জানে যে, রীতা বেঁয়ো। সে কেন ভুল করে ওর ডান হাতে পিস্তলটা গুঁজে দেবে?

—ভুল করে নয়, স্যার, ইচ্ছে করে! যাতে পুলিশ পাণ্ডুরঙের সন্ধান করে। দেখুন, মহিলাটি কেমন ধীরে ধীরে তিল-তিলে আমাদের দৃষ্টি ওই মদ্র লোকটির দিকে আকৃষ্ট করেছে! তার গাড়ির নম্বর সরবরাহ করেছে. সবচেয়ে বড় কথা : রীতা যে লেফট্-হ্যান্ডার এ তথ্যটা গোপন রাখতে ওর সংগ্রহে রাখা নেগেটিভটা উল্টো করে প্রিন্ট করে আমাদের ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছে! জেনে-শুনে মিথ্যে বলেছে যে, রীতা ডান হাতে লিখত।

বাসু কোনও জবাব দিলেন না।

নিখিল তাগাদা দেয়, আপনি কিছু বললেন না যে?

—বলব নিখিল, যখন মাইতি সওয়াল করতে উঠবে।

—মাইতি? রবিন মাইতি?

—না গো! তোমাদের পাব্‌লিক প্রসিকিউটার নিরঞ্জন মাইতি-সাহেব!

—কিন্তু কী করে করবেন, স্যার? শকুন্তলা তো আপনাকে কোনও রিটেইনার দেয়নি। আপনাকে সে তো তার ডিফেন্স কাউন্সেল বলে স্বীকার করে নেয়নি?

বাসু জবাব দিলেন না। টেলিফোনটা ক্র্যাড্‌ল্ থেকে তুলে নিয়ে ডায়াল করলেন রবিন মাইতির বাড়িতে। ও-প্রান্তে সাড়া দিলেন শ্রোতা : মাইতি স্পিকিং।

বাসু বললেন, গুড আফটারনুন মিস্টার মাইতি। আমি নিউ আলিপুর থেকে পি. কে. বাসু, কাউন্সেলার কথা বলছি। আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?

—বিলক্ষণ! আদালত-পাড়ায় আপনাকে না চেনে কে? আপনি কী রীতা বিদ্যার্থীর মার্ডার কেসটার বিষয়ে বলতে চান?

—না। আমি শকুন্তলা রায়ের ডিফেন্স-ব্যবস্থার বিষয়ে কথা বলতে চাই।

—ইট্‌স্ অল দ্য সেম। একই প্রসঙ্গ। শুনলাম, মিস্ রায় আপনাকে কাউন্সেলার হিসাবে নিয়োগ করতে অস্বীকার করেছেন? কথাটা সত্যি?

—হ্যাঁ তাই। আপনি এত তাড়াতাড়ি তা জানলেন কেমন করে?

—আমি ল-য়ের প্র্যাকটিস ছাড়াও রাজনীতি করে থাকি, স্যার! কিন্তু আমাকে আপনি 'তুমি' বলেই কথা বলবেন।

—বলব। যখন পরিচয়টা আর একটু ঘনিষ্ঠ হবে। আপাতত আমরা দুজন আইনজীবী হিসাবে কথা বলছি তো?

—বলুন স্যার? আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

—শকুন্তলার আইন-পরামর্শদাতা হিসাবে আমাকে স্বীকার করে।

—তা কেমন করে হয়? শকুন্তলা নিজেই যখন প্রত্যাখ্যান করেছে।

—কিন্তু কেন করেছে, তা তো আপনি জানেন, মিস্টার মাইতি! কী? জানেন না?

—আয়াম সরি! না, আমি জানি না; জানতে চাইও না। তাছাড়া আমি কোন্ অধিকারে আপনাকে এনগেজ করব? শকুন্তলার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

—এমপ্লয়ী এবং এমপ্লয়ারের সম্পর্ক। সেটা অন্তত আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। সে যে স্কুলে বাংলা পড়ায়, আপনি সেই স্কুলের গভর্নিং-বডির সভাপতি।

—আয়াম সরি, স্যার! কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করছে সে! আমি তাকে সাহায্য করার কে? করুণাময় ঈশ্বরের 'ইন্‌একজরিব্‌ল্ জাস্টিস্'-এ আমি বিশ্বাস করি—তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ বিচারে আমার আস্থা আছে!

—এতটা ঈশ্বরবিশ্বাসী হলে আপনি আইন পড়তে গেলেন কেন? ল প্র্যাকটিস করেন কেন? ঈশ্বরের বিচারেই সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না কেন?

—সরি স্যার! আপনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ, সিনিয়ার ল-ইয়ার। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করব না। কিন্তু আপনি কি ঈশ্বরের অপক্ষপাত ন্যায়নিষ্ঠ বিচারে সন্দেহ করেন?

—আপনি করেন না? আপনার মনে কখনো কি এ নিয়ে প্রশ্ন জাগে না? আপনি কি কখন কোথাও দেখেননি—'তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে/কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে!' সক্রেটিস্‌কে যারা হেমলক পানে বাধ্য করেছিল সেই আদিম কাল থেকে শুরু করে

আজও যারা চটকলের শ্রমিক ভিখারি পাশওয়ানকে পরিকল্পিতভাবে হাফিজ করে...

—সরি, স্যার! আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। আপনি দয়া করে আমাকে মার্জনা করবেন!

বাসু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অল-রাইট! তাই করব। আপনাকে মার্জনাই করব। জ্যাঠাইমার নির্দেশে আপনার আচরণে আমি ক্ষুব্ধ হব না।

—জ্যাঠাইমা! কার জ্যাঠাইমা?

—রমেশের!

—রমেশ? সরি স্যার! ঠিক বুঝলাম না!

—আয়াম ইকোয়ালি সরি, স্যার! বাঙলায় এম. এ পাশ কোনও ব্যক্তি যদি *পল্লীসমাজের* রমেশের জ্যাঠাইমাকে না চিনতে পারেন, তাহলে আমি নাচার!

বাসু ক্র্যাডলে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। নিখিল একতরফা কথা শুনেছে। তবু বুঝতে তার কোনও অসুবিধা হয়নি। বলে, রবিন মাইতিও আপনাকে 'রিটেইন' করতে রাজি হলেন না?

বাসু জবাব দিলেন না। গ্লাসে আরও এক পেগ ঢাললেন।

নিখিল উঠে দাঁড়ায়। বলে, বুঝতে পারছি, এসব আলোচনা এখন আপনার ভাল লাগছে না। আমি চলি, স্যার?

মদ্যপানরত মানুষটি হঠাৎ কাতর কণ্ঠে বলে ওঠেন, উড য়ু ডু মি আ ফেভার, দাশ?

নিখিল তৎক্ষণাৎ নিচু হয়ে ওঁর পদধূলি নিয়ে বলে, এসব কী বলছেন, স্যার? আপনি তো হুকুম করবেন—

—আমি ওই মেয়েটির সঙ্গে কাল সকালে একবার দেখা করতে চাই। ওর কাউন্সেলার হিসাবে নয়। একজন কোর্ট-অফিসার হিসাবে। অফ কোর্স, তোমার উপস্থিতিতে। আইনজীবী হিসাবে প্র্যাকটিস্ শুরু করার আগে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তার মর্যাদা রাখতে। তুমি রাজি আছ?

—তাই হবে, স্যার!

লোহার জালতির এ-প্রান্তে খুনের আসামী, অপর-প্রান্তে তার আইনজীবী, আর শ্রুতিসীমার বাইরে অথচ দৃষ্টিসীমার ভিতরে প্রহরী—এই প্রচলিত দৃশ্যটি এখানে রূপায়িত হলো না। কারণ পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল খুনী-আসামীর পক্ষে নিযুক্ত হননি। নিখিল বাসু-সাহেবকে তার অফিস ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। একটু পরে একজন মহিলা পুলিশ শকুন্তলাকে নিয়ে এলেন এ-ঘরে। নিখিল শকুন্তলাকে বলল, আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন।

মহিলা পুলিশকে আদেশ দিল, আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন। এঁকে আবার হাজতে নিয়ে যেতে হবে, কথাবার্তা শেষ হলে।

বাসু ধীরে-সুস্থে পাইপটা ধরালেন। শকুন্তলা নতনেত্রে চেয়ারে বসেই আছে। বাসু বললেন, শোন শকুন্তলা-মা, তুমি আমাকে ওকালতনামা দিতে অস্বীকার করেছ—কেন করেছ, তা আমি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। কারণ কাল রাত্রে আমি মিস্টার মাইতিকে অনুরোধ করেছিলাম, তোমাদের স্কুলের গভর্নিং-বডির প্রেসিডেন্টে হিসাবে এমপ্লয়ীর তরফে আমাকে এম্প্লয় করতে—

শকুন্তলা মুখ তুলে তাকাল। বললে, তিনি রাজি হননি তো?

—জাস্ট এ মিনিট, মিস্ রয়! তুমি এখন কোনও কথা বলবে না। কোনও প্রশ্নের জবাব দেবে না। তোমার নাম কী, অথবা দেওয়াল-ঘড়িতে কটা বাজে—এ জাতীয় প্রশ্নেরও জবাব দেবে না। তোমাকে এখানে ডাকা হয়েছে শুনতে, স্রেফ শুনতে। তোমার কথা বলা বারণ। যতক্ষণ না তোমার স্বার্থ দেখতে কোনও আইনজীবী উপস্থিত হচ্ছেন। অ্যাম আই ক্লিয়ার?

গ্রীবা সঞ্চালনে শকুন্তলা জানাল : সে বুঝতে পেরেছে।

বাসু আবার শুরু করেন, তবু ভুল করে তুমি যে প্রশ্নটা করে ফেলেছ তার জবাব আমি দেব—তোমার তা জানা থাকা দরকার বলেই দেব। সেক্ষেত্রে নিজের ডিফেন্স ব্যাপারে তুমি তোমার পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারবে। হ্যাঁ, তোমার অনুমান ঠিকই। মিস্টার মাইতি রাজি হননি। কেন হননি, তা তুমিও জান, আমিও জানি।

নিখিল এই পর্যায়ে বাসু-সাহেবকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে, আপনি যা বলবেন তা কি আমি টেপ-রেকর্ড করতে পারি?

—না! আদালতে যা বলার তা আমি পৃথকভাবে আদালতেই বলব। এখন যা বলছি—বিবেকের নির্দেশে, কোর্ট-অফিসার হিসাবে, তা শুধু শকুন্তলার শ্রুতির জন্য। তোমার উপস্থিতিটা আমাকে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হচ্ছে—এই যা।

নিখিল বলে, অলরাইট, স্যার। আপনি শুরু করুন।

বাসু পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে বলেন, শোন কুন্তলা-মা। প্রথমেই যে কথাটা বলব তা তোমাকে আগেও জনান্তিকে বলেছি। আজ মিস্টার দাশের সামনে তার আমি পুনরুক্তি করছি : রীতা কার গুলিতে মারা গেছে তা জানতে পেরেছে তিনজন। একজন রীতা নিজে—কিন্তু সে আর কথা বলবে না। দ্বিতীয়জন আমি, যুক্তি-পরম্পরায় অনিবার্য সিদ্ধান্তে। তৃতীয়জন : তুমি!...আমি তোমার পক্ষের আইনজীবী নই। ফলে যা বলছি, তার দায়দায়িত্ব আমার—তোমার নয়। তুমি আমার কোনো কথায় প্রতিবাদ বা সমর্থনসূচক কিছু বলবে না।...

তোমাদের তিনজনের কী সম্পর্ক তা মিস্টার দাশ এবং আমি, আমরা দুজনেই জানি। তুমি তোমার জবানবন্দিতে বলেছিলে—মিস্টার মাইতি তোমার বাড়িতে আগে অনেকবার এসেছেন। ইদানীং আসেন না। অপিচ, নিখিলের প্রশ্নের জবাবে তুমি আরও বলেছিলে, গত সাত-দশদিনের মধ্যে তিনি এসেছেন কি না তা তুমি জান না—কারণ এসে থাকলেও তোমার জ্ঞাতসারে আসেননি। অপরপক্ষে, মিস্টার মাইতি বলেছিলেন বিশেষ কারণে, তিনি রীতা বিদ্যার্থীর বাড়িতে যেতেন না, বা বাড়িতে ফোন করতেন না। এ থেকেই ত্রিকোণাকৃতি জ্যামিতিক সমস্যার স্বরূপটা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম...

—ঘটনা হচ্ছে এই : তুমি রীতা বিদ্যার্থীকে চিনতে স্কুলজীবন থেকে। তোমার স্বীকৃতিমতে তুমি জানতে যে, রীতা— বাস্টার্ড। তার শুধু পিতৃপরিচয় নয়, মাতৃপরিচয়ও নেই। রীতাও ন্যাচারালি জানত যে, তুমি জানতে। ফলে, তোমার বাড়িতে থাকতে শুরু করার পর রীতার কাছে যখন পাণ্ডুরঙ টাকা আদায় করা শুরু করল, তখন রীতা স্বভাবতই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিল। এ দুনিয়ায় তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যার সঙ্গে সে মন খুলে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে পারত। কিন্তু সমস্যাটা জটিল হয়ে উঠল যখন মাইতির সঙ্গে রীতার অন্তরঙ্গতা ঘটল। রীতার উপার্জন এমন কিছু নয় যে, ব্ল্যাকমেলার ল্যাখ-বেলাখ আদায় করতে পারে; কিন্তু রীতা বিদ্যার্থী যদি মাইতি-পরিবারের ঘরণী হয়, তখন পাণ্ডুরঙের জ্যাকপট লাভ হবে। রীতার মুশকিল হলো এই যে, এবার সে তোমার পরামর্শ বা সাহায্য চাইতে পারল না। বাধা : রবিন

মাইতি। এই নির্মম মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে—নির্জনতার সুযোগে, উপবাসী মেয়েটি ক্ষণিক উত্তেজনায় আত্মহত্যা করে বসল। নিজের পিস্তলে! নিজের ব্রেন স্ম্যাশ্‌ করে।

নিখিল বলে ওঠে, কিন্তু কোন হাতে?

বাসু ধমকে ওঠেন : সাইলেন্স! মিস্টার দাশ! দয়া করে মনে রাখবেন আপনি আমার জবানবন্দি নিচ্ছেন না। আইনের নির্দেশে আপনার উপস্থিতি আমরা দুজন মেনে নিয়েছি মাত্র। আমরা দুজন—একজন বক্তা, একজন শ্রোতা!

নিখিল চুপ করে গেল। বাসু ফের শুরু করেন :

—কুন্তলা-মা, আমি বুঝতে পারি দ্বৈরথ-সমরে পরাজিত হয়ে তুমি কী প্রচণ্ডভাবে মর্মাহতা হয়েছিলে। তুমি জান-কবুল লড়ে না গেলে ওই লোকটা পরপর দুবার ইলেকশনে জিততে পারত না। ওর ওই যে রবরবা, তার মূলে তোমার গোপন একনিষ্ঠ পরিষেবা! অথচ লোকটা—পদকর্তাদের ভাষায় 'আমার বঁধুয়া আন্‌বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া...'

পাইপের আগুনটা নিভে গিয়েছিল। আবার একটি অগ্নিশিখার সাহায্যে সেটাকে প্রজ্বলিত করে উনি শুরু করেন :

—কিন্তু গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে দশ-বিশটা শ্লোক অর্জুনকে শুনিয়েছিলেন—যার নির্যাস রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ *ক্ষণিকা* কাব্যে বিশেষ দুটি পংক্তিতে...

আত্মসংযম হারিয়ে শকুন্তলা প্রশ্ন করে বসে, আপনি সেসব কথা...

—সাইলেন্স! তোমার কথা বলা বারণ, শকুন্তলা!...তুমি সেই মন্ত্রে বিশ্বাস কর : "মনেরে আজ কহ *যে/ভালোমন্দ যাহাই আসুক 'সত্য'রে সও সহজে!*"—তুমি বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ, স্থিতপ্রজ্ঞ, তাই বুঝেছিলে জীবনে ভালো ও মন্দ দুটোই থাকে। রীতার ওই সোনালী চুল, ওই দুধে-আলতা গায়ের রঙ ঈশ্বর তোমাকে দেননি; তুমি শরৎবাবুর শ্যামলা সাধারণ মেয়ে। তেমনি ওই মেয়েটি জীবনে পিতার স্নেহ পায়নি, মাতার আদর পায়নি—ওর মা তোমার মায়ের মতো কোনোদিন ওর বিষয়ে চিন্তা করেনি : "ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে!" সে মায়ের জঠরে বাস করেছে অভিশাপরূপে। জন্মের পর আঁতুড়ঘরে তুমি দেখেছ 'জগো হাসে, তু রোয়'। আর ও দেখেছে : আঁস্তাকুড়ের পূতিগন্ধময় পরিবেশ। ভালো আর মন্দ—মন্দ আর ভালো—পাল্লা সমান-সমান। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের 'ইনএক্‌জরেব্‌ল্‌ জাস্টিস্‌'! তুমি শান্তমনে রীতাকে ক্ষমা করে দিলে—সে তোমার শত্রু হয়ে গেল না। বন্ধুই রইল। তোমার এই মহানুভবতায় আমি মুগ্ধ, কুন্তলা-মা।

—কালীপূজার আগেব দিন যখন তুমি ভদ্রেশ্বর যাও, তখনি তুমি জানতে : পরদিন বিকেলবেলা পাণ্ডুরঙ আসবে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করতে। রীতা তোমার মতো স্থিতধী নয়। মনের ক্ষেদে সে হয়তো বলে বসেছিল—'এভাবে তোর জীবনে কাঁটা হয়ে বেঁচে থেকে আমার কী লাভ বল, কুন্তলা? এর চেয়ে আমার বরং মরে যাওয়াই উচিত।' এই জাতীয় কথা সে বলেছিল কি বলেনি আমি জানি না, কিন্তু ওর উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তুমি মৃত্যুকামনার একটা কালো ছায়া দেখতে পেয়েছিলে। তাই সোমবার ভোররাতে ফিরে এসেছিলে কলকাতায়। বান্ধবীর প্রতি দুশ্চিন্তায়, আশঙ্কায়। ছাত্রীদের খাতা দেখার তাগিদে নয়।

—বেলা দশটা নাগাদ এসে চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতর ঢুকলে তুমি। একতলার কেউ নেই। হয়তো তুমি জোর গলায় ডেকেছিলে : রীতা? রীতা!...তোমার নজর হয়েছিল

একতলায় স্টিল আলমারির নবে কোনও চিঠি নেই। সুটকেসটা রেখে তুমি দোতলায় উঠে গিয়েছিলে। রীতার শয়নকক্ষের দরজাটা হাট করে খোলা। ভিতরে পদার্পণ করেই বজ্রাহত হয়ে গেলে তুমি। চাপ-চাপ রক্তের মধ্যে পড়ে আছে রীতা। দেহে যে প্রাণ নেই তা এক নজরেই বোঝা যায়। ওর বাঁ-হাতে পিস্তল, ডানমুঠিতে 'সুইসাইডাল-নোট'। সে কী লিখেছিল তা আমি জানি না। হয়তো লিখেছিল, 'তুই আমাকে ভালবেসে আশ্রয় দিয়েছিলি আর আমি কৃতঘ্নের মতো তোর ধন কেড়ে নিতে যাচ্ছিলাম। হয়তো নিতামও—কিন্তু তা এই বেজন্মার বরাতে লেখা নেই। তোর ধন তোকেই ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম।' এই জাতীয় কিছু...

নিখিল আর আত্মসংযম করতে পারল না। প্রশ্ন করে বসে, ওর ডানহাতেই যে 'সুইডাইডাল নোটটা' ছিল—

এবার আর ধমক দিলেন না বাসু-সাহেব। বললেন, না। ডানহাতের মুঠিতেই যে ছিল, তা বলতে পারব না। হয়তো টেবিলের উপর কাগজ-চাপায় রাখা ছিল। কিন্তু সুইসাইডাল নোট যে সে একটা লিখেছিল, এটা নিশ্চিত। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি—ওর পাইলট পেন-এ বেশি কালি আসে। তাই ওর টেবিলে আছে ব্লটিং পেপারের প্যাড। অথচ আশ্চর্য! উপরের ব্লটিং পেপারটা ধবধবে সাদা! কী করে হয়? যদি রীতা দু'একদিন আগে ব্যবহৃত ব্লটিং কাগজটা বদলে থাকে তবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন অবস্থায় তা ওর ছেঁড়া কাগজের ড্রামে আমি খুঁজে পেতাম। তা পাইনি। সারা বাড়িতে সেই ব্যবহৃত ব্লটিং পেপারটা নাপাত্তা। তার একমাত্র হেতু : কেউ সেটা পুড়িয়ে ফেলেছে। কেন?—কারণ 'সুইসাইডাল নোট' লেখার পর রীতা তা 'ব্লট' করেছিল। আয়নার সামনে ধরলে হয়তো কিছু কিছু পড়া যেত। সে সুযোগ আমাদের দেয়নি শকুন্তলা।...রীতার টেবিলে বাঁদিকে ছিল পেন-হোল্ডারে পাইলট কলমটা, ডান দিকে ঐ শৌখিন কৃত্রিম খাগের কলম আর ডেট-ক্যালেন্ডার। রীতা যদি ডান হাতে লেখার অভ্যস্ত হতো, তাহলে পেন-হোল্ডারটা টেবিলের ডানদিকে থাকার কথা!...

—রীতাকে আবার বাঁচানো যাবে না; কিন্তু রীতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তুমি বদ্ধপরিকর হলে, শকুন্তলা। রীতার বাঁ-হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে, আঁচলে মুখে, ডান হাতে গুঁজে দিলে। তুমি বুঝতে পেরেছিলে, এভাবেই পুলিসকে বোঝাতে পারবে এটা আত্মহত্যার কেস নয়—ওইভাবে ডান হাতে পিস্তল ধরে কেউ নিজের বাঁ-কানের উপরে গুলি করতে পারে না। করলেও তার নিজের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পিস্তলে থাকবে। রীতা যে 'লেফ্‌ট্-হ্যান্ডার' ছিল এটা যাতে আমরা বুঝতে না পারি তাই ফটোগ্রাফটা তুমি তখনি সরিয়ে ফেলেছিলে। রিভার্স প্রিন্ট করে দুদিন পরে আবার টাঙিয়ে দিয়েছিলে। বোকা মেয়ে। তুমি ভেবে দেখনি যে, রীতার অফিসের অনেকেই জানে যে, রীতা লেফ্‌ট্-হ্যান্ডার! একতলা থেকে আধপোড়া চুরুটের টুক্‌রোটা আর নিতান্ত ঘটনাচক্রে কুড়িয়ে পাওয়া কাফ-লিংকের ঝিনুকের টুকরোটা তুমি উপরের ঘরে নিয়ে যাও। প্রতিটি জানলা ভিতর থেকে ছিটকানি দিয়ে দাও যাতে পুলিস আন্দাজ করে হত্যাকারী এটাকে আত্মহত্যার কেস বলে সাজাতে চেয়েছে। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে নেমে এসে একতলায় কিচেনেটে ওই ব্লটিং পেপার আর মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তিটা তুমি পুড়িয়ে ফেলেছিলে। তারপর পুলিশে ফোন করেছ।

—এছাড়া সমস্যার দ্বিতীয় কোনো সমাধান নেই। পাণ্ডুরঙের পক্ষে ফটোটা রিভার্স-প্রিন্ট করে ওখানে টাঙিয়ে দেওয়া সম্ভবপর নয়। সে ব্ল্যাকমেলার, কিন্তু মার্ডারার নয়!

বাসু-সাহেব থামলেন।

শকুন্তলা এতক্ষণ নিশ্চুপ শুনে গেছে। এখন হঠাৎ বলতে শুরু করে, জানি না কী করে বুঝেছেন, কিন্তু আপনার...

বাসু ধমকে ওঠেন, কতবার এক কথা বলব? তোমার না এখানে কথা বলা মানা?

দ্বিগুণ জোরে শকুন্তলা চিৎকার করে ওঠে, না! আমাকে বলতে দিতে হবে! খুনের অপরাধে আমাকে ফাঁসি দিতে চান, দেবেন; কিন্তু স্বাধীন ভারতীয় নাগরিকের বাকস্বাধীনতা আপনি কেড়ে নিচ্ছেন আইনের কোন ধারায়?

নিখিল বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলল, প্লিজ স্যার!

বাসু কোনও সাড়াশব্দ দিলেন না।

শকুন্তলা দৃঢ়কণ্ঠে বলল, জানি না, কী করে আপনি কোন কথা জেনেছেন। মায় *ক্ষণিকার* ওই উদ্ধৃতিটা পর্যন্ত। তবে আমি স্বীকার করব—প্রায় অলৌকিকভাবে আপনি বাস্তব ঘটনা-পরম্পরার বর্ণনা করে গেছেন। আমি জানি, আপনি বুঝতে পেরেছেন, কেন আমি ডিফেন্স দেব না। রীতু অভিমানে আত্মহত্যা করতে পারে, আমি পারি না? শুধুমাত্র একটি অনুমান ওঁর সত্যি নয়। একটি ভুল উনি করেছেন।

বাসু চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন। কথা বললেন না।

নিখিল কিন্তু থামল না। বললে, কোনটা?

—রীতার লেখা শেষ চিঠিখানি, যাকে আপনারা 'সুইসাইডাল নোট' বলছেন—হ্যাঁ, তাই তো বাস্তবে—ওটা আমি পুড়িয়ে ফেলিনি। সযত্নে লুকিয়ে রেখেছি। আপনারা খুঁজে পাননি।

—কোথায়?

লাফ দিয়ে উঠে পড়ে নিখিল!

—চলুন! এখনি সেটা বার করে দিতে হবে।

ব্যবস্থা করতে নিখিল প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দু'-খানা গাড়ি চাই তার। এক্ষুণি। একটা প্রিজন ভ্যান, একটা রেডিও-ফিট করা জিপ। এছাড়া একজন মহিলা পুলিশ।

নির্জনতার সুযোগে বাসু মেয়েটিকে বলেন, রীতা জীবনযুদ্ধে হার স্বীকার করে নিয়েছে। হয়তো যে-সম্পদের জোরে রীতা তোর মুঠি থেকে মাইতিকে ছিনিয়ে নিয়েছিল—ওর সেই দুধে-আলতা রঙ, ওর সেই সোনালী চুল, নীল চোখ—এই সবকিছুকেই সে অভিসম্পাত মনে করত। আন্তরিক ঘৃণা করত!

শকুন্তলা অবাক হয়ে বলে, আপনি তাও জানেন?

—নারে কুন্তলা, জানি না। আন্দাজ করি। কারণ রীতা জানত এসব কিছুই সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পেতে বাধ্য হয়েছে; ওর ব্যভিচারী বাপের কাছ থেকে! ওর মাকে হয়তো হতভাগী ক্ষমা করতে পেরেছিল—হয়তো কুমারী-মা গত্যন্তর-বিহীন হয়ে তার প্রথম সন্তানকে এভাবে রাস্তায় ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। লোকলজ্জায় হতভাগিনী কর্ণজননী কুন্তীর মতো। কিন্তু ওর সোনালী-চুল বেড়াল-চোখো বাপ? যে একটি কুমারী মেয়ের সর্বনাশ করে পালিয়ে গেছিল? না, তাকে ওই হতভাগিনী কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেনি। আয়নার যতবার নিজের মেমসাহেবের মতো মুখটা দেখেছে ততবারই সেই ব্যভিচারী অচেনা বাপের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছে। আর তাই মিশনারী প্রতিষ্ঠানের দয়ায় মানুষ হয়ে ওঠা সত্ত্বেও সে ক্রিশ্চিয়ান থাকেনি। আর্যমিশনের মাধ্যমে হিন্দুধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। অসুরের রক্তে রাঙা খর্পরধারিণীর পূজার দিনে সে নিষ্ঠাভরে উপবাস করে!

...রীতার কথা থাক। সে তো আজ মান-অভিমানের বাইরে। কিন্তু তুই কেন এভাবে হার

মেনে নিবি, কুন্তলা-মা? রীতার অভিমান ছিল গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে—সে অভিমান করার অধিকার ছিল হতভাগিনীর। তোর তো তা নয়! তুই চোখের সামনে হাতচাপা দিয়ে দুনিয়াটাকে অস্বীকার করতে চাইছিস্। কিন্তু কার বিরুদ্ধে তোর এ অভিমান? সে কি তোর অভিমানের যোগ্য? তোর জীবনে কে ওই রবিন মাইতি? যাকে তুই দু'দুবার নির্বাচনে জিতিয়ে দিয়েছিস? সে তোদের বন্ধু? হ্যাঁ, উৎসবের দিনে, যখন সে ইলেকশান জিতে পার্টি থ্রো করে—কিন্তু ব্যসনে? রাজদ্বারে? রীতার শ্মশানযাত্রী কি হয়েছিল সে? সে তোদের বন্ধু! মাই ফুট!

শকুন্তলা বিহ্বলের মতো বলে, তাহলে আমি...আমি এখন কী করব?

—ওই স্কুলের চাকরি থেকে এখনি ইস্তাফা দে! অন্য স্কুলে নতুন করে জীবন শুরু কর। যতদিন তা না পাচ্ছিস্ প্রাইভেট টুইশানি কর—নিদেন পুরানো খবরের কাগজের ঠোঙা বানিয়ে দোকানে-দোকানে ফিরি করে তোর সংসার চালা। দুনিয়া অনেক বড় রে! জীবন অনেক মহান! তোর মতো স্থিতপ্রজ্ঞের অভিমানের যোগ্য কি ওই রাজনীতি-ব্যবসায়ী হাম্বাগ্ হরিদাস পাল?

শকুন্তলা উঠে এসে ওঁর পায়ের ধুলো নিল। অস্ফুটে বলল, রীতার ক্ষেত্রে আমি পারিনি; কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আপনি পেরেছেন!...না! আত্মহত্যা আমি করব না!

তখনই ফিরে এল নিখিল। বলল, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আসুন মিস্ রয়, চলুন দেখিয়ে দেবেন কোথায় লুকানো আছে রীতা বিদ্যার্থীর শেষ স্বীকারোক্তি।

তারপর বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলল, আপনিও আসছেন তো, স্যার?

বাসু বলেন, না হে! আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও। আমি বাড়ি যাব। আজ সকালে সুজাতার সিজারিয়ান হবার কথা।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গেট খুলে বাগানে ঢুকলেন।

নজর হলো বিশে বাগানের একান্তে গুল্‌তি হাতে কী যেন টিপ্ করছে। বাসু-সাহেব পিছন থেকে হাঁকাড় দেন : অ্যাই বিশে!

বিশ্বনাথ চম্‌কে এদিকে ফেরে।

বাসু-সাহেব ধম্‌কে ওঠেন, সেদিন বললাম না, গুল্‌তি দিয়ে পাখি মারা খারাপ! কোনোদিন মারবি না।

—পাখি মারচিনি তো, দাদু!

—তবে কী টিপ করছিলি এতক্ষণ?

—আদলা ইঁট! ওই দ্যাখেন কেনে! সামনে রইচে। অ্যাক্কেরে গুল্‌তি মারা ছাড়ি দিলে টিপ্ খারাপ হয়ি যাবে না?

বাসু স্বীকার করলেন, কারেক্ট! ফোঁস করায় দোষ নেই। ছোবল না মারলেই হলো। তা তোর দিদা কোথায়?

—বাইরের ঘরে।

বাসু এগিয়ে গেলেন সেদিকে। দেখলেন, রানী বসে আছেন তন্ময় হয়ে। জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে। কোলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা কোনও গল্পের বই নেই। টি. ভি.টা বন্ধ। টু-ইন-ওয়ান চলছে না। রানী দেবী টের পাননি কর্তার আগমন। খুব কাছাকাছি এসে

বাসু বলেন, তুমি তন্ময় হয়ে কী করছ?

রানী চম্‌কে এদিক ফিরে বলেন, কখন এলে?

—এই তো! কিন্তু তুমি একা বসে বসে কী করছিলে?

—প্রতীক্ষা! 'কিং'স্‌ কামিং'! কৌশিক বলে রেখেছে কোনো খবর হলেই টেলিফোন করবে। তাই টেলিফোনটার কাছাকাছি বসে আছি।

বাসু বলেন, বুঝলাম। 'দে অলসো সার্ভ হু ওন্‌লি সিট্‌ অ্যান্ড ওয়েট।'

রানী হাসলেন। বললেন, সরি, স্যার। দ্যাটস্‌ এ মিস্‌কোট।

—সরি, ম্যাডাম! দ্যাটস্‌ নট্‌ আ মিসকোট, বাট আ মডিফায়েড কোটেশন। মিল্টন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন—তাই লিখেছিলেন 'হু ওন্‌লি স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েট!' তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদে চক্ষুষ্মতী। তাই তোমার ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পংক্তিটা হবে—'হু ওন্‌লি সিট অ্যান্ড ওয়েট!'

ঠিক তখনই বেজে উঠল টেলিফোন। বিশে দৌড়ে এসে সেটা তুলবার অবকাশ পেল না। রানীই হাত বাড়িয়ে যন্ত্রটা তুললেন। তারপর বাসু-সাহেবকে যন্ত্রটা হস্তান্তরিত করে বললেন, তোমাকে খুঁজছে—

বাসু আত্মঘোষণা করতে ও-প্রান্ত থেকে নিখিল জানাল সে করুণাময়ী থেকে ফোন করছে। রীতা বিদ্যার্থীর সুইসাইডাল নোটটা পাওয়া গেছে। তার স্বাক্ষর স্থানীয় ব্যাঙ্ক মিলিয়ে দেখেছে। রীতারই সই। ফলে বাসু-সাহেবের মক্কেল মিস্‌ শকুন্তলা...

বাধা দিয়ে বাসু বললেন, এত তাড়াতাড়ি তুমি ভুলে গেলে নিখিল? মিস্‌ শকুন্তলা রায় আমার মক্কেল নন। তুমি আমার দু'দুটো শর্তই মেনে চলেছ, কিন্তু...

—কী শর্ত দুটো ছিল, স্যার?

—এক নম্বর, তুমি ভুল লোককে অ্যারেস্ট করবে—তা তুমি করেছ। দ্বিতীয় শর্তটা ছিল, যাকে অ্যারেস্ট করবে সে যেন অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ না হয়। সে শর্তটাও তুমি মেনেছ। কিন্তু আমার পোড়া কপাল! তাই রান্না-করা কৈ-মাছ কড়াই থেকে পিছ্‌লে পালিয়ে গেল!

নিখিল হাসতে হাসতে বলে, ওদিকের কোনো খবর আছে? সুজাতার?

—না! আমরা দুজন শবরীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছি! তা, তোমরা কি শকুন্তলাকে মুক্তি দিয়েছে?

—অফ্‌ কোর্স! সে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

—দাও! তার আগে বলতো হে—পাণ্ডুরঙকেও কি তোমরা রিলিজ করে দিয়েছ?

—ইয়েস, স্যার! যে চার্জে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল সে অপরাধ পাণ্ডুরঙ করেনি। ব্ল্যাকমেলিং-এর চার্জ তার বিরুদ্ধে আমরা এখনো ফ্রেম করিনি। সেটা প্রমাণ করাও শক্ত...

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, আমি একমত নই, নিখিল। তোমরা ছেড়ে দিলেও আমি তাকে সহজে ছাড়ব না। আইন যাই বলুক, আমার দৃষ্টিতে রীতার মৃত্যুর জন্য পাণ্ডুরঙ পুরোপুরি দায়ী। সে তাকে আত্মহত্যায় বাধ্য করেছিল। কৌশিক আর সুজাতা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুক। তারপর আমি ব্যবস্থা নেব। শকুন্তলা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল বন্ধুর তরফে। আমার প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা নেই; কিন্তু ওই হতভাগিনী মেয়েটাকে মৃত্যুর দিকে যে ঠেলে দিয়েছে তাকে অত সহজে আমি ছাড়তে পারি না।

—সে তো পরের কথা স্যার। নিন মিস্‌ রায়ের সঙ্গে কথা বলুন।

শকুন্তলা বলল, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব।আপনাকে আমি চিনতাম না।

বাঙলা বই আমি গোগ্রাসে গিলি; কিন্তু গোয়েন্দা কাহিনী বাদে। এখন যখন চিনেছি...

বাসু বললেন, দু'-চারদিন বাদে, কুন্তলা-মা। আমাদের বাড়িতে...

—হ্যাঁ, শুনেছি! ঠিক আছে। আপনার নাতি নার্সিংহোম থেকে এসে জাঁকিয়ে বসুক

বাসু বললেন, নাতি নয় গো। নাতনি!

বাসু-সাহেব টেলিফোনটা নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আবার বেজে উঠল। এবার অ্যাডভোকেট রবিন মাইতি। বাসু আত্মঘোষাণ করতেই মাইতি বললেন, আয়াম এক্সট্রিমলি সরি, স্যার...

বাসু ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এ-কথা তো আপনি আগেই জানিয়েছেন মিস্টার মাইতি—যখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন আপনার এম্প্লয়ীর তরফে আমাকে ওকালতনামা দিতে!

—না, না, না! আপনি বুঝছেন না। তখন আমার জানা ছিল না—রীতা সুইসাইড করেছে। সেটা জানার পর, কুন্তলা সসম্মানে মুক্তি পেয়েছে এ খবর পাওয়ার পর—আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে যাব। বলুন স্যার, কখন আপনার সময় হবে?

—য়ু শ্যাল হ্যাভ টু কাম থ্রু প্রপার-চ্যানেল!

—থ্রু প্রপার-চ্যানেল, স্যার?

—নিশ্চয়। যে মেয়েটা আপনাকে দু'-দুবার ইলেকশান জিতিয়ে দিয়েছে—তার মাধ্যমে আপনাকে আসতে হবে। আমি এখন 'বিজি' আছি। পরে কথা বলবেন।

লাইনটা কেটে দিলেন বাসু-সাহেব। রানী বললেন, নার্সিংহোমে একটা ফোন করে দেখ তো?

বাসু নির্দেশমতো ফোন করলেন। কৌশিককে হাতের কাছে পাওয়া গেল না; কিন্তু চিফ-মেট্রন জানালেন—সুজাতাকে এখনো ও.টি.তে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

লাইনটা কেটে দিয়ে বাসু আবার সল্ট লেকে ফোন করলেন, শকুন্তলাকে জানাতে যে, রবিন মাইতি ওঁকে ফোন করেছিল। শকুন্তলা সব শুনে বলল, আপনার পরামর্শটা আমি পুরোপুরিই গ্রহণ করেছি, দাদু! এইমাত্র ক্যুরিয়ার সার্ভিসে আমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলাম।

বাসু বলেন, সে কি! এত তাড়াহুড়া করার কী ছিল?

—ছিল না? আপনি জানেন না? হঠাৎ যদি মনের এই দৃঢ়তাটা হারিয়ে যায়? সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে যদি প্রত্যাখ্যান করতে না পারি?

—কিন্তু তুমি তো তাহলে হঠাৎ বেকার হয়ে গেলে। এখন কী করে সংসার চালাবে?

—যেটুকু জমেছে তাই খরচ করে। তারপর হয়তো পুরানো কাগজের ঠোঙা বানাব—আপনি চিন্তা করবেন না, দাদু!

বিকেলবেলায় এল প্রত্যাশিত ফোনটা। নার্সিংহোম থেকে।

সুজাতার সিজেরিয়ান নির্বিঘ্নে হয়েছে। মা ও সন্তান দুজনেই ভাল আছে। এইমাত্র ও.টি থেকে সুজাতাকে কেবিনে নিয়ে যাওয়া হলো।

বাসু বলেন, কিন্তু...ইয়ে...নাতি না নাতনি?

কৌশিক বললে, সুজাতা আপনাকে এখনি চলে আসতে বলছে। আপনি কি ব্যস্ত?

—নিশ্চয় নয়। আমি এখনি আসছি। কিন্তু আমি জানতে চাইছিলাম..

কৌশিক লাইনটা কেটে দিল।

বাসু স্বগেতোক্তি করলেন : ইডিয়েট!

রানী বলেন, বলল না? কি গো?

—না! মামুর সঙ্গে মশ্‌করা হচ্ছে!

উনি আবার নার্সিংহোমে ডায়াল করতে যাচ্ছিলেন। বাধা দিলেন রানী। বললেন, নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। তুমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলেই যাও না বাপু। স্বচক্ষে দেখে আমাকে একটা ফোন কর। আমি এখানেই ঠায় বসে থাকব। নার্সিংহোম তো দশ-মিনিটের ড্রাইভ।

বাসু যে বেশে ছিলেন সেই পোশাকেই রওনা দিলেন। শুধু বাড়ির চটিটা বদলে জুতো পরে।

বাসু রওনা হবার একটু পরেই আবার টেলিফোন বাজল।

কৌশিকই করছে। জানতে চাইল, মামু রওনা হয়েছেন?

—হ্যাঁ; কিন্তু আসল কথাটা তাঁকে বললে না কেন?

—আমরা দুজন বাজি ধরেছি। বাচ্চার মুখটুকু শুধু খোলা থাকবে। মামুকে বলতে হবে নাতি না নাতনি!

—কিন্তু আমাকেও বলবে না?

—ওমা! আপনাকে বলব না কেন? সুজাতার...

সুজাতা কেবিনে শুয়েছিল। তার গলা পর্যন্ত একটা চাদর। সাদা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। মুখে তৃপ্তির হাসি। মাথার কাছে একটা ফুলদানিতে একগুচ্ছ গোলাপ। পাশেই একটা বেবিকটে শুয়ে আছে সুকৌশলীর সংসারে নবাগত/নবাগতা শিশুটি।

বাসু এগিয়ে এসে সুজাতার মাথায় হাত রাখলেন। সুজাতা খুশির হাসি হাসল। বাসু এবার ভাগ্নের দিকে ফিরে বললেন, বাঁদরামো হচ্ছিল কেন? ভাইটাল ইনফরমেশনটা দিচ্ছিলে না কেন?

কৌশিক বলে, আমরা যে দুজন বাঝি ধরে বসে আছি. আপনি ঠিকমতো আন্দাজ করতে পারবেন কি পারবেন না। আমি বলেছি পারবেন না, সুজাতা বলেছে পারবেন। বলুন মামু—আপনার সংসারে কে এসেছে? চুন্নুমুন্নু নাতনি, না নাতি?

বাসু ঝুঁকে পড়ে সদ্যোজাত শিশুটিকে দেখলেন। তাঁকে দেখে বাচ্চাটা একগাল হাসল।

বাসু বললেন : এঃ! রানুরই জিত হলো। রানু বলেছিল নাতি; আমি বলেছিলাম নাতনি! এ তো ছেলে!

কৌশিক ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে ওঠে : ফেল! মামু ফেল! সুজাতাও হেরে গেছে—

বাসু-সাহেব কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে বলেন, নাতনি?

কৌশিক জবাব দেয় না। ঝাঁকি-দর্শনের ভঙ্গিতে কম্বলটা তুলে নিয়েই আবার চাপা দেয়। বাচ্চাটার ডায়াপার পরানো নেই।

বাসু বললেন, তাহলে তো আমিই জিতলাম! রানুকে বলেছিলাম...

কৌশিক বাধা দিয়ে বলে, সে তো না দেখে ব্লাইন্ডফোল্ড ফোরকাস্ট! কিন্তু স্বচক্ষে দেখে...

সুজাতাও বাধা দিয়ে বলে, আপনি মেয়েটার একটা সুন্দর নাম দিন, মামু।

বাসু বলেন, আমি কেন? তোমরা দুজনে মিলে ওকে পয়দা করতে পারলে, আর নামটা দিতে পারবে না?

সুজাতা রলে, না! আমরা দুজনে মিলে একটা গোয়েন্দা সংস্থাও তৈরি করেছিলাম। কিন্তু নামকরণটা করেছিলেন আপনি : সুকৌশলী! এবারও নামটা আপনাকেই দিতে হবে।

—বেশ তো, দেব। আগে রানুর সঙ্গে কনসাল্ট করি। তবে আমি 'ডিভিশন অব লেবারে' বিশ্বাস করি। ভালো নাম, মানে পোশাকী নামটা আমরা দুই বুড়ো-বুড়ি দেব। কিন্তু ডাকনামটা তোমরা স্থির করবে।

সুজাতা বলে, ডাকনাম তো স্থির হয়েই আছে। আমরা দুজনেই স্থির করে রেখেছিলাম যদি মেয়ে হয় তবে তার ডাকনাম হবে...

—'ডাকনাম হবে'?

—মিঠু!

বাসু হাসলেন। সে হাসি বেদনার। সে হাসি আনন্দের। চোখ থেকে চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে কাচটা মুছতে মুছতে বলছেন, তিন দশক পরে আবার আমার সংসারে ফিরে এল 'মিঠু'! ছিল কিশোরী মেয়ে, ত্রিশ বছর পরে হয়ে গেল সদ্যফোটা ফুট্‌ফুটে নাতনি!

চাঁপারঙের মুর্শিদাবাদী শাড়ির কাঁটা

রচনাকাল : প্রাকপূর্ব, 2000
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, 2001
প্রচ্ছদশিল্পী : গৌতম রায়
উৎসর্গ : শ্রী গৌতম রায়

কাঁটায়-কাঁটায় সন্ধ্যা ছয়টার সময় ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়ায় কটক-স্টেশনের সামনে।

নেমে এল একক যাত্রী। বছর পঁচিশের একজন সুবেশী যুবক। পরনে গ্রে-রঙের সফরি-স্যুট। গলায় নীলচে রঙের স্ট্রাইপ্‌ড়্-টাই, হাতে রেক্সিনের ফোলিও ব্যাগ। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিতে দিতেই গাড়ির পিছনের ডিকিটা খুলে ওর স্যুটকেসটা রাস্তায় নামিয়ে ফেলেছে রেলওয়ে-পোর্টার। যুবকটি গাড়ির পিছনের দিকে এগিয়ে আসার অবকাশে কুলিটা মাথায় জড়িয়ে নিয়েছে তার লাল-শালুর ফেট্টি। প্রশ্ন করে, কৌন ট্রেনসে যানা হ্যায়, সা'ব?

—ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস।

—বহ্ তো আনেবালী হ্যায়। আজ বিল্‌কুল টাইম পর আ-রহী! সামান উঠায়ুঁ?

—পুছ্‌নেকী কেয়া জরুরৎ হ্যায়?

স্যুটকেসটা মাথার উপর তুলবার উপক্রম করে লোকটা বলে—বিশ রোপেয়া লাগেগা সা'ব।

পট্টনায়ক খপ্ করে তার মণিবন্ধটা চেপে ধরে বলল, ব্যস! মৎ উঠাও!

কুলিটা নজর করেছে, স্যুটকেসের তলায় চাকা লাগানো আছে। অর্থাৎ সাহেব ইচ্ছে করলে সেটা টেনে টেনেও নিয়ে যেতে পারেন। খদ্দের ফস্‌কে যাবার আশঙ্কায় কুণ্ঠিত হয়ে বলে, ক্যেঁউ সা'ব? ক্যা কসুর ভৈল? জা'দা বোলা হ্যায় ম্যয়নে কেয়া? কসুর হুয়া কুছ?

—কসুর তো জরুর হুয়া, লেকিন জাদা নহী, কমি। শুনো ভাই। ম্যয়নে কিসী কুলী কো তিস্-সে কম কভি নেহী দিয়া। অগর তিস্‌মে খুশি হো তো উঠাও, নহী তো ম্যায় দুসরে কুলি কো বুলাউঙ্গা।

লোকটা ঘাবড়ে যায়। এ আবার কী জাতের দরাদরি?

—ক্যা? ত্রিশ রোপেয়া মে মাল উঠানা হ্যয়?

হাঁ-না কিছুই বলে না লোকটা। স্যুটকেসটা উঠিয়ে নিয়ে স্টেশন পানে হাঁটা ধরে। পিছন থেকে নির্দেশ ভেসে আসে—ফার্স্ট-ক্লাস, 'সি' কূপে!

ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস আজ ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে আসছে। অ্যারাইভাল টাইম : ছয়টা পনের। ঠিক সেই সময়েই গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে প্রবেশ করল ট্রেনটা। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। দশ মিনিট স্টপেজ। মালপত্র নিয়ে উঠল গাড়িতে। কূপেটা ফাঁকা। এতটা সৌভাগ্য হবে আশা করেনি জগদ্বন্ধু। সচরাচর যুগলযাত্রী হলেই কূপেতে ঠাঁই মেলে। ও একক যাত্রী, তবু কী জানি কেন এখানেই নির্দিষ্ট হয়েছে তার আসন। তুঙ্গে বৃহস্পতি থাকলে যা হয় আর কি। ট্রেনটা যাবে সেকেন্দ্রাবাদতক্। ওর গন্তব্য অবিশ্যি বিশাখাপত্তনম্। এই ট্রেনে। সেখান থেকে ভেসে পড়বে নীল দরিয়ায়। ভাসতে ভাসতে পরবর্তী বন্দরে। সেটা ওডেসা, না পানামা, দুবাই না সিডনি জানা নেই। জানা যাবে, বিশাখাপত্তনমে রিপোর্ট করলে।

বার্থ-সংলগ্ন হুকে কাঁধের ব্যাগটা কুলি টাঙিয়ে রাখল। জগদ্বন্ধু তার হাতে-ধরা ম্যাগাজিনগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখল সিটের উপর। তারপর হাত লাগালো কুলির মাথা থেকে স্যুটকেসটা নামাতে। কুলিটা চাইছিল সেটা সিটের নিচে ঠেলে দিতে। জগদ্বন্ধু বারণ করল : রাহ্‌নে দো!

হয়তো পরবর্তী স্টেশনেই উঠবে দ্বিতীয় যাত্রী। মহিলা হবে না নিশ্চয়, তবু তার উপস্থিতিতে ও নৈশ পোশাকটা পরতে চায় না। ট্রেন ছাড়লেই ও রাতের পোশাক পরে নেবে।

কুলিটা পাগড়ি দিয়ে মুখটা মুছে হাত পাতল। জগদ্বন্ধু ওয়ালেট বার করে দু-খানা দশ টাকার নোট ওর প্রসারিত হাতে ধরিয়ে দিল। লোকটা নিরুথায় সেলাম বাজিয়ে প্রস্থানোদ্যত হতেই পিছন থেকে ধমকে উঠল জগদ্বন্ধু পট্টনায়েক : —এই...এই...কাঁহা ভাগ্‌তে হো তোম্? বাকি রূপেয়া?

লোকটা বেশ বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, সা'ব! ম্যয়নে পহিলেই তো বোলা থা কি বিশ রূপেয়া...

—ঠিক হ্যায়! লেকিন ম্যয়নে ক্যা বাতায়া থা? বোলা থা না কি ম্যয়নে তিস সে কম কিসি কুলিকে কভি নেহি দিয়া? বোলো, সচ্‌মুচ্!

কুলিটা কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না।

জগদ্বন্ধু ওর হাতটা টেনে নিয়ে গুঁজে দেয় আরও একটা দশটাকার নোট! বলে, অব যা সেক্‌তে হো...

কুলিটা হেসে ফেলে। সকৃতজ্ঞচিত্তে বলে, সা—ব...

—নেহী নেহী! ঔর নেই! যাও ভাগো!

লম্বা সেলাম করে হাস্‌তে হাস্‌তেই বিদায় নেয় লোকটা। সে তো জানে না—জগদ্বন্ধু পট্টনায়েক এখন খুশিয়াল মুডে যাচ্ছে তার চাকরিতে জয়েন করতে। কাল সকালেই সে হাতে পেয়েছে প্রমোশন অর্ডারটা। কুরিয়ার সার্ভিসে।

এবার কামরার ভিতরটা নজর করল। জানলার কাচ ও শাটার বন্ধ থাকায় ঘরটা একটু গুমোট। শীতকাল বলে ফ্যানটাও চলছিল না। জগদ্বন্ধু জানলার কাচ ও শাটার তুলে দিল। খোলা জানলার ধার ঘেঁষে বসে পড়ে। বাইরের দিকে নজর দেয়। নানান জাতের যাত্রীর আনাগোনা ওদিকে প্ল্যাটফর্মে।

পেশায় মেরিন এঞ্জিনিয়ার জগদ্বন্ধু পট্টনায়ক। দু-মাসের ছুটি কাটিয়ে আজ আবার চলেছে কাজে যোগ দিতে। বয়স পঁচিশ, অকৃতদার। যাকে বলে, এলিজেব্‌ল্ ব্যাচিলার। মা জানতে চেয়েছিলেন, তুই বারণ করছিস্ কেন? বিদেশে তোর কি কোনো মেয়েকে পছন্দ হয়েছে?

জগদ্বন্ধু বলেছিল, মা, আমি তো বিদেশে কোথাও দু-দশ দিনের বেশি থাকি না! জাহাজে-জাহাজেই কেটে যায় মাসের পর মাস! কার সঙ্গে আলাপ হবে বলো? তবে ব্যস্ত হয়ো না, যখন বিয়ে করতে চাইব তখন জানাব। তুমিই পছন্দ করে নিয়ে এস তোমার বহুরানী!

একটা গন্ধ প্রবেশ করল পট্টনায়কের নাকে। মিষ্টি অথচ ঈষৎ ঝাঁঝালো। কীসের গন্ধ? একেবারে অপরিচিতও নয় গন্ধটা। ফুলের নয়। পূর্ববর্তী যাত্রীর কোনো দীর্ঘস্থায়ী ফরাসি সুবাস?

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়ল ট্রেনটা। পট্টনায়কের হাতে সোনালী ব্যান্ডে রোলেক্স ঘড়িটায় তখন ছয়টা পঁচিশ। ইস্ট-কোস্ট-এক্সপ্রেস আজ টাইম-টেব্‌ল্-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের সীমানা ছাড়িয়ে ট্রেন তখন নির্দিষ্ট পথে দৌড় শুরু করেছে। আবার গন্ধটা এসে নাকে লাগল। এবার কিন্তু ওর মনে পড়ে যায়। ক্লোরোফর্ম! গতবার সমুদ্রযাত্রায় তাকে দু-তিনদিন সিক্ বেডে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তখন একবার ওকে ও. টি. তেও যেতে হয়, পরীক্ষা করাতে। সেখানেই ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল। কিন্তু এখানে ও গন্ধটা আসছে কোথা থেকে? বসা অবস্থাতেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়ল না। হাত বাড়িয়ে ফ্যানটা খুলে দিল। হোক শীতকাল। গন্ধটাকে এ ঘর থেকে তাড়াতে হবে।

আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো। শীতের সন্ধ্যা। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। একঝাঁক টিয়া পাখি উড়ে গেল দিগন্তের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। ট্যা—ট্যা—ট্যা—

হঠাৎ খেয়াল হল, পরের স্টেশন ভুবনেশ্বর খুব বেশি দূরে নয়। সেখানে হয়তো ওর এই একাধিপত্য ব্যাহত হবে। ওর নিজের আপার-বার্থ, হয়তো নিচের তলার মানুষ এসে উপস্থিত হবেন। সুতরাং এখনই নৈশ-পোশাকটা পরে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। স্যুটকেসটা খুলে পাজামা-পাঞ্জাবি, তোয়ালে আর খবরের কাগজে মোড়া চপ্পল বার করে নিল। স্যুটকেসটা বন্ধ করে এবার সিটের নিচে পাচার করতে চাইল।

কিন্তু কি জানি কেন স্যুটকেশটা অন্দরমহলে যেতে আপত্তি জানালো। সেটা যেন কিছুতে বাধা পাচ্ছে। পূর্ববর্তী যাত্রী কি একটা মাল নামাতে ভুলে গেল নাকি? স্যুটকেসটা সরিয়ে সিটের নিচেটা এবার দেখবার চেষ্টা করল জগদ্বন্ধু। বাইরেটায় এতক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। নিচু হয়ে মনে হল সিটের নিচে কালো কাপড়ে ঢাকা বেশ বড়-সড় একটা বস্তা রয়েছে ; কিন্তু একী? সেই বস্তা থেকে চুঁইয়ে কী যেন একটা তরল পদার্থ—রক্ত না কি?

হাত বাড়িয়ে জ্বেলে দিল ফ্লুরেসেন্ট বাতিটা।

এ কী! হ্যাঁ, রক্তই তো!

নিচু হয়ে কালো কাপড়টা সরাতেই...

ফার্স্টক্লাস-সি কূপেতে পরমুহূর্তেই শোনা গেল একটা আর্তনাদ। যেন সেটা সবার আগে কর্ণগোচর হয়েছে রেলওয়ে এঞ্জিনটার। সেও ভয়ার্ত কণ্ঠে সাড়া দিয়ে উঠল পর-পর তিনটি হুইসিল-এ। উপায় নেই। তাকে থেমে পড়তে হল ভ্যাকুয়াম-ব্রেকের অমোঘ নির্দেশে। কোনো একটা কামরায় কেউ অ্যালার্ম-চেনটা টেনে দিয়েছে। ভুবনেশ্বর রেল-স্টেশনের ডিসট্যান্ট-

সিগন্যালের সবুজ বাতির আমন্ত্রণ সত্ত্বেও এঞ্জিনটাকে গজরাতে-গজরাতে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। সকাল থেকে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটা, টাইম-টেব্‌ল্ অনুসারী ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেসটার লেট হওয়ার পালা শুরু হল।

দুই

দু-দিন পরের কথা। একত্রিশে ডিসেম্বর। শুক্রবার, উনিশ শ' নিরানব্বই। অর্থাৎ সহস্রাব্দির শেষ সূর্যোদয় হয়েছে ঘণ্টা-খানেক আগে।

নিউ-আলিপুরে ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর 'ডাইনিং হল'। সকাল এখন সাতটা। পি. কে. বাসুর সঙ্গে যদি আপনাদের জান-পহ্‌চান না থাকে তাহলে আমি নাচার। তবু সেইসব ভাগ্যবান-ভাগ্যবতী—যাঁরা 'বাসু-সিরিজ'-এর কণ্টকে বিদীর্ণ হননি—তাঁদের খাতিরে ওঁর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে রাখি :

প্রসন্নকুমার বাসু কলকাতা 'বার'-এর প্রবীণতম আইনজীবী। ব্যবহারিক পরিচয়ে তিনি ক্রিমিনাল-সাইড ব্যারিস্টার। কিন্তু শুধু আদালত চৌহদ্দিতেই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন না। অর্থাৎ অভিযুক্তকে খালাস করানোই যেন তাঁর মূল উদ্দেশ্য নয়; ওই সঙ্গে আসল অপরাধীকে চিহ্নিত না করা পর্যন্ত যেন তাঁর মুক্তি নেই। আগে নিজেই প্রচুর ছুটোছুটি করতেন। এখন তাঁর বয়েস হয়েছে : আশি ছুঁই-ছুঁই। স্বামী-স্ত্রীর ছোট পরিবার ; কিন্তু সুখী পরিবার বলতে পারি না। একটা মোটর অ্যাকসিডেন্টে ওঁদের একমাত্র কন্যাটির মৃত্যু হয়েছে। সে গাড়িতে মিসেস্ রানু বসুও ছিলেন। তিনি হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন, কিন্তু হুইলচেয়ার-নির্ভর প্রতিবন্ধীর জীবনে। অর্থের প্রয়োজন ছিল না। বাসু-সাহেব তাই প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। রানু দেবীই রাজি হননি। জোর করে আবার তাঁকে গাউন পরালেন। আবার যাতায়াত শুরু হল আদালত-পাড়ায়।

এই সময়ে ওঁদের সংসারে এসে যোগদান করল একটি সদ্যোবিবাহিত দম্পতি: কৌশিক ও সুজাতা মিত্র। একই বাড়িতে ওঁরা থাকেন। একটি গোয়েন্দা-সংস্থা খুলে বসেছিল ওরা স্বামীস্ত্রী : 'সুকৌশলী'। গিন্নির 'সু' আর কর্তার 'কৌ'। বাকি 'শলী'টা পাদপূরণার্থে 'খলু'। নামকরণটা করেছেন বাসু-সাহেবই। ওদের আবির্ভাবে তাঁর দৌড়ঝাপটা কমেছে।

বাসু-সাহেবের জীবন 'কাঁটায়-কাঁটায়' বিজড়িত। উভয় অর্থেই। সমস্যার কাঁটা এবং ঘড়ির কাঁটা। সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনি প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ফিরে আসেন পৌনে সাতটায়। না, 'পৌনে-সাত' মানে 'সাতটা বাজতে মিনিট-পনের নয়; আই. এস. টি : ছয়টা পঁয়তাল্লিশ। শীতকালে। গ্রীষ্মে সময়টা একঘণ্টা এগিয়ে যায়।

সাড়ে ছয়টা নাগাদ প্রাতরাশপ্রত্যাশী কৌশিক এসে বসল 'ডাইনিং-হল'-এ। আর কেউ তখনো আসেনি। তার আগেই ওদের বাড়ির কাজের লোক, বিশু খান দু-তিন দৈনিক পত্রিকা উঠিয়ে নিয়ে এসেছে সদর থেকে। কৌশিক খুলে বসেছে একটা পত্রিকা।

আজ কাগজের প্রথম পাতাতেই বেশ বড় করে ছাপা হয়েছে একটি হত্যাপরাধ। হেডলাইন নিউজ নয়, তবে প্রথম পৃষ্ঠার ডানদিকে বেশ বড় হরফে ছাপা। গত পরশু রাত্রির ঘটনা। গত কালকের কাগজে মুদ্রণের সময় পাওয়া যায়নি। মনে হয় খবরটা অনেক রাত্রে আসায় আজ

সবিস্তারে তা প্রকাশিত হয়েছে। ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেসের ফার্স্টক্লাস কামরায় আবিষ্কৃত হয়েছে একটি মৃতদেহ।

এ জাতীয় সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পাওয়ার কথা নয়। পথে-ঘাটে আজকাল সকাল-সন্ধ্যা মৃতদেহ আবিষ্কৃত হচ্ছে। পার্টি-মস্তানদের ক্রমাগত : 'খুনকা বদলা খুন'। এটা তা নয়। প্রথমত মৃতদেহটা একজন সুন্দরী মহিলার, দ্বিতীয় কথা সেটা পাওয়া গেছে ওই ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস 'কূপের' কূপে এবং সর্বোপরি মেয়েটি একজন ধনকুবেরের একমাত্র কন্যা তথা একমাত্র ওয়ারিশ!

সাংবাদিকের আন্দাজে মহিলাটির বয়স ত্রিশ। অত্যন্ত ফর্সা, সুন্দরী এবং সুসজ্জিতা। তাঁর বুকের উপত্যকায় সম্ভবত বিদ্ধ হয়েছিল একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা— আমূল। ছুরিটা পাওয়া যায়নি। মহিলার ভ্যানিটি ব্যাগটা কিন্তু সিটের নিচে পাওয়া গেছে। তাতে ছিল সামান্য কিছু টাকা, দশ হাজার টাকার ট্রাভলার্স-চেক, প্রসাধন-সামগ্রী, রেলওয়ে টিকিট আর ক্যালকাটা-ক্লাবের সদস্য-কার্ড। শেষোক্ত কার্ড থেকেই জানা গেছে তাঁর পরিচয়। নাম : কমলকলি মালহোত্রা। স্বামীর নাম রূপেশ। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর পিতা হচ্ছেন স্বনামধন্য ধনকুবের : জগৎপতি দস্তুর।

শেষোক্ত হেতুতেই সংবাদটা প্রথম পৃষ্ঠায় অনেকখানি জায়গা জুড়েই ক্ষান্ত হয়নি উপ্‌চে পড়েছে পঞ্চম পৃষ্ঠাতে। পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে সংবাদটা পরিবেশন করেছেন। মৃতদেহটি প্রথম আবিষ্কার করেন একজন তরুণ মেরিন এঞ্জিনিয়ার। তিনি কটক থেকে বিশাখপত্তনম যাচ্ছিলেন। সেই 'সি'-চিহ্নিত কূপেতে যখন তিনি প্রবেশ করেন তখন সেটা ফাঁকাই ছিল। কিন্তু ট্রেনটা ছাড়ার পরে তাঁর নাকে একটা ক্লোরোফর্মের গন্ধ ভেসে আসে। চলন্ত ট্রেনে সেটা অপ্রত্যাশিত। পরক্ষণেই তাঁর নজরে পড়ে নিচে একটা রক্তের ধারা। নিচু হয়ে তিনি দেখতে যান—সিটের নিচে কী আছে। তৎক্ষণাৎ তিনি চেন টেনে দেন। ভুবনেশ্বর স্টেশনের অনতিদূরে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়ে।

পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে মহিলার স্বামী রূপেশ মালহোত্রা তাঁর নিজস্ব গাড়িতে ভুবনেশ্বর চলে যান। তিনিই মৃতদেহ শনাক্ত করেন। তিনি জানাতে চাননি বা জানেন না, মিসেস মালহোত্রা কোথায় যাচ্ছিলেন বা তাঁর কোনো পুরুষসঙ্গী ছিল কি না। তবে রেলওয়ে পুলিসের সরবরাহ-করা তথ্য অনুসারে সেই সি-কূপেতে যাচ্ছিলেন স-কন্যা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট পদ্মশ্রী জগৎপতি দস্তুর। মৃতের ভ্যানিটি ব্যাগে তাঁর টিকিটও ছিল। কন্যা খুন হয়ে যাবার সময় তিনি কোথায় ছিলেন জানা যায় না। রেলওয়ে চেকার জানিয়েছেন তিনি তখনো ওই কামরায় টিকিট চেক করতে যাননি। মহিলার সঙ্গে ওই ভ্যানিটি-ব্যাগ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো মালপত্র ছিল না। সংবাদপত্রের তরফ থেকে জগৎপতি দস্তুরকে তাঁর কলকাতার লাউডন-স্ট্রিটের বাড়িতে ফোন করা হলে তিনি জানান যে, কন্যার মৃত্যুসংবাদ তিনি ইতিপূর্বে জেনেছেন ; তাঁর জামাই ভুবনেশ্বরে চলে গেছেন, তিনি নিজে ওই ট্রেনে আদৌ যাননি।

ইতিমধ্যে সুজাতা এসে বসেছে। সে আর একটি সংবাদপত্র তুলে নিয়ে ওই মর্মান্তিক হত্যাসংবাদটিই পড়ছিল। বললে, ব্যাপারটা অত্যন্ত মিস্টিরিয়াস, তাই নয়? 'স্বামী-স্ত্রী' যুগলে গেলেই সচরাচর কূপেতে রিজার্ভেশন পাওয়া যায়। কোনো একক মহিলাকে কূপেতে এভাবে একা যেতে দেওয়া হয় না। অথচ রূপেশ মালহোত্রা কলকাতায় ছিলেন। তিনি জানেন না, তাঁর স্ত্রী কার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিলেন। এটা বিশ্বাস্য?

কৌশিক বলে, অফকোর্স। 'এত্তাই তো হোন্দাই রহ্‌তা'—এমনটা তো হয়েই থাকে। আমি

সঙ্গে না থাকলে তুমি কি একা-একা কোন পুরুষ-সঙ্গীর সঙ্গে কোথাও যেতে পার না? বা জীবনে কখনো যাওনি?

—না! কূপেতে নয়!

—কিন্তু কূপেতে রাত্রিবাসের কোনো পরিকল্পনা তো ওদের ছিল না। থাকলে ওই মেরিন এঞ্জিনিয়ার কটক থেকে সন্ধ্যারাত্রিতে ওই কূপেতে রিজার্ভেশন পেতেন না। মিসেস্ মালহোত্রার গন্তব্যস্থল ছিল নিশ্চয় কটকের আগের কোনো স্টেশন। তাছাড়া 'পুরুষ' কোনো সহযাত্রী যে ছিলই এমন কোনো এভিডেন্স এখনো তো আবিষ্কৃত হয়নি।

এই সময়েই বাসু-সাহেব ফিরে এলেন প্রাতর্ভ্রমণ সমাপ্ত করে। ওভারকোটটা খুলে এসে বসলেন তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে। বললেন, 'কী লয়ে বিচার? শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই-চার।' ও বুঝেছি! কমলকলি হত্যারহস্য। কাগজটা খুঁটিয়ে পড়েছ?

কৌশিক বলে, আপনি জানলেন কী করে? আপনি যখন বেড়াতে যান, তখনো তো সকালের কাগজ আসেনি?

ইতিমধ্যে চা-কফির সরঞ্জাম নিয়ে ফুটকি আর বিশু এসে উপস্থিত। ফুট্‌কি হচ্ছে বিশুর সম্পর্কে দিদি। সে সম্প্রতি বহাল হয়েছে মিসেস বাসুর কম্পানিয়ান হিসাবে। তাছাড়া সুকৌশলী দম্পতির সদ্যোজাত কন্যার তদারকি করতে। রানীদেবীও তাঁর হুইল চেয়ারে পাক মেরে এসে উপস্থিত হলেন ভিতর বাড়ি থেকে।

বাসু কৌশিকের প্রশ্নের জবাবে বললেন, শুধু সংবাদপত্র-নির্ভর গোয়েন্দাগিরি শার্লক-হোম্‌সের আমলে চলত মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ সুকৌশলী। এখন প্রচার মিডিয়া অনেক-অনেক অ্যাডভান্সড। তোমরা বোধহয় কাল অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলে—সান্ধ্য টি. ভি. নিউজ শুনবার সময় পাওনি।

রানু একটু পরে এসেছেন। তাই আলোচনার ধরতাইটা ধরতে পারেননি ঠিক। বললেন, কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে? কমলকলি হত্যারহস্য?

বাসু বলেন, ওই দেখ! তোমাদের মামীও খবরটার বিষয়ে ওয়াকিবহাল!

কৌশিক জানতে চায়, এটা কি আইনত রেলওয়ে পুলিসের এক্তিয়ারে, না উড়িষ্যা পুলিস-ফোর্সের?

বাসু বলেন, আইন-টাইন আমি ভাল বুঝি না বাপু। তবে আমার আন্দাজ : এটা বর্তমানে তোমার-আমার এক্তিয়ারে।

—আপনার-আমার? কোন সূত্রে?

বাসু নিঃশব্দে তাঁর পকেট থেকে একটি খাম বার করে ওদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, এটা কাল সন্ধ্যায় স্পেশাল মেসেঞ্জারে এসেছে। পড়ে দেখ...

খামটা বেশ ভারী, দামী ওজনদার কাগজের জন্য। বাঁ-দিকের নিচে কায়দা করে মনোগ্রাম করা ইংরেজি বড় হরফে দুটি অক্ষরের জড়াজড়ি : 'জে. ডি'। মাঝখানে কালো কালিতে—টাইপকরা নয়—বাসু-সাহেবের নাম ঠিকানা। প্রেরকের ঠিকানা খামের উপর নেই। ভিতরের চিঠিখানা কৌশিক খুলে বার করল। এটাও ইম্পোর্টেড দামী লেটার-হেডের কাগজ। উপরে ছাপা অক্ষরে লেখা : 'জগৎপতি দস্তুর'। ব্যস, আর কিছু না—না ঠিকানা, না কোন ফ্যাক্স-মোবাইল নম্বর—কিচ্ছু নেই। এই চিঠিখানিও টাইপ-করা নয়। জগৎপতির টানা হস্তাক্ষরে মোটা-মোটা ইংরেজিতে লেখা। বাঙলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় :

প্রিয় মিস্টার বাসু,
মিডিয়া-মাধ্যমে ইতিমধ্যে আমার দুর্ভাগ্যের কথা নিশ্চয় জানতে পেরেছেন। সাহায্যের প্রয়োজন। কাল, সকাল নয়টার সময় একবার অধমের গরিবখানায় পদার্পণ করলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ধন্যবাদান্তে ইতি
ভবদীয়
জগৎপতি দস্তুর।

কৌশিক চিঠিখানা ভাঁজ করতে করতে বললে, বুঝলাম। তা আপনার এক্তিয়ারটা বোঝা গেল, কিন্তু রহস্যের সঙ্গে 'সুকৌশলী'র কী সম্পর্ক তা তো বোঝা যাচ্ছে না।

বাসু-সাহেব সে কথার জবাব না দিয়ে গৃহিণীর দিকে ফিরে বললেন, রানু, 'অভিমান' শব্দটার ইংরেজি কী গো?

রানু কর্তা-বাদে প্রত্যেকের প্লেটে কাঁটা-চামচ আর ডিম টোস্ট সাজাতে সাজাতেই জবাব দেন—ও শব্দটার 'ইংরেজি' হয় না। যেমন বাঙলা হয় না সুজাতার মুখের বর্তমান অভিব্যক্তির। কর্তার কথায় she has blushed !

সত্যি কথা! সুজাতার মতে 'সুকৌশলী' ব্যারিস্টার বাসুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তাই কৌশিকের প্রশ্নটায় সে লজ্জা পেয়েছে।

বাসু তাঁর ফলে ভরা প্রাতরাশের ডিশ্‌টা কাছে টেনে নিয়ে বললেন ; তাহলে আমিই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিই কৌশিককে। মাথার সঙ্গে কানের যে সম্পর্ক, মহাবীর কর্ণের যুগল কর্ণের সঙ্গে যুগল কুণ্ডলের যে সম্পর্ক অথবা মহাবীর পবননন্দনের সঙ্গে তাঁর লাঙ্গুলের যে সম্পর্ক!

কৌশিক হেসে ফেলে। বলে, আপনার শেষ উপমাটায় আমি কাৎ এবং মাৎ! মামু যখন স্বয়ং হুঁকোমুখো হ্যাংলা হতে স্বীকৃত তখন আমরা কেন হতে পারব না তাঁর যুগল লাঙ্গুল? কী বল সুজাতা?

সুজাতা কর্তাকে ধমক দেয়, সব সময় এমন বিশ্রি রসিকতা আমার ভাল লাগে না।

রানু বলেন, এবার কিন্তু তুমি অন্যায় রাগ করছ সুজাতা। তোমাদের মামু বাকপ্রয়োগের উত্তেজনায় নিজেই হুঁকোমুখোর উপমেয় হতে স্বীকৃত হয়েছেন। যুগল ল্যাজের কল্যাণে!

বাসু ফর্ক দিয়ে চেপে ধরে পেঁপের টুকরোটাকে কাটতে কাটতে বললেন, আমার ধারণা এটা 'উপমা' নয় আদৌ, 'মেটাফার'। ফলে উপমান-উপমেয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

প্রসঙ্গটা বদলে দেবার আগ্রহে সুজাতা বলে, আপনি কি ওই মেয়েটিকে চিনতেন, মামু?

—কে? কমলকলি? হ্যাঁ, ওর বিয়েতেও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম—যাওয়া হয়নি। দস্তুর-সাহেব আমার পুরানো ক্লায়েন্ট। ওই কমলকলি হচ্ছে জগৎপতির একমাত্র সন্তান। কম বয়সেই ওর মা মারা গেছেন। তখনো জগৎপতি যুবকই। কিন্তু সে আর বিয়ে করেনি।

রানু জানতে চাইলেন, কেন?

—কেন, তা জানি না। তবে মা-হারা মেয়েটিকে দস্তুর দস্তুর মতো আদর দিয়ে মানুষ করার চেষ্টা করে। পারে না।

সুজাতা বলে, 'পারে না' মানে? কী পারে না?

—'মানুষ' হিসাবে গড়ে তুলতে। টোটালি স্পয়েল্ড চাইল্ড! তবে সুখের কথা, ড্রাগস্ বা মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের শিকার হয়ে পড়েনি। সোসাইটিতে মক্ষিরানীর ভূমিকাটাতেই তার সন্তুষ্টি। একাধিক তরুণ স্তাবকের স্তুতিতেই তার তৃপ্তি। ক্রমাগত সে বয়-ফ্রেন্ড পরিবর্তন করে ডেটিং করত। দস্তুরের এক কাজিনপুত্র একটা মার্ডার কেসে ফেঁসে যাওয়ায় আমি ওদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি। সেটা প্রায় বছর তিন-চার আগেকার কথা। ওই সময়ে কমলকলি একটি ক্লাস-ওয়ান লম্পটের প্রেমে পড়ে—যাকে বলে 'হেড ওটার হীল্স্'। কী যেন নাম ছোকরার—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কুমার বিক্রমজিৎ সিং। নিজের পরিচয় দিতে সে নাকি বলত যে, সে হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের কোন ভূতপূর্ব রাজপরিবারের সন্তান। সে আমলে ছেলেটিকে দেখেছিলাম। এক্সিডিংলি হ্যান্ডসম, স্মার্ট, টল। বলিউডে কেন যায়নি জানি না। তবে কানাঘুষায় শুনেছিলাম একটু 'শেডী' ক্যারাকটার। ব্যবসা করে, তবে কিসের বিজনেস্ কেউ জানে না। মাঝে মাঝেই মধ্যপ্রাচ্যের নানান জায়গায় উড়ে যায়—দুবাই, বেরুট, ওমান, কুয়েৎ। এদিকে মুম্বাই, হংকং, সিঙ্গাপুর! কলকাতায় এসে আশ্রয় নেয় খানদানী হোটেলে। তাজবেঙ্গল বা কেনিলওয়ার্থে। বিজনেস্টা কীসের জানা নেই, তবে অর্থাগমটা যে ভালই, তা আন্দাজ করা যায়। এ ছাড়া আর যা করে তা হল বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে বা বউয়ের সঙ্গে প্রেম। কমলকলির মতো অস্থিরমতি মেয়েকে সে আকর্ষণ করতেই পারে, কিন্তু এ ধরনের লোক যে মিস্ দস্তুরের মতো শিক্ষিতা বুদ্ধিমতীর মাথা ঘুরিয়ে দেবে এটা আশঙ্কা করা যায়নি। ছোকরা কিন্তু তাই দিয়েছিল। তবে জগৎপতিও পাকা খেলোয়াড়। দক্ষ হাতে সে ইন্টারফিয়ার করে। আমার যতদূর আন্দাজ, সে সি. বি. আইয়ের কোন বড়কর্তাকে দিয়ে বিক্রমজিৎকে কড়কে দেয়। মিস্ দস্তুরের পিছনে ঘুরঘুর করলে তার ব্যবসার হাল-হকিকৎ নিয়ে টানা-পোড়েন শুরু হবে। তৎক্ষণাৎ বিক্রমজিৎ রণে ভঙ্গ দিয়ে হাওয়া। তারপর দস্তুর খুব তাড়াহুড়া করে রূপেশ মালহোত্রার সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে দেয়। দিল্লীতে। কলকাতাতেও একটা পার্টি থ্রো করেছিল। তাজবেঙ্গলে। কিন্তু আমার যাওয়া হয়নি। যতদূর মনে পড়ে, তখন আমি চুঁচুড়ার সেই সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর ঘোষালের মার্ডার কেসটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

—সেই 'ড্রেস-রিহার্সালের কাঁটা'?

—হ্যাঁ, কৌশিক ওই রকমই কী একটা নামকরণ করেছিল মনে হচ্ছে।

রানী প্রশ্ন করেন, রূপেশ মালহোত্রার ব্যাকগ্রাউন্ড কী?

বাসু বলেন, আমি জানি না। রূপেশ ছোকরা দস্তুরের জামাই হবার আগেই আমার সেই কেস্টার ফয়সালা হয়ে যায়।

কৌশিক বলে, আমি কিন্তু তাকে ঘটনাচক্রে চিনি, মামু।

—কী রকম?

—একজন পসার-ওয়ালা অ্যাডভোকেটের একমাত্র মেয়ের সম্ভাব্য পাত্র 'রেসুড়ে' কি না সম্‌ঝে নিতে আমাকে একবার ঘোড়দৌড়ের মাঠে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল। গতবছর। কলকাতার রেস-কোর্সে। সেখানেই আমার এক সহকারী চিনিয়ে দেয় রূপেশকে। ধনকুবের দস্তুর সাহেবের জামাইয়ের পরিচয়ে। তার মুখেই শুনেছিলাম, সিনিয়ার মালহোত্রা বেশ মালদার লোক ছিলেন। দস্তুর-সাহেবের সঙ্গে কী যেন ব্যবসায়িক-সূত্রে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও ছিল। রূপেশ ছেলেটি সুদর্শন, দীর্ঘকায়। গ্র্যাজুয়েট। বাপের ব্যবসা দেখত। ওর বিয়ের পরই

সিনিয়ার মালহোত্রা প্রয়াত হলেন। বাপের সম্পত্তি সবকিছুই বর্তায় তাঁর একমাত্র পুত্রের হাতে। কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যে সে তার বেশিরভাগই উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে। ওই ঘোড়ার খুরে খুরে। কয়েকটি চালু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু ঘোড়া নয়, মদ্যপানে এবং আরও কিছু 'ম'-কারান্ত ব্যাধিতে। পরে শুনেছি, ব্যবসাপত্র সবই লাটে উঠেছে। এখন শ্বশুরের সম্পত্তিই তার একমাত্র ভরসা! কারণ ব্যাঙ্কও নাকি ওকে কর্জ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। প্রচুর দেনায় আকণ্ঠ ডুবে সে শুধু প্রতীক্ষা করছে কবে পূজ্যপাদ শ্বশুরমশাই সাধনোচিতধামে প্রয়াণ করেন।

বাসু বললেন, পশ্চাৎপটটি পরিষ্কার বোঝা গেল।

ইতিমধ্যে সকলের প্রাতরাশ শেষ হয়েছিল।

রানু বললেন, মেয়েটির কপালটাই খারাপ! জন্মেছে রাজকন্যা হয়ে। বিয়ে হল এক মদো-মাতালের সঙ্গে। তার উপর রেসুড়ে।

বাসু বললেন, দোষ কি তার কপালেরই শুধু? পুরুষকারের নয়?

কৌশিক বলল, 'পুরুষকার'?

—ওই হল রে বাপু! 'নিয়তির' বিপরীতার্থক স্ত্রীলিঙ্গে কী হবে আমি জানি না। 'নারীবীর্য' হবে কি? 'উইমেন্স লিব'-এ ধ্বজাধারীরা কী বলেন? শব্দটা ব্যাকরণ সম্মত?

রানু বলেন, বৈয়াকরণিক কী বলবেন জানি না। প্রাণীবিজ্ঞানসম্মত নয়। তবে তোমার বক্তব্য আমরা বুঝেছি। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি। কমলকলি ডুবেছে স্বখাতসলিলে। ঈশ্বর তাকে একটা প্রকাণ্ড হ্যান্ডিকাপ দিয়ে দুনিয়াদারী করতে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু নিজের দোষেই সে বেঘোরে প্রাণটা দিল।

কৌশিক বলে, শুনেছিলাম ওদের দুজনের মধ্যে নাকি মিউচুয়াল ডিভোর্স হতে চলেছিল। রূপেশ কাগজে সই করতে রাজি যদি শ্বশুরমশায়ের কাছ থেকে একটা অত্যন্ত মোটা অঙ্কের খেশারত পায়।

সুজাতা বলে, অর্থাৎ 'নাকের বদলে সোনার নরুন'! রাজকন্যার বদলে অর্ধেক রাজত্ব!

রানু প্রশ্ন করেন, কমলকলির নামে যেসব সম্পত্তি ছিল, তার ওয়ারিশ তো এখন রূপেশ? যেহেতু বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি।

বাসু বলেন, যদি না কমলকলি উইল করে সব সম্পত্তি অন্য কাউকে দিয়ে গিয়ে থাকে।

প্রাতরাশ শেষ হয়েছিল। বাসু জানতে চান, কৌশিক কি তাহলে আমার সঙ্গে যাচ্ছ দস্তুরের 'গরিবখানায়!' না কি একাই যেতে হবে আমাকে?

কৌশিক জবাব দেবার আগে রানু বলে ওঠেন, তোমার যুগল লাঙ্গুলই সঙ্গে যাচ্ছে।

—যুগল-লাঙ্গুল?

—সরি। আই মীন দুটো কানই। মাথার টানে কান। কৌশিক আর সুজাতা।

সুজাতা বলে, কিন্তু মিঠু?

—সে থাকবে তার দিদার কাছে! চিন্তা কী?

তিন

নিউ আলিপুর থেকে লাউডন স্ট্রিটের 'দস্তুর-প্যালেস' পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। অফিসযাত্রীদের ভিড় সবে শুরু হয়েছে। জমকালো কাস্ট-আয়রনের গেট থেকে পোর্টিকো পর্যন্ত লাল মুরাম-বিছানো পথ। পদচারীদের কিছু অসুবিধা হতে পারে। বিশেষ হাইহিল-ধারিণীদের। কিন্তু এ পথে পদাতিকের আবির্ভাব সেই যাকে বলে—'নীলচন্দ্রিমার জমানায় বারেক!' ওঁদের ফিয়াট গাড়িটা পোর্টিকোর আচ্ছাদনে এসে থামতেই ছুটে এল খাকি উর্দিপরা দারোয়ান। সেলাম করে খুলে দিল গাড়ির দরজা। ওঁরা তিনজন নামতে কৌশিকের হাত থেকে গাড়ির চাবিটা চেয়ে নিল। গাড়ি ঠিক মতো পার্ক করে সে চাবি নিয়ে ওখানে প্রতীক্ষা করবে। ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন ঝকমকে সাফারি স্যুট-পরা এক সুদর্শন ভদ্রলোক। সম্ভবত দস্তুর-সাহেবের সেক্রেটারি। কৌশিক পরে জানতে পারে, সে দস্তুর-সাহেবের দস্তুরমতো খাশ বেয়ারা! ওদের তিনজনকে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বিশাল ড্রইংরুমে। সেখানে তখন সুরেলা স্বরে একটি চাইমিং ক্লক সকাল নয়টার সঙ্কেত দিচ্ছে।

হাতঘড়ির সবচেয়ে বড় কাঁটাটা পুরো একচক্কর মারার আগেই সে ঘরে প্রবেশ করলেন জগৎপতি দস্তুর। ছয় ফুটের উপর দীর্ঘ, সুঠাম চেহারা। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা, একটু বুঝিবা গোলাপি আমেজ। ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো পাতলা হয়ে আসা চুলের স্কোর বোর্ডে সাদা চকখড়ি দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে ব্যাটস্‌ম্যানের হাফ্‌সেঞ্চুরি হয়ে গেছে। পরিধানে চাইনিজ সিল্কের পাজামা-পাঞ্জাবি। পায়ে চামড়ার বিদ্যাসাগরী চটি, চোখে রিমলেস সোনার চশমা, দশ আঙুলে গ্রহবারণ ছয়টি আঙটি। কে বলবে—ওঁর একমাত্র কন্যাটির মর্মান্তিক মৃত্যুর পর তিনটি সূর্যাস্তও হয়নি। লৌহকঠিন ব্যক্তিত্ব!

আগন্তুকদের বিপরীতে একটি সোফায় আসন গ্রহণ করে তিনি বিনা ভূমিকাতেই শুরু করলেন, মিস্টার বাসু, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, কেন এভাবে আপনাদের কষ্ট দিচ্ছি। আঘাত আমি সইতে পারি, কিন্তু অপমান নয়। আমার কন্যার এই মর্মান্তিক পরিণতির একটা বিচার চাই। ওয়েস্ট-বেঙ্গল আর উড়িষ্যা দুটো স্টেটের পুলিসই জয়েন্টলি তাদের কর্তব্য করছে। অ্যান্ড দে আর ডুইং ইট এক্সিডিংলি ওয়েল। আ'হ্যাভ নাথিং টু কমপ্লেন অ্যাবাউট। তবু আমি চাই, একই সঙ্গে আপনি এবং আপনার সুকৌশলী পৃথকভাবে এ তদন্তের ভার নিন। সমান্তরাল তদন্ত।

বাসু গম্ভীরভাবে বললেন, কিন্তু কেন? আপনি কি পুলিসের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না?

—ঠিক তা নয়, ব্যারিস্টার-সাহেব। আমি চাই প্রকৃত অপরাধীকে সঠিকভাবে শনাক্ত করতে এবং...ইয়েস, হি অর শী শ্যাল বি হ্যাঙ্‌ড বাই দ্য নেক...ওসব যাবজ্জীবন টিবনে আমার তৃপ্তি হবে না। সেকেন্ডলি, আমি চাই না, লোকটাকে চিহ্নিত করার পর আপনি বেমক্কা তার ডিফেন্স কাউন্সেল হয়ে পড়েন।

—আপনার ধারণা ভুল। প্রকৃত অপরাধীকে আমি কখনো...

—আই নো, আই নো, স্যার। এ নিয়ে এখন আলোচনার কোনো মানে হয় না। আপনি কি আমার লিগ্যাল কাউন্সেলার হতে স্বীকৃত।

—অস্বীকৃত হবার কোনো কারণ হয়নি। তবে কেসটা আগে বিস্তারিত শুনি। কাগজে যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে প্রথমে।

—বলুন?

—প্রথম প্রশ্ন : কমলকলিকে কে খুন করেছে তা কি আপনি জানেন?

এই প্রথম একটু বিচলিত মনে হল দস্তুর-সাহেবকে। ইতস্তত করে বললেন। সন্দেহভাজন দু'একজন যে নেই, তা বলব না...

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বলে ওঠেন, সন্দেহের কথা হচ্ছে না। নিশ্চিতভাবে জানেন কি না, বলুন?

—না, জানি না। নিশ্চিতভাবে জানলে তো এতক্ষণে তাকে হাজতে পুরে ফেলার ব্যবস্থা করতাম।

—অল রাইট, স্যার! এবার আপনি একটু বিস্তারিতভাবে বলুন। মানে সংবাদপত্রে যা মুদ্রিত হয়নি। কমলকলি কেন ভুবনেশ্বরে যাচ্ছিল? সেখান থেকে শুরু করুন। Better begin at the beginning!

—না, কলি ভুবনেশ্বরে যাচ্ছিল না আদৌ। যাচ্ছিল বালাসোর। ওখান থেকে তার চাঁদিপুর যাবার কথা ছিল। ইনফ্যাক্ট, আমার এক ডিসট্যান্ট কাজিন-এর ছেলে থাকে বালাসোরে। তার ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির একটা পার্টি ছিল—আজই ওরা সেখান থেকে সদলবলে চাঁদিপুরে বেড়াতে যাবার প্ল্যান করেছিল। আমার জন্যও রেলওয়ে টিকেট কাটা হয়েছিল ; কিন্তু হঠাৎ একটা কাজে আমি যেতে পারলাম না। কলি—আই মিন কমলকলি একাই রওনা হল।

—একেবারে একা?

—না। ওর একজন কম্প্যানিয়ান সঙ্গে ছিল। সোমা হাজরা।

—ওই একই কম্পার্টমেন্টে? 'সি'-কুপেতে?

—না না, সে ছিল সেকেন্ড-ক্লাসে। সেই তো ফিরে এসে প্রথম রিপোর্ট করে। তার কথা অবশ্য কাগজে কিছু বের হয়নি।

—অল রাইট। তার কাছ থেকেই তাহলে ফার্স্ট-হ্যান্ড রিপোর্ট শুনব। সে এ বাড়িতেই আছে তো?

—হ্যাঁ, তিন কুলে তার কেউ নেই, যাবে আর কোথায়? খুব ভেঙে পড়েছে। ন্যাচারালি!

—আপনি যা বলছিলেন, তাই বলে যান। আপনার যাওয়া হল না। যে কোনো কারণেই হোক। তা আপনি কি টিকিটটা রিফান্ড করেছিলেন?

—না। করিনি। দেখুন, আমরা এ. সি. টিকিট পাইনি। কিন্তু ফার্স্টক্লাস কুপে পেয়েছিলাম। আমি ইচ্ছে করেই টিকিটটা ফেরত দিইনি। যাতে দিনের বেলা কুপের নির্জনতায় কলির কোনো বেগানা যাত্রাসঙ্গী না জোটে। কিন্তু সেটা যে এমন 'ফেটাল' হয়ে যাবে তা কেমন করে জানব?

—বটেই তো! তারপর?

—যেহেতু কলি একটা ম্যারেজ-অ্যানিভার্সারিতে নিমন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছিল, তাই তার সঙ্গে সামান্য কিছু গহনা-গাটিও ছিল। মানে ধরুন, তার মার্কেট প্রাইস আট-দশ লাখ টাকার মতো হবে।

—জাস্ট আ-মিনিট! সে নিশ্চয় ট্রেনে সেগুলো পরে যাচ্ছিল না। তাহলে সেগুলো ছিল কোথায়? ওর ইউজুয়াল লাগেজের মধ্যে?

—না, না। জুয়েলারি আর অর্নামেন্টস্ ছিল একটা আলাদা ছোট কেস্-এ। বাইরে থেকে অবশ্য বোঝা যেত না যে, তার ভিতরে কী আছে। মনে হত কসম্যাটিক্স-প্যাক। সেটা কলির সঙ্গেই ওর 'সি' কূপেতে ছিল। সেটা সে হাতছাড়া করার মেয়ে নয়। তার বাকি লাগেজ ছিল ওই কম্প্যানিয়ানের সঙ্গে। সেকেন্ড ক্লাসে।

—বুঝলাম। বলে যান।

—বালাসোরে ট্রেন থামলে ওই কম্প্যানিয়ান, মানে মিস সোমা হাজরা ট্রেন থেকে নামে। একটা কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে কলির কামরায় চলে আসে। কলি তখন তাকে বলে, সে ওই বালাসোরে নামবে না। আরো কিছুটা দূর যাবে। কেন, কী বৃত্তান্ত তা বুঝিয়ে বলেনি। সোমাকে নির্দেশ দিয়েছিল, বালাসোরের ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে। আরও বলেছিল সে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ডাউন ট্রেনে বালাসোরে ফিরে আসবে। সোমা অবাক হয়, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারে না। একটু বিহ্বল হয়ে পড়ে। তখনই ট্রেনটা ছেড়ে দেয়। সোমা মালপত্র প্রথমে ক্লোকরুমে জমা দেয়। তার ছিল সেকেন্ড ক্লাস টিকিট। তাই সে ফার্স্টক্লাসের ওয়েটিং রুমে ঢুকতে পারে না। তার প্রবেশদ্বারে অপেক্ষা করতে থাকে। এরপর অনেকগুলি ডাউন ট্রেন আসে ও চলে যায়। বেলা তিনটে থেকে পাঁচটায়। কলি কিন্তু ফিরে আসে না। সোমা বাধ্য হয়ে একটা রিটায়ারিং রুম বুক করে। ফার্স্টক্লাস লেডিজ ওয়েটিং রুমের মহিলা কর্মচারীকে বলে রাখে যে, কালো রঙের শিফন শাড়ি পরা খুব ফর্সা এক মহিলা যদি সোমা হাজরার সন্ধান করেন তাহলে তাঁকে যেন 'বি' নম্বর রিটায়ারিং রুমে খোঁজ নিতে বলে। সারা রাতের মধ্যেও কলি ফিরে আসে না। শেষ পর্যন্ত গতকাল সকালে সোমা স্টেশনের জি. আর. পুলিস স্টেশনে একটা ডায়েরি করে। মালপত্র ক্লোকরুম থেকে খালাস করিয়ে দুপুরের কোন ডাউন ট্রেনে ফিরে আসে। সে সময় আমি অবশ্য বাড়িতে ছিলাম না। তবে ঘটনার রাত্রেই আমরা খবর পাই। কারণ কলির ব্যাগে দুটো টিকিট ছাড়াও ক্যালক্যাটা ক্লাবের কার্ডটা ছিল। কাল সকালেই আমার জামাই বাই রোড ভুবনেশ্বরে চলে যায়। বডি আইডেন্টিফাই করে।

বাসু জানতে চান, আপনার মেয়ে কেন বালাসোরে নামলো না তার কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন?

—অ্যাপারেন্টলি কোন কারণ তো খুঁজে পাচ্ছি না। তবে সোমা যা বলছে তাতে মনে হয়, বালাসোরে কলি তার কূপের মধ্যে একা ছিল না।

সুজাতা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। বলে, সোমা কী বলছে, তা সরাসরি তার মুখ থেকে শুনলেই ভাল হয় না?

বাসু বললেন, সেটা তো শুনবই। কিন্তু সে ফিরে এসে মিস্টার দস্তুরকে কী বলেছিল—আই মীন যতদূর তাঁর স্মরণে আছে—সেটা প্রথম শুনে নিতে দোষ কী? আপনি বলুন, মিস্টার দস্তুর?

—সোমা কলিকে ডাকতে গিয়ে ভিতরে একজন পুরুষকে দেখে। সে কূপের ভিতর পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। উল্টো দিকের জানলা দিয়ে বাইরে কিছু দেখছিল। সোমা তার মুখ দেখতে পায়নি।

কৌশিক জানতে চায়, সোমা কি কামরায় উঠেছিল?

—না, সে প্ল্যাটফর্ম থেকেই কথা বলছিল।

—প্ল্যাটফর্ম কি করিডোরের দিকে পড়েছিল, না কি কূপের ভিতরের দিকে?

—করিডোরের দিকে। কলি করিডোরে দাঁড়িয়ে সোমার সঙ্গে কথা বলেছিল।

মুষ্টিবদ্ধ দু-হাতের উপর থুতনির ভার রেখে, মেঝেয় পা পাতা ডুবে যাওয়া নরম গালিচার দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন বাসু-সাহেব। হঠাৎ বলে বসেন, আপনার কী মনে হয়? ওই আগন্তুকের অকস্মাৎ আবির্ভাবেই কমলকলি বালাসোরে না নামার সিদ্ধান্তটা হঠাৎ নিয়ে বসেছিল?

—লোকটা আন-অ্যাপয়েন্টেড অকস্মাৎ এসেছিল কি না আমি জানি না, কলি সিদ্ধান্তটা হঠাৎ নিয়েছিল কি না তাও আমি জানি না। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিই যে তার সিদ্ধান্ত বদলের হেতু এটা ধরে নেওয়ার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

—কারেক্ট। তা সেই লোকটি কে হতে পারে এ বিষয়ে আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন না?

দস্তুর প্রত্যুত্তর করার আগেই তাঁর হাতে ধরা যন্ত্রটায় একটা 'বিপ্ বিপ্' শব্দ হল। বোতাম টিপে উনি যন্ত্রটা কর্ণমূলে ধরে কিছু শুনলেন। যন্ত্রের কথামুখে বললেন, "থ্যাঙ্কস্ ফর রিমাইন্ডিং মি... না জিজ্ঞেস করিনি, এখন করছি। করে তোমাকে জানাচ্ছি" তারপর ওঁদের দিকে ফিরে বললেন, আপনাদের জন্য চা-কফি বা ড্রিংক্স কিছু পাঠাতে বলব?

বাসু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করেন, কে জানতে চাইছেন? সোমা হাজরা?

—না, আমার সেক্রেটারি। ইন্ ফ্যাক্ট তিনিই আমার হাউস-কীপার। কলির মা মারা যাবার পর।

—আই সি! তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। যাবার আগে কথা বলে যাব। ওঁকে আপাতত জানিয়ে দিন, আমরা এইমাত্র ব্রেকফাস্ট করে এসেছি। আর কিছু চাই না।

যন্ত্রে সংবাদটা জানিয়ে বোতাম টেপার পর বাসু বললেন, আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। সেটা আবার করব?

—না। মনে আছে আমার।...না, আমার কোনও নিশ্চিত ধারণা নেই।

—নিশ্চিত ধারণার কথা তো আমি জানতে চাইনি। অনুমান? এনি ওয়াইল্ড গ্যেস্?

দস্তুর কয়েক সেকেন্ড নিশ্চুপ বসে রইলেন। মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি। তারপর বললেন, সরি। আই হ্যাভ দ্য নেম আনসার। কোনকিছু অনুমান করতেও পারছি না আমি।

—আই সি! পোস্টমর্টাম রিপোর্ট এখনো...

বাসুর প্রশ্ন না শেষ হবার আগেই উনি বললেন, না। এখনো পাওয়া যায়নি। আর পেলেই বা কী জানা যাবে? মৃত্যু তো হয়েছে একটা ছোরার আঘাতে।

বাসু বললেন, তা হোক। পোস্ট-মর্টাম রিপোর্ট পেলে 'টাইম ফ্যাকটারটা' হয়তো জানা যেত। ট্রেনটা বালাসোরে কখন পৌঁছায়?

দস্তুর সরাসরি জবাব দিলেন না। যন্ত্রটা তুলে নিয়ে তাঁর সেক্রেটারিকে বললেন, পামেলা, তুমি যে চার্টটা বানিয়েছ, তার দুটো কপি নিয়ে এঘরে চলে এস। ওঁরা তোমাকেও কিছু প্রশ্ন করতে চান।

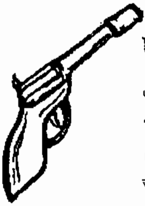

চার

একটু পরে ঘরে এসে উপস্থিত হলেন, মিস্ পামেলা কাত্রোচ্চি। বছর পঁয়ত্রিশের একজন ইতালিয়ান মহিলা—দস্তুরের সেক্রেটারি। ভারতীয় পোশাকে। বাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ি, স্লিভলেস ব্লাউজ। একহাতে রিস্টওয়াচ অপর হাত নিরাভরণ। দীর্ঘদেহী, মধ্যক্ষামা, বয়েজকাট চুল, নীল চোখ। ভারতীয় কায়দায় হাত তুলে সবাইকে যৌথ নমস্কার করে বসলেন বাসু-সাহেবের পাশে। নিষ্কথায় তাঁর হাতে তুলে দিলেন দু কপি কাগজ। পরিষ্কার বাঙলায় বললেন, টাইম-টেব্‌ল্ থেকে কপি করা। তিন-চার কপি টাইপ করেছি। পুলিসকেও দিয়েছি।

বাসু কাগজখানা হাতে নিলেন বটে, তাকালেন না। এক কপি বাড়িয়ে ধরলেন সুজাতার দিকে। বললেন ; খুব ভালো বাঙলা শিখেছেন তো! কতদিন আছেন বাঙলা দেশে?

—তা বছর কুড়ি হবে। তোমার বাড়িতেই তো এটা আমার ইলেভেন্থ ইয়ার। তাই না মিস্টার দস্তুর?

দস্তুর বোধকরি এটাকে 'খেজুরে আলাপ' পর্যায়ে ফেললেন। জবাব দিলেন না। পকেট থেকে পাইপ বার করে তামাক ঠেশতে থাকেন। সুজাতা ইতিমধ্যে টেবিলে পেতে ফেলেছে কাগজটা :

8045 ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস

কি.মি.	স্টেশান	পৌঁছায়	ছাড়ে	যাত্রাসময়
0	হাওড়া		10-15	ঘণ্টা-মিঃ
116	খড়্গপুর	12-15	12-35	2.00
292	বালেশ্বর	14-40	14-45	2.05
294	ভদ্রেশ্বর	16-05	16-10	1.20
337	যাজপুর-কেওঞ্ঝর রোড	16-55	16-57	0.45
409	কটক	18-15	18-25	1.18
437	ভুবনেশ্বর	19-25	19-33	1.00

মিস্ পামেলা কাত্রোচ্চি বললেন, ঘটনার দিন ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস অন ডট রাইট-টাইম ছিল ; মানে যতক্ষণ না কলি-মার দেহটা আবিষ্কৃত হয়।

বাসু তাকে বললেন, আই সি! সোমা কী বলছে? গহনার বাক্সটা কূপেতেই ছিল, এবং তা মিসিং?

—হ্যাঁ তাই।

—দ্যাট মে বি দ্য রীজন! —নিজের মনেই বললেন বাসু।

কয়েক মুহূর্ত সবাই নীরব। ডিসেম্বরেও শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের একটা মৃদু শব্দ। নীরবতা ভেঙে মিস্ পামেলা বলেন, কিন্তু বাইরের লোক কীভাবে জানবে যে ওতে কী আছে? আপনারাই বলুন?

কৌশিক একটু চিন্তা করে বলে, কিন্তু বাইরের লোক যে হতেই হবে, তার কী অর্থ?

বাসু মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি। দস্তুর আর তাঁর সেক্রেটারির মধ্যে চকিত দৃষ্টি-বিনিময় হল। দুজনেই নির্বাক। বাসুই আবার বলেন, সোমা কতদিন এ বাড়িতে ওই কাজ করছে?

জবাবে দস্তুর বলেন, বাট শি ইজ হান্ড্রেড-পার্সেন্ট ফেইথফুল! অ্যান্ড বিয়ন্ড সাস্‌পিশন!

—বাট দ্যাট ওয়াজ নট মাই কোশ্চেন?

পামেলা বললেন, প্রায় দু বছর। দস্তুর বলতে চেয়েছিল, আমরা তাকে মেয়ের মতোই দেখি। তিনকূলে তার কেউ নেই। অর্ফানেজে মানুষ। নিজের চেষ্টায় গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। আর...তাছাড়া...দু-বছর ধরে তো দেখে আসছি—ওই যে-কথা দস্তুর বলল ; শি ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফেইথফুল।

বাসু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাছাড়া সে তো ছিল তিন বগি পিছনে। আর ছুরি চালানো মেয়েদের কাজ নয়। স্ত্রীলোক হত্যাকারী হলে দেখা যায় মেথডটা: বিষপ্রয়োগ! অলমোস্ট নাইন্টি পার্সেন্ট।

দস্তুর বিরক্ত হয়ে হঠাৎ বলে ওঠেন, প্লিজ ব্যারিস্টার-সাহেব। সন্দেহের তালিকা থেকে আপনি কয়েকজনকে বাদ দিন—আমাকে, পামেলা, সোমা বা আমার বাড়ির দারোয়ান-পাচক-বেয়ারা-ড্রাইভারদের। এ-কাজ সেই স্কাউন্ড্রেলটার—সেই যাকে ট্রেনের কামরায় সোমা দেখেছিল বালাসোর স্টেশনে।

কৌশিক জানতে চায়, আপনার মেয়ের শেষকৃত্য কোথায় হবে?

দস্তুর জবাব দিলেন না। পকেট থেকে রুমাল বার করে চশমার কাচটা মুছতে থাকেন। পামেলা বলেন, আজ দুপুরেই আমরা বাই রোড ভুবনেশ্বর যাচ্ছি। কলি-মার হাজবেন্ড তো ওখানেই আছেন। কয়েকজন নিকট আত্মীয়ও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। পৃথক গাড়িতে। 'ফিউনারাল' পুরীর স্বর্গদ্বারেই হবে।

বাসু জানতে চান, কমলকলির ওয়ারিশ কে? তার স্বামী?

দস্তুর আবার আলোচনায় যোগ দেন। বলেন, বিয়ের তিনমাসের মধ্যে কলি তার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি—গোটা সাতেক ল্যান্ডেড প্রপার্টি, শেয়ারস্, অন্যান্য সিকিউরিটি একটা উইল করে তার হাজবেন্ড রূপেশ মালহোত্রাকে দিয়ে বসে। আমি যখন জানতে পারি ততদিনে ওদের সম্পর্ক তিক্ত হতে শুরু করেছে। আমি উইলটা নষ্ট করে ফেল্‌তে চেয়েছিলাম। কারণ আমার মনে হয়েছিল, ওদের ডিভোর্স অনিবার্য! কিন্তু কলি রাজি হয়নি!

—রাজি হয়নি! কেন? সে কি ডিভোর্স চাইছিল না?

—সর্বান্তঃকরণে চাইছিল। ওরা তো গত সাত মাস সেপারেশনে আছে। একসঙ্গে একটা রাতও কাটায়নি। কলি চাইছিল মিউচুয়াল ডাইভোর্স। স্কাউন্ড্রেলটা গররাজি নয়। তবে তার ডিমান্ড ছিল আকাশচুম্বী!

—তাহলে কমলকলি তার উইলটা বদ্‌লাতে রাজি হল না কেন?

দস্তুর নীরবে পাইপ টানতে থাকেন।

পামেলা বলেন, তুমি ভুল করছ মিস্টার দস্তুর। ডাক্তার আর লিগ্যাল অ্যাডভাইসারের কাছে কিছু লুকাবার চেষ্টা বোকামি!

দস্তুর তাঁর সেক্রেটারির দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, আমাকে কলি বলেছিল, উইলে একাধিকবার রূপেশকে বলা হয়েছে 'মাই হাজবেন্ড'! সুতরাং ডিভোর্স হয়ে গেলে যদি আমার মৃত্যুই আগে হয় তাহলে রূপেশ কিছুতেই ওই উইলের প্রবেট পাবে না। তাছাড়া...আমার আশঙ্কা...রূপেশ এমন কিছু একটা তথ্য ওর সম্বন্ধে জানতে পেরেছিল যেজন্য ও উইলটা নষ্ট করতে পারেনি। সেটা যে কী, তা আমি জানি না!

বাসু জানতে চান, ওদের কোন জয়েন্ট ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট ছিল?

দস্তুর তাঁর সেক্রেটারির দিকে ফিরে বললেন, য়ু বেটার আনসার দ্যাট কোশ্চেন।

পামেলা বলেন, না, ছিল না। জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট সব ক্লোজ করে দিয়েছিল কলি। তবে আন্দাজ করা যায়, রূপেশ মাঝে মাঝেই কলির কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে যেত।

—ব্ল্যাকমেলিং?

—হতে পারে। আবার নাও পারে। হয়তো স্ক্যান্ডালের ভয়ে। মিস্টার দস্তুর ওকে ডিভোর্স পিটিশন ফাইল করাতে রাজি করিয়েছিল। আমাদের অ্যাটর্নি তার কাজ শুরু করেও দিয়েছিলেন।

—রূপেশ মালহোত্রা আজকাল কোথায় থাকে?

আবার কথোপকথনে যোগ দেন দস্তুর-সাহেব, সল্ট লেকে। ওর বাপের বানানো দু' দুটি বাড়ি—আলিপুরে ও লেক গার্ডেন্সের দুটি বড় বাড়ি—ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে।

—তার মানে, পর্শু কমলকলি যখন রওনা হয়, সেদিন সকালে রূপেশ কলকাতাতেই ছিল?

—তাই ছিল বলে আমার ধারণা। কংক্রিট প্রমাণ নেই। অন্তত রাত আটটায় সে সল্টলেকের বাড়িতে ছিল। কারণ সেই সময় ভুবনেশ্বর থেকে পুলিসের এস. টি. ডিটা সে রিসিভ করে।

—বাড়ির টেলিফোনে? আর য়ু শ্যিওর? মোবাইল নম্বরে নয়?

দস্তুর একটু চম্‌কে ওঠেন। বলেন, ওদিক থেকে আমি চিন্তা করিনি। না, সে খবরটা আমার জানা নেই!

বাসু বললেন, আপনার 'কেস'টা আমরা অ্যাকসেপ্ট করলাম। এবার মিস্‌ হাজরার সঙ্গে একটু কথা বলব। জনান্তিকে। তাকে কাইন্ডলি পাঠিয়ে দিন।

পাঁচ

ওঁরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। ডোর ক্লোজারের অমোঘ আকর্ষণে ফ্লাসপাল্লাটা বন্ধ হয়ে গেল। সুজাতা তখন সেই নির্জন ঘরে মামুকে বলে, আমার মনে হয়...

—নট নাউ! আমাদের আলোচনাটা পরেও হতে পারে।

সুজাতার খেয়াল হল। দেওয়ালের নাকি কান থাকে! বিশেষ, অমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাগনেটের বৈঠকখানায় : কনসিলড্ টেপ-রেকর্ডার!

একটু পরেই এসে হাজির হল সোমা হাজরা। তারও বয়স ওই ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। সেও রীতিমতো সুন্দরী। মুখাবয়ব খুব নয়নাভিরাম নয়। তবে অত্যন্ত ফর্সা এবং সুতনুকা। যুক্তকরে সবাইকে যৌথ-নমস্কার করে দাঁড়িয়ে রইল। বাসু-সাহেবের নির্দেশে আল্‌তো করে বসল একটি সোফায়। আগে থেকে জানা না থাকলে কৌশিক বুঝতেই পারত না এই মেয়েটি ছিল কমলকলির মেইড-সার্ভেন্ট—গৌরবে : কম্প্যানিয়ান। ওর পরনে সাদামাঠা হাল্‌কা নীল রঙের তাঁতের শাড়ি। ব্লাউজ ম্যাচ করা নয়। প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি। চোখ দুটি এখনো লাল। সেটা অস্বাভাবিক নয়। প্রথম কথা, মালকিনের আকস্মিক অপমৃত্যু,

দ্বিতীয়ত ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার অভাব। কমলকলি ওর চাকরিটা ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে নিয়েই ওপার পানে রওনা দিয়েছে।

বাসু বলেন, তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, মা। কিন্তু তবু তোমাকে একটু বিরক্ত করব। কয়েকটা প্রশ্ন করব। প্রথম কথা : পর্শুদিন সকালে তোমরা যখন স্টেশনে রওনা হও তখন কি মিসেস মালহোত্রা স্বাভাবিক ছিল? না কি কোনো অস্থিরতা বা নার্ভাসনেস্-এর লক্ষণ তোমার নজরে পড়েছিল?

—আজ্ঞে না। তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই ছিলেন। বরং কিছুটা খুশি-খুশি মুডে ছিলেন।

—কিন্তু বালাসোর স্টেশনে তাকে অন্যরকম দেখলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একেবারে আলাদা মুড। কেমন যেন একটা অ।   ভাব। আমার সঙ্গে গুছিয়ে কথাও বলতে পারছিলেন না।

—বালাসোর স্টেশনে কমলকলি তোমাকে ঠিক কী বলেছিল বলতো? আই নো, ভার্বাটিম সব কথা মনে করে বলা সম্ভবপর নয়। তবু যতখানি তোমার মনে আছে—

একটু ভেবে নিয়ে মিস্ হাজরা বললে, আমি জানলার কাছে এসে দাঁড়াতে উনি কূপে থেকে বার হয়ে করিডোরে এলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে জানলায় ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'সোমা, আমার প্ল্যানটা একটু বদলাতে বাধ্য হচ্ছি...আই মিন...এখনই বালাসোরে আমি নামতে পারছি না।'

—জাস্ট এ মিনিট! তোমার ঠিক মনে আছে যে, ও বলেছিল 'প্ল্যানটা বদলাতে বাধ্য হচ্ছি' এবং 'নামতে পারছি না'? অর্থাৎ সে বলে নি তো যে, 'প্ল্যানটা বদলাচ্ছি' এবং 'নামছি না'?

সোমা হাজরা একটু চিন্তা করে বলল, না স্যার! আদালতে হলফ্ নিয়ে আমি ও কথা বলতে পারব না। তবে যদ্দূর আমার মনে পড়ে উনি বলেছিলেন 'বাধ্য হচ্ছি' এবং 'নামতে পারছি না।'

—ও.কে! তারপর?

—উনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন...

—নো, নো, নো! তুমি ডাইরেক্ট ন্যারেশানে ওর কথাগুলো বলে যাও, যতদূর তোমার মনে পড়ে—

সোমা আবার একটু চিন্তা করে নিল। তারপর বললে, উনি বললেন, 'সোমা, তুমি লাগেজগুলো ক্লোকরুমে রেখে ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে আমার জন্য অপেক্ষা কর। আমি রাতের মধ্যেই কোনো ডাউন ট্রেনে ফিরে এসে লেডিজ ওয়েটিং রুমে তোমার খোঁজ করব। তোমার কিছু টাকা লাগবে?' তাতে আমি বললাম, 'না। টাকা লাগবে না ; কিন্তু কত রাত হবে আপনার?' উনি জবাব দিলেন না। কূপের মধ্যে গিয়ে কাকে কী যেন জিজ্ঞেস করলেন। তখনই আমার নজর হল কূপের ভিতর একজন ভদ্রলোক আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখ না ঘুরিয়েই তিনি দিদিকে কী যেন বললেন। তৎক্ষণাৎ দিদি আবার জানলার ধারে ফিরে এসে বললেন, 'ম্যাক্সিমাম রাত দশটা। ডাউন ট্রেন কখন আছে জানি না তো। তবে আজ রাত্রেই ফিরব। তুমি স্টেশন ছেড়ে কোথাও যেন যেও না।' আমি কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম—সম্ভবত জানতে চাইছিলাম উনি কোথায় যাচ্ছেন। বা কেন যাচ্ছেন—ঠিক কী জানতে চাইছিলাম তা আমার এখন মনে নেই। কিন্তু ঠিক তখনই ট্রেনটা দুলে উঠল। দিদি জানলা থেকে সরে গেলেন। ট্রেনটাও ছাড়ল।

বাসু বললেন, আই সি! তার পরের কথা তো তুমি তোমার এজাহারেই দিয়েছ। তুমি

রিটায়ারিং রুমের ‘বি’-কামরায় রাতটা ছিলে, সারা রাতে কমলকলি না ফেরায় তুমি বালাসোরের পুলিস স্টেশনে একটা ডায়েরি করে পরদিন ফিরে এলে। তার মধ্যে নতুন কথা কিছু নেই। কিন্তু গহনার কেসটা তাহলে তোমার দিদির কাছেই থাকল? মানে, ট্রেনটা কখন বালাসোর ছাড়ে?

—তাই তো থাকার কথা। আমাকে যখন দিদি সেটা দেননি।

—হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ার পর বালাসোর পৌঁছানোর আগে তুমি কি ওই দিদির কামরায় গিয়েছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ট্রেন ধরতে আমরা নয়টা-নাগাদ বাড়ি থেকে বার হই। তাড়াহুড়ায় দিদির তখনো ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি। সেটা আমি একটা ক্যাসারোল হট-কেসে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। খড়্গাপুরে যখন গাড়ি দাঁড়ায়—বারোটা নাগাদ—তখন আমার কয়েকজন সহযাত্রীকে মালগুলো পাহারা দিতে বলে খাবারের কৌটোটা নিয়ে দিদির কামরায় চলে আসি। খড়্গাপুরে বিশ মিনিট স্টপেজ। দিদিকে খাবারের ক্যাসারোল হট-কেস আর কফি ভর্তি ফ্লাস্কটা দিয়ে আসি। দিদি আমার সামনেই খেতে শুরু করেছিলেন ; কিন্তু শেষ করতে পারেননি। ট্রেন ছেড়ে দিতে পারে আশঙ্কা করে আমি সেই বাটি আর ফ্লাস্কটা রেখেই আমার কামরায় ফিরে আসি।

কৌশিক বলে, কিন্তু সেগুলো তো কূপেতে পাওয়া যায়নি?

—আমিও তাই শুনেছি। জানি না, সেগুলো কোথায় গেল।

বাসু জানতে চান, খড়্গাপুরে কমলকলি কী খেয়েছিল?

—খান দুই আলুর পরোটা, চিকেন-মটর, স্যালাড, আর একপিস্ সন্দেশ ছিল কৌটায়। দিদি তার কতটা কী খেয়েছিলো আমি জানি না। কী করেই বা জানব?

বাসু মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, থ্যাঙ্কস সোমা। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। তুমি মিস্টার দস্তুরকে একবার এঘরে আসতে বল। যাও—

সোমা উঠল না। নিজে থেকেই বলে, আমার মনে হয় বালেশ্বরে যে ভদ্রলোককে আমি কূপের ভিতর দেখেছিলাম হয়তো তাঁরই প্ররোচনায় দিদি প্রোগ্রামটা বদলান।

বাসু একটু চমকে উঠে বলেন, ও হ্যাঁ! তার কথা তো তোমাকে এখনো জিজ্ঞেস করাই হয়নি। তোমার কী মনে হয়েছিল? সেই লোকটির সঙ্গে ট্রেনেই তোমার দিদির আলাপ হয়? না কি সে কমলকলির পূর্বপরিচিত?

—তা আমি কেমন করে জানব স্যার? আমি তো তাঁকে ভাল করে দেখতেই পাইনি। ট্রেন যতক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল তারমধ্যে তিনি একবারও এ পাশ ফেরেননি। তাঁর মুখটাও দেখতে পাইনি।

—মুখ নাই দেখ, তার একটা শারীরিক বর্ণনা দাও। হাইট, স্ট্রাকচার, পোশাক?

—মনে হল ভদ্রলোক বেশ লম্বা। স্লিম ফিগার। গ্রে রঙের ফুলপ্যান্ট। গায়ে হাফশার্ট অথবা টি-শার্ট। ঠিক মনে নেই। তাঁর মাথায় একটা ক্যাপ ছিল, হুডওয়ালা। তিনি দিদির সঙ্গে দু-একটা কথা বলেছিলেন, কিন্তু বরাবর ওপাশ ফিরে।

বাসু পাইপটায় আগুন ধরাতে ধরাতে ফস্ করে বলে বসেন, লোকটা তোমার দিদির হাজব্যান্ড মিস্টার রূপেশ মালহোত্রা নয় তো?

রীতিমতো চমকে ওঠে সোমা। সামলে নিয়ে বলে, তাঁকে আমি কয়েকবার দেখেছি। এ লোকটির হাইট এবং স্ট্রাকচার মিস্টার মালহোত্রার মতোই। তবে উনি বলে মনে হয় না।

—কেন হয় না? তুমি তো লোকটাকে শুধু পিছন থেকে দেখেছ। এদিকে আবার হাইট স্ট্রাকচার মালহোত্রার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে? তাহলে?

সোমা জবাব দিতে পারে না। বোকার মতো তাকিয়ে থাকে।

—তার মানে লোকটা মিস্টার মালহোত্রা হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে! তাই না? এ-কথাই তো বলতে চাইছ?

শব্দ বার হল না মিস্ হাজরার মুখ থেকে। নীরব শিরশ্চালনে সে স্বীকৃতি জানালো।

—তুমি কুমার বিক্রমজিতের নাম শুনেছ? চেন তাঁকে?

এবারও সোমা চমকে ওঠে। বলে, কুমার বিক্রমজিৎ? দিদির বন্ধু? হ্যাঁ তাঁকে একবার দেখেছি। কেন বলুন তো?

—লোকটা কুমার বিক্রমজিৎ নয় তো?

—না, তা মনে হয় না।

—কেন?

—তাছাড়া কতটুকু সময় তাঁকে দেখেছি বলুন?

—তা তো বটেই! তবে পরে যদি প্রমাণিত হয় লোকটা কুমার বিক্রমজিৎ তাহলেও তুমি অবাক হবে না। তাই না?

—হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। আমি তো তাঁকে খুঁটিয়ে দেখিনি।

—কেন? তোমার তো প্রচণ্ড কৌতূহল হবার কথা। কৌতূহল হয়নি তোমার?

—হ্যাঁ, তা হয়েছিল। কি জানি, আমি ঠিক জানি না।

বেশ বোঝা যায় এ জাতীয় প্রশ্নোত্তরের অভিজ্ঞতা তার নেই। সে বেশ ঘাবড়ে গেছে'

—ঠিক আছে এবার এস তুমি। মিস্টার দস্তুরকে পাঠিয়ে দাও।

সোমা উঠে দাঁড়ায়। চলতে গিয়েও কী ভেবে থেমে পড়ে। হঠাৎ প্রশ্ন করে, সেদিন দি কী রকম ড্রেস পরেছিলেন জানেন?

বাসু তৎক্ষণাৎ বলেন, হ্যাঁ শুনেছি। একটা চাঁপা-রঙের মুর্শিদাবাদী।

—চাঁপা রঙের মুর্শিদাবাদী? কে বলেছে?

—কার এজাহারে সে কথা আছে তা তো মনে পড়ছে না। বোধহয় সেই মেরিন এঞ্জিনিয়ারের স্টেটমেন্ট-এ। কেন বলতো?

সোমা দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, তাহলে সে ভদ্রলোক কালার ব্লাইন্ড। দিদি পরেছিলেন ডীপ কালো একটা চাইনিজ শিফনের শাড়ি, সেই সঙ্গে স্লীভলেস কালো ম্যাচিং ব্লাউজ। অমন পোশাকে ফর্সা রঙের দিদিকে যে কী দারুণ দেখাচ্ছিল—

বাসু বললেন, না, এতক্ষণে মনে পড়েছে। চাঁপা রঙের মুর্শিদাবাদীর কথাটা বলেছিল সেই জি-আর-পির ইন্সপেক্টার—যে ডেডবডি কূপে থেকে স্টেশানে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করে।

সোমা প্রতিবাদ করে, তাহলে সেই পুলিশ অফিসারকেই চোখ দেখাতে বলুন। সে লোকটাই কালার-ব্লাইন্ড।

বাসু বলেন, তা কেন? তুমি তো তোমার দিদিকে দেখেছিলে বালাসোর স্টেশন পর্যন্ত আর বডিটা পাওয়া যায় ভুবনেশ্বরের কাছাকাছি। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে। কমলকলি হয়তো নির্জন কূপেতে ইতিমধ্যে শাড়িটা পাল্টে ছিল।

রুখে ওঠে সোমা—কী করে পালটাবেন? তাঁর স্যুটকেস তো আমার জিম্মায়? তাঁর কাছে তো ভ্যানিটি ব্যাগ ছাড়া কিছুই ছিল না।

বাসু মাথা নাড়লেন, তা বটে! তুমি যে আরও গুলিয়ে দিলে ব্যাপারটা! আর য়ু শ্যিওর বাড়ি থেকে সে কালো শিফনের শাড়ি পরেই বেরিয়েছিল।

—কী আশ্চর্য! আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি তাঁর কম্প্যানিয়ান। সকাল নয়টা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত তাঁকে বারে বারে দেখেছি। বাড়িতে, গাড়িতে, হাওড়া স্টেশনে, খড়্গপুরে, বালাসোরে...

সুজাতা আর থাকতে পারে না। বলে, আপনিই কিছু উল্টোপাল্টা করছেন, মামু! মেয়েরা কখন কী শাড়ি পরে আছে তা শুধু মেয়েরাই নজর করে! আমার কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে, দস্তুর-সাহেবের স্টেটমেন্টেও 'কালো রঙে'র শাড়ির উল্লেখ ছিল। চাঁপারঙের নয়।

—দস্তুর? দস্তুর আবার শাড়ির রঙের উল্লেখ করল কখন?

—ওই যখন বর্ণনা করছিলেন যে, মিস্ হাজরা ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমের মহিলা ইনচার্জকে বলছে, 'খুব ফর্সা একজন কালো রঙের শিফন শাড়িপরা মহিলা যদি ওর খোঁজ করেন...'

বাসু বিহ্বল হয়ে বলেন, 'কালো'? আমার যদ্দুর মনে পড়ে উনি 'চাঁপা রঙ' বলেছিলেন...কী জানি। বাট দ্যাটস্ নাইদার হিয়ার নর দেয়ার! শাড়ির রঙে কী আসে যায়?

ছয়

ঘরের বাইরে আসতেই দেখা হয়ে গেল দস্তুর-সাহেবের সঙ্গে। উনি বললেন, আপনাদের খবর দিতেই আসছিলাম। ইন্সপেক্টার দাশ এসেছেন, ও-পাশের উইং-এ অপেক্ষা করছেন। আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।

বাসু বলেন, নিখিল একটু বসুক। তার আগে আপনার সঙ্গে দু-একটা জরুরি কথা সেরে নিই।

—চলুন, তাহলে আবার ঘরে গিয়ে বসা যাক।

ওঁরা ফিরে এলেন সেই বৈঠকখানায়। দস্তুর বলেন, এবার বলুন?

—না, আমি বলব না, বলবেন তো আপনি!

—আমি! মানে? আমি কী বলব?

—সেই বিশেষ কথাটা, যা আপনি এখনো আর কাউকে বলেননি, বলতে পারছেন না—barring possibly Miss Pamela !

একটু রাগত স্বরে দস্তুর বলেন, হোয়াট ডু য়ু মিন? আমি আপনার কাছে কিছু লুকোচ্ছি? অফ অল পার্সেন্স : আমি! যে আমি আপনাকে ডেকে এনে এ কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি?

বাসু জবাব দিলেন না। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন দস্তুরের চোখের দিকে। দস্তুর বলেন, কী হল? কিছু একটা বলুন?

বাসু প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললেন, অলরাইট, আমিই বলছি : আয়াম এক্সট্রিম্‌লি সরি মিস্টার দস্তুর! আপনি যদি আপনার এই স্ট্যান্ড না বদলান—সেই গোপন কথাটা বলতে রাজি না থাকেন—তাহলে আই'ল ওয়াশ মাই হ্যান্ডস্ অফ্ দিস্ কেস। রাইট নাউ!

উঠে দাঁড়ালেন বাসু। দস্তুরও। তারপর তিনি দু-হাত কোমরের দুদিকে রেখে মাথা নিচু করে কয়েকটা মুহূর্ত চিন্তা করলেন। এবং তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা গোলাপী রঙের খাম বার করে বাসু-সাহেবের হাতে দিলেন। বললেন, আই হোপ দিস্ উইল স্যাটিসফাই য়ু।

বাসু ওই খাম থেকে একই রঙের কাগজে লেখা একটি চিঠি বার করলেন। একবার চোখ বুলিয়ে কৌশিকের দিকে বাড়িয়ে ধরেন। সুন্দর ঝক্‌ঝকে হস্তাক্ষরে ইংরেজিতে লেখা ছোট্ট চিঠি। বাঙলা করলে দাঁড়ায় :

> কলি...আমার কলি!
>
> ভাবতে খুব আনন্দ হচ্ছে যে, আমাদের সেই পুরনো দিনগুলো আবার ফিরে আসবে। আবার তোমাকে কাছে পাব, পাশে পাব। তোমার হাতে রাখব আমার হাত! তোমাকে কাল সকালেই চাঁদিপুর যেতে হবে শুনে ভীষণ খারাপ লাগছে। সহস্রাব্দের প্রথম সূর্যোদয় তাহলে আমরা দুজনে একসঙ্গে দেখব না? না! তা হবে না। হতে পারে না। তার আগেই তোমার-আমার দেখা হবে! কী ভাবে? বলব না। তবে জেনে রাখ, আমার অভিধানে 'অসম্ভব' বলে কোন শব্দ নেই।
>
> তোমারই 'অলি'

চিঠিটা পড়ে, ভাঁজ করে খামের মধ্যে ভরে বাসু-সাহেবের হাতে ধরিয়ে দিল কৌশিক। সুজাতাও ঝুঁকে পড়ে পাঠ করে নিয়েছে ইতিমধ্যে। খামটা ফেরত পেয়ে দস্তুর সেটা পকেটে রাখলেন। বললেন, এটার কথা এখনি পুলিসকে বা আর কাউকে জানাবেন না প্লিজ।

বাসু বললেন, কোথায় পেলেন এটা? আর কবে?

—পেয়েছি কাল দুপুরে। কলির ড্রয়ার ঘাঁটতে বসে।

—ড্রয়ার কি চাবিবন্ধ ছিল না?

—ছিল। কিন্তু আমার কাছে এ বাড়ির সমস্ত চাবির ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। ওর দেরাজের ডুপ্লিকেট চাবিটা কোনদিন ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি। কালই প্রথম।

—আপনার সেক্রেটারি জানেন?

—হ্যাঁ। বর্তমানে আমরা পাঁচজন জানি।

—হাতের লেখাটা চেনা? এবার কি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?

—হস্তাক্ষর আমার অপরিচিত ; কিন্তু এবার কিছুটা বোধহয় 'গ্যেস্' করতে পারছি।

—কুমার বিক্রমজিৎ?

—পামেলার তাই ধারণা। আমারও!

—কিন্তু কীভাবে চিঠিটা এ-বাড়িতে এল?

—আমার জানা নেই। কুরিয়ার সার্ভিসে সম্ভবত।

—আপনার মেয়ে যে আবার ওই স্কাউন্ড্রেলটার খপ্পরে পড়েছে তা টের পাননি?

দস্তুর বললেন, দেখুন বাসু-সাহেব, আমার মেয়ে প্রাপ্তবয়স্কা। সে তার জীবন কী ভাবে কাটাবে তার ভিতর আমার এখন আর নাক গলানো ঠিক নয়! ইনফ্যাক্ট, হতভাগীটা খুন না হয়ে গেলে আমি কোনদিনই তার টেবিলের ড্রয়ার খুলে দেখতাম না। কী বলব আপনাকে—কলির মৃত্যুসংবাদের চেয়ে এই গোলাপী খামখানা আমাকে কিছু কম আঘাত দেয়নি। কিন্তু আগেই বলেছি, আঘাত আমি সইতে প্রস্তুত, 'ইনসাল্ট' নয়। খুন যেই করে থাক

আমার অনুরোধ আপনি খুঁজে বার করুন, আমাকে লুকিয়ে কে আমার বিবাহিতা কন্যার সঙ্গে অবৈধ প্রেম করছিল।

বাসু বললেন, চলুন এবার ওঘরে যাওয়া যাক।

ওপাশের উইংস-এ ঢুকতেই সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো নিখিল দাশ। পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষা-বিভাগের হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের একজন হেভিওয়েট অফিসার। দীর্ঘদিনের পরিচয় এঁদের সঙ্গে এবং বাসুর স্নেহধন্য। বলে, আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিল এ কেসে আপনার গাইডেন্স পাব। তাই আপনি নয়টার সময় আসছেন শুনে একঘণ্টার মার্জিন দিয়ে চলে এলাম।

বাসু বলেন, তা ওই একঘণ্টার মার্জিনটা কেন?

—আপনার প্রাথমিক তদন্তের জন্য একঘণ্টা সময়ই কি যথেষ্ট নয়?

ওঁরা চারজন চারটি সোফায় আসন গ্রহণ করেন।

বাসু-সাহেব জানতে চান, তা কেমন বুঝছ?

নিখিল বলে, প্রাইম সাসপেক্ট রূপেশ মালহোত্রা। ঘটনার দিন ও বাড়িতে ছিল না। আপনি এতক্ষণে নিশ্চয় জেনেছেন যে, ওরা সেপারেশনে ছিল। কমলকলি থাকতেন এখানে, আর মিস্টার মালহোত্রা তাঁর সল্টলেকের বাড়িতে। গতকাল মিস্টার মালহোত্রা বাই রোড ভুবনেশ্বরে রওনা হয়ে যাবার পর আমরা গিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছি। আঠাশ তারিখে তিনি বাড়িতেই ছিলেন ; কিন্তু ঘটনার দিন—উনত্রিশে, বুধবার, তিনি সকাল থেকেই অনুপস্থিত। মানে, তাঁর বেড-টিও অস্পর্শিত পড়ে ছিল। উনি শেষরাত্রে কখন উঠে, কোথায় বুঝি চলে গেছেন। বাড়ির লোক জানে না। ঘরটা খোলা ছিল। সাড়ে ছয়টায় ওঁর বেয়ারা টিপয়ে টি-কোজি দিয়ে ঢাকা চায়ের ট্রেটা রেখে যায়। তার ধারণা হয়েছে—সাহেব বুঝি বাথরুমে। ব্যস্! তারপর রাত এগারোটা পর্যন্ত তিনি কোথায় ছিলেন তা বাড়ির কেউ জানে না। ভেরি মিস্টিরিয়াস্!

বাসু বলেন, কিন্তু রাত আটটা নাগাদ ভুবনেশ্বর স্টেশনের এস. আর. পি. তো রূপেশকে এস. টি. ডি করে খবরটা জানায়।

—বাড়িতে নয়। মোবাইল নম্বরে। সে কোথা থেকে মেসেজটি পায় তা জানা যায় না।

বাসু বলেন, ডেডবডি ভুবনেশ্বর স্টেশনে এসেছে সাড়ে সাতটায়। আধঘণ্টার মধ্যে রেলওয়ে এস. পি রূপেশের মোবাইল নম্বর পেয়ে গেল কী করে? সেটা সম্ভব?

নিখিল মাথা নেড়ে বলল, আমি জানি না। খোঁজ নেব।

দস্তুর বলে ওঠেন, খোঁজ নিতে হবে না। আমি জানি। কলি —আই মিন কমলকলির হাত-ব্যাগে একটা ছোট্ট টেলিফোন রেডি-রেকয়নার থাকে। তাতে তার স্বামীর মোবাইল নম্বর নিশ্চয় ছিল। মৃতদেহের সঙ্গেই সেটা হস্তগত হয়েছে পুলিসের।

বাসু পাইপে তামাক ঠেশ্‌তে ঠেশ্‌তে বলেন, প্রাইম সাসপেক্ট ছাড়া আরও একজনের 'অ্যালেবাইটা' তোমাকে যাচাই করে দেখতে হবে, নিখিল। লোকটা ভবঘুরে। আজ এখানে, কাল সেখানে। কিন্তু বর্তমানে কলকাতায় আছে। থাকলে কোনো খানদানী হোটেলে।

নিখিল বললে, করেছি, স্যার! আপনি কুমার বিক্রমজিতের কথা বলছেন তো?

—হ্যাঁ, তাই বলছি, কিন্তু তুমি আন্দাজ করলে কী করে?

—সময়ের দিক থেকে আমি তো আপনার চেয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা লীড নিয়ে বসে আছি, স্যার। মিসেস মালহোত্রার সমস্ত অতীতটাই আমাদের খুঁটিয়ে দেখতে হয়েছে। 'কঙ্কতিকা সম্মার্জনী' চালিয়ে।

তারপর হঠাৎ মিস্টার দস্তুরের দিকে ফিরে বললে, আপনি কিছু মনে করবেন না স্যার। ইট্‌স্ আ কেস্ অব মার্ডার! তাই সব কথা খোলাখুলি আলোচনা করছি। আপনি যে বছর-তিনেক আগে পুলিসের সাহায্যে ওই লোফারটাকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাও আমাদের জানা।

দস্তুর বললেন, লুক হিয়ার, ইন্সপেক্টার! কমলকলি বর্তমানে নিন্দা স্তুতির ওপারে। আপনারা যা করছেন, তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। কারণটা আপনিই বলেছেন : আফটার অল্ ইট্‌স্ আ কেস অব মার্ডার! আমি চাই খুনী লোকটাকে ফাঁসির দড়ি থেকে ঝোলাতে। অ্যাট এনি কস্ট! কিন্তু কলির নামে কতকগুলো কুৎসা সংবাদপত্রে ছাপা হলে আমি ব্যথিত হব। এই যা!

নিখিল বললে, আই রেসপেক্ট য়োর সেন্টিমেন্ট, স্যার, অ্যান্ড অ্যাপ্রিশিয়েট য়োর পয়েন্ট।

বাসু জানতে চাইলেন, আমার খবরটা কি ঠিক? মানে কুমার বিক্রম কি এখন কলকাতায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ। হোটেল 'রাতদিন'-এ। তারপর ঘটনার দিন, মানে ওই বুধবার সকাল নয়টায় তিনি হোটেল থেকে চেক-আউট করে বেরিয়ে যান। ট্যাক্সিতে। কোনো ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস না রেখে।

—তুমি কি খোঁজ নিয়ে দেখেছিলে—হোটেলের ট্রাভল এজেন্টের মাধ্যমে সে কোনো প্লেনের বা ট্রেনের টিকিট খরিদ করেছিল কি না।

—সেটা তো এলিমেন্টারি স্যার। দেখেছি। না, হোটেলের মাধ্যমে সে কোনো টিকিট কাটেনি। কিন্তু চেক-আউট টাইমটা খুব কন্সপিকুয়াস। ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ছাড়ে দশটা পনেরয়।

সুজাতা প্রশ্ন করে, এটা যদি বিক্রমজিতের কাজ হয়, তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, মিসেস মালহোত্রার মাধ্যমেই সে জানতে পেরেছিল ও ফার্স্ট ক্লাস সি-কূপেতে বালাসোর যাচ্ছে। এবং একাই।

দস্তুর বলেন, কিন্তু আমি যে যাব না, এটা তো আমি কলিকে জানিয়েছিলাম একবারে শেষ মুহূর্তে। তখন কি চেষ্টা করলেও অন্য কেউ ফার্স্ট ক্লাস টিকিটের রিজার্ভেশান পাবে?

নিখিল বলে, আন্‌রিসার্ভড সেকেন্ড ক্লাসে গেলেই বা ক্ষতি কী? ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস তো ভেস্টিব্যুল ট্রেন। চলতি গাড়িতেও এ কামরা ও কামরা করা যায়। হয়তো সে খড়্গপুরে কামরা বদলে ফার্স্টক্লাস বগিটায় চলে আসে।

বাসু বললেন, আমার খট্‌কা লাগছে দু-একটা কারণে। প্রথম কথা : মোটিভটা যদি ধরে নিই সেই আট দশ লাখ টাকার গহনা, তাহলে বলব, এ জাতীয় রাহাজানি যারা করে তারা একটা বিশেষ শ্রেণীর লোক। কুমার বিক্রমজিৎ—সে যতই লম্পট হোক—সে ক্লাসে পড়ে না। তার পক্ষে চোরাই মাল পাচার করা অত্যন্ত কঠিন। খুন করা আরও!

নিখিল বলে, কিন্তু তার বিজনেস্‌টা যে কী জাতের, তা তো আমরা জানি না, স্যার? সে দু-তিন মাস অন্তর ওদিকে দুবাই, বেরুট, কুয়েৎ যায়, এদিকে রেঙ্গুন সিঙ্গাপুর হংকং। তার ব্যবসাটা হীরে-জহরতের স্মাগ্‌লিং হলে আমি অন্তত আশ্চর্য হব না।

—না, আমিও না, বললেন বাসু। তারপর যোগ করলেন, কিন্তু ও জাতের অ্যান্টিসোশাল যদি পরিকল্পিত মার্ডার করে—হঠাৎ করে বসা হোমিসাইড নয়—তাহলে অস্ত্রটা রিভলভার হওয়ার সম্ভাবনা নাইন্টি-ফাইভ পার্সেন্টি। ছোরা যদি মারণাস্ত্র হয়—অত কাছাকাছি থেকে, তাহলে চল্‌তি ট্রেনে আততায়ীকে রক্তের ধারাস্নানে হয়তো অবগাহন করতে হবে। তার ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা হয়ে যাবে নাইন্টি নাইন পারসেন্ট।

—মানলাম! কিন্তু মিসেস মালহোত্রা যে ছোরার আঘাতে প্রাণ দিয়েছেন এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। বুলেট উন্ড নয়। অস্ত্রটা অবশ্য পাওয়া যায়নি ; কিন্তু পোস্টমর্টাম না করেও যে ডাক্তারবাবু ওর ডেথ্-সার্টিফিকেট দিয়েছেন তিনি স্পষ্ট করে লিখেছেন মৃত্যুর হেতু : স্ট্যাব উন্ড!—ছোরার আঘাতে।

কেউ কোন কথা বলল না প্রায় বিশ সেকেন্ড। তারপর বাসুই বলেন, চুরি যাওয়া গহনাগুলোর লিস্ট তোমার কাছে আছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁর কম্পানিয়ান, সোমা দেবী লিস্ট মিলিয়ে সেগুলো বাক্সে তুলেছিল তাঁর কাছ থেকে সেটা আমি পেয়ে গেছি। অল দ্য আইটেমস্—তাদের ডেস্ক্রিপ্শান, হীরে চুনি পান্নার সংখ্যা আর ডিটেইল্স্। গহনা থেকে খুলে নিয়ে বিক্রি করতে গেলেও ধরা পড়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। চোরাবাজারের সমস্ত ঘাঁটিতে সেই লিস্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ মিস্টার রূপেশ মালহোত্রাকে অনারেব্‌ল্ এক্সেপসান হিসাবে ধরে নিলে হত্যার উদ্দেশ্য একটাই : জুয়েল থিফের কাজ। রেলের ছিঁচকে চোর চুরি করতে পারে ; কিন্তু খুন?—নেভার।

বাসু জানতে চান, তুমি কি আজই ভুবনেশ্বর রওনা দেবে?

—দেবে মানে? দিয়ে বসে আছি। যাবার পথে দস্তুর সাহেবের বাড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছি। ওঁরাও আজই দুপুরে যাচ্ছেন। বাই রোড। কিন্তু ওঁদের উদ্দেশ্য শেষ কাজ। পুরীতে। আমার ডেস্টিনেশন : ভুবনেশ্বর।

—প্রথমে কোথায় যাবে?

—খড়্গপুর। বালেশ্বরেও দাঁড়াব, তারপর একে একে ভদ্রক, যাজপুর রোড, কটক। ফাইনালি ভুবনেশ্বর। আমি বালাসোরে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বাকি পথটা ট্রেনে যেতে চাই। প্রতিটি স্টেশনেই আমাকে খোঁজ নিতে হবে। মিস্ হাজরা তাঁকে শেষবারের মতো জীবিত দেখেছেন বালাসোরে—বেলা পৌনে তিনটায়। আর মিস্টার পট্টনায়ক তাকে মৃতাবস্থায় দেখেন কটকে, সন্ধ্যা সওয়া ছয়টার। তার মানে হত্যাকাণ্ডটা অনিবার্যভাবে ঘটেছে—বালেশ্বর-কটকের মাঝখানে। রেললাইন অনুসারে ভৌগোলিক দূরত্ব 177 কিলোমিটার ; সময়ের ব্যবধান সাড়ে তিন ঘণ্টা। আগামীকাল রাত্রে অথবা পর্শু সকালে আমি কলকাতা ফিরব আর তৎক্ষণাৎ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

সাত

ফেরার পথে গাড়িতে সুজাতা প্রশ্ন করে, বিক্রমজিতের চিঠিখানার কথা আপনি জানলেন কী করে?

—জানতাম না তো। আন্দাজ করেছিলাম।

—সেটাই বা কী করে?

—হিউম্যান সাইকোলজি। হত্যাকাণ্ডের প্রাইম সাসপেক্ট রূপেশ মালহোত্রা। পুলিসও তাই ভাবছে। দস্তুরও। কলির সঙ্গে তার লিগ্যাল ডিভোর্স হয়নি। রূপেশ মৃত কমলকলির স্বামী। উইল মোতাবেক তার ওয়ারিশ। হত্যাপরাধে সে যদি সাজা না পায়, আর উইলের এক কপি যদি তার কাছে থেকে থাকে তাহলে কমলকলির যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি সে সহজেই দখল করবে। দস্তুর—উইথ অল হিজ হাফিং অ্যান্ড পাফিং কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু রূপেশকে

ফাঁসাবার জন্য আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। পুলিসই তা করছে এবং করবে। তাহলে দস্তুর তড়িঘড়ি আমাকে ডেকে পাঠালো কেন? তার কাছে এমন কিছু ক্লু নিশ্চয়ই আছে, যা সে পুলিসকে জানাতে পারছে না—স্ক্যান্ডালের ভয়ে। তাছাড়া তার অবচেতন মন চাইছে রূপেশই হত্যাকারীরূপে চিহ্নিত হক। একমাত্র তা হলেই সে তার কন্যাকে দান করা কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারবে। সেগুলো ওই লোফারটার মাধ্যমে রেসকোর্সে ঘোড়ার খুরে খুরে ধুলো হয়ে যাবে না। বিক্রমজিতের চিঠির কথা আমি জানতাম না। কিন্তু রূপেশ ছাড়া অন্য কোনো লোককে যে দস্তুর সন্দেহ করছে এটা নিশ্চিত। সেটার একটা জোরালো কারণ আছে—আর তার ক্লুটা যে দস্তুরের আস্তিনের তলায়, তা আশা করেছিলাম। দেখা গেল আমার অনুমান নির্ভুল। দস্তুর যে বলেছিল ওই গোলাপী চিঠিখানির আঘাত তার কন্যার মৃত্যুর সমতুল্য, তা সেটা বাগাড়ম্বর নয়। সে বিক্রমজিৎকে ও ব্যাপারে চিহ্নিত করেছে। তাকে মর্মান্তিক প্রত্যাঘাত করতে চায়—তাকে ফাঁসি দিয়ে। ওই ছোকরা যে তার বিবাহিতা কন্যার সঙ্গে প্রেম করছে এতে সে অপমানিত বোধ করেছে। বাট নট অ্যাট দ্য কস্ট অব অ্যাকুইটিং রূপেশ। এ জন্যই সে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। এই ভেবেই ওকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম।

এই সময় কৌশিক বলে ওঠে, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, মামু—

বাসু তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, সেটা বাড়ি গিয়ে। গাড়ি চালাতে চালাতে নয়। লুক অ্যাট দ্য রোড!

লাঞ্চ টেবিলে বাসু-সাহেব বলেন, হ্যাঁ, 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'! এবার বল কৌশিক কী ছিল তোমার প্রশ্নটা?

কৌশিক বলে, না, প্রশ্ন ঠিক নয়, আমি সমস্ত ব্যাপারটা একবার ঝালিয়ে নিতে চাইছিলাম। জানতে চাইছিলাম আপনার মতামত।

—ঝালিয়ে নেও।

আমার প্রথম যুক্তি, কমলকলি হত্যামামলার অপরাধী আমাদের চেনা-জানা লোকের বাইরে কেউ নয়। কারণ অজানা অচেনা কোন অ্যান্টিসোশালের পক্ষে জানা সম্ভবপর নয় যে, ওর কাছে ট্রেনের কামরায় আট দশ লাখ টাকার গহনা আছে। ফলে খুনিকে আমরা চিনি। যদিও তাকে চিহ্নিত করতে পারছি না। আপনি একমত?

—না। আদৌ নয়। হয়তো হত্যাকারী আমাদের অপরিচিত। একজন পেশাদারী মার্ডারার। তবে আমাদের পরিচিত কোন লোকই তাকে এ কাজে লাগিয়েছে।

—তা যদি হয়, তাহলে ওই সঙ্গে মেনে নিতে হবে যে, তাকে নিয়োগ করতে পারে একমাত্র একজন লোকই—রূপেশ মালহোত্রা। হয়তো প্রফেশনাল মার্ডারারের প্রাপ্য সে মিটিয়েছে সেই গহনা দিয়ে। তাকে ওগুলো নিয়ে সরে পড়ার সুযোগ দিয়ে। ডু য়ু এগ্রি?

—না। আদৌ নয়। রূপেশ ছাড়াও অন্য কেউ প্রফেশনাল মার্ডারার নিয়োগ করে থাকতে পারে।

—আর কার স্বার্থ থাকতে পারে? কমলকলির উইলের তো একজনই ওয়ারিশ?

—উইল কি একা কমলকলিই বানাতে পারে? আর কেউ বানায় না?

—আবার কে? বানালেও এ কেসে তার রেলিভেন্স কী?

বাসু এবার তাঁর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, তুমি ও-বেলা একটা প্রশ্ন করেছিলে, রানু। আমি বলেছিলাম জবাবটা আমি জানি না। এখন তার জবাবটা আমি জেনে গেছি। বলব?

রানু আর এক হাতা লাউ চিংড়ি উঠিয়ে নিয়ে বললেন, ও বেলার প্রশ্ন এ বেলা বাসি হয়ে গেছে। জবাবটা আমারও জানা।

বাসু-সাহেব—যাঁর চমক দেবার একচেটিয়া অধিকার—চমকে উঠে বলেন, কী প্রশ্ন? আর কী উত্তর বল তো?

ও বেলা আমি জানতে চেয়েছিলাম কমলকলি শৈশবে মাতৃহারা হবার পর দস্তুর আবার কেন বিয়ে করেনি। আর তুমি বলেছিলে যে, তুমি জান না। এবেলা ও প্রশ্নটা তামাদি হয়ে গেছে। কারণ আমি জানি : কেন।

বাসু রীতিমতো অবাক হয়ে বলে ওঠেন, ম্যাগনিফিক্! তা সে প্রশ্নের উত্তরটা তুমি কী করে জানলে তা বুঝে গেছি। সুজাতা নিশ্চয় সাতকাহন করে সকাল বেলাকার গল্প করেছে। কিন্তু কেমন করে বুঝলে যে, সেই প্রসঙ্গটাই আমি তুলছি?

রানু মিচকি হেসে বললেন, এলিমেন্টারি ওয়াটসন! তুমি দ্বিতীয় উইলের প্রসঙ্গ তুলতেই বোঝা গেল—এবার দস্তুরের উইলের কথা হচ্ছে। হয়তো পামেলা বুঝতে পেরেছে দস্তুরের দ্বিতীয়বার বিবাহের পথে একমাত্র কাঁটা ওই মেয়েটা—যে এখন দস্তুরের উইল মোতাবেক ওয়ারিশ। কারণ প্রসঙ্গটা উঠেছিল প্রফেশনাল মার্ডারার এনগেজ করা নিয়ে।

সুজাতা বললে, আমি মামিমার সঙ্গে একমত। প্রফেশনাল খুনি এনগেজ করা হয়েছে যদি প্রমাণিত হয় তবে তার পশ্চাৎপদে একজন নয়—দুজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি।

কৌশিক একটু অবাক হয়ে বলে, মিস পামেলা? আমার বিশ্বাস হয় না।

সুজাতা রুখে ওঠে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে না। আমরা একটা অ্যাকাডেমিক ডিস্‌কাশান করছি। সম্ভাব্য আততায়ী কে? সেক্ষেত্রে মিস্ পামেলা কাত্রোচ্চিকে সন্দেহ তালিকার বাইরে রাখা যায় না। সকালবেলা দেখলাম দস্তুর সাহেবকে সে বরাবর 'তুমি' বলে সম্বোধন করে গেল। দস্তুর ওর এম্‌প্লয়ার, ওর 'বস'। তাকে 'আপনি' বলে কথা বলাই শোভন ও স্বাভাবিক—বিশেষ তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে।

কৌশিক বলে, তার অন্য কারণ থাকতে পারে। উনি বিদেশী। ভালো বাঙলা জানেন না। হয়তো 'আপনি-তুমি' গুলিয়ে যায়!

—ঘোড়ার ডিম! মামুকে, তোমাকে আমাকে তিনি বরাবর 'আপনি' সম্বোধন করে গেলেন। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, কোট 'দস্তুর ওকে ডিভোর্স পিটিশন ফাইল করাতে রাজি করিয়েছিল। আমাদের অ্যাটর্নি তার কাজ শুরু করেও দিয়েছিলেন।,' আনকোট। আসলে কী জানেন, মামু, মেমসাহেবের 'চাঁপা কলি'রঙ দেখলেই এ দেশী ছেলেদের মাথা ঘুরে যায়।

বাসু বলে ওঠেন, নো নো নো। দিস্ ইজ নট দ্যা ভেনু ! দাম্পত্যালাপ লাঞ্চ টেবিলে নয়। শয়নকক্ষে।

কৌশিক ব্যাপারটা সামলে নিতে বলে, কিন্তু মামু, চাঁপারঙের মুর্শিদাবাদী শাড়ির কথাটা হঠাৎ আপনার মনে হল কেন? ও-কথা তো কেউ বলেনি।

ছুরি কাঁটা প্লেটে নামিয়ে দিয়ে বাসু চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। বলেন, সেটাই তো ট্র্যাজেডি মিস্টার 'সুকৌশলী'! য়ু সী, বাট য়ু ডোন্ট অবজার্ভ।

কৌশিক রুখে ওঠে,—কী দেখি, আর লক্ষ্য করি না? 'চাঁপা রঙের মুর্শিদাবাদী'র কথা কে কখন বলেছে? বলুন?

বাসু এবার পুডিঙের বৌলটা কাছে টেনে নিতে নিতে বলেন, ঠিক আছে বাপু, ঠিক আছে! ওটা না হয় তোমাদের মামুর একটা স্লিপ অব টাং হয়েছিল। তা এমন ভুল কি আর সবাই করে না? করেনি? হোম্‌স্? প্যয়রোঁ? ব্যোমকেশ অথবা তোমাদের ফেলুদা?

সুজাতা কৌশিক পরস্পরের দিকে তাকালো। হঠাৎ দুজনেই গম্ভীর হয়ে গেল। ওরা দুজনেই বুঝতে পারে 'চাঁপা-রঙের মুর্শিদাবাদী' শাড়িটার একটা প্রাসঙ্গিকতা আছে! কী সেটা? বাসু-মামু তো এমন ভুল করেন না!

রানু বলেন, চাঁপা রঙের মুর্শিদাবাদীর ব্যাপারটা কী?

বাসু বলেন, বাদ দাও ওসব ফালতু কথা। কিন্তু একটা ভুল হয়ে গেছে। নিখিলকে খোঁজ নিয়ে দেখতে বলা হয়নি—মিস্ পামেলা কাত্রোচ্চির আদি নিবাসটা কোথায়। ইতালি না সিসিলি?

সুজাতা জানতে চায়, কেন? তাতে কী সুরাহা হবে?

কৌশিক প্রত্যাঘাতের এই সুযোগটা ছাড়ে না। স্ত্রীকে বলে, সেটা জানতে হলে কিছু পড়াশুনা করা প্রয়োজন। মারিয়া পুজোর 'দ্য গডফাদার', 'দ্য লাস্ট ডন', 'দ্য সিসিলিয়ান', এবং সর্বশেষ রচনা : 'OMERTA' !

বাসু আবার বলে ওঠেন উঁহুহু। এখানে নয়—ওসব দাম্পত্যালাপ মশারি ফেলা জনান্তিকে প্লিজ!

রানু বলেন, সুজাতার কাছ থেকে গোটা কেসটা শুনেছি। এ কথা নিঃসন্দেহ যে রূপেশ মালহোত্রা হচ্ছে প্রাইম সাস্‌পেক্ট। এমন কি তার 'অ্যালেবাই' প্রতিষ্ঠিত হলেও ধরে নিতে হবে যে, সে 'প্রফেশনাল' 'মার্ডারার' নিয়োগ করেছিল। কারণ কমলকলির মৃত্যুতে সেই সবচেয়ে লাভবান হচ্ছে। কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি। দ্বিতীয়ত, পামেলা কাত্রোচ্চি। সিসিলিয়ান ঘরানার হলে ওর রক্তের মধ্যেই এটা আছে। তার মোটিভও স্পষ্ট বোঝা যায়। সে বুঝেছে কমলকলি জীবিত থাকতে দস্তুর ওকে বিয়ে করবে না। ওদের সোসাইটিতে এমন বিয়ে হামেহাল হয়। ফলে দস্তুর কেন তার সেক্রেটারিকে বিয়ে করছে না বোঝা কঠিন। তবে এটা নিশ্চিত যে, কমলকলি জীবিত থাকতে দস্তুর তার উইলটা পালটাবে না। থার্ডলি : কুমার বিক্রমজিৎ! তার ক্ষেত্রে আট দশ লাখ টাকার ওই গহনার পুঁটুলি ছাড়া লাভের অঙ্কে আর কিছু পড়ছে না! তবে কৌশিকের সঙ্গে আমি একমত। অর্থাৎ নিজে হাতে খুন যেই করে থাক : 'প্রাইম মুভার' আমাদের অপরিচিত কেউ নয়।

আট

ঠিক দুদিন পর ভোরবেলা এল নিখিলের টেলিফোন। বাসু-সাহেব তখনো প্রাতঃভ্রমণ থেকে ফিরে আসেননি। রানুই ফোনটা ধরলেন। নিখিল বলল, খড়্গপুর থেকে বলছি, মামিমা। আমি ঘণ্টা-তিনেকের মধ্যে কলকাতায় ফিরব। সরাসরি আপনাদের বাড়িতে যাব। স্যার যেন আমার জন্য বাড়িতেই অপেক্ষা করেন। অ্যারাউন্ড বেলা দশটায়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছি। সাম ভেরি ভাইটাল ক্লুজ।

রানু বলেন, বলব। দশটার সময় উনি বাড়িতেই থাকবেন। কিন্তু তুমি বাপু কাকলিকে একটা ফোন করে জানিয়ে দিও। সে বেচারিও ব্যস্ত হয়ে আছে।

নিখিল হেসে ফেলে। টেলিফোনেই বলে, ঠিক আছে, মামিমা। তাকেও জানিয়ে রাখব। আমি বাড়ি না ফিরে সরাসরি নিউ আলিপুরে গেলে সে রাগ করবে না।

নিখিল এসে পৌঁছলো ঠিক দশটা দশে। বেচারি মুখ খুলবার আগেই রানু জানতে চান, ব্রেকফাস্ট হয়েছে? না কি নাওয়া-খাওয়া ভুলে দৌড়াদৌড়ি করছ?

নিখিল বলে হ্যাঁ, কিছু খাব মামিমা। খিদে পেয়ে গেছে। সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি।

—তাহলে বাইরে গিয়ে তোমার ড্রাইভারকেও বলে এস। সে যেন দোকানপাটে না দৌড়ায়। সে বেচারির জলখাবারও বিশুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বাসু নিখিলকে আহ্বান করে বললেন, এস এস মিস্টার দাশ, অব খুনখারাপি বিভাগ।

নিখিল হাসতে হাসতে বলে, 'খুন-খারাপি বিভাগ'টা কি 'হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের বঙ্গিকরণ?

বাসু বলেন, কী জানি বাপু। ঠিক মতো বঙ্গিকরণ হল কি না তা ওই কাঁটা-সিরিজ লেখক এঞ্জিনিয়ার-সাহিত্যিক বলতে পারে। কিন্তু তোমার মুখচোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তোমার অনুসন্ধান কার্য অনেকটাই সাফল্য লাভ করেছে।

—তা বেশ কিছুটা সফলতা লাভ করা গেছে, স্যার। সে সব বলছি, কিন্তু তার আগে বলুন এ দুদিনে আপনার তরফে কিছু খবর জমেছে?

—জমেছে! এ দুদিনে হাফ-এ বট্‌ল শিভ্যাস্ রিগ্যাল খতম্ হয়েছে। বেশ কয়েক পাউচ তামাকও ধোঁয়া হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আমি তো ঘর ছেড়ে আদৌ বার হইনি। তবে চিন্তাভাবনা করেছি। একটা সলুশানের দিকে কিছু ইঙ্গিতও পেয়েছি।

ইতিমধ্যে বিশু একটা ট্রেতে খাবার আর এক পেয়ালা কফি এনে নামিয়ে দিয়েছে নিখিলের সামনে। কফির পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে নিখিল বললে, বেশ, তাহলে আমার সংগৃহীত তথ্যগুলিই শুনুন।

বাসু হাতটা তুলে ওকে থামতে বলেন, আরে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কফিটা শেষ কর। আমিই দেখি তোমার সংগৃহীত তথ্যগুলো গ্যেস করতে পারি কি না।

—আপনিই আন্দাজ করবেন? অল রাইট। করুন।

বাসু একটু চিন্তা করে বলেন, আমার মন বল্‌ছে—এক নম্বর, তুমি ওই মার্ডার ওয়েপানটা খুঁজে পেয়েছ। ছোরাটা। তাতে রক্তের দাগ কালো হয়ে গেছে। হোক কালো, তা কিন্তু হিউম্যান ব্লাড! অ্যাম আই রাইট?

কফির কাপটা নিখিল ধীরে ধীরে টেবিলে নামিয়ে রাখল। তার চোখে বিস্ময়। সে কিছু বলতে যেতেই বাসু বাধা দিয়ে বলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও নিখিল। আমার বলা শেষ হয়নি। তুমি সেটা আবিষ্কার করেছ ভদ্রকের পরে এবং যাজপুর কেওনঝড় রোডের আগে। রেল লাইনের ধারে। তাই না?

সম্মোহিতের মতো বাসুর দিকে তাকিয়ে নিখিল বললো, সাতাশ কিলোমিটার ফ্রম ভদ্রক স্টেশন, কিন্তু...

—আরে দাঁড়াও না বাপু। অত তাড়াহুড়ো কর কেন। বুড়ো মানুষটাকে একটু দম ফেলতে দেবে না? ভাল কথা, ভদ্রক স্টেশনে সেই ভেন্ডারটাকে খুঁজে পেয়েছ?

—কিসের ভেন্ডার?

—তা তো বলতে পারব না। চা-কফি, স্ন্যাকস্, মেঠাইওয়ালা অথবা বুক সেলার। সেই যে গো, সেই লোকটা—যে, মিসেস মালহোত্রাকে জানলার ধারে বসে থাকতে দেখেছিল। তাকে তার সওদা বিক্রি করে। তার দেখা পাওনি? তাজ্জব!

নিখিল যেন প্রতিধ্বনি করে, তাজ্জব! আপনি এখানে বসে তা কেমন করে জানলেন?

—ইন মাই য়ুজুয়াল ওয়ে! মস্তিষ্কের গ্রে-সেলগুলোর সাহায্যে। এবার বল, লোকটা কী বেচেছিল কমলকলিকে? চা, কফি, পাকৌড়া না পুরী তরকারি?

নিখিলের হতভম্ব ভাবটা তখনো কাটেনি। সে শুধু বলল, আজ্ঞে না, সে লোকটা ছিল ম্যাগাজিন-ভেন্ডার। মিসেস মালহোত্রা তার কাছ থেকে একটা 'ডেবনেয়ার' আর একটা 'স্টার ডাস্ট' ম্যাগাজিন কিনেছিলেন।...

—আর তার হাতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'তোড়ানি তুম্ রাখ্ দো'। অ্যাম আই করেক্ট?

নিখিল কোনো জবাব দিল না। বজ্রাহতের মতো বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে স্থাণুর মতো বসে থাকে।

—কী হল? নিখিল?

সম্বিত ফিরে পায় নিখিল। বলে, স্প্লেন্ডিড! আপনি কী করে জানলেন?

সুজাতা ঝুঁকে পড়ে নিখিলকে প্রশ্ন করে, কী নিখিলদা? ভেন্ডারটা আপনাকে তাই বলেছিল? মিসেস্ মালহোত্রা তাই বলেছিল ভেন্ডারটাকে? 'তোড়ানি তোম রাখ দো?'

একটিমাত্র শব্দে স্বীকার করল ইন্সপেক্টার নিখিল দাশ : ভার্বাটিম!

সপ্তরথী একসঙ্গে আক্রমণ করে বাসু-সাহেবকে, বলুন? কেমন করে এখানে বসে এই ম্যাজিক দেখালেন?

বাসু মুচকি হেসে কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, এসব তো এলিমেন্টারি, না কি বল ভাগ্নে? চাঁপা রঙের মুর্শিদাবাদী শাড়ি পরা একটি ভদ্রমহিলা এছাড়া আর কী বলতে পারেন?

ওরা কেউ কিছু বলতে পারে না।

রানু হাসতে হাসতে বলেন, নিখিল তোমার কফিটা একেবারে জুড়িয়ে যাচ্ছে যে?

নিখিল এদিকে ফিরে বলে, কী করব মামিমা? একপেট ঘোল খাবার পর কফি কি খাওয়া যায়?

বাসু প্রশ্ন করেন, পোস্ট-মর্টাম রিপোর্ট কি পাওয়া গেছে? ডাক্তার কি বলতে পারছেন খুনটা কখন হয়েছে?

নিখিল বলে, বল্‌ব না! কেন? সেটাও আপনি মন্ত্রবলে জানতে পারেননি?

—একেবারে যে কোন আন্দাজ করতে পারিনি তা নয়! পোস্ট-মর্টাম রিপোর্ট অনুযায়ী মৃত্যুর সময় বেলা চারটে থেকে ছয়টা। মানে সায়েন্টিফিকালি তাই হবার কথা। সেফসাইডে থাকবার জন্য অটোপ্সিসার্জেন হয়তো চারটের বদলে বলেছেন তিনটে থেকে ছয়টা! মিলল সময়টা?

নিখিল জবাব দিল না। নিঃশব্দে খাবারের প্লেটটা টেনে নিয়ে আহারে মন দিল। সুজাতা তাগাদা দেয়, কী হল নিখিলদা? পোস্ট-মর্টাম রিপোর্ট অনুযায়ী সময়টা তাই?

নিখিল অমলেট চিবাতে চিবাতে বললে, স্যার শুধু ঘোল খাইয়েই আমাকে রেহাই দিলেন না। মাথায় গাধার টুপিটাও পরিয়ে ছাড়লেন। আশ্চর্য! কী করে হয়?

কৌশিক শুধু বললে, কী? ফোর টু সিক্স? না থ্রি টু সিক্স?

তার দিকে তাকিয়ে নিখিল বল্‌লে, বেলা সাড়ে তিনটে থেকে ছয়টা! মির‍্যাকুলাস্!

কৌশিক এদিকে ফিরে কী বলতে গেল। শুধু 'মামু' বলামাত্রই তিনি বলে ওঠেন, কী আশ্চর্য! এতে অবাক হবার কী আছে? ভদ্রক স্টেশনে কমলকলি জীবিতা ছিল। কারণ স্টেশন-

ভেন্ডার তাকে দেখেছে। রেলের খতিয়ান অনুযায়ী ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস তখনো অন-ডট চলেছে। তাহলে বেলা চারটে দশ পর্যন্ত কমলকলি জীবিত ছিল! কেমন? এটা ফ্যাক্ট! প্রুভড? এদিকে জগদ্বন্ধু পট্টনায়ক যখন 'সি'-টাইপ কম্পার্টমেন্টে কুলি নিয়ে ঢোকে তখনো ট্রেন রাইট টাইম। তখন সন্ধ্যা ছয়টা সতের আঠারো। কারণ ছ'টা পনেরয় ট্রেনটা ইন করেছে। তার আগেই কমলকলি মারা গেছে। এই গ্লেয়ারিং এভিডেন্স হাতে থাকাতে পোস্ট মর্টাম রিপোর্টে তোমরা কী আশা করেছিলে? ডাক্তার বলবে—সকাল দশটা থেকে রাত আটটা?

নিখিল বলে, না স্যার। আপনার যুক্তিটা দাঁড়াচ্ছে না। যে ডাক্তার পোর্স্ট মর্টেম করেছেন তিনি আদৌ জানেন না, যে, ভদ্রক স্টেশনে একজন ভেন্ডার মিসেস্ মালহোত্রাকে জীবিত অবস্থায় দেখেছে। সেটা আপনি-আমি জানি। তিনি জানেন না।

বাসু বলেন, বটেই তো! ডাক্তারবাবু শবব্যবচ্ছেদ করে তা বিজ্ঞানসম্মত পথেই 'সত্যে'র কাছাকাছি এসে পৌঁছবেন। তাই তিনি এসেছেন। আমরা জানি, মৃত্যুর সময় চারটে দশ থেকে ছয়টা-সতেরর ভিতর—ফ্রম আদার এভিডেন্স। ডাক্তারবাবু একই সত্যে উপনীত হয়েছেন নিহত মহিলার দেহ ব্যবচ্ছেদ করে ডাক্তারী বিজ্ঞানে।

নিখিল এ তথ্যটা মেনে নিল। সে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। ছোরাটা ঠিক কোথায় পাওয়া গেল অথবা ভেন্ডারের সঙ্গে কমলকলির কথোপকথনের বিষয়ে সে আর ফিরে গেল না। বললে, বেশ বোঝা যাচ্ছে খুনটা হয়েছে ট্রেনটা ভদ্রক ছাড়ার ঠিক পরেই। শুধু পোস্ট-মর্টাম রিপোর্ট নয়, মার্ডার ওয়েপনটার অবস্থানও সে কথা এস্ট্যাবলিশ্ করছে! অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট চান্স, লোকটা নেমে যায় যাজপুর-কেওনঝড় স্টেশনে—বিকাল চারটে পঞ্চান্নে। আমরা সে স্টেশনেও খোঁজ করেছি। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেনি। কী বলবে? লোকটা নিশ্চয় রক্তমাখা অবস্থায় ট্রেন থেকে নামেনি। হয়তো তার গায়ে একটা আলোয়ান জড়ানো ছিল—রক্তের দাগ যদি তাতে লেগে থাকে তবে তা ঝোলার ভিতর নিয়ে সে টুক করে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছে।

কৌশিক বলে, তার মানে লোকটা যাজপুর-কেওনঝড় রোড থেকে ডাউন ট্রেন ধরে ফিরে আসে?

—যদি অ্যাট অল কলকাতায় ফিরতে চায়। চাক বা না চাক বর্তমানে যে ভারতবর্ষের প্রায় একশ কোটি লোকের মধ্যে এখন অচিহ্নিত একজন!

তারপর একটা নোটবই দেখে দেখে বলে, লোকটা যখন যাজপুর নামে সেই সময় ডাউন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল বৈদ্যনাথধাম এক্সপ্রেস। পুরী থেকে পাটনা যাচ্ছিল, খড়্গপুর হয়ে। সম্ভবত সে তাতেই চড়ে বসে—তাড়াতাড়ি যাজপুর স্টেশন ত্যাগ করার প্রেরণায়। মৃতদেহটা তো যে-কোন মুহূর্তে আবিষ্কৃত হতে পারে। তারপর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দু-দুটো লোকাল ডাউন ট্রেন পাস করে। সন্ধ্যা সাতটার কাছাকাছি এসে পড়ে তিরুপতি-হাওড়া এক্সপ্রেস। অবশ্য ইস্ট-কোস্ট যাজপুর স্টেশন ছেড়ে চলে যাবার পর লোকটার আর কোনো তাড়াহুড়া ছিল না।

সুজাতা বলে, কেন থাকবে না? সে তো শুধু একটা রক্তমাখা চাদরই লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল না, তার কাছে ছিল দশ লাখ টাকার অর্নামেন্টস্।

নিখিল বলে, তা বটে!

নয়

দুপুরবেলা মধ্যাহ্ন আহারের আসরে এল একটা টেলিফোন। বিশে শুনে নিয়ে কর্ডলেস ফোনটা বাড়িয়ে ধরল বাসু-সাহেবের দিকে বললে, আপনের। ধরেন। নাম বুলছে না।

বাসু-সাহেব ছুরি ফর্ক প্লেটে নামিয়ে রেখে 'নিস্তার' টেলিফোনটা নিয়ে তার 'কথামুখে' শুধু বললেন, বাসু—?

ও-প্রান্তবাসী বলে, আপনার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছি, স্যার, খুব জরুরি ব্যাপারে। আপনার চেম্বারে গিয়েই বলব। কখন আপনার সময় হবে বলুন?

—আপনার নাম? পরিচয়?

—সেটা সাক্ষাতেই বলব, স্যার। টেলিফোনে নয়।

—কেন? সেই যাঁরা ছুঁলে ছত্রিশ ঘা হয়, তেনারা কি আপনাকে খুঁজছেন?

—ঠিক তা নয়। তবে প্রায় সেই রকমই। একটা দুর্ঘটনায় মৃত...

—দুর্ঘটনায়! আর য়ু শ্যিওর? রেলওয়ে অ্যাকসিডেন্ট?

—ঠিক তাও নয়। তবে ঘটনাটা রেলগাড়ির কামরার ভিতরেই—

—বুঝেছি। সেই যাকে বলে—'রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা, ভাবিনি সম্ভব হবে কোনদিন...'

—আজ্ঞে?

—শুনুন মিস্টার মালহোত্রা, আপনি যদি আমাকে লিগ্যাল কাউন্সেলার হিসেবে রিটেইন করতে চান, তাহলে প্লিজ ডোন্ট কাম! আয়াম অলরেডি বুকড ফর দ্যা কেস।

—আই নো দ্যাট, স্যার। তা জেনেই আপনার সাক্ষাত চাইছি।

—এখন একটা কুড়ি। আপনি তিনটেয় আসতে পারবেন?

—পারব স্যার। আপনি দুপুরে...মানে, বিশ্রাম করেন না?

—করি। আপনারা অনুমতি দিলে। সো কাম অ্যাট থ্রি—লাইনটা কেটে দিলেন।

রানু বলেন, রূপেশ মালহোত্রা? সে আবার কী চায়?

—সম্ভবত মোলাসেস্! আখের গুড়!

—আখের গুড়! তার মানে?

—'আখের' গুছিয়ে নিতে যা প্রদেয়। 'মধ্বাভাবে'! চাইছিল আমাকে রিটেইন করতে। যখন শুনল যে সে—'মোল্যাসেস্-এ স্যান্ড' তখন চাইছে প্রমাণ করতে ভাজা মাছের সে একটা পিঠই চেনে—ও পিঠটা ওর অচেনা!

কৌশিক বলে, সল্টলেক থেকে বলছিল। তাই না?

—কী জানি। জিজ্ঞেস করিনি। পুরীতে সৎকার করেছে পথের কাঁটাটাকে। সম্ভবত এখন প্রথামত পুলিসের গ্রেপ্তার এড়াতে চায়। দ্বিতীয়ত ধর্মপত্নীর উইলের প্রবেট।

রানু বলেন, ওভাবে বলছ কেন? হয়তো রূপেশ সম্পূর্ণ নির্দোষ।

বাসু বলেন, হতে পারে। কিন্তু ও যেভাবে টেলিফোনে আমাকে বোঝাতে চাইছিল যে এটা অ্যাকসিডেন্ট ...

—তা নয়। টেলিফোনে হয়তো ও 'মার্ডার' শব্দটা ব্যবহার করতে চাইছিল না।

বাসু বললেন, তাও হতে পারে। তাই সে আমাকে 'ডায়াল এম' করছিল।

ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় তিনটের সময় এল রূপেশ মালহোত্রা। বয়স চল্লিশের সামান্য কম বলেই মনে হয়। দীর্ঘ একহারা চেহারা মাথায় ব্যাকব্রাশ চুল। এখনো পাকতে শুরু করেনি। গোঁফ-দাড়ি কামানো। পরনে সাফারি স্যুট।

বিশে তাঁকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালো। বাসু ভিতরের দরজা দিয়ে চেম্বারে এসে বসলেন। তাঁর নির্দেশে বিশে ওঁকে এঘরে নিয়ে এল। বাসু বললেন, প্লিজ সিট ডাউন। বলুন এবার কী বলতে এসেছেন?

—আপনি আমাকে 'তুমিই' বলবেন, স্যার!

—অলরাইট। বল রূপেশ, কী বলতে চাও!

—আমি আজ জগন্নাথ এক্সপ্রেসে ফিরে এসেছি। এসেই শুনলাম, আপনাকে মিস্টার দস্তুর এনগেজ করে ফেলেছেন, না হলে...

—আই নো, আই নো! কিন্তু তোমাকে কি পুলিসে সন্দেহ করছে? এমন আশঙ্কা করার পিছনে কোনও যুক্তি আছে?

—আপনি তা ভালভাবেই জানেন, স্যার। কমলকলির মৃত্যুতে আনফরচুনেটলি আমিই সবচেয়ে লাভবান হচ্ছি...

বাসু ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'অ্যাডভার্ব'টা বেজায়গায় বসল না?

—আজ্ঞে?

—তুমি বোধহয় বলতে চাইছ, 'কমলকলির আনফর্চুনেট মৃত্যুতে তুমিই সবচেয়ে লাভবান হচ্ছ'—তাই না?

—দুটোই সত্যি, স্যার! তাই পুলিশের চোখে আমি প্রাইম সাসপেক্ট। এ হত্যারহস্যে ডিফেন্স কাউন্সেল হিসাবে আমার প্রয়োজনটাই ছিল সবচেয়ে বেশি।

বাসু আবার হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, আর য়ু শিওর? তোমার শ্বশুরের একান্ত সচিব পামেলা কাত্রোচ্চির নয়?

রূপেশ মুখ তুলে ওঁর চোখে চোখে তাকালো। পাঁচ সাত সেকেন্ড দেরি হল জবাবটা দিতে। তারপর অস্ফুটে বলল, আই ডোন্ট নো, স্যার।

—বাট য়ু ক্যান ভেরি ওয়েল গ্যেস্! কান্ট য়ু?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমিও ভেবে দেখেছি। জে. ডি. সাহেব এবার হয়তো তাঁর মতটা বদলাবেন। হয়তো এখনই নয়, আঘাতটা সামলে ওঠার পর।

—'মত' আর 'পথ'টা বদল নাও করতে পারেন ; কিন্তু উইলটা তাঁকে পালটাতেই হবে। নতুন ওয়ারিশ তাঁকে খুঁজে দেখতে হবে। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে কেন? তুমি তো জানই, এ-'কেস'-এ তোমাকে ক্লায়েন্ট হিসেবে মেনে নিতে পারব না।

রূপেশ মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর মুখ তুলে বললে, উড য়ু মাইন্ড, স্যার, ইফ আই স্মোক?

—সার্টেনলি নট! ফীল কাম্‌ফার্টেবল!

রূপেশ পকেট থেকে ইন্ডিয়াকিং সিগ্রেটের কার্টন বার করে একটা ধরালো তার লাইটারে। বললে, আপনি আমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না—আমি রেস খেলে বহু টাকা

উড়িয়েছি, স্ত্রীর সঙ্গে আমার বনিবনাও হয়নি, আমরা 'সেপারেশনে' ছিলাম, এসব প্রাথমিক তথ্যগুলি ছাড়া আপনি আর কিছুই বিশেষ জানেন না। আমি কিন্তু আপনার সম্বন্ধে 'থরলি' ওয়াকিবহাল। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, মক্কেলকে বাঁচাতে আপনি কায়দা করে কোনও নিরপরাধীকে ফাঁসির দড়ির দিকে ঠেলে দেবেন না। সেটা আপনার স্বভাববিরুদ্ধ কাজ হবে। তাই আমি চাই : আপনি 'কেস'টা সল্‌ভ্ করুন। আমি জানতে চাই—কে আমার স্ত্রীকে ট্রেনের কামরায় খুন করেছে। আমি জানতে চাই : কে আমার স্ত্রীকে প্রেমপত্র লিখে প্রলুব্ধ করত...

বাসু কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে বলেন, তার মানে? কমলকলিকে যে একজন প্রেমপত্র লিখত এ তথ্যটা তুমি আন্দাজ করলে কী করে?

—আন্দাজ নয়, স্যার। কংক্রিট প্রমাণ! ডকুমেন্টারি প্রুফ। সেগুলিই আপনার কাছে জমা দিতে এসেছি।

—অলরাইট। প্রসীড। কিন্তু সবার আগে বল, ঘটনার দিন—ওই ঊনত্রিশ তারিখ দুপুরে তুমি নিজে কোথায় ছিলে?

রূপেশ তৎক্ষণাৎ বলল, এ প্রশ্নটা কি প্রাসঙ্গিক, স্যার? অ্যাট-অল রেলিভেন্ট?

—নয়? হত্যামুহূর্তে তুমি কোথায় ছিলে এটা তো একটা মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সেটাই তোমার 'অ্যালেবাই'।

—না, স্যার। সেটা পুলিসের মতে। আপনার তদন্ত অনুসারে নয়।

—কেন নয়?

—আপনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান! আপনি ভালভাবেই জানেন : রূপেশ মালহোত্রা যদি মূল আসামী হয়, তবে সে নিজে হাতে খুনটা করবে না। কারণ রূপেশ মালহোত্রার কাছে আট দশ লাখটাকার গহনা কিছুই নয়। তার স্থির লক্ষ্য : কমলকলির উইলবর্ণিত শেষপৃষ্ঠার : 'শিডিউল অব প্রপার্টিজ'! যার মূল্যমান কয়েক কোটি টাকা। ফলে, রূপেশ মালহোত্রা যদি এ অপরাধের শীর্ষবিন্দুতে থাকে তবে সে প্রফেশনাল মার্ডারার নিয়োগ করবে। হত্যা মুহূর্তে থাকবে হত্যাস্থল থেকে বহু বহু দূরে। পাক্কা 'অ্যালেবাই' থাকবে তার। তাই নয়, স্যার?

বাসু বললেন, এ তো তোমার অ্যানালিসিস্। আমার প্রশ্নের জবাব তো দিলে না! ঊনত্রিশ দুপুরে তুমি বাস্তবে ছিলে কোথায়?

রূপেশ কিছুক্ষণ নীরব রইল। মাথা নিচু করে। তারপর হঠাৎ বাসু-সাহেবের চোখে চোখে তাকিয়ে বলল, এ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা কি আপনার উচিত হচ্ছে, স্যার?

বাসু বললেন, অলরাইট বল না তাহলে।

—ভেবে দেখুন, স্যার। আমি আপনার মক্কেল নই। আমি যা বলছি, যা বলব, তা কোনও 'প্রিভিলেজড কম্যুনিকেশন' নয়। মামলা আদালতে উঠলে আপনাকে প্রসিকিউশনের প্রশ্নের জবাবে বলতে হবে, আমি কী কী বলেছি। হত্যামুহূর্তে আমি কোথায় ছিলাম সে কথাও। আমি জানি, পুলিশ ইতিমধ্যে আমার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছে। তারা জানে, ঘটনার দিন ভোরবেলা আমি বাড়ি থেকে চলে যাই। ফিরে আসি রাত এগারোটায়। পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করছে জানতে আমি ওই দুপুরে কোথায় ছিলাম। আমার কোনও পাক্কা 'অ্যালেবাই' আছে কি না। তাই নয়?

—অলরাইট! বোল না সে কথা। ঠিকই বলেছ তুমি। যেসব কথা তুমি এখন বলছ তা কোনো 'প্রিভিলেজড কম্যুনিকেশন' নয়। প্রয়োজনে তা আমাকে বলতে হবে পুলিসকে। সুতরাং ও প্রসঙ্গ থাক।

—না, স্যার! থাকবে না। সব জেনেবুঝেও আমি তা আপনাকে জানাব। আমি বিশ্বাস করব : আপনি তথ্যগুলি অযাচিতভাবে পুলিশকে জানাবেন না। প্রসিকিউশন যদি আপনাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তোলে তখন আপনি বলতে বাধ্য হবেন। সেটা জানি। তবু আমি বলব, ওই দিন ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত আমি কোথায় ছিলাম।

বাসু এবার নিজে থেকেই বাধা দিয়ে বলেন, থাক না? কী দরকার?

—দরকার আছে, স্যার! সবগুলো অ্যাভেইলেব্‌ল্ ডাটা আপনার হাতে পৌঁছানো দরকার। যাতে পর্যায়ক্রমে আপনি এ বিচিত্র সমস্যার সঠিক সমাধানে পৌঁছতে পারেন। আমি ঘটনার দিন ভোরবেলা বাড়ি থেকে বার হয়ে যাই। বেলা নয়টা পর্যন্ত কোথায় ছিলাম, কী করেছিলাম, তা আমি এখন বলছি না। তারপর আমি হাওড়া স্টেশনে চলে যাই, শুধুমাত্র একটা স্যুটকেশ নিয়ে। ফর য়োর ইনফরমেশন, স্যার আমি ওই ইস্ট কোর্স এক্সপ্রেস ট্রেনটা ধরে বালাসোর চলে যাই। আনরিসার্ভড সেকেন্ড ক্লাসে। আমি ওই ট্রেনেই ছিলাম।

রূপেশ যেন এক নিশ্বাসে কথাকটা বলে ফেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। চুপ করে গেল একেবারে।

বাসু অবাক হলেন কি না, বোঝা গেল না। শান্তস্বরে প্রশ্ন করলেন, কেন রূপেশ? ওই ট্রেনে তুমি বালাসোর গেলে কেন?

রূপেশ বলে, আমারও নিমন্ত্রণ ছিল সেই ম্যারেজ-অ্যানিভার্সারিতে। প্রকাশ দস্তুর—মানে যার ম্যারেজ-অ্যানিভার্সারি ছিল—সে আমাকে পৃথকভাবে আমন্ত্রণ করেছিল। সামাজিক দৃষ্টিতে কমলকলির স্বামী আমি। প্রকাশ জানে যে, আমাদের সেপারেশন চলছে। কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও হয়েছিল আমাদের বিয়ের পরে। ফলে, সে আমাকেও সল্টলেকের ঠিকানায় নিমন্ত্রণপত্র পাঠায়। সম্ভবত সে আন্তরিকভাবে চাইছিল যাতে আমাদের দুজনের মনোমালিন্যের অবসান হয়। কলি বা জে.ডি জানতেন না আমার নিমন্ত্রিত হবার কথা। গত মাস-ছয়েক আমি লাউডন স্ট্রিটে দস্তুর প্যালেসে যাইনি। ভেবেছিলাম, বালাসোরে কলিকে কয়েকটা কথা বলব। সে জন্যই ওই সুযোগটা নিই। আমার ধারণা ছিল, ওঁরা দুজন ফার্স্ট ক্লাস 'কূপে'তে যাচ্ছেন। তাই ভেবেছিলাম, বালেশ্বর স্টেশনে ওঁদের মীট করব। ট্রেনটা যখন বালাসোর স্টেশনে 'ঈন' করল তখন আমার কামরাটা পড়েছিল ঠিক এক্সিট ডোরের সামনে। আমি চট করে নেমে প্রস্থান পথের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। দেখতে পাই, প্রকাশ নিজেই এসেছে ওঁদের রিসিভ করতে। সে ছোটাছুটি করছে প্ল্যাটফর্মে। ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টগুলোয় সে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করল। জে. ডি বা কমলকলির দেখা পেল না। ট্রেনটা ছেড়ে দিল। প্রকাশ হতাশ হয়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমি সবটাই দেখলাম। আত্মপ্রকাশ করলাম না।

বাসু জানতে চাইলেন, কেন?

—বেশ বুঝতে পারলাম, যেকোন কারণেই হোক ওঁরা এ ট্রেনে আসেননি। আমি কলকাতায় ফিরে আসতে চাইলাম। ইনফ্যাক্ট, পরের একটা প্যাসেঞ্জার ধরে আমি খড়গপুরে চলে আসি। সেখান থেকে এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে কলকাতায়। হাওড়া থেকে আমি দস্তুর প্যালেসে ফোন করেছিলাম। ফোন ধরেছিল কোনও একজন বেয়ারা। সে জানালো, জে. ডি. বাড়িতে নেই আর কলি বালাসোরে চলে গেছে। ওই সকালের ট্রেনেই। আমি তাকে নিজের পরিচয় দিইনি।

—বুঝলাম। কিন্তু প্রকাশের কাছে কেন তুমি আত্মপ্রকাশ করলে না?

—সহজবোধ্য হেতুতে। দেখতে পেলে সে আমাকে ওদের বাড়িতে জোর করে ধরে নিয়ে যেত। যেটা আমি অ্যাভয়েড করতে চাইছিলাম। কলির সঙ্গে দেখা করতেই আমি বালাসোরে গিয়েছিলাম। পার্টিতে যোগ দিতে নয়।

বাসু জানতে চান, তুমি কি তার আগেই জানতে যে, কমলকলিকে কেউ প্রেমপত্র লেখে বা তার সঙ্গে কারও একটা অবৈধ প্রণয়ের পর্যায় চলছিল?

—না, স্যার। সে কথা তখন আমি জানতাম না।

—তাহলে কখন জানলে এবং কেমন করে জানলে?

রূপেশ ব্যাখ্যা দেয়। কমলকলির মৃত্যু সংবাদ সে তার মোবাইল ফোনেই পেয়েছিল। পরদিন সে গাড়ি নিয়ে ভুবনেশ্বরে চলে যায়। যাবার আগে জে.ডি. কে একটা ফোন করে। তাঁকে ফোনে ধরতে পারে না। তিনি বাড়ি ছিলেন না। তবে পামেলার সঙ্গে তার ফোনে কথা হয়। জানতে পারে যে, মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা ও বাড়িতে সকলেই জানে। রূপেশ পামেলাকে জানায় যে, সে গাড়ি নিয়ে ভুবনেশ্বরে চলে যাচ্ছে দেহটা শনাক্ত করতে। সংবাদটা যেন জে. ডি. কে জানানো হয়।

রূপেশ বলে, আপনাকে স্যার আমি দুটি তথ্য দেব। যে কথা আপনাকে মিস্টার নিখিল দাশ জানাতে পারেননি। ইন ফ্যাক্ট, তা তিনি নিজেও জানেন না। আপনিও না। আমি আপনার মক্কেল নই। তবু এ দুটি তথ্য আপনাকে সরবরাহ করছি গোপনে। আমি চাই না, আপনি অপ্রয়োজনে তা জে. ডি. বা পুলিসকে জানান।

—কী তথ্য?

—আপনি সেটা গোপন রাখবেন তো? প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন?

বাসু বললেন, লুক হিয়ার ইয়াংম্যান! এটা একটা মার্ডার কেস। কোনো এভিডেন্স—যা সমাধানের পথের ইঙ্গিত দিচ্ছে—তা আমি জেনে গোপন রাখতে পারি না। অ্যাজ অ্যান অফিসার অব দ্য হাইকোর্ট! তুমি আমাকে ওসব কথা তাহলে বোল না।

—না, স্যার! আমি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। আমি যে তথ্যগুলি দিচ্ছি তা জে. ডি. জানেন না। ক্যালকাটা পুলিসের নিখিল দাশও জানেন না। কিন্তু উড়িষ্যা পুলিস জানে। ইন ফ্যাক্ট, আমি তা জেনেছি এস. আর. পি. ভুবনেশ্বরের কাছে থেকে।

—য়ু মিন সুপারিন্টেডেন্ট অব রেলওয়ে পুলিস, ভুবনেশ্বর?

—ইয়েস স্যার! তিনিই আমার মোবাইল ফোনে আমাকে দুঃসংবাদটা জানান। তাঁর উপস্থিতিতেই আমি মর্গে গিয়ে মৃতদেহ শনাক্ত করি। তাঁর কাছ থেকে এ দুটি গোপন তথ্য আমি জেনেছি। প্রয়োজনে আপনি তাঁকে এস. টি. ডি করে জেনে নিতে পারেন আমি সত্যকথা বলছি কি না।

—তিনি জানেন, অথচ নিখিল দাশ জানে না? হাউ কাম?

—আমিই তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম তথ্য দুটি মৃতামহিলার স্বার্থে গোপন রাখতে। আমি তাঁকে বলেছিলাম, ক্যালকাটা পুলিস চলে পার্টির নির্দেশে। আর পার্টি চলে বিজনেস্ ম্যাগনেটদের নির্দেশে। ফলে, তথ্য দুটি গোপন থাকবে না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে যাবেই। তাতে লাভ হবে না কারও। শুধু শুধু একটি মৃতা মহিলার কেচ্ছাকাহিনীতে খবরের কাগজ মজা লুটবে। দুর্ভাগিনীর শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার আগেই এই মুখরোচক কেচ্ছাটা মুখে মুখে ফিরবে।

বাসু জানতে চান, এস. আর. পি, ভুবনেশ্বর রাজি হলেন?

—হলেন। বললেন, মৃতা মহিলাটি বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হয়েছে উড়িষ্যায়। এক্ষেত্রে কেসটা উড়িষ্যা হাইকোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত। তিনি তাঁর রিপোর্টে তথ্য দুটি গোপন রাখবেন না ; কিন্তু আমার অনুরোধে ক্যালকাটা পুলিসকেও অযাচিত জানাবেন না।

—আই সি। তথ্য দুটি কী?

—কলির হ্যান্ডব্যাগে একটা ছোট্ট নোট বই ছিল। টেলিফোন নম্বরের রেডি-রেকয়নার। তাতেই আমার মোবাইল নম্বরটা এস. আর. পি. খুঁজে পান ও আমাকে ফোন করেন। উনি আমাকে সেটি দেখান। আমি সেটা পকেটে পোরার উপক্রম করতেই ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলেন, "নো, নো, স্যার! ওটা এভিডেন্স! আপনাকে দেখতে দিয়েছিলাম শুধু। প্রত্যর্পণ করছি না।" তখন আমি বললাম, "এই খাতায় আমার স্ত্রীর অনেক বান্ধবীর নাম-ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার আছে। যা আমার জানা নেই। অথচ কলির শ্রাদ্ধে তাঁদের নিমন্ত্রণ করতে হবে। আমি কি নাম ঠিকানাগুলি টুকে নিতে পারি?" উনি তাতে আপত্তি করলেন না। আমি গোটা পঞ্চাশ নামের তালিকা বানিয়ে ফেললাম। নোট বইটা ফেরত দিলাম। এই নিন স্যার, সেই লিস্টের একটা জেরক্স কপি।

বাসু তালিকাটি হাত বাড়িয়ে নিলেন। টেবিলের উপর কাগজচাপার তলায় রাখলেন। বললেন, দ্বিতীয়টা?

রূপেশ সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, ওই লিস্টের প্রথম পাতাতেই একটি মুসলমানের নাম দেখতে পাচ্ছেন : 'আলী'? লোকটাকে আমি চিনি না। তবে সেটা কিছু অবাক করা খবর নয়। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবীকেও কলি চিনতো না। কিন্তু আপনি লক্ষ্য করে দেখুন, স্যার ওই এন্ট্রিটি বেশ কিছু মিস্টিরিয়াস্! তাই নয়?

বাসু জবাব দিলেন না। কাগজটা তুলে নজর করলেন। প্রথম দিকেই 'A'-এন্ট্রিতে লেখা আছে "Ali 0119734270"।

—কী মনে হয় স্যার? 'আলী' নামের কোনো ভদ্রলোকের মোবাইল নম্বর?

—হতে পারে। অথবা নিউ দিল্লির কোনো টেলিফোন নম্বরও হতে পারে, কারণ দিল্লির জোনাল কোড নম্বর '011'—হয়তো বাকি সাতটা নম্বর আলীসাহেবের টেলিফোনের।

রূপেশ বলল, আমারও তাই আন্দাজ হয়েছিল। তাই আজ খুব সকালেই ওই নম্বরে একটা এস. টি. ডি করেছিলাম। জবাব পেলাম : এ নম্বরটায় কেউ থাকে না। দ্য নম্বর ডাজ'ন্ট এগ্‌জিস্ট!

বাসু বলেন, বুঝলাম। কিন্তু এতে মিস্ট্রির কী দেখলে? হয়তো অনেক পুরানো নম্বর। আলী এ নম্বর ছেড়ে দিয়ে গেছে!

—না, স্যার। 'আলী' নয়। লোকটা মুসলমানই নয়। হিন্দু। ওর ছদ্মনাম 'অলি'।

—কী করে জানলে?

রূপেশ নিঃশব্দে তার পকেট থেকে বার করে দিল একটা খাম। ইতিপূর্বে দৃষ্ট একই হস্তাক্ষরে লেখা ছোট্ট চিঠি :

কলি, আমার কলি,

প্লীজ, বালাসোরে তুমি যেও না। একেবারে শেষমুহূর্তে হঠাৎ (ভগবান না করুন) তোমার স্টম্যাক আপসেট তো হতেই পারে। পারে না? জে. ডি. তখন একাই যেতে বাধ্য হবেন। তিনি রওনা হয়ে গেলেই আমাকে হোটেলে ফোন কর। বাদবাকি আমার দায়িত্ব।...সকাল থেকে তোমাকে দুবার ফোন করি। প্রথমবার ধরেন জে. ডি স্বয়ং।

তৎক্ষণাৎ লাইন কেটে দিই। দ্বিতীয়বার টেলিফোন ধরে তোমার সেই ভেটকিমুখো কম্পানিয়ান—কী যেন নাম, ভুলে গেছি। আমি যতবার জানতে চাই, 'মিসেস মালহোত্রা আছেন?' ততবারই সে জবাব দেয়, 'আপনি কে বলছেন?' বোঝ সেই ভেটকিমুখোর অবস্টিনেসি! আমি কি বলব যে, আমি তাঁর মালকিন কমলকলির চারপাশে ঘুরঘুর করা মুগ্ধ ভ্রমর? আমি টেলিফোন করতে পারছি না। তুমি কর। কেমন?

পাঠান্তে বাসু বললেন, এটা তো জেরক্স কপি। মূল কাগজখানা কি ছিল গোলাপী রঙের? আর কালীটা নীল?

রূপেশ অবাক হয়ে বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?

বাসু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করেন, আর নোট বইয়ে আলীর ওই নাম নম্বরটা? সেটা কি ছিল একই কালিতে লেখা?

রূপেশ স্বীকার করল তা ওর মনে নেই। সে লক্ষ্য করে দেখেনি।

বাসু জানতে চান, বালাসোর স্টেশনে তুমি সোমা হাজরাকে দেখতে পাওনি ? মানে, কলির সেই ভেটকিমুখী কম্পানিয়ানকে?

—আজ্ঞে না! আমি অন্য কোনো যাত্রীর দিকে নজরই করিনি। স্টেশনে বেশ ভিড়ও ছিল। আমি প্রকাশকে নজরে রেখেছিলাম। জে. ডি. আর কমলকলিকেই খুঁজছিলাম।

বাসু জানতে চান, এই মুগ্ধভ্রমর 'অলি'টি কে তা আন্দাজ করতে পার?

জবাবটা দিতে একটু দেরি হল রূপেশের। গুছিয়ে নিয়ে বলল, একটি মৃতব্যক্তির সম্বন্ধে কথাটা বলা বোধহয় শোভন হচ্ছে না। বাট ইট্‌স্ এ মার্ডার কেস! আপনাকে সব কথাই বলা উচিত। দেখুন, কলি কিছু ধোওয়া তুলসীপাতাটি ছিল না। প্রাকবিবাহ জীবনে তার একাধিক প্রেমিক ছিল। সুতরাং 'অলি' যে কে তা নিশ্চিত করে বলতে পারি না—

—নিশ্চিত করে তো বলতে বলছি না। এনি ওয়াইল্ড গ্যেস্?

—হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে আমার সন্দেহ লোকটার নাম বিক্রমজিৎ সিং। আমাদের বিয়ের আগে বেশ কিছুদিন কলি ওই বিক্রমজিতের সঙ্গে স্টেডি ডেটিং করছিল। তারপর জে. ডি.-র হুড়ো খেয়ে লোকটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। আমাদের বিয়েতে সে নিমন্ত্রিত হয়েছিল কি না জানি না—আমি কলিকে কোনদিন প্রশ্ন করিনি, কিন্তু সে আসেনি। না দিল্লিতে, না পরে কলকাতার তাজবেঙ্গলের পার্টিতে। তবে লোকটা সম্প্রতি আবার ঘুরঘুর করতে শুরু করেছিল। আমাদের সেপারেশনের পর থেকেই। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে সে কলকাতার হোটেল 'রাতদিনে' সাতদিন ছিল। ঊনত্রিশ তারিখে—অর্থাৎ ঘটনার দিন সকালে আটটা নাগাদ হোটেল থেকে চেক আউট করে কোথাও চলে যায়। কোনো ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস না রেখে।

—এ তথ্য তুমি জানলে কেমন করে?

রূপেশের হাসিটা ম্লান দেখালো। বললে, আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। ফলে, ওর গতিবিধির উপর নজর রাখতে আমি একটি গোয়েন্দা সংস্থাকে নিযুক্ত করেছিলাম। কলি যদি বেমক্কা খুন হয়ে না যেত তাহলে ডিভোর্স-কেস-এ একটা মানি সেট্‌ল্‌মেন্টের প্রশ্ন উঠতই। তখন এসব তথ্য আমার কাজে লাগত।

বাসু বলেন, বুঝলাম। তা তুমি আমার কাছে ঠিক কী চাইছ বল তো?

—আপনি খুঁজে বার করুন! কে, কেন কলিকে এভাবে খুন করল! শুধুই গহনার লোভে?

না কি আরও বড় কোন লাভের আশায়? দ্বিতীয়ত, আমার পরলোকগতা স্ত্রীকে কে 'সিডিউস্' করছিল?

—আর আমার সমাধান যদি বলে : না! গহনার লোভে কেউ কলিকে খুন করেনি! করেছে আরও কোনও বড়জাতের প্রাপ্তির লোভে? আমার সমাধান যদি বলে : এসব চিঠি জাল! হত্যাকারী এগুলি সৃষ্টি করেছে হত্যাপরাধ 'অলি' নামের একজনের স্কন্ধে চাপিয়ে দিতে? সে ক্ষেত্রে?

—কে এমন লোক হতে পারে? একটা সম্ভাব্য নাম বলুন?

বাসু ওর চোখে চোখে তাকিয়ে বলেন : রূপেশ মালহোত্রা!

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল রূপেশ। বললে, গুড বাঈ স্যর! বেস্ট অব ল্যাক!

দশ

সেদিনই রাত আটটা নাগাদ আবার একটা টেলিফোন এল। জি.ডি.র কাছ থেকে। বাসু-সাহেব আত্মঘোষণা করা মাত্র দস্তুর বললেন, একটা অত্যন্ত গোপন এবং জরুরী সংবাদ জানাতে চাই। আপনাকে কষ্ট দেব না। আমি নিজেই এখনি আপনার বাড়িতে চলে আসতে চাই। আপনি কি আধঘণ্টা সময় দিতে পারবেন?

—অফকোর্স! য়ু আর ওয়েলকাম!

—মিস্টার কৌশিক মিত্র কি আছেন? তাঁকে কি পাব?

—পাবেন। সে বাড়িতেই আছে।

—আমি যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, এ খবরটা কাউকে জানাবেন না। বিশেষত পুলিসকে।

—এগ্রিড। আসুন আপনি।

আধঘণ্টার মধ্যেই দস্তুর-সাহেবের গাড়ি এসে থামল বাসুসাহেবের বাড়ির পোর্টিকোর সামনে। গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া তিনি একা। কৌশিক বারান্দায় অপেক্ষা করছিল। আপ্যায়ন করে নিয়ে এসে বসালো তাঁকে বাসু-সাহেবের ঘরের সমুখে প্রতীক্ষাগারে। বাসু খবর পেয়ে নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, আসুন মিস্টার দস্তুর। এ ঘরে এসে বসুন।

দস্তুর এ ঘরে এসে বসলেন। ড্রিংস কোন কিছু নিতে রাজি হলেন না। জানালেন, পুরীর স্বর্গদ্বারে কমলকলির শেষকৃত্য করে উনি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। তার পরেই উনি সরাসরি চলে এলেন জরুরি ব্যাপারটায়। ঘণ্টাখানেক আগে—রাত সাতটা নাগাদ উনি বোম্বাই থেকে একটা এস. টি. ডি. কল পান। যিনি ফোন করছিলেন তাঁর নাম আবদুল লতিফ। মুম্বাই ক্রফোড মার্কেটে তাঁর বিরাট সোনারূপার জুয়েলারি শপ এ. বি. জুয়েলার্স। ওঁরা দুজন পার্টনার। আবদুল লতিফ আর বীরেন্দ্রনাথ দত্ত। একজন মুসলমান একজন হিন্দু। একজন মুম্বাইওয়ালা একজন বাঙালী। তবু ওঁদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। দস্তুর-সাহেবের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘদিনের পরিচয়। ব্যবসায়িক সূত্রে। সেই প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র পার্টনার জনাব আবদুল লতিফই ফোন করছিলেন।

বাসু জানতে চান, কী বলতে চান জনাব আবদুল লতিফ?

দস্তুর বলেন, আমার টেলিফোনে একটা গ্যাজেট আছে। বোতাম টিপলেই দুপক্ষের কথা একটা অডিও টেপ-এ রেকর্ড হয়ে যায়। আমি লতিফের ফোন পাওয়ামাত্র বোতামটা টিপে দিয়েছিলাম। আমাদের দুজনের কথাই টেপ-এ ধরা গেছে। সেটা আমি নিয়েও এসেছি। গাড়িতে আছে...

কৌশিক বলে, ঠিক আছে, আমি সেটা নিয়ে আসছি। তাহলে আপনাদের কথোপকথন ডাইরেক্ট ন্যারেশানে শোনা যাবে।

দস্তুর একটি টু-ইন ওয়ানে টেপটা ভরে নিয়ে এসেছেন। কৌশিক যন্ত্রটা চালিয়ে দিল। প্রথম দিককার কিছুটা কথা রেকর্ডেড হয়নি। সম্ভবত তখনো দস্তুর-সাহেব ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারেননি এবং বোতামটাও টিপে দেননি। কথাবার্তা আদ্যন্ত হিন্দিতে। অনুবাদে তা এই রকম :

দস্তুর : আপনি যখন বলছেন তখন পুলিসকে কিছু জানাব না। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

লতিফ : আপনার মেয়ের সম্বন্ধে মর্মান্তিক সংবাদটা কাগজে পড়েছি। আমার গভীর সমবেদনা ইতিপূর্বেই ফ্যাক্স করে জানিয়েছি। সেই সংক্রান্ত একটা অত্যন্ত গোপন সংবাদ আপনাকে এখন জানাতে চাই। আপনি যদি সম্পূর্ণ গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দেন।

দস্তুর : সে কথা তো আগেই বলেছি। বলুন আপনি?

লতিফ : কলি-মার অপহৃত অলঙ্কারের একটি পিস—পান্না বসানো নেকলেসটা এখন কোথায়, কার কাছে আছে, আমি জানি।

দস্তুর : আর য়ু শ্যিওর? ওটা সেই নেকলেসটাই?

লতিফ : দস্তুর সা'ব! আপনার য়্যাদ নেই। নেকলেসটা এই বান্দার কারিগরেই বানিয়েছিল। আমি সেন্ট্রাল লকেটের বড় পান্নাটি সরিয়ে দেখে নিয়েছি তার নিচে আমাদের কোম্পানির মনোগ্রাম আছে : 'এ.বি'। যার কাছ থেকে নিয়ে দেখেছি, সে তা জানে না। পান্না যথাস্থানে সেট করে তাকে ফেরত দিয়েছি। বলেছি, কাল আসতে।

দস্তুর : অল-রাইট। আমি মেনে নিলাম এটা সেই একই নেক্‌লেস। কিন্তু পুলিসের সাহায্য ছাড়া সেটা আমি কী করে উদ্ধার করব?

লতিফ : আপনি নিজে চলে আসুন। মুম্বাইয়ের নেক্সট ফ্লাইটে। কাল রাত নটার সময় লোকটা নেকলেস নিয়ে আমার বাড়িতে আসবে। নগদ টাকায় বেচতে। আমি তাকে হাতে নাতে ধরিয়ে দেব।

দস্তুর : অলরাইট! কিন্তু পুলিসের সাহায্য ছাড়া তাকে আমি ধরব কীভাবে?

লতিফ : পুলিসই ধরবে। মুম্বাইয়ের পুলিস্! আমার চেনা পুলিস! আপনি শুধু আইডেন্টিফাই করবেন নেকলেসটা।

দস্তুর : বুঝলাম না। আপনি যদি পুলিসেই শেষ পর্যন্ত খবর দেন, তাহলে আমার পুলিশে খবর দেওয়ায় আপত্তি কী?

লতিফ : সে আলোচনা আমি টেলিফোনে করব না, স্যার। ইনফ্যাক্ট, এর সঙ্গে যদি কলি-মার দুর্ঘটনাটা—আপনি নিশ্চয় বুঝছেন, আমি কোন দুর্ঘটনার কথা বলতে

চাইছি—জড়িত না থাকত তাহলে আমি হয়তো আপনাকে এতকথা বলতামই না। আপনি কি আসতে পারবেন? কাল রাত নয়টায়? আমার গরিবখানায়?

দস্তুর : না। আমি নিজে যেতে পারব না। কাল আমাকে কলকাতাতে থাকতেই হবে। তবে আমার তরফে একজন প্রতিনিধি যাবেন। নামটা লিখে নিন : মিস্টার কৌশিক মিত্র অব 'সুকৌশলী'। উনি একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা। অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন।

লতিফ : অলরাইট স্যার। উনি যেন ওঁর পাসপোর্ট বা ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে আসেন। আমার দোকানে নয়, বাড়িতে। অ্যাড্রেস তো আপনার জানা? বান্দ্রার কার্টার রোড...

দস্তুর : হ্যাঁ, অ্যাড্রেস আমার জানা। যদি মিস্টার কৌশিক মিত্র কোন কারণে না যেতে পারেন তাহলে আজ রাত্রেই আমি ফোনে জানাব। সে-ক্ষেত্রে অন্য কেউ যাবে।

লতিফ : থ্যাঙ্কু স্যার। 'অন্য কেউ'টা যেন পুলিসের লোক না হয়। গুড নাইট!

কৌশিক বলল, আমি রাজি। কাল মর্নিং ফ্লাইটেই মুম্বাই চলে যাব। এখন টিকিট পেলে হয়।

দস্তুর বললেন, সে চিন্তা করবেন না। আপনি যেতে পারেন ধরে নিয়ে আমি দুখানি টিকিটের ব্যবস্থা করেছি। ভি. আই. পি কোটায়। আপনি একা যাবেন না। মিস্টার দাশও যাবেন। কিন্তু তিনি আবদুল লতিফের বাড়িতে যাবেন না। মুম্বাই পুলিস লোকটাকে অ্যারেস্ট করার পর তিনি আত্মঘোষণা করবেন। লতিফকে আমি ওয়ার্ড অব অনার দিয়ে রেখেছি।

বাসু বললেন, নাইন্টি ফাইভ পার্সেন্ট চান্স, জনাব আবদুল লতিফ এ জাতীয় চোরাই মাল খরিদ করে থাকেন—আন্ডার ওয়ার্ল্ডের কাছে থেকে। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার প্রতি বন্ধুত্বের খাতিরে, এবং সম্ভবত কমলকলিকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন বলেই তিনি এই পদক্ষেপ করেছেন। অথবা হয়তো মার্ডার কেস জানার পর চুপ করে থাকতে তাঁর বিবেকে বেধেছে।

দস্তুর শুধু বললেন, না, ব্যারিস্টার সাহেব। নাইন্টি ফাইভ নয়, ওটা সেন্ট পার্সেন্ট। মুম্বাইয়ের যে পুলিস কর্তার মাধ্যমে তিনি জুয়েল থিফটাকে ধরিয়ে দেবেন তিনি ওঁর জানা লোক। তিনি এমনভাবে জুয়েল থিফকে ধরবেন যাতে আন্ডার ওয়ার্ল্ড বুঝতে না পারে যে, খবরটা পাচার হয়েছে আবদুল লতিফের মারফত! যা হোক, তাহলে ওই কথাই রইল। মিস্টার মিত্র, আপনি তাহলে মিস্টার দাশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমার গাড়ি কাল সকালে আপনাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে। টিকিট আমার ড্রাইভারের হাতে থাকবে। ইন্সপেক্টার দাশ অবশ্য সরাসরি পুলিসের গাড়িতে এয়ারপোর্টে যাবেন! তাহলে চলি?

দস্তুর উঠে দাঁড়ালেন। যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন। বাসু ঠিক তখনই পিছন থেকে প্রশ্ন করেন, মিস্ পামেলা কাত্রোচ্চি কি এই নতুন পরিস্থিতির কথাটা জানেন?

দস্তুর দোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ান। একটু দেরি হল জবাবটা দিতে। তাঁর ভ্রূকুঞ্চিত হল। নতনেত্রেই বললেন : নো। গুডনাইট।

এগারো

পরদিন ভোরবেলাকার মুম্বাই ফ্লাইটে রওনা হয়ে গেল ওরা দুজন—নিখিল আর কৌশিক। মুম্বাই এয়ারপোর্টে পৌঁছে নিখিল বললে, মুম্বাইয়ে আমরা একত্রে থাকব না। আমি থাকব আমার এক সহকর্মীর বাড়িতে চার্চ গেটে। রাত সাড়ে আটটায় আমি থাকব বান্দ্রায়। কার্টার রোডে সমুদ্রের ধারে একটা 'সি ফেয়ারার্স ক্লাব' আছে। সেখানেই অপেক্ষা করব। সাড়ে আট থেকে সাড়ে নয়। তুমি একাই যাবে জনাব আবদুল লতিফের বাড়িতে। ওঁর বাড়ি থেকে ক্লাবটা ইষ্টক-ক্ষেপণ দূরত্বে। প্রয়োজনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কর। লোকটা ধরা পড়লে তো নিশ্চয়ই।

কৌশিক রাজি হল। ওরা নির্গমনদ্বার দিয়ে বার হয়ে আসতেই নিখিল বলল, ওই প্ল্যাকার্ডটা দেখ। লোকটা তোমাকেই রিসিভ করতে এসেছে। ওর কাছে এগিয়ে যাও।

যারা যাত্রীদের নিতে এসেছে তাদের মধ্যে একজনের বোর্ডে লেখা 'কে মিত্র'।

কৌশিক তার কাছে এগিয়ে আসতেই লোকটা বললে, গুডমর্নিং, স্যার, য়ু আর কৌশিক মিত্র? ফ্রম ব্যারিস্টার...

কৌশিক পাদপূরণ করল : পি. কে বি—

—আইয়ে স্যার, মেরা সাথ। সামান?

কৌশিক জানালো তার হাতে যে অ্যাটাচি কেস আছে এছাড়া তার আর কোন মালপত্র নেই। ওরা এগিয়ে এল পার্কিং লটের কাছে। লোকটা সবিনয়ে বলল, বুরা না মানিয়ে সা'ব, আপকো ড্রাইভিং লাইসেন্স?

—বুরা মাননেকা ক্যা সওয়াল? বলতে বলতে কৌশিক তার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখিয়ে দিল। গাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। ফিয়াট গাড়ি। ঘুরতে ঘুরতে চলে এল বান্দ্রায়, কার্টার রোডের কাছাকাছি।

এয়ারপোর্ট থেকে বেশি দূরে নয়। এসে থামল একটা থ্রি-স্টার হোটেলের সামনে।

এই হোটেলেও কে. মিত্রের নামে একটা সিঙ্গল বেড ঘর আগে থেকেই বুক করা আছে। আবদুল মিএগার বাড়িতে স্থানাভাব নেই—বড় এ/সি গেস্টরুম আছে। তবু তিনি অগ্রিম এই ব্যবস্থাটি করে রেখেছেন। ড্রাইভার হিন্দিতে জানালো, আমার সাহেবকে বাড়িতে বা দোকানে ফোনটোন করবেন না। প্রয়োজনে তিনিই যোগাযোগ করবেন। আপনি যা যা অর্ডার দেবেন, শুধু ভাউচারে সই করে দেবেন। নগদ পেমেন্ট কিছু করবেন না। আমি রাত সাড়ে আটটায় আবার আসব।

কৌশিকের সঙ্গে একটা ক্রাইম থ্রিলার ছিল। সে সারাদিন বই পড়ল, টি.ভি দেখল, কর্মহীন একটা অলস দিন অতিবাহিত করে দিল হোটেলে। পশ্চিম দিকের জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। সেদিকে সূর্যাস্ত হল। শুভ্রপক্ষ গাংচিল দলের ক্রমাগত ওড়াউড়ি। কলকাতায় একটা ফোন করল। তার নিরাপদ পৌঁছানো সংবাদ আর হোটেলের টেলিফোন নম্বর জানিয়ে দিতে।

রাত সাড়ে-আট পার হয়ে গেল। লোকটা এল আরও আধঘণ্টা পরে। বিলম্ব হওয়ার জন্য মাফি চাইল। তারপর বলল, আসুন স্যার, এবার আমরা যাব—

—কোথায়? জনাব আবদুল লতিফের বাড়িতে?

—জি না। বান্দ্রা পুলিশ স্টেশন। ওখানেই ওঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

কৌশিক কথা বাড়ালো না। 'ওঁরা' বলতে কারা, তাও জানতে চাইল না। রওনা হল ফিয়াট গাড়িতে।

বান্দ্রা পুলিস স্টেশনে অপেক্ষা করছিল নিখিল দাশ। ধড়াচূড়া পরা। বলল, এস কৌশিক, আলাপ করিয়ে দিই—ইনি মিস্টার সঞ্জয় সিং, বান্দ্রা পি.এস্-ইনচার্জ। খবর ভাল। লোকটা হাতেনাতে ধরা পড়েছে। আবদুল মিঞার বাড়ির কাছাকাছি। তবে অনেকটা দূরে। কোন 'ইয়ের ব্যাটা' বলতে পারবে না : এই ধরিয়ে দেবার মধ্যে জহুরী আবদুল মিঞা-সাহেবের কোনো হাত আছে, নেক্‌লেসটা রসিদ দিয়ে ক্যালকাটা পুলিসের তরফে আমি নিয়েছি। দেখবে?

কৌশিক ইংরেজিতে বলে, এমন জিনিস তো বাজারে খরিদ করে বউকে উপহার দিতে পারব না, কী বলেন সিংজী? একটু হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করি। তাতেই তৃপ্তি।

ও.সি. সাহেব তাঁর গোঁফ চুমড়িয়ে শুধু বললেন, সহী বাৎ!

নেক্‌লেসটা বেশ বড় আর ভারী। তিন তিন ছয় আর মাঝখানে একটা বড় পান্নার লকেট। আবদুল মিঞা বাড়িয়ে বলেননি—লাখ্ দুয়েকের বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়।

নিখিল বলে, লোকটা একটা দাগী জুয়েল থিফ। বার্গলারি কেসে মেয়াদও খেটেছে বার-তিনেক। তবে আলমারি ভেঙে গহনা হাতানো ছাড়া আর কোন দিকে ঝোঁক নেই। খুন-খারাপির চার্জ কোনোদিন ওঠেনি খাতায়। ওর এলাকা মুম্বাই শহর। কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাইতেও ওদের গ্যাঙটাকে কাজ করতে দেখা গেছে।

কৌশিক জানতে চায়, কী নাম লোকটার?

সঞ্জয় সিং আগ্ বাড়িয়ে হিন্দিতে জবাব দেন, দেখুন স্যার, এসব লোকের হরেক কিসিমের নাম থাকে। এরও আছে। পিতৃদত্ত নামটা কী জানি না। মিস্টার দাশ ওকে দেখে বলছেন, লালবাজারে, মানে ওর কলকাত্তাইয়া নাম : নেড়া করিম।

কৌশিক জানতে চায়, 'নেড়া করিম'? কেন? এমন অদ্ভুত নাম কেন? লোকটা কি নেড়া?

জবাব দিল সঞ্জয় : যূল ব্রেনারের মতো নিপাট কামানো মাথা। লোকটা অর্ডার দিয়ে গোটা কতক পরচুল বানিয়ে রেখেছে। হায়দরাবাদে ওর মাথায় বিরাট বাব্‌রি, এখানে 'গুলিট'-এর মতো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। কোলকাতায় নেড়া বোষ্টম। কোথাও ওর দাড়ি-গোঁফ দুইই আছে ; কোথাও দাড়ি আছে, গোঁফ নেই ; কোথাও গোঁফ আছে দাড়ি কামানো! কলকাতায় শুনেছি—

নিখিল ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, হ্যাঁ। গোঁফ-দাড়ি নিপাট কামানো। তবে বছর দুই-আড়াই ওকে দেখা যায়নি। অন্তত কলকাতার জুয়েলারি মার্কেটে অথবা ধনীর প্রাসাদে।

সঞ্জয় বললেন, এখানেও সে অনেকদিন লুকিয়ে লুকিয়ে ছিল। দেড় দু-বছরের মধ্যে ও অ্যারেস্ট হয়নি। কোনো জুয়েল লিফটিং বা বার্গলারি কেসে ওকে সন্দেহের তালিকাতেও পাওয়া যায়নি। ওদের গোটা গ্যাঙটাই বেশ কিছুদিন ইনঅপারেটিভ হয়ে গেছিল।

নিখিল জানতে চায়, গোটা গ্যাঙ বল্‌তে?

—ওরা দলে ছিল তিন-চার জন। সম্ভবত নেড়া করিমই ছিল দলের পাণ্ডা। আর ছিল একজন বিহারী—সে লোকটাও ইদানীং না-পাত্তা। এছাড়া ছিল একজন গোয়ানিজ ইয়াং-ম্যান : আল্‌ফান্সা। সেও কর্পূরের মতো উপে গেছে। আমাদের রেকর্ডে দেখছি—নেড়া করিমের একটি মহিলা সহযোগীও এককালে ছিল। কেউ বলে, সে নেড়া করিমের জরু, কেউ বলে রক্ষিতা। মেয়েটি সুন্দরী। বছর পঁচিশ বয়স। কিন্তু তারও কোনো পাত্তা ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে

না। মাঝে একবার মাসছয়েকের জন্যে তার সাজাও হয়ে যায়। ধরা পড়ে ওদের সঙ্গে ; কিন্তু গহনা চুরির কেস-এ সে ছাড়া পেয়ে যায়—

নিখিল বাধা দিয়ে বললে, এই যে বললেন, মাসছয়েক মেয়াদ খাটে?

—হ্যাঁ। মিথ্যে সাক্ষী দেবার অপরাধে। 'আন্ডার ওথ' সজ্ঞানে মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিল বলে। সে মেয়েটিও এখন না-পাত্তা।

কৌশিক জানতে চায়, নেড়া করিম কী করে? থাকে কোথায়?

—বর্তমান নিবাস বোরিভেলি পাহাড়ের গায়ে একটা মুসলমান বস্তিতে। কাজ করে কান্দিভেলিতে। একটা মটোর রিপেয়ারিং শপে। গাড়ি রঙ করার কাজ। আমরা যাব ওর বাড়িতে এবং দোকানে। আপনাদের আসার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

নিখিল বলে, নেক্‌লেসটা কীভাবে ওর ঝোলার ভিতর এল, সে বিষয়ে ও নিজে কী বলছে?

—বলছে : ও জানে না। ধরা পড়েই ওর তাৎক্ষণিক স্টেটমেন্ট : এটা কীভাবে তার বিগ-শপার ব্যাগে এসেছে তা ও জানে না। ওর কোনও 'শ্যালিকাসুত্র' ওকে ফাঁসাবার জন্য এভাবে ওর ঝোলার ভিতর একটা সোনার গহনা ফেলে দিয়ে পুলিশে খবর দিয়েছে।

—সেই 'শ্যালকপুত্রে'র উদ্দেশ্যটা সম্বন্ধে ও কী বলছে?

সঞ্জয় বলে 'দ্যা সেম কক্ অ্যান্ড বুল স্টোরি'। শেষবার মেয়াদ খেটে বেরিয়ে আসার পর ওদের গ্যাঙটা আবার ওকে দলে ফিরে যেতে ডাকছে। কিন্তু ও রাজি নয়, কারণ ইতিমধ্যে ও 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' হয়ে গেছে। রঙ মিস্ত্রির জীবিকা ছেড়ে সে যেতে চাইল না। তাই এভাবে ওকে ফাঁসানো হল।

—দেড়-দুলাখ টাকার একটা নেকলেসের বিনিময়ে?

—তাই তো বলছি : কক অ্যান্ড বুল স্টোরি! গুছিয়ে একটা মিথ্যা গল্পও বলতে পারেনি লোকটা। নেড়াকে ডেকে পাঠাব? কথা বলবেন?

কৌশিক বললে, হ্যাঁ, লোকটাকে একবার চাক্ষুষ দেখে নেওয়া যাক। দু-চারটে প্রশ্নও করা যাবে, যাতে ওর বাড়ি বা দোকানের লোকের জবানবন্দির সঙ্গে ওর বক্তব্য কতটা মেলে যাচাই করে নেওয়া যায়।

ও.সির নির্দেশমতো নেড়া-করিমকে হাতকড়া পরানো অবস্থায় নিয়ে এল একজন সশস্ত্র পুলিস। নেড়া করিম খর্বকায় এবং স্থূলকায়। বয়স পঞ্চাশের এপারে নয়। ও.সি. বললেন, ওই টুলটাতে বস, করিম। তুমি নিজেই নিশ্চয় বুঝতে পারছ—ধরা পড়ার পরেই তুমি যে-কথা বলেছিলে তা দাঁড়ায় না। তোমাকে দলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টায় কোনো শালা তোমার ব্যাগে দু-লাখ টাকার একটা গহনা ঝেড়ে দেবে না! ...না, না, কোনো কথা বল না। আগে শোন, আমি কী বলতে চাইছি। এক নম্বর কথা : তুমি ফেঁসে গেছ। হাতে-নাতে ধরা পড়েছ। তোমার আবার মেয়াদ হয়ে যাবেই। কোনো শালা ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু তুমি যদি আমাদের বলে দাও—সচ্ সচ্ বাতা দেও—কীভাবে তুমি ওটা পেলে, তাহলে তোমার বিরুদ্ধে গহনাচুরির কেসই আমরা আনব না। আনব চোরাই মাল পাচার করার অভিযোগ। চুরির দায়ে সাজা হলে দু-তিন বছর এই বুড়ো বয়সে ঘানি টানতে হবে। কিন্তু চোরাই মাল বেচার অপরাধ বড় জোর ছ-মাস জেল হবে। বাকি দলটা ধরা পড়লে, তুমি যদি রাজসাক্ষী হও তাহলে বেকসুর খালাসও হয়ে যেতে পার! দেখ ভেবে, সত্যি কথাটা বলবে কি না।

লোকটা মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবল। তার পর বললে, হুজুর ওরা আমাকে জানে মেরে দেবে।

—দেবে না। সবকটাকে জেলে ঢুকিয়ে দেব। তাছাড়া তুমি যদি চাও তাহলে তোমাকে রাজসাক্ষী করবই না আমরা। তুমি শুধু জানিয়ে দাও কে কোথায় তোমাকে এটা এনে দিয়েছিল। মুম্বাই বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করতে বলেছিল। আমরা জানি, তুমি ওই দল ছেড়ে দিয়েছ। সৎভাবে কান্দিভালিতে একটা মটোর রিপেয়ারিং শপে রঙ মিস্ত্রির কাজ করছ। আমরা আরও জানি, তোমাদের বাকি সবাই—সেই আল্‌ফান্স, আর সেই বিহারী বদমাশটার—কী যেন নাম মনে নেই...

নেড়া করিম হঠাৎ ধরতাইটা ধরিয়ে দেয়, ব্রিজলাল কাহার—হুজুর!

—হ্যাঁ, ব্রিজলাল! তাদের কারও সঙ্গে মুম্বাই জহুরী বাজারের জান পহ্‌চান নেই। তুমিই এতদিন চোরাই মাল পাচার করেছ। মুম্বাই, হায়দরাবাদ, কলকাতার অনেক জহুরীর সঙ্গে তোমার জান্-পহ্‌চান আছে। এ জন্যই ওরা তোমাকে দলে ফেরত নিতে চাইছে। এসবই আমাদের জানা। এখন বল, কে কখন তোমাকে এই নেকলেস্‌টা এনে দিয়েছে। তুমি বান্দ্রা অঞ্চলের ওই কার্টার রোডে ওটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে? ওখানে তো কোনও জুয়েলারি দোকান নেই?

নেড়া করিম বললে, হ্যাঁ হুজুর, কবুল খাচ্ছি—এটা আমার ব্যাগে অজান্তে কেউ ফেলে দেয়নি। আমাকে বেচতেই দিয়েছিল। মালটার দাম স্যার, দু-লাখের কম হবে না। কিন্তু দেড়লাখে বেচতে পারলেই আমি এবার পঁচিশ হাজার টাকা মুনাফা করতাম। কারণ আমাকে ওরা জানিয়েছিল শওয়া লাখ্ পেলেই আমি যেন ওটা ঝেড়ে দিই।

সঞ্জয় জানে—মূল প্রশ্নটা হচ্ছে : কে ওকে বেচতে দিয়েছিল। খুব সম্ভবত এ লোকটা জানে না, ওই অলঙ্কারটার সঙ্গে একটা মার্ডার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তা জানলে হয়তো পঁচিশ হাজার টাকা মুনাফার লোভে সে এতবড় দায়িত্বটা নিতই না। কিন্তু মূল প্রশ্নটা সরাসরি করার আগে লোকটাকে একটু সহজ হবার সুযোগ দিল। জানতে চাইল, তোমাকে হাজতে এরা ঠিকমতো দানাপানি দিচ্ছে তো?

নেড়া হাসি-হাসি মুখে বললে, ও-সব কথা ছেড়ে দিন স্যার। আমি তো এই প্রথমবার শশুরালে আসিনি। এখানকার আপ্যায়ন সম্বন্ধে আমার ঠিকঠাক অভিজ্ঞতা আছে।

সঞ্জয় শুনল না। একটা কন্সটেবলকে ডেকে অর্ডার দিল ওর হ্যান্ডকাফ খুলে নিতে। চার পেয়ালা চা আর বিস্কুট আনারও হুকুম দিল।

হাতকড়ি থেকে মুক্তি পেয়ে প্রৌঢ় মানুষটা একটু স্বস্তি পেল। সঞ্জয়ের অনুরোধে চা-বিস্কুট সেবনেও আপত্তি করল না। বলল, হুজুর, আমি বুড়ো মানুষ। পুরনো দিনের দোস্তটা এল। বলল, মালটা বাজারে ঝেড়ে দিতে পারলে, বিশ-পঁচিশ হাজার মুনাফা থাকবে। নেকলেসটা ওরা কোথায় হাতিয়েছে—দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, না কানপুর—আমি জানি না। জানতে চাইও না। কী দরকার আমার জেনে? আমি তো চিনির বলদ। চোরাই মালটা জান্-পহচান আদমির কাছে ঝেড়ে দেব। নগদ রুপেয়া গুনে নেব। ব্যস্। তারপর শালার গহনা বেরুট গেল না হংকং, তাতে আমার কী দরকার? কবুল খাচ্ছি হুজুর, লোভে পড়ে এটুকু পাপ আমি করেছি। এখন রাখলেও আপনি, মারলেও আপনি।

সঞ্জয় আক্রমণ করল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা দিক থেকে। ওর মনটা নরম করতে। বললে, বোরিভেলি বস্তিতে এখন কে, কে থাকে?

—আমার আব্বাজান, বিলকুল বুড্ঢা। ওর আম্মা। চোখে দেখে না। আমার ঘরওয়ালী আর দুটি মেয়ে।

—ছেলে নেই তোমার?

—ছিল হুজুর। 'ছিল' বলছি কেন? 'আছে'। তবে আমার নাগালের বাইরে। জাহাজের খালাসী হয়ে গেছে সে। দরিয়ায় দরিয়ায় ঘুরে বেড়ায়। দু-পাঁচ বছর পরে মন চাইলে আসে। যখন ওদের জাহাজ মুম্বাই বন্দরে ভেড়ে।

—তোমার ঘরওয়ালীর নাম তো জাহানারা বেগম্?

লোকটা চমকে ওঠে। চোখে চোখে তাকায়। পরক্ষণেই বোধহয় ওর পূর্বকথা মনে পড়ে যায়। বছর-তিনেক আগে শেষবার যখন সে ধরা পড়ে তখন ব্রিজলাল আর জাহানারাও ধরা পড়েছিল। ব্রিজলালের দু-বছর সশ্রম সাজা হয়, আর জাহানারার মাত্র ছয়মাসের। মাথা নেড়ে বলে, জী না হুজুর। আমার জরুর নাম 'ফতিমা'। এ আমার প্রথমপক্ষের।

—আর জাহানারা? যে গতবার তোমার সঙ্গে ধরা পড়েছিল। তারও তো ছয়মাসের মেয়াদ হয়ে যায়! সে কোথায়?

নেড়া উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে 'থুক' ফেলে এল। গুছিয়ে নিয়ে বসে বললে : দোজখ্।

—দোজখ্? মতলব?

ধীরে ধীরে একটি বেদনার কাহিনী মেলে ধরল নেড়া। তার নিজের দু-বছরের মেয়াদ হয়েছিল। তার দ্বিতীয় পক্ষের বিবি জাহানারার হয়েছিল মাত্র ছয় মাসের কারাদণ্ড। নেড়া আশা করছিল মুক্তি পাবার পর জাহানারা আসবে তার খসমের সঙ্গে দেখা করতে। গরাদ দেওয়া খুপরির ভেতর থেকে অনেক অনেক দিন পর সে দেখবে তার সুন্দরী স্ত্রীকে। কিন্তু জাহানারা এল না। এক মাস দু'মাস তিনমাস। তারপর একদিন সাক্ষাত সময়ে দেখা করতে এল ওর প্রথমপক্ষের বিবি, ফতিমা। তার কাছেই পেল সংবাদ : পাখি উড়ে গেছে। ওরই হাতে গড়া সাগরেদ আলফান্সোর সঙ্গে।

চরম বেইমানি! আলফান্সোকে নেড়াই নিয়ে এসেছিল এ লাইনে। হাতে ধরে সব কিছু শিখিয়েছিল। গতবার সে ধরা পড়েনি। ফাঁক-ফোকর দিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। পুলিসে তার পাত্তা পায়নি। জাহানারা যেদিন জেনানা ফাটক থেকে ছাড়া পায় সেদিন ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল আলফন্স! জাহানারা জানত, সে নিজে অনিকেত। এতদিন সে ছিল একটা বস্তির ঘরে, নেড়া করিমের সঙ্গে। সে আশ্রয় হাতছাড়া হয়ে গেছে। ওর খসম্ এখনো মেয়াদ খাটছে। জেলখানা থেকে মুক্তি পেল জাহানারা বিলকুল খালি হাতে। তবে একেবারে নাঙ্গা ভিখারি নয়। তার ছিল দু-দুটি সম্পদ—জওয়ানি আর খুবসুরতি।

না, জাহানারাকে দোষ দেয় না নেড়া। মেয়েটার সঙ্গে তার নিজের বয়সের ফারাকটাও তো দেখতে হবে। জাহানারা পঁচিশ, ও তার ডবল : পঞ্চাশ। নেহাত দম্পতি—তাই এতদিন ব্রিজলাল বা আলফান্স্ জাহানারার দিকে হাত বাড়ায়নি। আর মাঝে মধ্যে বাড়াতো কি না তাই কি ছাই ও জানে? মোট কথা প্রথমা বিবির মুখে শুনল : আলফন্সের সঙ্গে জাহানারা নিকা করেছে। ওরা দুজনেই ভারত পুলিসের নাগালের বাইরে পালিয়ে গেছে। কে জাহানারার প্লেন

ফেয়ার দিল নেড়া জানে না—আন্দাজ করতে পারে মাত্র। আলফান্স ওর সঙ্গে হয়তো যায়নি হয়তো বেচে দিয়েছে কোন আরব-শেখকে। জাহানারার বিমানভাড়া হয়তো মিটিয়েছে তার সেই দুই সম্পদই : খুব্‌সুরতি আর জওয়ানি।

হয়তো সে এখন সেই মধ্য প্রাচ্যের আরব শেখের হারেমে আরামেই আছে। দুঃখ করে না নেড়া। এ তার বদনসিব্।

সঞ্জয় ওকে খোলাখুলি বললে, দেখ করিম! তুমি ওই নেকলেসটা চুরির ব্যাপারে জড়িত এটা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু কে তোমাকে ওটা বিক্রি করতে দিয়েছে তার নামটা তুমি যদি না জানাও তাহলে বাধ্য হয়েই তোমার বিরুদ্ধে চুরির কেস সাজাতে হবে। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি—নেকলেসটা চুরি গেছে কলকাতাবাসী এক শেঠ-এর বাড়ি থেকে। তাই কলকাতা থেকে এসেছেন এই অফিসার। উনি শনাক্ত করেছেন গহনাটা। এখন বল, তুমি কতদিন আগে কলকাতা গেছিলে?

নেড়া তার চিবুক চুলকিয়ে বললে, য়্যাদ নেই হুজুর। মেয়াদ খেটে বার হয়েছি আজ একবছরের উপর। জেলেও ছিলাম বছর দেড়েক। ফলে, কলকাতায় শেষবার গেছি অন্তত তিন-চার বছর আগে।

—তাহলে তুমি কী স্থির করলে বল? তুমি বুড়োমানুষ। কথা আদায় করতে ওসব 'কচুয়া ধোলাই টোলাই' তোমাকে দেব না। তোমার সামনে দুটি পথ খোলা আছে। এক : কে তোমাকে নেকলেস্‌টা এনে দিয়েছিল তার নাম এবং কোথায় তোমার কাছ থেকে দেড়লাখ টাকা সে নিতে আসত তা আমাদের গোপনে জানিয়ে দাও। আমরা যে তোমার মাধ্যমে জেনেছি এটা গোপন থাক্‌বে—

—তাই কি কখনো থাকে, হুজুর?

—থাকে! পুলিস কোথা থেকে কীভাবে কোন্ খবর পায় তা কি জানাজানি হয়? এই যে আজ তোমাকে বান্দ্রা স্টেশনের বাইরে অটো রিক্‌শায় ওঠার মুখে চোরাই মালসহ আমরা গ্রেপ্তার করলাম, এটা কীভাবে? বান্দ্রা এলাকায় তো কোন সোনারূপার দোকান নেই। তাহলে তোমাকে ধরলাম কীভাবে?

—সেটাই তো ভাবছি, হুজুর।

—সে ভাবনা ছেড়ে দাও। বরং ভেবে দেখ কোন সাজাটা তোমার মনপসন্দ্। চোরাই মাল বিক্রির চেষ্টায় বড় জোর ছয় মাস? নাকি দু-লাখ টাকার গহনা চুরি—যার মেয়াদ না হোক দুটি বছর ঘানি টানা!...না, না, এখনি কিছু ফস্ করে বলে বস না। একটা রাত ভাল করে ভেবে দেখ। কাল সকালে জবাব দিও!

কান্দিভেলি বা বোরিভেলিতে সমস্যার কোনও সুরাহা হল না। কান্দিভেলিতে যে মটোর রিপেয়ারিং শপে ও রঙ মিস্ত্রির কাজ করে তার মালিক যুক্তপ্রদেশের লোক : রামবিলাস মিশির। প্রৌঢ় নির্বিরোধী ব্রাহ্মণ। দোকানটা মাত্র বছর দুই-তিন খুলে বসেছেন। কিন্তু প্রচুর কাজ পাচ্ছেন। আট-দশ জন লোক দিবারাত্র কাজ করে তাঁর গ্যারেজে। হ্যাঁ, মহম্মদ করিমকে তিনি চেনেন। বোরিভেলির একটা মুসলমান বস্তিতে থাকে। হ্যাঁ, উনি জানেন, লোকটা দাগী আসামী। বছর দুই আগে জেল থেকে বার হয়ে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। উনিই দয়া করে তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। রামজীর কৃপা হলে হয়তো তার জীবনযাত্রাই বদলে যাবে। না—গতমাস খানেকের মধ্যে মহম্মদ করিম একদিনও কামাই করেনি। গতকাল সে

অবশ্য 'উল্‌টি টাইমে' ছুট্টি নিয়েছিল। আজ এত বেলাতেও সে কেন যে আসেনি তা উনি আন্দাজ করতে পারছেন না। জ্বরজ্বারি হয়ে থাকবে। অথবা তার আব্বাজান—তিনি খুব বুড়ো—তাঁরই কিছু হয়ে থাকবে।

অর্থাৎ নেড়া করিম যে নেকলেসচুরির দায়ে থানার হাজতে এ সংবাদটা তার অজানা।

বোরিভেলির বস্তিতেও একই হালৎ। বাড়ির লোক জানে না, কেন কাল রাত্রে মানুষটা ঘরে ফিরল না। ওরা আশঙ্কা করেছিল : পথ দুর্ঘটনা! বাস-অ্যাকসিডেন্ট! পুলিশ দেখে বেরিয়ে এল সবাই। জড়ো হল বস্তির আশপাশের মানুষ। কী হয়েছে, স্যার?

সঞ্জয় সিং অনর্গল মিথ্যার সাহায্যে বস্তিবাসীর কৌতূহলকে প্রশমিত করল। হ্যাঁ, মহম্মদ করিম কাল বান্দ্রা স্টেশনের কাছে একটা মটোর গাড়ির ধাক্কা খেয়েছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আঘাত মারাত্মক নয়। দু-চার দিনের মধ্যেই ওকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। ওর জ্ঞান আছে। এই ঠিকানায় নাকি ওর জরু 'ফতিমা বিবি' থাকে। তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। 'ফতিমা' কার নাম?

ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে বছর চল্লিশের একটি মহিলা মাথায় ঘোমটা তুলে। জানতে চায়, হাত পা কাটা যায়নি তো হুজুর?

—না, না, তেমন কিছু নয়। দুদিনেই ছাড়া পেয়ে যাবে হাসপাতাল থেকে।

সঞ্জয়ের সঙ্গে এক মহিলা পুলিসও এসেছিল, সে বলল, ভিতরে চলুন দিদি, কথা আছে।

ভিতরে নিয়ে গিয়ে বলল, করিম ভাই ভালই আছে। ওর হাঁটুতে কিছুটা চোট লেগেছে। শরীরে আর কোনও ক্ষতি হয়নি। আপনি ওর জন্য একটা লুঙ্গি আর ফতুয়া একটা পোঁটলায় বেঁধে দিন। আর, টুথব্রাশ ব্যবহার করে কি করিম ভাই?

—জী না। দাঁতন।

—ও আচ্ছা। মেয়েরা বাড়িতেই থাক। বুড়ো দাদু দিদাকে দেখভাল করতে পারবে। আর আচ্ছা, ফতেমা দিদি, 'জাহানারা' কার নাম?

রীতিমতো চমকে উঠল ফতিমা, ক্যোঁও?

—প্রথম দিকে, যখন ওর ভালো করে জ্ঞান হয়নি তখন উনি বার বার জাহানারার কথা বলছিলেন। আপনার মেয়ে দুটির মধ্যে কারও নাম কি—

কথার মাঝখানেই ফতিমা বলে ওঠে, জী নেহী! বহ্ ইহা নেহী রহতি!

—গুজর গয়ী?

—জী নহী! ভাগ গয়ী।

বুঝিয়ে বলে, সে ছিল মহম্মদ করিমের দ্বিতীয় পক্ষের বিবি। বড়ি বদমাইশ। পুলিশনে উন্‌কী পকড় লি। ছে মাহিনেকা লিয়ে সাজা ভি হুয়ী...

—তারপর? খালাস হবার পর?

—না জানে কোথায় ভেগেছে! তবে আমার ঘাড় থেকে তো নেমেছে! খোদার মেহেরবানি।

—সে কি এখানেই থাকত? এই বাড়িতে?

—জী নহী! অন্য বস্তিতে। কিন্তু তার খোঁজ এত নিচ্ছেন কেন? সে তো দু-বছর হল নাপাত্তা!

—না...মানে...অসুস্থ লোকটা তার নাম করে বার বার খোঁজ করছে—

—তবে বলুন দোজখে তার পাত্তা নিতে! সে দোজখেই আছে!

একটু ইতস্তত করে মহিলা পুলিস জানতে চাইল, তার কোন তসবির মানে ফটো টটো আছে?

ফতিমা রুখে ওঠে, জী নহী! বহ্ কস্‌বি কী নাম ইঁহা মৎ লিজিয়ে!

বারো

দিন দুই পরে ওরা ফিরে এল কলকাতায়। নেড়া করিম তার দলের লোকের নাম বলেনি। মানে বলেছে, কিন্তু 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' পদ্ধতিতে। হ্যাঁ, নেকলেস্‌টা ওকে বিক্রি করতে দিয়েছিল ওর সেই পুরনো দিনের দোস্ত—ব্রিজলাল কাহার। কিন্তু তার পাত্তা ও জানে না। কথা ছিল, ব্রিজলাল এসে ওর কান্দিভেলির কর্মস্থলে মাঝে মাঝে ফোনে খবর নেবে। মালটা ঝেড়ে দেওয়া হয়েছে জান্‌লে সে ওই দোকান থেকেই নগদে সওয়া লাখ টাকা নিয়ে যেত। মুম্বাইয়ে সে কোন ঠিকানায় থাকে তা নেড়া করিম জানে না। ব্যস! চ্যাপ্টার ক্লোজড্!

খবরে খুশি হতে পারলেন না দস্তুর-সাহেব। নেকলেস্‌টা উদ্ধার হয়েছে জেনে তিনি বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখালেন না। নিখিল দাশ নিজেও খুশি হতে পারেনি।

বাসু-সাহেব ওদের কাছ থেকে সব কিছু খুঁটিয়ে শুনলেন। বললেন, সমাধানের দিকে আমরা এখনো একপদও অগ্রসর হতে পারিনি। এমনকি দ্বিধারাটাও এখনো একমুখি হল না।

সুজাতা বলে, 'দ্বিধারা' মানে?

—হত্যার উদ্দেশ্যটা তো দুই ধারায় বইছে। প্রথম থেকেই। যদি সম্পত্তির লোভে প্রফেশনাল মার্ডারার এন্‌গেজড করা হয়ে থাকে তাহলে প্রাইম সাস্‌পেক্ট রূপেশ মালহোত্রা। সেকেন্ডলি : পামেলা কাত্রোচ্চি। উভয় ক্ষেত্রেই খুনীকে সম্ভবত ওই আট দশ লাখ টাকায় পুরস্কৃত করা হয়েছে। আর যদি সম্পত্তির লোভে কমলকলিকে খুন করা না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের জানতে হবে—কে, কে জানতো যে ফার্স্ট-ক্লাস কূপেতে কমলকলি অরক্ষিতা অবস্থায় দশ লক্ষ টাকার গহনা নিয়ে চলেছে!

সুজাতা বলে, আমরা জানি : অনেকেই সেটা জানত। আবার এমনও হতে পারে আরও অনেকে হয়তো জানতো, যে খবর আমরা জানি না।

নিখিল বলে, তা ঠিক। রূপেশ আর বিক্রমজিৎ জানত। দস্তুর সাহেব, পামেলা জানতেন, সোমা হাজরা জানত, হয়তো হেড বাবুর্চি ইসমাইল, বা ওঁর হেড বেহারাও জানত। এমনকি দস্তুর-সাহেবের কাজিনের পুত্র, পুত্রবধূ—মানে, যাদের বিয়ের অ্যানিভার্সারিতে কমলকলি চাঁদিপুর যাচ্ছিল, হয়তো তারাও তথ্যটা জানত। আমরা তা জানি না।

বাসু বললেন, আরও একজন জানত। তার নাম তুমি করলে না।

নিখিল বলে, আর কে?

—কমলকলি নিজে।

পরিবেশটা এতই ঘন হয়ে উঠেছে যে, এ রসিকতায় কেউ কিন্তু হাসল না। বাসু অতঃপর

জানতে চান, নেড়া করিমের এমপ্লয়ার, মানে সেই কান্দিভিলির রিপেয়ার শপ ওনারের বয়স কত? দেখতে কেমন?

কৌশিক বলে, টিপিক্যাল বিহারী ব্রাহ্মণ। তবে স্বাস্থ্য ভালো। লম্বা-চওড়া। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, মাথায় কাঁচাপাকা চুলে লম্বা টিকি। চোখে বাইফোকাল। রঙ কালো। বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ।

বাসু চোখ বন্ধ করে শুনছিলেন। হঠাৎ বলেন, আর নেড়া করিম? বেঁটে আর মোটা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। রীতিমতো বেঁটে আর মোটাও। কিন্তু আপনি কী ভাবে...

—ব্যস্ ব্যস্ ব্যস্। আর কিন্তু টিন্তু নয়। জিগ্‌স ধাঁধার ওই একটা পীস্ই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এখন নাইন্টি-এইট পার্সেন্ট চান্স আমার সলুশান হয়ে গেছে। বাকি দু-পার্সেন্ট লুকানো আছে লাউডন স্ট্রিটে। রানু, তুমি দস্তুরকে একবার টেলিফোনে ধর তো!

রানীদেবী তাঁর হুইল চেয়ারে পাক মেরে টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেলেন। বাসু বলেন, নিখিল, তোমারও একটা জরুরী কাজ আছে। এখনই সঞ্জয় সিংকে একটা ফ্যাক্স করে দাও—কান্দিভেলির রামবিলাস মিশিরকে যেন তিন শিফ্‌টে নজরবন্দি করে রাখে। জাস্ট ফর টু ডেজ। লোকটা যেন পালাতে না পারে।

কৌশিক বলে, রামবিলাস মিশির? কেন? তার কী অপরাধ?

—বাঃ! তুমিই তো বললে, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, মাথায় টিকি।

রানু টেলিফোনে দস্তুরকে ধরেছেন। বাসু বললেন, লুক হিয়ার মিস্টার দস্তুর! সেদিন সন্ধ্যায় আপনি অযাচিত আমার বাড়িতে এসেছিলেন। আজ আমি একটা রিটার্ন ভিজিট দিতে চাই। রাইট নাউ। ইন হাফ অ্যান আওয়ার! আপনার সময় হবে?

—হবে, নিশ্চয় হবে। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—আপনি টেপ-রেকর্ডারের বোতামটা টেপেননি তো?

—না, না! কী যে বলেন!

—তাহলে বলি, আপনি আমাকে যে কাজটা অ্যাসাইন করে ছিলেন তার সমাধান হয়ে গেছে—

—মানে? আপনি জানেন, কে ট্রেনের কামরার মধ্যে কলিকে...

উনি বাক্যটা শেষ করার আগেই বাসু-সাহেব বলেন, ইয়েস্ স্যার! শুধু তাই নয়, সেই গোলাপীখামে যে ভদ্রলোক চিঠি লিখেছিলেন তাঁর পরিচয়টাও। বাই দ্য ওয়ে মিস্ পামেলা কাপ্রোচ্চি বাড়িতে আছেন তো?

—না নেই। আমরা পুরী থেকে ফিরে আসার সময় সে ওখানেই থেকে গেছে। 'তোশলী স্যান্ডস বীচ'-এ। আজই তার ফেরার কথা।

—অন্তত মিস্ সোমা হাজরা তো আছে? তার কাছে দু-একটা কথা জানার আছে।

দস্তুর বলেন, সরি স্যার। সেও কলকাতায় নেই। দুদিনের ছুটি নিয়ে বর্ধমানে গেছে। তবে আজই তার ফেরার কথা। সন্ধ্যাবেলা।

—তা হলে আমরা এখনই আসব?

—বাই অল মীন্‌স্।

—আমার সঙ্গে নিখিল আর সুকৌশলী দম্পতি থাকবে—

—য়ু আর অল ওয়েলকাম!

দস্তুর-সাহেব দস্তুরমতো উত্তেজিত। বাড়ির বাইরে পায়চারি করছিলেন। পর পর ... গাড়ি এসে ভিড়ল পোর্টেকোতে। পুলিসের জিপ আর কৌশিকের ফিয়াট। সেদিনকার ... বেয়ারা এগিয়ে এসে খুলে দিল ফিয়াট গাড়ির দরজা। দস্তুর আপ্যায়ন করে নিয়ে গি... বসালেন তাঁর বৈঠকখানায়।

বাসু সরাসরি কাজের কথায় এলেন, আমি কলি-মার ঘরটা একটু দেখব। আপনি আপনার সেই ডুপ্লিকেট চাবির থোকাটা নিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

কৌশিক, সুজাতা ও নিখিলকে বললেন, তোমরা এখানেই অপেক্ষা কর। আমরা পনেরো মিনিটের ভিতরেই ঘুরে আসছি।

ঘর থেকে নির্জন করিডোরে বার হয়েই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন দস্তুর। বাসুর হাত দুটি ধরে বললেন, টেল মি স্যার? ইজ ইট রূপেশ?

—নো! ইট ইজ নট! কিন্তু এভাবে মাঝপথে আমাকে রুখে দেবেন না প্লিজ। লোকটাকে আমি চিহ্নিত করেছি। তার পালাবার পথ নেই। কিন্তু নামটা জানানোর আগে আই মাস্ট সিকিওর দ্য মোস্ট ভাইটাল কনক্লুসিভ এভিডেন্স! সবার আগে দেখতে হবে, সেটা যেন বেহাত হয়ে না যায়। আসুন।

দস্তুর আর কথা বাড়ালেন না। দুজনে এসে দাঁড়ালেন কমলকলির তালাবন্ধ ঘরের সামনে। দস্তুর চাবির গোছা থেকে একটি চাবি বার করে গোদ্‌রেজের তালা খুলে দিলেন। ঘরে ঢুকেই তিন-চারটে সুইচ জ্বেলে দিলেন। ঘরটা আলোয় আলো হয়ে গেল। চালু হল এয়ার-কন্ডিশনারটা। বন্ধ করে দিলেন ফ্লাশ পাল্লাটা।

ঘরে একটা প্রকাণ্ড ডবলবেড খাট। একান্তে একটা টেবিলের উপর কমলকলির একটা এনলার্জড ফটো। মাল্যভূষিত। ঘরে ধুনোর গন্ধ। একান্তে সোফা সেটি, সেণ্টার টেবল্। বাসু চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে একটা সোফায় বসে বললেন, বসুন। আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। আমার ধারণা : আমি সমাধানে উপনীত হয়েছি—কিন্তু একটু আগেই যে-কথা বললাম : মার্ডার কেস-এ একেবারে পাথুরে প্রমাণ দিতে না পারলে ডেথ্ সেন্টেন্স হয় না। সেই পাথুরে প্রমাণের সন্ধানেই আমি এখন এসেছি।

দস্তুর বললেন : সার্চ দ্য রুম, ইফ য়ু প্লিজ।

—দেখছি। তার আগে জানিয়ে দিই—আপনাকে টেনশনমুক্ত করতে—সেই গোলাপী রঙের খামে চিঠিখানা বিক্রমজিৎ লেখেনি। আপনার কন্যার সঙ্গে তার বিবাহোত্তর জীবনে কোনোও অসৎ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

—তাহলে কে লিখেছে সেই চিঠিখানা? যেটা আমি তার প্রাইভেট ড্রয়ার থেকে আবিষ্কার করি? আর কে হতে পারে?

—বলছি। তার আগে আপনার হেড কুককে একবার এঘরে আসতে বলুন।

—হেডকুক? অফ্ অল পার্সেন্স, আমার হেডকুক? কেন? ...ও আয়াম সরি।

ঘরের সুইচবোর্ডে একটা কলবেল ছিল। সেটা টিপে দিলেন। এল একজন খিদমদগার। তাকে বললেন, ইসমাইলকে ডেকে দে। বল জরুরী দরকার।

মিনিট-খানেকের ভিতরেই ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল মহম্মদ ইসমাইল। দস্তুর প্যালেসের শেফ্। খানদানী হোটেলে যেমন থাকে সফেদ চোঙামতো টুপি মাথায়। নত হয়ে সেলাম করে বললে, হুকুম ফরমাইয়ে সা'ব? ক্যা বানানা হ্যয়?

দস্তুর তাকে বুঝিয়ে বললেন ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন বাসু-সাহেব—ওঁর খানদানী মেহ্‌মান। লোকটা পুনরায় সেলাম করে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো। বাসু হিন্দিতে বললেন, না, ইসমাইল কোন খাবার বানাবার ফরমায়েশ দেব বলে তোমাকে ডেকে পাঠাইনি। তোমার কাছে দু-একটা খবর জানতে এসেছি। তবে কথাটা তোমার ঠিক ঠাক মনে নাও থাকতে পারে। পাঁচ সাতদিন আগেকার কথা। তোমার যদি ঠিক মতো য়্যাদ না হয় তাহ্‌লে কিচেনের আর পাঁচজন বাবুর্চি খানসামার সঙ্গে শলাহ্ করেও আমাকে জানাতে পার। আমি অপেক্ষা করব।

—লেকিন সওয়াল ক্যা হ্যয়, জনাব?

—মিসেস মালহোত্রা, মানে কমলকলি দিদিমণি যেদিন—মানে, বুধবার উনত্রিশ তারিখ সকালবেলা—ট্রেন ধরতে যান, সেদিন সকালে তিনি কি ব্রেকফাস্ট খেয়ে যান?

—জী হাঁ সা'ব! মেরা য়্যাদ হ্যায়।

—কী খেয়েছিলেন তা কি তোমার মনে আছে?

ইসমাইল লক্ষ্ণৌয়ী বিনয়ে বিগলিত হয়ে খানদানী উর্দুতে যা নিবেদন করল তা এইরকম :

—জী হাঁ সরকার! আমার সম্পূর্ণ স্মরণে আছে। ক্যোও কি আমার হাতের রান্না দিদিমণি সেই শেষবার গ্রহণ করেন। তারপর আর কিছু তাঁকে রেঁধে খাওয়াতে পারিনি। সেদিন ব্রেকফাস্টে আমি তাঁকে পরিবেশন করেছিলাম চারখানি আলুর পরোটা, মুর্গ-মটর, একটা ওমলেট, সালাড, আর দু পিস সন্দেশ। লেকিন উনি মাত্র দু-পিস্ পরোটা নিলেন। ওমলেট ছুঁলেন না। সন্দেশও একটা মাত্র খেলেন।

—কোথায় বসে খেলেন? 'ডাইনিং-হল'-এ?

—জী না। ওঁর ওয়াক্ত কম ছিল। উনি ট্রেন ধরার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলেন। আমি এঘরেই ওঁর খাবার এনে দিয়েছিলাম। ওই টেবিলে বসে উনি ঝট্‌পট ছোট-হাজ্‌রি খেয়ে নিলেন।

—ঘরে তখন আর কে ছিল? আর কে তাঁকে এঘরে বসে খেতে দেখেছে?

—আর কে থাকবে হুজুর? সোমা দিদিমণি শুধু ছিলেন। আর পরে রতন জুঠা বর্তন উঠিয়ে নিতে এসেছিল। সে দেখেছে। রতনের নিশ্চয় য়্যাদ হবে। ক্যোও কি দিদি রতনকে বলেছিলেন, 'রতন পরোটা আর ওমলেট জুঠা করিনি। তুই খেয়ে নিস্।'

বাসু জানতে চান, তখন দিদিমণি কি একটা কালো শিফন শাড়ি পরে ছিল?

—হুজৌর, 'শিফন' কাকে বলে আমি জানি না। তবে দিদিমণি ঘোর কালো রঙের মসলিন-তরিকা শাড়ি পরেছিলেন, ওই কাপড়ে তৈরি জ্যাকেট ভি পিহ্‌নে হুয়ে ব্রেকফাস্ট খায়ী!

বাসু দস্তুরের দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললেন, লোকটার মেমারি অ্যাপ্রিশিয়েট করতে আমি যদি ওকে একশ টাকা বক্‌শিস্ দিই আপনি কিছু মনে করবেন?

—অফকোর্স! বলে দস্তুর ঘুরে দাঁড়ালেন তাঁর হেডকুকের দিকে। পকেট থেকে একটা পাঁচশ টাকার নোট বার করে তাকে দিয়ে বললেন, সাহেব তোমাকে এই 'তোফা' দিতে বলছেন, দিদিমণিকে তুমি ভালবাস, তাঁর কথা তোমার এত চমৎকার ভাবে মনে আছে। তারই জন্যে এই তোফা।

লোকটা লম্বা সেলাম দিয়ে বিদায় হল।

বাসু বললেন, এবার চলুন, মিস্ সোমা হাজ্‌রার ঘরটা দেখব।

—আসুন।

কিন্তু সোমা হাজরার ঘরে ঢোকায় বাধা পড়ল। সে ঘরটা প্রাসাদের পশ্চিমপ্রান্তে, একান্তে। ঘরের দরজা দু-পাল্লার, সেগুনকাঠের রেইজড-প্যানেল পাল্লা। তাতে গোদরেজের তালা নেই। দুটি পিতলের কড়ায় ঝুলছে একটা মোক্ষম নবতাল। তদুপরি হ্যাস্‌প্ বোল্ট-এ আর একটা মজবুত চাইনিজ লক! দস্তুর বললেন, এ তালার ডুপ্লিকেট চাবি আমার রিঙে নেই দেখছি। মনে হচ্ছে, সোমা নিজেই এই দুটি তালা কিনে এনে লাগিয়েছে।

বাসু বললেন, তাহলে আপনার ড্রাইভারকে ডাকুন। গাড়ি থেকে টুল-বক্সটা নিয়ে আসুক। তালা দুটো এখনি ভাঙতে হবে। তাছাড়া নিচে খবর পাঠান—ওরাও চলে আসুক। সর্বসমক্ষে তালা দুটি আমি ভাঙতে চাই।

দস্তুর বললেন, আজ বিকালেই কিন্তু মিস্ হাজরা ফিরে আসবে।

—আই ডোন্ট কেয়ার! আধঘণ্টার ভিতর তালা দুটি ভেঙে ফেলতে হবে।

তাই হল। ওঁরা বৈঠকখানায় গিয়ে আবার বসলেন। আধঘণ্টার মধ্যেই দস্তুরের সেক্রেটারি—পামেলা নন, ইনি পুরুষ—এসে খবর দিলেন তালা দুটি ভাঙা হয়েছে; কিন্তু হ্যাস্প-বোল্ট বা হুড়কো এখনো খোলা হয়নি।

ওঁরা উপরে উঠে এলেন। বাসু স্বহস্তে হুড়কো সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ছোট ঘর। দুটি জানলাই বন্ধ। একটা সিংগ্‌ল বেড খাট। ড্রেসিং টেবিল। খান দুই চেয়ার। একটা ক্যানভাসের ইজিচেয়ার, ওপাশে দেওয়াল ঘেঁষে গোদরেজের স্টিল-আলমারি। খাটের উপর বিছানার চাদর মেঝে পর্যন্ত লুটানো।

সেটা তুলে দেখা হল। নিচে খান-দুই স্যুটকেস। তালাবন্ধ।

বাসু জানতে চান, ওই স্টিল-আলমারিটা কার? আপনার না সোমা হাজরার?

—আলমারিটা হাউস-প্রপার্টি। কিন্তু ভিতরে বোধহয় রাখা আছে সোমার কাপড় জামা। আমি ঠিক জানি না। কলি অথবা পামেলা থাকলে বলতে পারত।

—ওর চাবি আছে আপনার কাছে?

—ঠিক জানি না। চাবিটা ছিল 'কলি'র কাছে। সে হয়তো সোমাকে দিয়েছে। তবে এর ডুপ্‌লিকেট হয়তো দীর্ঘদিন আমার কাছেই অব্যবহৃত পড়ে আছে।

—লেট্‌স্ সি।

—কিন্তু কাজটা কি ঠিক হবে? সোমা তো আজ সন্ধ্যাতেই...

কথাটা শেষ হল না। বাসু এগিয়ে এসে ওঁর হাত থেকে চাবির গোছাটা কেড়ে নিয়ে দস্তুরের সেক্রেটারিকে দিলেন। বললেন, প্লিজ ট্রাই টু ওপন আপ্।

দু-তিনটি থোকায় ত্রিশ-চল্লিশটা চাবি। ভদ্রলোক একটার পর একটা চাবি দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যান। নিখিল অস্ফুটে প্রশ্ন করে, ওর ভিতরে আপনি কী খুঁজতে চাইছেন, স্যার? কী থাকতে পারে ওই আলমারির ভিতর?

—দ্য লাস্ট পীস্ অব দ্য জিগ্‌স পাজল। সেই চাঁপা রঙের মুর্শিদাবাদী শাড়িখানা—যেটা পরে কলি এ বাড়ি ছেড়ে যায়।

নিখিল প্রতিবাদে কী একটা কথা বলতে যায়। তার আগেই দরজার কাছ থেকে শোনা যায়

মহিলা কণ্ঠে একটা আর্তনাদ : একি? একী? আপনারা এখানে কী করছেন? তালা ভেঙে আমার ঘরে ঢুকে...

সবাই এপাশ ফিরে দেখেন দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে সোমা হাজরা। তার কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী ঝোলা ব্যাগ। আর কী আশ্চর্য! তার পরিধানে চাঁপা রঙের একটা মুর্শিদাবাদী শাড়ি!

বাসু বলে ওঠেন, দেয়ার য়ু আর!

তারপর সুজাতা আর কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, কী হে 'সুকৌশলী'? চাঁপা-রঙের মুর্শিদাবাদী শাড়ি নাকি বাজারে বিক্রি হয় না।

ঠিক তখনি দস্তুরের সেক্রেটারির হাতের চাপে আলমারির হ্যান্ডেলটা ঘুরে যায়। তিনি বলে ওঠেন, খুলে গেছে, স্যার!

সোমা হাজরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিতে যায়। তাকে রুখে দেয় নিখিল। বলে, প্লিজ ডোন্ট অবস্ট্রাক্ট আস। আলমারির ভিতর কী আছে আমাদের দেখতে দিন। আপনার সামনেই আমরা তা দেখব।

—না, না, না! তা আপনারা পারেন না। আগে সার্চ ওয়ারেন্ট না করিয়ে আমার ঘরের ভিতরেই আসতে পারেন না।...

বাসু বলেন, কারেক্ট! আন্ডার সেকশান, 442 অব ইন্ডিয়ান পেনাল কোড অনধিকার প্রবেশ! তাছাড়া তালাভাঙা, আন্ডার সেকশান 445 অব I. P. C

সোমা ঘুরে দাঁড়ায় বাসু-সাহেবের মুখোমুখি। গলায় বিষ ঢেলে বলে, আপনি, আপনিই যত নষ্টের গোড়া। আপনি নিজেকে কী ভাবেন বলুন তো? শাহ্-য়েন-শাহ্! বাদশাহ্? যা ইচ্ছে করবেন?

বাসু-সাহেব একটি ছদ্মকুর্নিশ করে বলেন, জী নেহী জাহানারা বেগম-সাহেবা। বান্দা তো হ্যাঁয় হুজুরাইনকী নফর!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে ওঠে ইন্সপেক্টার নিখিল দাশ।

—কী? কী বললেন? জাহানারা বেগম-সাহেবা?

—ইয়েস ইন্সপেক্টার দাশ! নেড়া কাশেমের সাগরেদ জাহানারা বেগম কুয়েত, বা দুবাই চলে যাননি। দস্তুর-প্যালেসে চাকরি নিয়েছিল কলির কম্পানিয়নের পরিচয়ে! ঠিক দু-বছর আগে।

সোমা হাজরা চিৎকার করে ওঠে, কে? কে জাহানারা বেগম? আপনি...আপনারা...

বাসু ডান হাতটা তুলে তাকে মাঝপথে থামিয়ে দেন। বলেন, একটি কথাও বল না সোমা! যতক্ষণ না তোমার পক্ষের সলিসিটার উপস্থিত হচ্ছেন। সে কন্সটিটিউশানাল রাইট তোমার আছে। কারণ নিখিল তোমাকে অ্যারেস্ট করছে একটা মারাত্মক চার্জে : এইডিং অ্যান্ড অ্যাবেটিং অ্যা ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার!

নিখিল নিঃশব্দে এগিয়ে আসে। সোমা হাজরার হাতে পরিয়ে দেয় স্টেনলেস্ স্টিলের একজোড়া বালা। আলমারির হ্যান্ডেল ঘোরানো গিয়েছে আগেই। নিখিল কারও অনুমতির অপেক্ষায় থাকল না। টেনে খুলে দিল আলমারির পাল্লাটা। সামনেই জড়ো করে রাখা একটা কালো শিফনের শাড়ি-জ্যাকেট।

সোমা দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে একটা চেয়ারে।

তেরো

আধঘণ্টা খানেক হল ওঁরা নিউ আলিপুরের ডেরায় ফিরে এসেছেন। নিখিল আসেনি। সে বাড়ি গেছে। তার স্ত্রী কাকলিকে নিয়ে আসতে। বলে গেছে, আমাদের দুজনের আজ রাত্রে আপনার বাড়িতে নিমন্ত্রণ। মামিমাকে রান্নাবান্নার হাঙ্গামা করতে বারণ করবেন। আমি সাত-আট প্যাকেট চিকেন বিরিয়ানি আর মাংস নিয়ে আসব। ডিনার খেতে খেতে শুনব : কী করে আপনার জিগ্‌স পাজ্‌লটার সমাধান হল। বাই দ্য ওয়ে স্যার—আপনি রাত্রে কী খাবেন?

—জানি না। তোমার মামিমা আজ আমার জন্য কী বরাদ্দ করেছেন। বোধকরি দুধ-সাবু!

—না, স্যার। আজ একটা ডে-অব-এক্‌সেপশান। আপনিও খাবেন চিকেন বিরিয়ানি। কিচ্ছু হবে না। আমি মামিমাকে বলব।

—দেখ, যদি পুলিসের হুম্‌কিতে সে রাজি হয়।

ও বাড়িতে মূল ঘটনার যবনিকা পড়ে গেছে। জাহানারা মেয়াদ খেটেছে, তার ফিঙ্গার-প্রিন্ট লালবাজারে সযত্নে সংরক্ষিত। তাছাড়া তার আলমারির ভিতরে সিক্রেট-ড্রয়ার থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে কমলকলির যাবতীয় গহনা—পান্নাবসানো নেকলেসটা বাদে অবশ্য। নেড়া কাসেম বোধহয় ভেবেছিল—পুলিশ কলকাতা শহরের হাজারটা বাড়িতে তল্লাসি করলেও শুধু 'দস্তুর প্যালেসে' করবে না। গোদরেজ আলমারির চাবিটা কমলকলি অনেকদিন আগেই দিয়েছিল সোমাকে—ওই আলমারিটা ব্যবহার করতে। নিখিলের ব্যবস্থাপনায় সোমা হাজরা ওরফে জাহানারা বেগমকে জেনানা হাজতে অপসারিত করা হয়েছে।

বাসু-সাহেব এ কেসে কোনও ফী নিতে অস্বীকার করেছেন। বলেছিলেন, আমি মূলত ডিফেন্স কাউন্সেলার। নিরপরাধ আসামীকে বাঁচানোই আমার ধর্ম। এ ক্ষেত্রে আমি স্বধর্মচ্যুত হয়েছি। প্রসিকিউশনের তরফে কাজ করেছি। কলি-মায়ের প্রাণটা তো ফেরত দিতে পারব না। সুতরাং...

দস্তুর জনান্তিকে বলেছিলেন, কিন্তু আপনি প্রকারান্তরে আমার মনে শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন। আমার মেয়েকে কলঙ্কমুক্তা করেছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন, কলির মৃত্যুর পর তার চাবির থোকাটা সোমার হেপাজতে এসে যায়। সন্দেহটা বিক্রমজিতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে সোমাই ওই চিঠিখানা কলির ড্রয়ারে রেখে দেয়।

—তা হোক! এক্ষেত্রে আমি কোন ফি নেব না।

কৌশিক সুজাতাও জোড়হস্তে বলেছিল, প্লিজ স্যার! আমরাও এক্ষেত্রে কিছু নিতে পারব না।

রাত সাড়ে-আটটা নাগাদ বিরিয়ানি পোলাওয়ের একগাদা প্যাকেট নিয়ে নিখিল সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হল। সবাই জমিয়ে বসলেন ড্রইংরুমে। নিখিল বলে, এবার বলুন, স্যার, কী করে বুঝলেন? প্রথমে বলুন, সোমা হাজরাকে প্রথম কখন সন্দেহ করতে শুরু করেন?

—যখন সে বেমক্কা আমাকে প্রশ্ন করে বসল : 'দিদি সেদিন কীরকম ড্রেস পরেছিলেন জানেন?' ফর আ সপ্লিট সেকেন্ড আমার মনে প্রশ্ন জাগল—এ কথা ও জানতে চাইল কেন? আমি সঙ্গে সঙ্গে বল্‌লাম, 'হ্যাঁ, শুনেছি। একটা চাঁপা-রঙের বেনারসী।' দেখলাম, ও দৃঢ় প্রতিবাদ করল। উইথ গাস্টো সে প্রমাণ করতে চাইল—না, চাঁপারঙের বেনারসী নয়, কালো শিফন শাড়ি। আমার মনে প্রশ্নটা বারবার উঠছিল—কেন? কেন? কেন? আমি ভেবে

দেখলাম—আমাদের পরিচিত ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে একমাত্র সোমা হাজরাই জানে যে, 'সি' কূপেতে কমলকলি একা যাচ্ছে দশ লাখ টাকার গহনা নিয়ে। সে নিজেই যদি খুনটা করে তাহলে তার প্রথম কাজ হবে টাইম ফ্যাকটারটাকে গুলিয়ে দেওয়া। কিন্তু একা হাতে সে খুনটা করতে পারে না। যদি কেউ তার সহকারী থাকে তাহলে পারে। সুযোগমতো সে ক্লোরোফর্ম ভেজানো রুমালটা চেপে ধরবে কলির নাকে। ওর সহকারী ধরে থাকবে কলির হাত দুটো। কলি অজ্ঞান হয়ে গেলে দুজনে কাজ হাসিল করে লাসটাকে বেঞ্চির নিচে চালান করে দেবে। আমার মনে হল তা যদি ঘটে থাকে তাহলে ওরা সেটা করেছে খড়্গাপুর বালাসোরের মাঝামাঝি—অ্যারাউন্ড বেলা সাড়ে বারোটা থেকে একটা নাগাদ। সেক্ষেত্রে বালাসোরে ওর সহকারী অর্থাৎ নেড়া করিম কলির মালপত্র নিয়ে নেমে যায়। ক্লোকরুমে জমা দেয়। সোমার কাছে ছিল ওই কালো শিফন শাড়ির ডুপ্‌লিকেট সেট। ইন ফ্যাক্ট সে নিজেই কমলকলিকে ওই স্ট্রাইকিং পোশাকটা বেছে দেয়। দুটি কারণে—যাতে ফর্সা কমলকলি একটা কন্সপিকুয়াস চটকদারী ফিগর হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, ওর নিজের কাছে একটা ডুপ্লিকেট শিফন শাড়ির সেট আছে।...ডেডবডি বেঞ্চির নিচে পাচার করে নেড়া করিম যখন বালাসোরে নেমে গেল তখন 'সি' কূপের দরজায় ছিটকিনি দিয়ে পোশাক বদলিয়ে সোমা বসল জানলায়। ভদ্রক স্টেশনে সে ম্যাগাজিন ভেন্ডারকে ডেকে টাকা-পঁচিশের পত্রিকা কিনে পঞ্চাশটাকা দিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য : ভেন্ডারটা যাতে ফার্স্টক্লাস কূপেতে একজন কালো শিফন পরা ফর্সা মহিলাকে মনে রাখতে পারে। তার রূপযৌবন, বা গা দেখানো কালো শিফন শাড়ির জন্য না হলেও ওই পঞ্চাশটাকার নোট দিয়ে ভাঙানি না চাওয়ায়। সোমাই গোলাপী কাগজে প্রেমপত্র দুটি লেখে। একটি রেখে দেয় কলির ড্রয়ারে—চাবি তার কাছেই ছিল কলির মৃত্যুর পর। দ্বিতীয়টা ট্রেনের কামরায় ওর ভ্যানিটি ব্যাগে। কলির টেলিফোন রেকনয়টারে 'অলি' এন্ট্রিটাও তারই করা।

নিখিল জানতে চায়, তাহলে সে নামল কখন? কোথায়?

—সম্ভবত ভদ্রকের পরের স্টেশনেই—যাজপুর কেওনঝড়ে। হত্যাকাণ্ডটা যে ভদ্রকের পরে হয়েছে—অর্থাৎ সোমার জবানবন্দি হিসাবে সে নিজে বালাসোরে নেমে যাবার পর—এটা এসট্যাব্‌লিশ করতে মার্ডার ওয়েপনটা সে ছুঁড়ে ফেলেছিল বিটুইন ভদ্রক অ্যান্ড যাজপুর।

কৌশিক বলে, কিন্তু পোর্স্ট-মর্টেমে অটোপ্সি সার্জেন কেন বললেন মৃত্যুর সময় সাড়ে তিনটের আগে নয়? তিনি তো ভদ্রক স্টেশনে কমলকলিকে জীবিত দেখতে পাওয়ার কথা জানতেন না!

—কারেক্ট। কিন্তু তিনি কীভাবে টাইম ফ্যাক্টারটা স্থির করলেন? খুব সম্ভবত মৃতের পাকস্থলী এবং অন্ত্রে খাদ্যের জীর্ণতার সূত্র ধরে। পাকস্থলীতে তিনি যে খাদ্য পেয়েছেন তা থেকে বুঝেছেন : খাদ্যগ্রহণের তিন সাড়ে-তিন ঘণ্টা পরে পরিপাক যন্ত্র কাজ করা বন্ধ করেছে। কারণ লোকটা মারা গেছে। তিনি পুলিসের কাছ থেকে জেনেছেন যে কমলকলি লাস্ট মিল বা ব্রেকফাস্ট খেয়েছে খড়্গপুরে। অর্থাৎ বারোটা সওয়া বারোটায়। সুতরাং তার তিন সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে—বিটুইন ভদ্রক অ্যান্ড যাজপুর সে মারা গেছে। অটোপ্সি সার্জেনের বিচার নির্ভুল। কিন্তু বাস্তবে কমলকলি ব্রেকফাস্ট খেয়েছিল বেলা নয়টায়। বাড়িতে। ফলে তারপর তিন সাড়ে তিন ঘণ্টা যোগ দিলে হয় বারোটা সাড়ে বারোটা।

সুজাতা প্রশ্ন করে, কিন্তু নেড়া করিম যে বেঁটে আর মোটা এটা আন্দাজ করলেন কেমন করে?

—খুব সহজে। হত্যাপরাধটা রূপেশ অথবা বিক্রমজিতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল সোমা। ও জানত না—কার কী জাতের 'অ্যালেবাই' আছে। তাই লোকটাকে খুব বেশি চিহ্নিত করেনি। তবে রূপেশ ও বিক্রমজিত দুজনেই রোগা ও লম্বা। আমার মনে হল যে, নেড়া করিমও যদি রোগা এবং লম্বা হয় তাহলে সোমা কিছুতেই ও কথা বলত না। সে বলত, ভদ্রলোক রোগা কি মোটা, লম্বা কি বেঁটে তা সে নজর করেনি। এ থেকেই আন্দাজ হল জাহানারা বেগমের সহকারী ছিল হয়তো মোটা আর বেঁটে!

এই সময়ে বিশে এসে জানালো দস্তুর-সাহেবের ড্রাইভার সাহেব এসেছেন। তিনি দেখা করতে চান।

বাসু বললেন আসতে বল তাকে।

লোকটা এসে স্যালুট করল। তার হাতে একটা বিগ শপার ব্যাগ। একটি খাম সে হস্তান্তরিত করল বাসু-সাহেবকে।

একই রকম খাম, একই রকম কাগজ। খামটা খুলে উনি পড়লেন :

"প্রিয় ব্যারিস্টার-সাহেব,

পত্রবাহকের হাতে কয়েকটি জিনিস পাঠালাম :

1.A. কলকাতা পুলিসের কাছ থেকে পান্না-বসানো (বিশদ বিবরণ-সহ) একটি নেকলেস প্রাপ্তির রসিদ।

1.B. ইন্সপেক্টর দাশের মিসেসকে আমি সেটা উপহার দিচ্ছি—এই মর্মে একটা স্বীকারোক্তি। প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি টেলিফোনে জানিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়েছি।

2. কলির সেই কসম্যাটিক কম্প্যাক্টের বাকি গহনাগুলি। এগুলি আপনার নাতনির জন্যে আমার আশীর্বাদী। তার বিবাহের সময় আপনি-আমি হয়তো উপস্থিত থাকব না এটা তার বিবাহে আমার অগ্রিম আশীর্বাদ ও যৌতুক। কী জানেন বাসু-সাহেব? ওই গহনাগুলো এ-বাড়িতে রাখতে মন সরছে না। মর্মান্তিক দুঃখ বিজড়িত স্মৃতিচিহ্ন। যদি নিখিলবাবু ও কৌশিকবাবু মনে করেন এই অলঙ্কারগুলি অশুভ ও অভিশপ্ত তাহলে তাঁরা যেন গহনা ভেঙে নতুন করে গড়ে নেন। আমাকে যেন প্রত্যর্পণ না করেন। বাকি রইলেন আপনি নিজে এবং মিসেস বাসু-আপনার জন্য এক বোতল 'রয়্যাল স্যালিউট' পাঠালাম। দুঃখ ভোলাতে এমন ওষুধ আর নেই। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি! সবচেয়ে বড় কথা : আপনি 'কলি'কে মিথ্যা কলঙ্ক থেকে মুক্ত করেছেন। আমাকে শান্তি দিয়েছেন। কন্যার স্মৃতির সঙ্গে কোনো ক্লেদ যুক্ত হয়ে রইল না। মিসেস বাসুই একমাত্র ব্যতিক্রম। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ব্যতীত আর কোন উপহার পাঠালাম না। সে ধৃষ্টতা দেখাবার স্পর্ধা আমার নেই। বিবাহসূত্রে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁকে যে রত্নটি উপহার দিয়েছেন, তার পর আর কোনো পার্থিব উপহার তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎ।

ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

ইতি
ভাগ্যহীন
জগৎপতি দস্তুর।"